বাংলার চালচিত্র

আবদুল জব্বার

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

দ্বিতীয় মুদ্রণ, মাঘ ১৩৭১

প্রচ্ছদপট

অঙ্কন—শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী

মুদ্রণ—রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশি
ও সূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য, তাপসী প্রেস ৩০ বিধান সরণী কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রি

প্রকৃতির কবি, মানব-মনের মরমী,
বাস্তবের নিখুঁত শিল্পী,
'পথের পাঁচালী' আর 'আরণ্যকে'র
অবিনশ্বর সাহিত্যিক
স্বর্গত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রদ্ধাস্পদেষু—

লেখকের অন্যান্য বই :

ইলিশমারির চর

মুখের মেলা

মাতালের হাট

ঝিনুকের নৌকো

বিদ্রোহী বাসিন্দা

মাটির কাছাকাছি

রূপের আগুন

দুটো কথা

'বাংলার চালচিত্র' বইখানি ছাপা হয়ে বেরিয়ে গেল। এতে আমি বড়ই খুশী হয়েছি—একটা সাহিত্যিক আনন্দ, তার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক আনন্দ,—'সমাজ' অর্থে আমি সমগ্র মানব-সমাজের কথা ভাবছি। আর একটি ছোট কথা—একটু ভাষাতাত্ত্বিক আনন্দও পেয়েছি। আজকাল আর কিছুই না হোক বাঙালীর মধ্যে তার ভাষার সাহিত্যের গৌরব এখনো অক্ষুণ্ণ আছে। জীবনের সব দিকেই বাঙালী হটে আসছে—এটি একদিকে যেমন বাইরের প্রতিকূলতায় তাকে দাবিয়ে রাখছে অন্যদিকে সে নিজেই 'স্বখাত সলিলে' ডুবে মরছে। বাংলায় এখনো বড় বড় উপন্যাস, বড় গল্প, ছোট গল্প, নানা রকমের প্রবন্ধ, আর তাছাড়া অবোধ্য, দুর্বোধ্য, বোধগম্য, জ্ঞানগোচরের অতীত রকমারি কবিতা বেরোচ্ছে; আমাদের মতো অন্য পাঁচ কাজ নিয়ে যারা ব্যস্ত তাদের পক্ষে এসব ব্যাপারে মন দেওয়া, আর এই ভীষণ খরস্রোতা সাহিত্য-নদীতে সাঁতার দেওয়া অসম্ভব ব্যাপার। ক্বচিৎ কখনো সাহিত্যিক বন্ধুদের মুখে ঝাল খেতে হয়, মনে জানবার ইচ্ছা আছে, তাঁদেরই জিজ্ঞেস করি, ভাল বই কি বেরুল আর তাঁদেরই সুপারিশ মতো দু'চারখানা বই যোগাড় করে পড়বার চেষ্টা করি। কখনো কখনো খুব ভাল লাগে, পুলকিত হই, বন্ধুদের কৃতজ্ঞতা জানাই। আবার কখনো কখনো তাঁদের পছন্দ করে দেওয়া বই ভাল লাগে না। এ বিষয়ে আমি নাচার। সেই যে ল্যাটিন কথা আছেঃ রুচি নিয়ে ঝগড়া বা মারামারি চলে না।—আবার কখনো কখনো এমন হয় যে, আচম্‌কা চোখের সামনে একটা লেখা—গল্প বা উপন্যাস, এমন কি আধুনিক কবিতা এসে গেল, আর সেটা পড়ে অত্যন্ত ভাল লাগল, মনে হল, নতুন জিনিস যেন আবিষ্কার করলুম। রাজশেখর বসুর 'গড্ডালিকা' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—ভোরের বেলা উঠে একদিন যদি বাড়ীর সামনে দু'গাছা দূর্বাঘাস গজিয়ে উঠেছে দেখি, তাতে আশ্চর্য কিছু থাকে না কিন্তু যদি দেখি রাতারাতি একটি বিরাট বনস্পতি গজিয়ে উঠেছে, তাহলে মনে বিস্ময় জাগে বৈকি!—এই ধরনের মনোভাব আমি 'দেশ' পত্রিকার পাতায় যখন শ্রীযুক্ত আবদুল জব্বারের 'বাংলার চালচিত্রে'র কতকগুলি রচনা পড়েছিলুম, আমার মনকেও যেন অভিভূত করেছিল। মনে মনে আফসোস হল, হায় রে! এই ভদ্রলোক

সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে জানি না কত মাস এই রকম অপূর্ব সত্যজীবনচিত্র এঁকে যাচ্ছেন, তার কোনো হদিস আমার কাছে এল না! পুরনো 'দেশ' পত্রিকাগুলি খুঁজে বার করে যতগুলি পেলুম, সবগুলির 'বাংলার চালচিত্র' পড়ে ফেললুম। প্রত্যেকটিই অপূর্ব, খাঁটি কথায় ভরা—আর একটি জিনিস এগুলির মধ্যে দেখলুম, এঁর রচনা যে মেকি নয় তার প্রমাণ জীবনের সব দিক নিয়ে বাংলার ঘরোয়া শব্দে ভরপুর। আর সেই সব শব্দ স্বাভাবিকভাবেই তিনি ধরে দিয়ে গেছেন, আর এতে ইনি একটা আনন্দ পেয়েছেন; সেইজন্য কখনো একটু অকৃপণ হাতেই এই সব শব্দ পরিবেশন করেছেন। এতে এঁর বইয়ের একটা 'ডকুমেণ্টারী ভ্যালু' অর্থাৎ যাকে নক্‌লী হিন্দুস্থানীতে বলা যায় 'দলীলানা কীমৎ' আছে।

যাই হোক, কিছু ভাল লাগলে চুপ করে থাকতে পারি না। ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করবার বাসনা হল। টেলিফোনে সাগরময় বাবুর কাছে খোঁজ নিলুম। তার দু'চারদিন পরেই আবদুল জব্বার সাহেব সশরীরে হাজির। আলাপ করে আরো ভাল লাগল। আলাপ করে দেখলুম, আমাদের দক্ষিণ বাংলার বিশেষ করে কলকাতার দক্ষিণে—হিন্দু আর মুসলমান বাঙালী অধিবাসীর, আর এখানে যারা বসবাস করছে—যেমন কাবুলিওয়ালা, বেহারী মুচি, চাষী, বাইরে থেকে আগত ফকির-মিস্‌কিন, আলেম-মোল্লা, সাধু-সন্ন্যাসী, চটকল-শ্রমিক, জেলে, সাপুড়ে, হিজড়ে, কাঠুরে, সেদো, থানার দালাল, দর্জি, কসাই, তাঁতী, তিয়োর, মদের ভাটিওয়ালা, গরাণ কাঠের মহাজন, শিউলি, কুমোর, গরু ব্যাপারীর দালাল—এদের সম্বন্ধে পুরোদস্তুর ওয়াকিফহাল! কথা-বার্তায় একটি সহজ সারল্য আর তার সঙ্গে চিত্তের অদ্ভুত সংস্কারমুক্ত ভাব আমাকে আকৃষ্ট করল। আর এছাড়া হিন্দু বা অহিন্দু, মুসলিম বা গ-য়ের মুসলিম—এসব লৌকিক সংকীর্ণতার একেবারে উর্ধ্বে।

এঁর বইয়ের সম্বন্ধে আমি এঁকে একখানি যে চিঠি লিখেছিলুম সেটি ইনি রেখে দিয়েছিলেন। সেই চিঠির কতকটা অংশ এঁর বই সম্বন্ধে আমার এই 'দুটো কথা'র সঙ্গে আমি জুড়ে দিচ্ছি। সেইটাই হবে আমার প্রথম পাঠের আনন্দের ভেট।

…আপনার লেখা আর লেখার মধ্যে নিহিত সত্য কথা, খাঁটি কথা, কাজের কথা বলবার যে একটা সার্থক চেষ্টা দেখেছি, সেটাই আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে। আপনার লেখায় আমাদের এই সুখদুঃখময় জীবনের যে

ছবি ফুটে উঠেছে, সততায় আর শক্তিতে সেটা আমার কাছে অতুলনীয় লেগেছে। আপনি নিজে নিজেকে যা মনে করেন, সেটুকু স্পষ্ট করে জোবের সঙ্গে বলতে আপনার দ্বিধা বা সংকোচ নেই—এর মূলে আছে আত্মসম্মানবোধ। 'স্বে মহিম্নি'—নিজের মহিমায় আপনি দাঁড়িয়ে আছেন। এ বিষয়ে কারো তোয়াক্কা রাখেন না। এরকম মনের জোর দুর্লভ। আমি নিজে তিন-পুরুষে' কেরানী ঘরের ছেলে, গরীব মধ্যবিত্ত পরিবেশে মানুষ, মোতীশীলের ফ্রি ইস্কুলে আট বচ্ছব কবে আমরা চার ভাই পড়েছি—জুতোর অভাবে খালি পায়ে, ছাতার অভাবে বর্ষায় স্লেট মাথায় দিয়ে ইস্কুলে গিয়েছি। লোকে অনেক সময় ছেলেবেলার কথা ভুলে যায়। যাই হোক, আপনি মানুষকে বড়ো করেই দেখেন—নিজের আত্মসম্মানবোধ আছে বলে অপরকেও তাব প্রাপ্য সম্মান দিতে আপনাব আটকায় না। আপনার 'চালচিত্র' এখন থেকে প্রতি সপ্তাহেই আগ্রহের সঙ্গে প্রতীক্ষা করে পড়ছি—প্রত্যেকটিই চমৎকার লাগছে। যথাকালে বইয়ের আকাবে এগুলো বেরোবে, আমি তাবই প্রতীক্ষা করছি।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

নিবেদনমিদং

'বাংলার চালচিত্র' নামটির উদ্ভাবক শ্রদ্ধেয় শ্রীসাগরময় ঘোষ। তাঁর বদান্যতা ও স্নেহ জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে আমার—তাঁর আহ্বান রূপ নিয়েছে আমার জন্য এক পরম আশীর্বাদে।

১৯ জুলাই '৬৯ থেকে ২৫ এপ্রিল '৭০ পর্যন্ত বিখ্যাত ও মর্যাদাবান 'দেশ' পত্রিকায় 'বাংলার চালচিত্রে'র সমস্ত রচনাগুলি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। তা থেকে ছোট বড আটটি রচনা আমরা বাদ দিয়েছি। কিন্তু পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার হুবহু চেহারা বর্তমান গ্রন্থে নেই, কিছু কিছু যোগ-বিয়োগ করা হয়েছে।

যে সমস্ত গুণীজ্ঞানী, সাহিত্যরসিক, পাঠকপাঠিকাগণ পত্র বা আলোচনার সাহায্যে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত করেছেন এবং ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধন করতে সুযোগ দিয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমি ঋণী রইলাম।

যাদের কথা আমি লিখেছি তারা অনেকেই আসল নামে জীবিত অথবা মৃত ব্যক্তি, কিন্তু ছদ্মনাম তাদেরই কপালে জুটেছে যারা দুশ্চরিত্র বলে সমাজে পরিচিত।

তথ্যভিত্তিক রচনার মধ্যে গল্পের আকারে আমি জলজ্যান্ত মানুষ এনেছি, চরিত্র এনেছি—এরা গাঁয়ের মানুষ, ক্ষেতে-খামারে, কলে-কারখানায় কাজ-করা অন্ধকারের প্রাণী। রুচিশীল সাংস্কৃতিক আলোকমঞ্চে এরা আসন পাবে কিনা এবং পেলেও নিচের তলার ধুলোমাটিতে এ যুগেও এরা অপাংক্তেয় হয়ে বসে থাকবে কিনা দেশের সাহিত্যের রথী মহারথী পণ্ডিত মনীষী মহাজনরা তা বিচার করবেন। আমি ভূমিহীন কৃষক ও কারখানা শ্রমিকের ঘরের সন্তান, সুখে-দুঃখে আজো আমি তাদের কোলেই রয়েছি। তাদের যেমন দেখেছি, জেনেছি, নির্ভেজালভাবে কোনো রঙ না চড়িয়ে সেইভাবেই চিত্রিত করেছি।

'বাংলার চালচিত্র' গ্রন্থাকারে প্রকাশের লগ্নে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক গগনের যেসব উজ্জ্বল নক্ষত্র স্বনামধন্য যশস্বী সাহিত্যিক, কবি, শিল্পী এবং গুণীজ্ঞানী মহাজনদের সহৃদয় প্রশংসালাভ করতে পেরেছি সবিনয়ে প্রত্যেকের উদ্দেশে সশ্রদ্ধ নমস্কার এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

স্বর্গত কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব, যাঁর স্নেহচ্ছায়ায় আমার দীর্ঘ ছ-বছর

সূচীপত্র

			পৃষ্ঠা
গরুহাটা বিবিরহাট : উলুবেড়িয়া	…	…	১
মিঠেজল : রুপোলী ইলিশ/পাথর কালো জেলে	…	…	৮
শ্যামগঞ্জের বড় সরদার	…	…	১৭
চাষীবাড়ির সাদিয়া	…	…	২৪
সাপ মন্ত্র এবং সাপুড়ে ঈশ্বর ঢালি	…	…	৩২
জনক	…	…	৪৪
দর্জিপাড়া মেটিয়াব্রুজ	…	…	৫৪
বৃহন্নলা সংবাদ	…	…	৬১
তিয়োর বোনে বাঁশের আটল	…	…	৬৯
ধানের নাম লক্ষ্মী	…	…	৭৬
সাগরদ্বীপের মহাজন	…	…	৮৪
থানার দালাল	…	…	৯৭
কান্না কবর কিয়ামত	…	…	১০৪
জিব্রিলের ডানা	…	…	১১৫
হলদে টাকা : সোনালী চাঁদ	…	…	১২৩
সরাবন তহুরা	…	…	১৩৩
সেয়ানে সেয়ানে	…	…	১৩৮
মোল্লা এবং মল্লিক সাহেব	…	…	১৪২
পান	…	…	১৫১
বদলিওয়ালা	…	…	১৬০
বাবা বড় কাছারী	…	…	১৭৫
কুমোরবাড়ি : কলসী-হাঁড়ি	…	…	১৮৩
মা মনসা : বাবা শা-ফরিদ	…	…	১৯৪
কাবুলিওয়ালা	…	…	২০৫
মাংস এবং কসাই	…	…	২১৩
জয়নগরের মোয়া	…	…	২২৩

			পৃষ্ঠা
শামদ্দি জেলে এবং সমুদ্র	...	.	২৩৪
কাঠ কাটে কাঠুরে	...	...	২৪৪
বুভুক্ষা	...	...	২৫৩
দানসাদ মিস্ত্রির কথা	...	...	২৭০
মনের ছবি : গ্রিগরের ঘোড়া	...	...	২৮২
হরিজন	...	...	২৯২
গাড়োয়ান	...	...	২৯৯
মেদিনীপুরের ফকির	...	.	৩০৭
তাঁত বোনে তাঁতী	...	..	৩১৭

গরুহাটা

বিবিরহাট ঃ উলুবেড়িয়া

এখন চাষের মরসুম। চাষীরা বুড়ো হড়মাসার গরু খাপড়ে বেচে দিয়ে নতুন হেলে-জোড়া কেনার ধান্ধায় সাত হাট ঘোরাঘুরি করছে। শীতে ধান ওঠার পর উচ্ছে, ঝিঙে, পাট, মুগকলাই ইত্যাদি চাষের জন্যে অবরে-সবরে বুড়ো খল্-পা ছাড়া কিংবা কাঁধে ঝটকা-লাগা বাতিল গরুতেই কোনোক্রমে মাটি ঠুকরে চাষ করেছিল। কিন্তু এখন আষাঢ়ের বর্ষা নামলে 'আগো' ভাঙা, 'দোয়ার', 'বোড়ানি', 'কাদা করা'র জন্যে জবরদস্ত গরু চাই। যে গরুর পেট পর্যন্ত ডুবে গেলেও জোর কদমে হামুস-হামুস করে হাল মই টেনে যাবে—শোবে না বা 'আলা' মেরে যাবে না।

বিবিরহাটের হাট বসে বৃহস্পতিবার। হাজার হাজার গরু ছাগল আসে চারদিক থেকে। কসাইখানার খাপড়ের মালই বেশি। তবু তার মধ্যে থেকে যদি নয়চা ছ-দাঁত বাছুর কিংবা 'বেগোড়শো' দোহারা গরু পাওয়া যায় চাষীরা আসে তার খোঁজে মাথায় গামছার পক্কড় জড়িয়ে, ট্যাঁকে নোটের তাড়া খুঁসে।

গরু ব্যাপারীর দালালরা নানান কসরত করে গরু দেখায়। মা-কালীর দিব্যি গেলে বলে, 'এমন গরু আর তোমার বাপও চোখে দেখেনি চাচা। যদি শোয় তাহলে আমার মেয়ের সনে তোমার 'লিকে' দিয়ে দেব।'

নগেন কোরোংয়া এ অঞ্চলের ডাক-সাইটে গরুর দালাল। তার বাচনভঙ্গি যেমন অশ্লীল, তেমনি মজার। হাটের হাজারটা দালাল তার শিষ্য। সবাই গাঁজায় দম দেবার সময় তাকে এক ছিলিম না দিয়ে নিমকহারামি করে না। কিংবা উলুবেড়ে থেকে যে দালালটা ভাল এক জোড়া হেলে এনে মোটা টাকা লাভ ঝেড়েছে সে যখন বিবিরহাটের শুঁড়ির দোকানে কচ্ছপ অথবা পাঁঠার মাংসের চাট নিয়ে গিয়ে সাদা পানি গলায় ঢালে, নগেনকে বাদ দেয় না। নগেন কোরোংয়া কারবাইডে তৈরি দেশী ধেনো গলায় ঢালে বোতল উপুড় করে ঘট্ঘট্ করে। চোখ দুটো তার করমচার মতো লাল।

পোয়ালির জলিল মোল্লা বলে : 'আল্লা আল্লা! শালা দম্ ফেটে একদিন মরবি তুই!'

রাতের মোহিনীরা রাত নামবার আগেই দু-এক টাকা কামাবার লোভে মুখে ছাইপাঁশ মেখে শুঁড়িখানার পাশে বুক চিতিয়ে খুঁটি হেলান দিয়ে চোখের কিংবা হাতের ইংগিতে অনুনয়-বিনয় সহকারে আহ্বান করে। নগেন জলিল মোল্লার দাড়ি ধরে চুমু খেয়ে বলে, 'মামু গো, মোর মাসি তোমাকে ডাকছে, 'শরীল' শেতল আর হাল্কা করে এস।'

হাট শেষে তারা 'উল্কোপাত' করে বাড়ি ফেরে। হাতে থাকে গামছায় বাঁধা দেড় কেজি চাল। জলিল মোল্লা, খোকা কোটাল, নগেন কোরোংয়া, যতীন বেরা, হরেন ঘোড়া, হিমু ঢেঁকি, অখিল ভোঁড় একদল গরু ব্যাপারীর দালাল, শনিবার উলুবেড়ের হাটবারের দিন পাঁচটা গ্রাম থেকে এসে জোটে বিড়লাপুরের তিন ফটুকে পোলের ফেরি ঘাটায়। জোয়ারে নৌকো ছাড়বে। ততক্ষণ বসে বসে গাঁজা চলে রওশন পালোয়ানের কাছে। রওশন পেতলের পাঁপি পরানো বিরাট বড় অর্ডারী কোলকেতে একবারে এক ভরি গাঁজা চড়ায়। কোল্জেয় বল্ থাকে তো দম মারো। খোকা বুড়ো বার দুই টেনে বুলবুল করে নীলচে ধোঁয়া ছেড়ে খ্যাকশিয়ালের মতো খ্যাকখ্যাক করে কাশতে কাশতে বলে, 'কোল্জে যেন কয়লা হয়ে যায় মাইরি।'

রওশন বিরাট চেহারার লোক। সাত ফুট উঁচু—তেমনি প্রস্থ। ন-গজ কাপড় লাগে তার জামা করতে। বিড়লা কোম্পানী তার মিলের প্রধান দরওয়ান পদে রাখতে চেয়েছিল বাঁধা মাইনেয় কিন্তু সে রাজী নয়—সে কারো গোলাম হতে চায় না। আসলে বাইরে তার বেশি উপায়। হুজ্জত হাঙ্গামা, জমির জবর দখল ইত্যাদি ব্যাপারে তার ডাক এলে থোকা নগদ একশো টাকা। রওশন স্রেফ একটা লাঠি হাতে নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালে সব নাকি ভাগেল বা

জোয়ার লাগলে বারো পয়সা করে টিকিট কেটে নৌকোয় ওঠে ফড়ে দালালরা। নগেন একটা পাঁঠা এনেছে। তার গায়ের উৎকট গন্ধে বিরক্ত হয়ে সবাই তাকে গালাগালি করে। পাঁঠার টিকিট কাটা হয় নি বলে ফেরি-ঘাট-জমা-নেওয়া টিকিটবাবু তেড়ে আসে। নগেন পায়ে ধরে, 'দোহাই বাবা, মানসিকের পাঁঠা, এর ভাড়া যে নেয় সে একেবারে বিধর্মী। উলুবেড়ের কালী মন্দিরে বলি দেব বলে নিয়ে যাচ্ছি শালাকে। সাত ছেলের মা আমার বউয়ের আর ছেলে যাতে না হয় তার জন্যে মানসিক।'

রওশন পালোয়ান হাসে। ফেরি-ঘাটের বাবুও হাসে। অগত্যা বিনি

ভাড়ায় নগেনের পাঁঠা চলে আসে উলুবেড়ের হাটে ব্যা ব্যা করে চেল্লাতে চেল্লাতে। নদীর মাঝখানে জলিল মোল্লা পাঁঠার গন্ধে আর চিৎকারে ক্ষেপে গিয়ে যখন জীবটির ঠ্যাং ধরে দরিয়ায় ফেলে দেবার জন্যে টানাটানি আরম্ভ করে নগেন কাঁদতে থাকে। সে তার অভিনয়। অভিনয়ে সে দক্ষ। একটি মেয়ে ছিল সেই নৌকোয়। সেও হেসে কুটোকুটি হচ্ছিল।

নগেন বললে, 'দেখ্ জলিল চাচা, তুই যদি আমার পাঁঠাকে জলে ফেলে দিস তাহলে এতগুলি লোকের সামনে হলপ করে বলছি, আমি ন্যাংটো হব।'

তা পাবে নগেন!

মেয়েটির তো কথা শুনে চক্ষুস্থির! সে এবার ঘুরে বসল অন্যদিকে মুখ করে।

উলুবেড়ের ফেরি-ঘাটে উঠে তারা স্টেশনের পাশের গরুহাটায় গেল হাঁটতে হাঁটতে।

হাজার হাজার গরুর মেলা। দেশ-বিদেশ থেকে গরু এসেছে। ভাগলপুরী, পাঞ্জাবী, মুলতানী, দেশী—গাই, দামড়া, হেলে, ষাঁড়, বাছুর—লাল সাদা কালো, বাঘ ছাবা—কত রকমের গরু। গরুর সাগর। হাজার হাজার লোক দর-দস্তুর করছে। যে বড় ব্যাপারী তার খোঁয়াড়ে পঁচিশ-ত্রিশটা গরু। বাছাই গোলগাল—কমবয়সী—ন-পো আড়াই হাত খাড়াই। কারো তিনটে কারো দুটো গরু খোঁটায় বাঁধা। দালালরা হাটে পৌছেই বড ব্যাপারীদের কাছ থেকে একটা গরু খুলে নিয়ে আসে। মহাজন দাম বলে দেয়: 'ফুই ফ্যারো।'

নগেন বলে, 'ফুই ছাপ্পোড।'

'শালা! চাপ্ডা দিস্।'

নগেন গরুটাকে এনে একটা খোঁটায় বাঁধে। গরুটার পেছনে খদ্দের লাগছে। পাঁচজন চাষী কানাকানি করে দেখছে। নগেন গরুটাকে বার-কতক তাড়া দেয় ল্যাজ মলে। গরুটা ছোটাছুটি করে। নগেন বলে, 'এর নাম হল পক্ষীরাজ ঘোড়া, শালার ল্যাজে হাত ঠেকাবার জো নেই এমন 'বাইচে' শালা হালে জুড়লে হাল-মই আর হেলোকে নিয়ে স্বর্গে উড়ে যাবে।'

'কত দর গো ব্যাপারীর পো?'

'কে, নানীর বাপ? তুমি এই গরু কিনবে? ট্যাঁকে পহাকড়ি আছে যাই বাবা, আমার পাটাটার পেছনে খদ্দের লেগেছে।'

ফল্স খদ্দের খোকা কোটাল এসে হঠাৎ বলে নগেনকে, 'দেখ বাপু ব্যাপারী, আমার শেষ কথা বলি, দুশো তের গণ্ডা।'

'মানে? দুশো ছাপ্পানো টাকা? না দাদা, আর একটু বাড়ো। ষাট পর্যন্ত —তাহলেই দেব।'

চাষীটি দেখলে দুশো ছাপ্পানো পর্যন্ত দর উঠেছে। তারা চা-দোকানে বসে বসে কি করবে না করবে ভাবনা-চিন্তা করতে থাকে। এই ফাঁকে নগেন খোকার বুড়ো হাবড়া গরুটার দাম কত ঠারে জেনে নিয়ে তার খদ্দেরদের সামনে বলে আসে, 'কসাইখানার মাল, একশো আশী পর্যন্ত দিতে পারি, এক মরসুম হাল চলবে—দাও তো দেখ দাদা!'

খোকা বলে, 'হাল করবে তো একটা ছাগল কিনে নিয়ে যাও। পুরো দুশো দিতে হবে।'

নগেন বললে, 'আচ্ছা আসছি। নব্বুই হলে আমি নেব, অন্য কাউকে ঐ দরে দিলে উলুবেড়ের হাটে উঠলে তোমাকে দেখে ছাড়ব। আসছি আমি।'

এসেই নগেন খদ্দের পায়। দুশো ষাট নয়—ছাপ্পানো। নগেন টাকা গুনে নিয়ে হঠাৎ চাষীটির পায়ে হাত দেয়, 'দুটো টাকা দালালী দাও, বড় ব্যাপারীর গরু, আমাদের সাধ্য কি এ রকম আচোট গরু হাটে তুলি! কুমারী মেয়ের পানা—কেউ ছোঁয় নি এখনো। দেখ না, দাঁত দেখ—ছ-দাঁত হয়েছে।'

দাঁত দেখায় নগেন গরুটার। চাষীরা দেখে সত্যিই ছ-দাঁত। তড়পি গড়ন। পাগুলো সরু। চনবনে কাজল চোখ। খাড়া খাড়া কান। ছোট ছোট শিং। ছোট ল্যাজ।

নগেন বলে, 'এই গরুর দাম বিবিরহাটে তিনশো টাকা। শুধু টাকা নেই বলে নিয়ে যেতে পারছি না। এই টাকা এখনই রজব আলী মহাজনকে দিতে হবে। দু-টাকা দালালী দাও দাদা—তোমার দুটো পায়ে পড়ি, নইলে আমার মাগ-ছাওয়ালরা না খেয়ে মারা যাবে।'

গরু পছন্দ, কাজেই চাষীর মন তখন হাল্কা। দুটো টাকা ফেলে দেয়। আর বলে, 'হাঁ র‍্যা বাবা নগেন, এর একটা জোড়া দেখে দে না—দালালী দোবখন।'

নগেন বলে, 'বসো খুড়ো, সারা হাট খুঁজে দেখছি, মহাজনের টাকাটা দিয়ে আসি।'

নগেন এসে মহাজনকে দুশো দশ গণ্ডা অর্থাৎ চল্লিশ টাকা দিয়ে দিলে। ব্যাপারীদের মধ্যে দামকড়ির হিসাবটা ঠারে বলাবলি হয়। সে একটি অদ্ভুত ভাষা। ফড়েরা ভিন্ন সে ভাষা অন্য কেউ জানে না। নগেনের লাভ হয়

আঠারো টাকা। হাটের 'দান' দিতে হবে দু-টাকা। আর একটা সাইজ মতো গরু খুঁজতে থাকে। চাষীটি খুঁজে খুঁজে এসে তার সঙ্গ নিলে সে বিরক্ত হয়। বলে, 'বসো না যেয়ে। তোমাদের দেখলে বেশি দর হাঁকবে। ঘে ষতে পারব না।'

আবার একটি বাছুর গরু আবিষ্কার করে আনলে নগেন। তারও রঙ সাদা। ছ-দাঁত। প্রায় কাঁধে কাঁধে সমান। চাষীটির চোখে ধরল। দাম বললে নগেন : 'দুশো আশী—এক পয়সা কম নয়। দুশো পঁচাত্তর পর্যন্ত দর উঠেছে।'

চাষী মাথা চুলকোয়। তার কাছে মাত্র দুশো ষাট টাকা আর আছে। তারপর খেয়াভাড়া ইত্যাদি লাগবে তার।

বলে, 'দুশো ষাট পর্যন্ত দিতে পারি। এটার যা দাম ওটার তাই তো হবে।'

'তা কি হয়। মহাজনের যেমন কিনতে পড়েছে। আশীর কম হবে না।'

পাঁঠা বিক্রি করতে চলে যায় নগেন। একজন কালীভক্ত খদ্দের জোটে। নগেন বলে, 'এ পাঁটার নরম মাংস পেলে মা-কালীর মাথা ঠাণ্ডা হবে— তোমার ভক্তের মামলা জয় হবে। শালার পাঁটা, রাত্রে 'মা মা' করে ডাকে!'

'বলো কি?'

'বিক্রি করার ইচ্ছে ছিল না, মা-কালীর দিব্যি দিয়ে বলছি, বউয়ের রোজ গেলে দু-চার আনা পয়সা হত ছাগলের পাল ধরিয়ে। শালার পাঁটা হঠাৎ 'সাধু' হয়ে গেল। কে বোধহয় হিংসা করে হিং খাইয়ে দিয়েছে। শালা খালি মোটা হচ্ছে আর রাত্রে 'মা মা' করে ডাকছে। বউ বলে, ওগো কোনো কালীভক্তকে দিয়ে এস—'মা' ওকে ডেকেছে।'

কালীভক্ত মানুষটি করজোড়ে কিছুক্ষণ আকাশের দিকে বন্ধ চোখে কী যেন সব বিড়বিড় করে মন্ত্র আওড়ালে। তারপর পাঁঠাটার মাথায় হাত দিলে। নগেন সময় বুঝে দড়ি আলগা করে দিলে পাঁঠাটা লোকটির পায়ে গা ঘষতে থাকল। লোকটি মহা খুশী। বলে, 'দর কত বাবা?'

নগেন বলে, 'আপনার সঙ্গে আবার দর—ছি ছি—যা দেন দিয়ে দিন। পনেরো কেজি মাংস হবে। ছ-টাকা কেজি ধরলে ছ-পনেরো নব্বুই টাকা দর হয়।'

ভক্তটি আর দর পর্যন্ত করলে না। টাকা গুনে দিলে। সন্দেহ হল নগেনের। দশ টাকার নোটগুলো নকল নয় তো? জলছবি আছে? হাঁ,

তা আছে। তবু মহাজনকে একবার দেখাতে হয়। রক্ততিলক-চর্চিত গেরুয়াধারী বাবাজী হাসিমুখে ততক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। নগেন এসে বললে, 'ঠিক আছে বাবা, অপরাধ নিও না, সাধুদের আমি বিশ্বাস করি না, কেননা তাদের সঙ্গে আমি অনেক মিশেছি, অনেক গাঁজা টেনেছি, তাদের চরিত্র জানি। তবে তুমি বাবা সত্যিকার সাধু, বোধহয় তোমার আশ্রমে অনেক মেয়েরা আসে, পেলা পেসাদী পড়ে!'

সাধুটি হাসলে মাত্র। পাঁঠা নিয়ে চলে গেল। যাবার সময় শুধু বলে গেল, 'জিতা রহ বেটা! ঠকাও মত্!'

গরুটির দাম শেষ পর্যন্ত ঠিক হল দুশো সত্তর টাকা। চাষীটি অন্য লোকটির কাছ থেকে ধার নিলে।

নগেন এবার হাটের 'দান' দিয়ে সরে পড়ল একান্তে। মহাজনের টাকা অবশ্য সে দিয়ে এসেছে দুশো পঞ্চাশটা। চা-দোকানে বসে বসে হিসেব করতে লাগল কত লাভ হল। প্রথম গরুতে আঠারো, পাঁঠা বিক্রিতে পনেরো, দ্বিতীয় গরুতে কুড়ি। তাহলে একুনে ১৮+১৫+২০=৫৩ টাকা। দু-টাকা দানের বাদ। ৫১ টাকা। একটা খাপড়ের গরুও হবে না। বেলা চারটে বেজে গেল। খোকা কোটাল টাকা পাবে। দুটো গরু বেচেছে নগেন সে লক্ষ্য করেছে। টাকা চাইবে। আর একটা গরু আনলে কি বিক্রি হবে এখন? মহাজনের কাছে গেল। দেখলে, একটা বাছুর সমেত দুধেল পাঞ্জাবী গাইয়ের খদ্দের লেগেছে। মহাজন নিজে বিক্রি করছে দরদস্তুর করে। সাড়ে আটশো টাকা দাম বলেছে। নগেন খাটালের বেহারী গোয়ালাটাকে আড়ালে ডেকে এনে বললে, মহাজনের সঙ্গে দরদস্তুর করতা হ্যায় কাহে? হাম লোককো বোলো। হামকো পঁচিশ রুপিয়া দে গা তো আটশো মে কর দেগা।'

'দুধ কেত্না হোতা হ্যায়?'

'আট সের।'

'বাছুর কেত্না দিন-কা?'

'এক মাহিনা-কা।'

গোয়ালা কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলে। জলিল মোল্লা আসতেই তাকে ইশারা করলে নগেন। জলিল মহাজনকে বললে, 'গাইটা আটশো হয়তো আমাকে দেন হুজুর।'

মহাজন বলে, 'নগেন আটশো বলেছে, দিলে তাকেই আগে দিতে হয়।'

জলিল বলে, 'কিরে নোগে, নিবি আটশো, না হলে আমি নেব—গয়লা খদ্দের আছে।'

নগেন বলে, 'কি হে বেহারী, নাও তো টাকা ছোড়।'

বেহারী টাকা বার করে। একশো টাকার আটখানা নোট গুনে দেয়। নগেন গরু খুলে দিয়ে হাত পাতে। পঁচিশ টাকা তাকে দিতে হবে। বেহারী বলে, 'ঐ আটশো থেকে সে কেটে নিক।'

নগেন গরু কেড়ে নিয়ে মহাজনের গড়ায় আবার বেঁধে দেয়। বেহারী নিজে মহাজনের কাছে গেলে সে বলে, 'সাড়ে আটশো, এক পয়সা কমতি নেহি।'

ব্যাপার কি! একজন হেসে বলে, 'দাঁড়ি-মাঝি-ফড়ে, তিন নিয়ে উলুবেড়ে!'

অগত্যা নগেনকে পঁচিশ টাকা দিতে হয়। মহাজন এসব ব্যাপারে ফড়েদের মুখ চায়। নইলে গরু বিক্রি করে টাকা নিয়ে পালালে অনেক ভোগান্তি। মহাজন বেহারীকে একটা ছাড়পত্র লিখে দেয়। নইলে বাজার থেকে গরু বার করে নিয়ে যেতে পারবে না। নগেন মহাজনকে বললে, সত্তর-পঁচাত্তর টাকার মধ্যে একটা খাপড়ের মাল করে দাও—বিবিরহাটে বেচে দেব। আজ ছিয়াত্তর টাকা কামাই করেছি।'

মহাজনকে একটা বোতল এনে দিতে সন্ধ্যা পর্যন্ত যে গরু আর বিকোলো না সেই একটা বেগোড়শো বুড়ো গাড়ির গরু দিলে একশো পঞ্চাশ টাকা দর করে। বাকি টাকাটা আগামী হাটে দিয়ে দেবে নগেন।

রাত আটটার মধ্যে ভাটার টানে নৌকোয় উঠল সকলে। সবাই দুটো একটা করে গরু কিনেছে। কম দামের। কসাইয়ের কাছে, অথবা গরিব চাষীর কাছে বিক্রি করবে তারা বিবিরহাটে। গরুগুলোর চার পা বাঁধা এক দড়িতে। আণ্ডা আণ্ডা চোখ বার করে গাঁক্ গাঁক্ করে চেঁচাচ্ছে!

দাম কড়ি বা সারাদিনের উপায় সম্বন্ধে গল্প করে গরু ব্যাপারীর দালালরা ফেরার পথে।

বাড়িতে ফিরে আসে মাতাল হয়ে দু-এক কেজি চাল হাতে নিয়ে। হাটবার আসার আগে পাড়ায় ঘুরে ঘুরে ছাগল গরু 'খাসী' করে বেড়ায় নগেন কোরোংস্যা। নইলে খাসী মেরে মাংস বিক্রি করে।

হাটবারে গরুকে 'চান' করিয়ে হাটে নিয়ে যায়। ছুঁচোলো লোহা-কাঁটা ফুটিয়ে গরুকে তাড়া করে খদ্দেরদের দেখায় গরুটা কতখানি 'খরো' আছে। চাষীরা ধরতে পারে না। সেই গরু কিনে নিয়ে গিয়ে যখন হালে জোড়ে তখন গরুটি পয়লা কদম ফেলবার আগেই ঝুপ করে শুয়ে পড়ে। হাজার মারো, বড় বড় চোখ বার করে থাকবে, গোবর বার করবে গল্‌গল করে!

সামনে চাষের মরসুম। আকাশ নামল। এখন উপায়? ভাল গরু চাই।

উলুবেড়েয় গরু কিনতে যেতে হবে—টাকার দরকার। গয়নাগাঁটি বিক্রি করতে হবে। নইলে চাষ হবে না। বালবাচ্ছারা সব অনাহারে মরবে। জমি অনাবাদী হয়ে পড়ে থাকলে সরকার দখল করে নেবে। অতএব আগামী শনিবার সাতশো টাকা ট্যাঁকে নিয়ে উলুবেড়েয় যেও, এক জোড়া ভাল হেলে গরু পাওয়া যাবে। তার কমে হলে খাপড়ের মাল মিলবে।

মিঠেজল : রুপোলী ইলিশ

পাথর কালো জেলে

আমি যদি পাখি হইতাম রে
তোরে লয়ে যাইতাম রে ভিনদেশে
হাড় কালো হইল আমার
তোরে ভালবেসে…'

আষাঢ়ের আকাশ-ভাঙা বর্ষণমুখর গহিন রাতে ষাঁড়াষাঁড়ির বান-ডাকা ফেনা ওগরানো নদীতে ইলিশের জাল ফেলে উদ্দাম চিৎকারে গান জুড়েছে কলিমদ্দি মাঝি। তার সঙ্গী দুজন দাঁড়ি কানাই আর ইয়ার আলী নাচ জুড়েছে হাত তুলে কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে। ছ-সেরি এক ঝাঁপা তাড়ি শেষ করেছে তিনজনে। কড়া গাঁজা ফোটা তাড়ি। পেটে পড়তে না পড়তেই বিক্রম ধরেছে। ঝড়ের ঝাপটা সিপ্‌টির মতন লাগছে এসে গায়ে। শীতে জড়ো হয়ে পড়ছিল তারা। পাশের নৌকোর কাশেম আলীকে বলেছিল তারা, মালজাল কিছু আছে কিনা। সে বলেছিল, 'আল্লার কিরে কলিমদ্দি চাচা—

এক গেলাসও তাড়ি নেই। মোরা গাঁজা টেনে জাড তাড়াচ্ছি। শালা বড্ড কনকনে হাওয়া।'

কলিমদ্দি জানে ওদের কাছে 'ধেনো' আছে। তাও কারবাইড দেওয়া! বিষ। তার চাইতে দেশী তাড়ি ভাল।

জালের 'সেতে' হাত দিয়ে পরখ করে কলিমদ্দি। ভীষণ টান ধরেছে। দমকে দমকে টান পড়ছে জালে। ছিঁড়ে বেরিয়ে না যায়। নিচে বাঁধা পর পর বাইশখানা ইট আছে। উপরে তল্‌তা বাঁশের অসংখ্য চোঙা ভাসছে। আঠারোখানা নৌকো জাল পেতেছে গদাখালিতে। তারপর রাইপুর, পুঁটেমাঝির ঘোলে আরও কত গণ্ডা নৌকো নেমেছে কে জানে। আষাঢ়ের অর্ধেক হয়ে গেল আকাশে জল নেই। হঠাৎ সাগর থেকে ইলিশের ঝাঁক এসে হাজির। পাহাড়ের বরফগলা মিঠে লাল জল নেমেছে। মাছ ডিম ছাড়ার জন্যে পাগল হয়ে আছাড়-কাছাড় করে তীরের বেগে ছুটে আসছে নদীর মিঠে জলে।

গতকাল দশটা মাছ পেয়েছে কলিমদ্দিরা। আজ এই বর্ষার রাতে মনে হচ্ছে আরো বেশি মাছ গাঁথবে। গতকাল আট টাকা কেজি পাইকিরি দিয়েছে; পাইকেররা নাকি দশ টাকায় বেচেছে। একটা ইলিশ দেড় কেজি ওজন। তাহলে খদ্দেরের কাছে পনেরো টাকা! গরিব লোকের পক্ষে কেনা মুশকিল।

'দরিয়ার পাঁচ পীর বদর বদর!'

সবাই মিলে হই দিয়ে বার বার চিৎকার করে। বান এসেছে। পাহাড়-প্রমাণ ঢেউয়ে নৌকোগুলো মোচার খোলার মতো লাফাতে থাকে।

হাল কষে 'ঝিঁকি' মেরে ঢেউ কাটায় মাঝিরা। মাঝে মাঝে কাছির সঙ্গে যে মোটা পাকানো তার আছে 'বেংতি' জালের প্রান্তে তাতে কড়কড় করে শব্দ হয়।

কানাই বলে, 'কলিম চাচা, শালা 'বেংতিটা' আজ না দিলে হত। মনে হচ্ছে শালার মধ্যে 'শুশুক' পড়েছে। চচ্চড় করতেছে কেন?'

'ডুবো জাহাজী-কাঠও ঢুকতে পারে!'

'তাহলে জাল ছিঁড়ে 'ফাদরাফাই' হবে—মহাজন খচে ডাং হবে।'

বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঘন ঘন। রাত দুটোর সময় ভাঁটা পড়লে কখন জাল উঠবে তার অপেক্ষায় টিমটিম লণ্ঠন হ্যারিকেন জ্বেলে আড়বাধির ফণীমনসার

ঝাড়ের পাশে, বনঝামা, হরকোচ, তেকাঁটাল আর শরখড়ির ঝোপের তলায় মেয়েমদ্দ পাইকেররা বসে আছে। ওয়াটারপ্রুফ বা ছাতার মধ্যে হুমড়ি খেয়ে জড় হয়ে পড়ে আছে মাছের আশায়। এ বর্ষার কোনো জোর নেই। হঠাৎ এক চাপড়া মেঘ আসে, ঝরে গিয়ে ফুরিয়ে যায়। হুড়হুড় খল্ খল্ শব্দ চারদিকে। দহের মুখটাতে পাক মেরে পাতালে চলে যাচ্ছে পানা, খড়-কুটো কাঠ, টিন, আবর্জনা। ঐখানটাতে পুঁটে মাঝির ঘোঙ্গ। পুঁটে মাঝির নৌকো ঐ দহের মধ্যে ডুবে গিয়েছিল। বিষম ফ্যাসাদের জায়গা। তবু কটা জেলের মেয়ে ফেটি পেতে পেতে তোপ্সে, ভোলা, চিংড়ি, পাঙাস, তুলবেলে ধরছে, এত রাতেও দু-চারজন সুতোলি 'দোন' ফেলে বসে আছে।

বয়ার ওপরে লাল আলো জ্বলছে সট সট করে, মাপা সময়ের ব্যবধানে। ওখানটাতে চোরাবালির মধ্যে জাহাজ আটকে যেতে কলিমদ্দিরা কদিনে অনেক মাল উদ্ধার করেছিল। কাঠ, জার, ড্রাম, টিন, গম, কয়লা, মদের বোতল, ট্রাঙ্ক কত কি। বাঁশতলার ঘাটের পঞ্চাশটা জেলেডিঙি ভাড়া বয় না, মাছ ধরে না, ভাঁটার টানে তারা নেমে যায় সমুদ্রের দিকে আর চোরাই মাল সংগ্রহ করে। জাহাজের ফেলে দেওয়া মাল তোলে। কিংবা রাত্রে কোনো যাত্রী বেশি টাকা দিলে পারাপার করে দেয়। কেউ মেয়ে নিয়ে পালায়, কেউ চাল ধান আনে—তাতে মোটা উপায়। আঁচিপুর থেকে উলুবেড়িয়ার ফেরি নৌকো পারাপার হতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় লাগে বলে কলিমদ্দি মাছের মরসুম বাদে ছোট আট-দশ বছরের চিগ্নে দুটোকে নিয়ে খেয়া পাড়ি মারে। ফেরি ভাড়া দিতে হয় উপরি যারা ঘাট জমা নিয়েছে তাদের। খোঁয়াড় আর ফেরিঘাট বিলির টাকা সরকারের বিনিখরচার লাভের ব্যবসা।

কাশেম হেঁকে বলে, 'গদাখালি নলদাঁড়ির দিকে নাকি বেশি মাছ পড়ছে হে···তাই এদিকে জাল পেতেছি আজ মোরা।'

'তোর মাথা—লঙ্কায় সোনা সস্তা শোনা যায়'—বলে কলিমদ্দি—'এখানেই পাঙ্গয়ের 'খোর' বেশি—পনেরো 'বেড়' পানি—চড়া দিয়ে মাছ যায় নাকি হে শালার পো'···

কানাই হেঁকে বলে, 'যাই পাও, মহাজনের 'গবেব' যাবে সব। সারা বছর তার মুদিখানার লম্বা খেরো খাতায় 'বিলেত' জমা হয়ে আছে ৫০০।৭০০ টাকার। তার নৌকো তার জাল—জালের এক বখরা, নৌকোর দেড় বখরা, মাঝির এক বখরা, দাঁড়ির এক বখরা। লও শালা, কটা মাছের কত বখরা করবে করো।

কুড়িটা মাছ পেলে হবে সাড়ে চার বখরা। মহাজনের একার আড়াই বখরা। আসলে পাঁচ বখরা করে সে তিন বখরা নিয়ে নেবে। তার মানে ১২টা মাছ তার। বাকি ৮টা মাছের মাঝি পাবে চারটে। দু'জন দাঁড়ি পাবে দুটো করে চারটে। পাইকিরি দাম যদি আট টাকাও হয়, একটা মাছ দেড় কেজি হলে ১২ টাকা। দুটোয় ২৪ টাকা। মহাজন চোখ রাঙিয়ে বলবে, 'একটা দিবি আর একটা বেচবি, এই তো কথা ছিল। এখন শালারা একটা মাগের জন্যে ঘরে লিয়ে যাচ্ছ আর একটা বেচে চাল ডাল কিনছ।'

কাশেম বলে যায়, 'কাল মহাজনকে বলিচি, মোর একটা শালী এয়েচে, শালা চ্যাম্পিয়ান চেহারা। মহাজনের চোখ দুটো যেন চকচক করতে লাগল। বললে, তোর বউও তো শালা বাঘিনী, আমার দোকানে এসে খুঁটি হেলান দিয়ে মুঠো মুঠো চাল চিবোয় আর মস্করা করে। বলি, তুমি তো তার 'নানা' হও। শালা মুখ খারাপ করলে। বউ বলে মিনসের ঘোড়া রোগ আছে, সেই করোমচা আর গেঁয়ো বনটার নিচে অন্ধকারে লম্ফ হাতে নিয়ে পদি পিসিদের বাড়ি থেকে জাল সেবে দিয়ে ফিরছি আর মিনসে হঠাৎ লম্ফটা ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিয়ে জড়িয়ে ধরলে। আমি 'বাবাগো', 'মাগো' করে চিল্লে উঠতে মারলে দৌড়। আমার বউয়ের সে কি হাসি। মহাজন নাকি আমার শালীটাকে নিকে করতে চায়। বলেছে মুদিখানার সব দেনা তোর তাহলে শোধ করে দেব কাশেম। শালীটা ভাতারখাকি। চ্যাম্পিয়ান চেয়ারা মাইরি।'

কলিমদ্দি বলে, 'মহাজনের কুনজর সবদিকে। আমাকে বলছে, কলিম তোর মেয়েটাকে দে আমাকে। বিবির হালে থাকবে। বলিচি তোমার বউ আছে, ছেলে বি-এ পাস করেছে, মেয়ে 'ম্যাটরিক' পাস—ভরা সংসার—কুড়িটা নৌকো, দুটি ভাঁটিখানা, একটা মুদি দোকান, একটা কাঠের আড়ত, বন্দুক, দোতলা পাকা বাড়ি, রেডিও, কিসের অভাব আবুল হোসেন মিয়া? আমার কচি মেয়েটার দিকে লক্ষ্য কেন? শালা আজ ভদ্দরলোক হয়েছে, পঞ্চাশ সালের দুভিক্ষের বাজারে এক মণ চালের বদলি আমার একখানা নৌকো দলিল করে নিলে। যার যা ছিল মহাজন আবুল মিয়া আর তারিণীর 'গব্বে' চলে গেল। একটা নৌকো করতে পাঁচ হাজার টাকা খরচ। একটা সুতোর জাল করতে দুশো টাকা। নতুন নাইলনের তৈরি জালের খরচ পাঁচশো ষাট টাকা। 'বেংতি' বা 'থড়' জালের খরচা শ-পাঁচেক। পেটের দায়ে মোদের নৌকো জাল জমি সব গেল। মায় ভিটেমাটি পর্যন্ত বন্ধক। জাতব্যবসা

ছেড়ে এখন সব জোয়ান ছেলেরা চটকলে ঢুকতেছে যেয়ে। শুনতে পাচ্ছি 'মচ্ছমুন্তিরি' নাকি মোদের 'লোন' দেবে!'

ভাঁটা পড়তে শুরু করল রাত দুটোর পর।

'দরিয়ার পাঁচ পীর বদর বদর।'

জাল তুলতে শুরু করলে একে একে সকলে।

নদীর খোলে অন্ধকার। দূর বাঁধের ওপরে বিরলাপুর চটকলের আলো। আকাশে পাটাতনের ক্রেন যেন হাতীর শুঁড় তুলে দাঁড়িয়ে আছে। তিন ফটুকে পুলের কাছে গেল কেউ কেউ পাড়ি মেরে, কেউ এল রায়পুরে—৭৫ নম্বর বাস রুটের মূল যেখানে—ওখানে ভোর চারটের ফার্স্ট বাসে মাছ নিয়ে কলকাতায় যাবার পাইকেররা আছে।

নৌকো ভিড়োবার আগেই পাইকেররা এক কোমর জলে নেমে যায় বাজরা-ব্যাগ-থলে হাতে নিয়ে। হুড়দাঙ্গা বাধায় সকলে।

কলিমদ্দি মাঝি বলে, 'মাছ নেই, হাঁটো সব। একটাও মাছ পড়ে নি।'

মেছুনী পরিষ্কারী দাসী বলে, ' 'ফাল্সা' কথা 'আখো'। দাও মিন্সে আমাকে সব কটা মাছ দিয়ে দাও।'

'বাসি গায়ে নৌকো ছোঁবে না বলছি অপয়া মাগী! রাত বারোটা থিঙে ঐ আড়বাঁধির চাতালে মদ্দদের সনে বসে, শুয়ে পড়ে আছে, এখন বলে, মাইরি দাদা, তোমার বুকে হাত দিয়ে বলছি, কুন্ ছিনাল মিছে কথা বলে, 'পোষক কাপড় আমার!'

'হাঁ তুমি তো 'পোষকারি' দাসী।—মাত্তেরে তেরোটা মাছ পড়েছে। দশ টাকা কেজির এক আধলা কমে হবে নে।'

নৌকোর খোলে জ্যান্ত ইলিশগুলো লাফালাফি করছে। বড় বড় কটা পাঙাস মাছ পড়েছে। কেজি তিনেক হবে ডিমওয়ালা বড় বড় তোপ্সে। এসব পড়েছে চোঙার আকারের ঘন মোটা বেংতি জালে। একটা মড়া পড়েছিল, পায়ে তার ইট বাঁধা। তুলেই কেউ দেখবার আগেই ফেলে দিয়েছে কলিমদ্দি। কেউ মেরে ফেলে দিয়েছে। আস্ত জোয়ান মেয়েমানুষ।

কলিমদ্দির চোখ দুটো লাল কুঁচের পানা। যম ভূতের মতন পাথর কালো দুর্জয় চেহারা। একটা বোতল এনে দেয় কানাই। ছিপি খুলে গলায় ঢালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কলিম।

সব পাইকেরদের তেড়ে দেয় সে। অন্য নৌকোর কাছে ঘোরাঘুরি করে তারা। ঘরোয়া খদ্দের দেখে কলিম একজনকে বলে, 'তোমার কটা মাছ চাই ?'

'কত করে দেবেন ?'

'ওরে বাবা, জেলে মাঝিকে আবার 'দেবেন' বলে যে এ ব্যাটা! দশ টাকার কমে হবে না। একটা লও, পনেরো টাকা পড়বে—আর ওজন করব না—এটা সাতপো, মানে এক কেজি সাতশো হবে।'

লোকটা নিয়ে নেয়।

পরিষ্কারী এসে পায়ে ধরে। নৌকোয় উঠে পড়ে সে কাপড়-চোপড় অনেক ওপরে তুলে ধরে।

কলিমদ্দি চোখ চাপা দিয়ে হায় হায় করে ওঠে।

পরিষ্কারী বলে, 'দূর মিন্‌সে, এখনো যে অন্ধকার!'

নৌকোর খোলে নেমে যেয়ে বাজরার মাছগুলো তুলে আনে পরিষ্কারী। বলে, 'আর মাপামাপিতে কাজ নেই, 'থোকো' দর দাও, গড়ে দেড় কেজি করে। কটা ছোট আছে কটা একটু বড়পানা।' বলতে বলতে আবার সে ঝপ্‌ করে জলে নেমে পড়ে।

কলিমদ্দি হঠাৎ তার আঁচলটা চেপে ধরে। বলে, 'ডাঁড়ি মাঝির পরনে ট্যানা, পাজারী মাগীর কানে সোনা!'

পরিষ্কারীর বুকটা উদোম হয়ে যায়। লুকোবার জন্যে ব্যস্ততারও কিছুমাত্র বালাই নেই। তার মাথার চুলের ভ্যাপসা গন্ধ পায় কলিমদ্দি। আঁচলের গিঁট থেকে টাকা খুলে নেয় সে। দাঁড়ি দুজন তখন গাঁজা টানতে ব্যস্ত। কলিম দেখে পরিষ্কারীর আঁচলে একশো টাকার নোট। সে খুলে নিয়ে ট্যাঁকে খোঁসে। পরি কিছু বলে না। নিক না, কাল মাছ নিতে তাহলে বেগ পেতে হবে না। বলে, 'হিসেব করো মিন্‌সে।'

কলিম বলে, 'কিসের হিসেব? মাছ লিয়ে চলে যাও। কাল হিসেব হবে।'

পরি চকিতে বাজরা মাথায় তুলে নিয়ে চলে যেতে গেলে আবার আঁচলে টান মেরে মাছের বাজরা নৌকোয় ফেলে দেয় কলিম, 'ইয়ার্কি না? মাগী, বারোটা মাছ ডেড় কেজি করে হলে—বারোটা আর ছটা—মানে আঠারোটা—আঠারো কেজি দশ টাকা করে হলে—কত দাম? একশো আশী টাকা—ফেল

টাকা মাগী ! মনে করেছে মাঝি এখন মাতাল হয়ে আছে, হিসেব করতে পারবে নে না ?'

'ধম্মের দাদা ··'

কলিম আবার গাল দেয় ।

'আজ আর টাকা নেই···'

'তবে কানাই, ইয়ার আলী তোরা এট্টু চোখের আড়াল হ তো···'

'কেন, ভয় নাকি !' চোখ ঠারে পরিষ্কারী ।

'বলে কি মাগী !···দাও টাকা দাও ।'

'আর নেই সত্যি দেখো, 'সার্চো' করো !'

পরির কোমর, নাইকোঁচড হাতড়ায় কলিম । তলপেটে কাতুকুতু দেয় হা হা করে দাঁত বার করে হাসতে হাসতে যখন অন্য টাকার সন্ধান পায় । আরো একশো টাকা বের হয় । নিয়ে নেয় কলিমদ্দি । বলে, 'কুড়ি টাকা গায়ে রইল পরিদিদি । কাল মাছ পাবে তুমি, কুন্ শালা কথা হুডোয় । আজ তোমার অন্তত তিন চার কেজি মাল বেশি হবে । যাও পালাও ।'

যাবার সময় পরি রসিকতা করে, 'মহাজনকে বলে দোব ।'

কলিমদ্দি বলে, 'তোমার 'ইয়ে'—তাতে হুঁকো—হাহা-হাহা·· '

নৌকো নিয়ে আবার তিন ফটকের পোলের কাছে আসে কলিমদ্দিরা । মহাজন সেখানের চা-দোকানে বসে আছে পাঁচ সেলের ফ্ল্যাশ-লাইট আর রুপোবাঁধানো ক্রিজভরা ছড়ি হাতে নিয়ে । ওরা যেতেই বললে, 'কী হুজুররা কি রায়পুরে গেছিলে জাল তুলে ?'

'আল্লার কসম চাচা, শেষ বেলা জাল তুলনু মোরা । 'বেংতি' জালে একটা মডা পড়েছিল । এই কটা পাঙাস আর তোপ্‌সে পড়েছে । আর পাঁচটা ইলিশ মাত্তোর !'

'হুঁ । ওদেরও তিনটে, পাঁচটা, সাতটা করে সব পড়েছে । জাল নৌকো তুলে দে ।'

কলিমদ্দি বলে, 'সবুর করো না চাচা, মিঠেপানি আসতেছে সবে, আষাঢের ঢল নাবুক । ভারি বর্ষা নাবুক । এ বছর মাছ হবে ।'

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ওঠে মহাজন, 'এত জাহাজ গেলে, নদীতে এত চড়া পড়ে গেলে মাছ পড়বে না ঘোডার আণ্ডা হবে !'

তিনটে ইলিশ আঙুলে গলিয়ে নিয়ে মহাজন চলে গেল । অন্য নৌকোর

আগের বখরাগুলো বেচে দিয়েছে মনে হচ্ছে। ও তিনটে ঘরে খাবে। ওরা আর কিছু বলে না। কানাই আব ইয়ার আলী বাকি দুটো মাছ নিয়ে ঘরে চলে যায়। এটা হিসেবের বাইরে।

কলিমদ্দি একটা বড পাঙাস রেখে বাকিগুলো বেচে দেয়। জালের মধ্যে পাঁচটা ইলিশ লুকোনো ছিল পরিকে দেবার আগে—জাল থেকে মাছ বার করবার সময়েই। সেটাই মহাজনকে দেখাতে হয়। সবাই তাই করে। নইলে কদিনের আর মরসুম!

নৌকো নঙ্গর করা রইল ঘাটে। আবাব দুপুরে জোয়ার লাগলে খেয়ে দেয়ে জালে আসবে কলিমরা। তার আগেই টাকা বখরা নেবার জন্যে আসবে তার বাড়ি কানাই আর ইয়াব। ঠিক মতো না দিলে হয়তো মহাজনকে বলে দেবে। তারপর মারামাবি। রক্তপাত। মৃত্যুও ঘটতে পারে। অগাধ মদ খাইয়ে মাতাল করে ঠেলে ফেলে দেবে যাঁভাষাঁড়ির-বান-ডাকা-নদীতে অন্ধকারে। মাঝি হবার লোভে দাঁড়িরা এমন কীর্তি কববার আগেই মাঝির টের পাওয়া চাই। তাহলে তাকে ছাঁটাই করতে হবে। কিন্তু কলিমের দাঁড়ি দুজন খুন হজম করতে জানে। তারা তিনজনে এক।

কলিমের মেয়েটা সোমত্ত হয়ে উঠেছে, তাকে পার করা দরকার। সে ঠোটে রঙ দেয়, নাই বার করে কাপড পরে দেখে কলিম কাঠের চ্যালার বাড়ি দিয়েছে ঘাকতক একদিন। খাবার সময় ইয়ার এল তার বাড়িতে। ইয়ারের বিয়ে হয নাই—জোয়ান ছেলে—কলিমের মেয়ে মরজিনার সাথে তার ভাব হয়েছে মনে হয়। ওর সঙ্গেই বিয়ে দেবে মনে মনে ঠিক করে কলিম। আর মেয়েটাকে বিদায় করে কাশেমের শালীটাকে সে নিকে করবে। কাশেম রাজী। কাশেমের শালীও রাজী।

শুধু আর দিন কতেক যাক।

আষাঢ়-শাঙনের ঢলটা নাবুক। নৌকোর খোল ভরে—জালে হাল্সি গাঁথা হয়ে মাছ পড়ুক।

নইলে রাগে ঈর্ষায় মহাজন নৌকো কেড়ে নেবে যদি দোকানের দেনাটা না শোধ হয়।

ইয়ার আলী এসে বললে, 'চাচা, চার চোখ মেলে দেখে এলুম, গাঙে লালপানি এয়েছে—জোয়ার লেগেছে—চলো জালে যাই ..'

'যাই···রে···যাই·· ' সাড়া দেয় কলিমদ্দি।

মরজিনা বলে, 'ইয়ার-ভাই এক মুঠো ভাত খেয়ে যাও।"

'হাঁ বাবা, যা একমুঠো খেয়ে নে—ভয় নেই, তোর সাথেই মরজিনার আমার বে দোব।' বললে কলিমদ্দি।

মরজিনা ভেংচি কাটল বাপের দিকে জিব বার করে।

কলিমদ্দি হুঁকো টানতে টানতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার সময় ইয়ার আলীও তার পিছু নিলে মরজিনা পিছন থেকে তার হাত ধরে।—'খেয়ে যাও—'

কলিমদ্দি বলে, 'যা বাবা, খেয়ে আয়, আমি কাশেমদের বাড়ি বসতেছি ততক্ষণ। যাচা অন্ন ছাড়তে নেই।'

অগত্যা ইয়ার আলী ফিরে এসে রান্নাঘরে ঢুকে ভাত খেতে না বসে মরজিনাকে ধরে চুমো খেতে আরম্ভ করলে। কলিমের আট দশ বছরের ছেলে তুটো তখন নদীতে ছোট পান্‌শি নিয়ে জাহাজী ভাসা মাল সংগ্রহ করতে বেরিয়েছে।

মরজিনা বলে, 'ছিঃ! ছাড়ো। সাদীর আগে এসব করলে 'গোনা' হয়। বাপ তো বলেছে। কদিন বাদেই · '

'কাশেমের শালীকে তোমার বাপ বে' করবে।'

'জানি!'

'বড় তাগড়াই মেয়ে।'

'ধ্যাৎ! আমাব বাপের হাডে বাজের আগুন। যাও এখন—বাপ ডাকছে·· '

কলিমদ্দির ডাক শুনে ইয়ার আলী ছুটতে ছুটতে চলে যায়। কিন্তু সামনে পড়ে যায় তার মহাজনের বি-এ পাস, চশমা চোখে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' হাতে ছেলেটা। কলিমদ্দিব বাডির দিকেই যেন তার গতি। কিন্তু কেন?···

নৌকো থেকে জাল নামিয়ে ঘোলা লালচে জলে স্থির চোখে তাকিয়ে রইল ইয়ার আলী। জল পাক খাচ্ছে। মরজিনা কি তাহলে খারাপ! কলিমদ্দিকে বলবে?

কলিমদ্দি তখন গান ধরেছে তারস্বরে চিৎকার করে:

আমি যদি পাখি হইতাম রে
তোরে লয়ে যাইতাম রে ভিন দেশে

হাড় কালো হইল আমার
তোরে ভালবেসে···
তোরে ভালবেসে রে তোরে ভালবেসে···

হুগলী নদী ফেনা ওগরাচ্ছে। দূর থেকে কাশেম হেঁকে বলে, 'কলিমদ্দি ·· ইয়ার আলী···কানাই দাদা রে ··আজ মাছ পড়বে···'

'দরিয়ার পাঁচ পীর বদর বদর!'

তাড়ি ছাঁকতে আরম্ভ করলে কলিমদ্দি। প্রথমে দিলে তার হবু জামাই ইয়ার আলীকে। সে জিব কেটে বললে, 'তুমি অগ্গেরে খাও চাচা, তুমি মুরুব্বি—গুরুজন।'

কলিমদ্দি খুশী হয়ে তার পিঠে চাপড় কষালে। তারপর 'বিস্মিল্লা' বলে তাড়িটুকু গলায় ঢেলে বললে, 'বেশি খেলে আবার মোর প্যাটে সয়নে রে বাপ! কাছা খুলতে তর দেয় নে—একেবারে সররররররর···'

কানাই আর ইয়ার আলী হেসে গড়িয়ে পড়ে। হঠাৎ বৃষ্টি নামলে তারা ঘন ঘন চিৎকার করতে থাকে! 'দরিয়ার পাঁচ পীর বদর বদর!!'

শ্যামগঞ্জের বড় সরদার

'উনিশ শো আটাশ সালে চটকল বসল শ্যামগঞ্জে—হুগলী নদীর আড়বাঁধির ওপরে। দিনদুপুরে মড়া নিয়ে টানাটানি করত শিয়ালে, তিন ফটকের পোলের পাশে—পুঁটেমাঝির ঘোলে। হরকোচ, গেঁয়ো, তেকাঁটাল ফণীমনসা, বিল-ঝনঝনি, বাজ-বরণ, লঙ্কাসিরে, আশশ্যাওড়া, বাটাং জীবদণ্ড, বনঝামার জঙ্গল ছিল নদীর ধার দিয়ে বরাবর। একলা যেতে গা শিউরে উঠত। শনি-মঙ্গলবারের হাট বসত শ্যামগঞ্জে। খটির নৌকো থেকে ধান, কাঁটাল কিনত লোকজন। বাকুসীর দোকো দরকচা বেগুন আসত হাটে। এক পয়সা সের। আসত হালি শহরের কুমড়ো। একটা আধমণ কুমড়ো—থোকো দাম দু'আনা। ধান দু' টাকা চার আনা মণ। তখন চারটে করে জন-মজুর টাকায়। দেড় সের সাত-পো একটা ইলিশ এক আনায়। ষোলটা ইলিশ টাকায়; শ্যামগঞ্জের বাজারে ইলিশের 'টাল' দিত জেলেরা। রাজ্যের নৌকো ভাসত নদীতে।

নদীর ঘোলাজলে লালচে-হয়ে-যাওয়া-গামছার-কৌপীন-আঁটা-ভিজে গা কালো-চেহারার জেলেরা লাল চোখ মেলে বসে বসে হাটের মাঝখানেই তাড়ি খেত, গাঁজা টানত। মাছি ভিনভিন করত পাকা আম কাঁটালের গায়ে। একটা টাকা ট্যাঁকে খুঁসে নিয়ে হাটে এলে তিন বাপ-ব্যাটায় সেই পয়সার মাল বয়ে নিয়ে যেতে পারত না।'

'এমন আকালের দিন তখন ছিল না।'—কথা বলে আব্বাস হালদার। ছ-ফুটের ওপর দীর্ঘ চেহারা বুড়োর। বয়স এখন নাকি তিন কুড়ি দশ। কি চার কুড়িও হতে পারে। কে আর গুনে রেখেছে। বাপ ছিল মূর্খ। সুন্দরবন কেটে তারা বসত করেছিল এখানে। নিজের হাতে কত গণ্ডা বাঘ মেরেছে নাকি তারা।…'শ্যামগঞ্জে চটকল বসতে মোরা কাজ শিখতে গেনু। মুই তখন জোয়ান। মোর ভাইপো সিরাজটাকে নিয়ে যেতুম কাজ শিখতে। বড সায়েব 'তালায়' যখন জুতো মসমসিয়ে আসত চারদিকে চেয়ে চেয়ে, মুই তখন সিরাজকে সরদারের হুকুমে বড় একটা 'ঘাই ঝোঁড়া' চাপা দিয়ে রাখতুম। সায়েব কাছে এলে ছুটে যেয়ে সালাম দিতুম। সেই সিরাজ, নবা, বঙ্কে, রহমান, আজাহার সবাই 'সারপোষ' (সার্ভিস) 'পেনসিল' (পেনসন) পেয়ে বুড়ো-হাবড়া হয়ে মরে গেল। সবাইয়েব মাগছেলে ভেসে গেছে। দেনার দায়ে বেচারীরা কাবুলীর হাতে মার খেয়ে গেছে। 'মুই শুধু এখনো আছি। মোর 'ছাথ্‌তা' কত ম্যানেজার, কত বাবু এল গেল, চটকলের বয়েস হল চল্লিশ বছর, তবু আমাকে কেউ ভোলে না। আমি পয়লা 'ইসপিনে' কাজ শিখি। ডাণ্ডি মেরে নলি খোলা হাতের তেলো দিয়ে 'টেকো' ধরে হাতে পায়ে বাঁদরের মতন কড়া পড়ে গেল। তখন 'হপ্তা' ছিল তিন টাকা চোদ্দ আনা। ছ-বছর পরে এনু 'দেরানে', সেখান থেকে 'বিমে'। হাতিকল, ঘড়িকল, পাঁজচাপা, রোপিং, বোঁপিন, ফুঁকোনলি, ইস্পিনিং, দেরান, বিম, তাঁত সব 'ডিপার্টে'ই কাজ জানি আমি। আমি হয়ে গেনু বড় সরদার। দেশ স্বাধীন হবার আগে। সারা কারখানায় একশো জন সরদার—তার ওপরে বড় সরদার আমি। কত নাম। কেরানী বাবুরা আমাকে সালাম করত। আমি যার কথা বলব তাকেই কাজ দিতে হবে। বড়বাবু বললেও আমি 'কাজ জানে না' বলে 'নাকচ' করে দিতে পারতুম। ম্যানেজার সায়েব আমার কাছ থেকে পাঁচ হাজার লোকের হদ্দ-হদিস নিত। বাবুদের সম্বন্ধেও আমার 'রিপোর্ট'ই চূড়ান্ত। কে কেমন চুরি করে, কোন্ সরদার তার নিজের ঘরের কাজে কত জন

ফালতু লোক ছাড়ে, কত গাঁট পাট এল, কত গাঁট চট প্যাকিং হয়ে ক্রেন দিয়ে জাহাজে নামল, আব্বাস আলীর ছিল সব নখদর্পণে। তার চোখ কান এড়াতে পারত না কেউ।'

হালদারের পিটপিটে চোখ দুটো দেখলে সে যে বুদ্ধিমান তা বুঝতে কষ্ট হয় না। ভুরু দুটো তার পেকেছে, পেকেছে মাথার অর্ধেক চুল আর দাড়িগুলো। আব্বাস আলীর হাতে রুপো বাঁধানো দামী ছড়ি। এখন তার দোতলা পাকা বাড়ি। হজ করে এসেছে মক্কা থেকে। আজ গাঁয়ে একটা শালিশি বসলে ডাকো সেই 'আব্বাস হাজীকে'।

অথচ…

'একদিন ছিল আমার তালপাতার কুঁড়ে। বর্ষাকালে মাটি-কাদার মেঝে থেকে কেঁচো উঠত। বুড়ী মা ভিজে জুজ্‌ড়ি হয়ে বকের মতন বসে থাকত সারা রাত জেগে। একটা ছাতা ছিল না। ছিল না একটা 'হেরকেন' (হ্যারিকেন)। মা পরের বাড়ি ঢেঁকি ঠেঙিয়ে যে এক-আধ মুঠো 'খুদ' পেত তার জাউ খেয়ে কলে যেতুম। একদিন খুব পানি হচ্ছে, মানপাতা মাথায় দিয়ে কারখানায় গেছি, আর পড় তো পড় শালা একেবারে লাল-মুখো ইংরেজ ম্যানেজারের সামনে। সায়েব কাছে এল। পাতাটায় হাত দিয়ে দেখলে। নীল চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল। আমার তো পরাণ খাঁচা ছাড়া! পাতাটা নিয়ে সায়েব তার কুটিতে চলে গেল। ভাবনু, মহা অপরাধ করেছি। কারখানার 'ভিৎরে' কেন শালার মানপাতা 'লেস্‌তে' (লিয়ে+আসতে) গেনু মুই! চাকরিটা আমার যাবে!'

'বেলা ন'টার সময় দেখি গোরা সায়েব কারখানায় এসে ঢুকেছে। সবলোকের পাশে পাশে যাচ্ছে, তন্নতন্ন করে কাকে যেন খুঁজছে! শেষে আমাকে দেখতে পেলে। আমার দিকে এগোতেই, ওরে বাপ—দে শালা দৌড়…বিমের পেছনে লুকোলুম। সায়েব ঠিক এসে ধরল আমাকে, মোরগ যেমন ছুটে এসে ধরে মুরগীকে—আর ঠোঁপর বসায় তার মাথায়—আর পাকড়াও করে নিজের আয়ত্তে।…আমার পচা ময়লা ঘাম-ভেজা মষে-ধরা জামার কলার ধরে নীল-চোখো লাল-মুখো সায়েব টেনে আনলে অফিসে। নিজের খাস-কামরায়। বড়বাবু পিয়ারীলালকে ঘণ্টা বাজিয়ে ডেকে পাঠালে। বাবুর বড় বড় গোঁফ। খই ফোটার মতন চড়বড় করে ইংরিজি বলে সে। সায়েব তাকে মানপাতাটা দেখিয়ে শুধোলে—'হট ইস দিস্?' সায়েব আমাকে

ইশারা করে দেখালে, বাবু মারতে গেল।—'ব্যাটা বাঁদর, কারখানার ভেতরে কে তোকে মানপাতা আনতে বললে!' আমি 'কসুর হয়েছে' বলে হাতজোড় করে মাফ চাইলুম। সায়েব তখন বাবুকে 'ড্যাম ফুলিস' বলে গাল দিয়ে বোধহয় আমার সব কিছু জানতে চাইলে। নামধাম। কিসে কাজ করি। বছরে কদিন কামাই। বাবু খাতা দেখে এসে বললে, মিল পত্তনি থেকে কাজ করছে, একদিনও কামাই নেই! নাম আব্বাস আলী হালদার। মোহামেডান।'

'হ্যাং ইওর মোহামেডান!' সায়েব খুশী। নীল চোখ নাচিয়ে হাসলে। বললে, 'তুমার ছাতা নাই?'

'না হুজুর-বাবা।'

'তুমার আউর কে আছে?'

'মা—জইফ বুঢ্ঢী।'

'ঘর?'

'তিন বাই ছয় হাত একটা তালপাতার কুঁড়ে। পানি পড়ে।'

বাবু সব বুঝিয়ে দিলে। এক কাঠা জমিও নেই।

সায়েবের মনে ধরল আমাকে। কুঠি-বাড়িতে নিয়ে গেল। মেমের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে। ছাতা কাপড় জামা কিনবার টাকা দিলে। সরদার করে দিলে। দশ টাকা 'হপ্তা' তখন। উপরি আরো দশ টাকা—লোক লাগালেই তারা সপ্তা গেলে দিত সরদারের নজরানা। একদিন সায়েব কলকাতায় যাবে—ঘোড়ার গাড়ির কোচে উঠে বসতেই গাড়ি টগবগিয়ে গেট ছেড়ে বেরিয়ে গেল। হঠাৎ দেখি, সায়েব ব্যাগ ফেলে গেছে। চেন টেনে দেখি অনেক টাকা। টাকার বাণ্ডিল। ছুটলুম সায়েবের গাড়ির পেছনে। অনেক দূর যেয়ে চেঁচামেচি করে তবে ধরনু। সায়েব নেমে এল। ব্যাগ দেখে অবাক। আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে গেল। আমি হয়ে গেনু গোটা মিলের মানে শ্যামগঞ্জের—বড় সরদার।

'তারপর সেই সায়েব এল আমার বাড়ি দেখতে। নাম তার হেনরী মিচেল। এই তিরিশ বিঘে বাস্তু ডাঙা কিনে দিয়ে গেল তিন হাজার টাকা দিয়ে। দোতলা পাকা বাড়ি সেই বেঁধে দেবার খরচ যোগালে। মিচেল ছিল আমুদে লোক। আমাকে নিয়ে বেড়াতে বেরুত। হেঁটে হেঁটে গাঁয়ের পাড়ায় পাড়ায় যেতাম। রায়পুর, কাশীপুর, আলমপুর, হাঁসনাচা, আছিপুর,

রাজিবপুর, গদাখালি, নলদাঁড়ি কত গ্রামে যেতুম। ছেলেদের দেখলেই সায়েব নাচতে বলত তাদের সামনে পয়সা ছড়িয়ে দিয়ে। তারপর ফটো তুলত। নথ নাকে কিংবা নোলক নাকে কোনো মেয়েকে দেখলে সায়েব তাদের নথ-নোলক ধরে নাড়া দিয়ে মজা করত। তার ভাষা তখন সব আমি বুঝতুম। একদিন হল কী জানো ভাই, গদাখালীর বাঁশের সাঁকো পার হয়ে আসতে পারে না কাদের একটা অতি সুন্দরী, বছর আঠারো বয়সের মেয়ে। সায়েবও বাঁশের সাঁকো পার হতে পারে না। আমি দুজনকে পার করে দিলুম। মেয়েটার ছবি তুললে সায়েব। মেয়েটি মিষ্টি-মিষ্টি হাসতে লাগল আড়ে আড়ে। আর ব্যাটা সায়েব করলে কী তাকে 'কলকে' ফুলের বনটার পাশে ধরে চুমো খেয়ে দিলে। মেয়েটি লজ্জায় লাল হয়ে পালাল। দশটা টাকা দিয়ে আমি তার ঠিকানা জেনে নিলুম সায়েবের হুকুমে। তারপর মেম আমাকে সেই মেয়েটির ছবি দেখিয়ে বলেছিল, কে এই মেয়ে? সায়েব নাকি রোজ সন্ধ্যার পর লঞ্চ নিয়ে যায় কাঁটাখালির ঘাটে—প্রথম দিন সে মামার বাড়ি আসছিল—সেখানে লঞ্চে ওঠে মেয়েটি। তার মা বাপ জানে। তারা টাকা নেয়।'

'মিচেল সায়েব বছর পনেরো থেকে দেশে চলে গেল। বিরাট বড়লোক তারা। বিলেতে বাড়ি গাড়ি ব্যবসা ছিল। তার একটা চিঠি আছে আমার কাছে।'

বুড়ো আব্বাস হালদারের সাত বেটা। সাতখানা ঘর তারা দখল করেছে। চিলেকোঠায় থাকে এখন বুড়ো। তোবঙ্গ থেকে সায়েবের চিঠিখানা বার করে এনে দেখালে। উপদেশ বাণী পাঠিয়েছে হেনরী মিচেল।

সূর্য ডুবে আসছে। ছাদে বসে লোটার-পানিতে 'অজু' করলে আব্বাস আলী। মাদুরী বিছিয়ে মগরেবের নামাজ পড়লে। দোওয়া-দরুদ পড়তে লাগল অনেকক্ষণ।

ছাদ থেকে শ্যামগঞ্জের গোটা মিলখানা স্পষ্ট দেখা যায়। বাদশাহ শাহজাহানের তাজমহল দেখার মত আব্বাস আলী কারখানাটার দিকে তাকিয়ে থাকে। প্রতি শনিবার এখনো তাকে একবার যেতে হয়। বাবুরা চেয়ার দেয়। পেনসন পায় হালদার। মাসে চল্লিশ টাকা।

শুধোলাম, 'তুমি বড় সরদার হয়ে যে টাকা কামিয়েছিলে সেই টাকায় বাড়ি, সেই টাকায় মক্কায় গিয়েছিলে বলে কেউ কেউ রটায়, সেটা কি সত্যি?'

'হজে যাওয়ার টাকা আমার গতর খাটানীর। শুনেছিলুম, কালো টাকা নিয়ে গেলে নাকি আরবের উট পিঠে নেয় না। আর হজ 'জায়েজ' (মনোনীত) হয় না। বাড়ির টাকা মিচেল সায়েবের। তবে যে-সব টাকা দিয়ে শতখানেক বিঘে জমি কিনেছিলুম সেগুলোর কথা বলতে পারো। পরের টাকা না হলে বড়লোক হওয়া যায় না। মিচেল সায়েবও অনেক টাকা মারত।'

'তুমি যে সতেরোটা গরু, একশো খাসী, একশো মণ চাল, তিন নৌকো দই করে সাতটা গ্রামের লোককে ইস্তাহার ছড়িয়ে 'খানা' খাইয়েছিলে তার খরচ কোথায় পেলে?'

'সবই আল্লার দয়ায় ভাই। ঐ চাঁদনীর পুকুরটা কাটাবার সময় দু-ঘড়া সোনার মোহর পেয়েছিলাম বাদশাহী আমলের। সে সব ঐ মানুষজনকে খাইয়ে শেষ করে দিয়েছিলুম। লোকে বলে একটা 'কালা জীন' আছে নাকি আমার বাস্তুতে—সে সব যোগায় আমাকে!' হাসতে থাকল বড় সরদার।

অনেকক্ষণ চুপচাপ। আমাদের চা দিয়ে গেল। আলো জ্বাললে আব্বাস হালদার। বললে, 'টাকা হল গাঙের বালি। যখন আসে রাশি রাশি। যখন যায় ভাঁটার টানে বেরিয়ে যায়। আজ আমাব সব বেরিয়ে গেছে। ছেলেরা কেউ লেখাপড়া শিখলে না। ভাগচাষের জমি সব বেরিয়ে বেদখল হয়ে গেল। ছেলেরা চাষও জানে না। আলাদা করে দিতে কলে-কারখানায় যাচ্ছে। কেউ তাঁতে বিমে দেয়ানে বোপিনে কাজ করে। বজবজের কারখানায় যায়—শ্যামগঞ্জের কারখানায় বাপের মান ডোবাবার জন্যে যায় না বেটারা। এখন চোখটা বুজলেই বাঁচি। পাকা গবরটাও গেঁথে রেখেছি। মরণ আর আসছে না। আজ একটু দুধ পাই না। চালের দর এক টাকা আশী পয়সা কিলো। গত বছর তিন টাকাও হয়ে গেল। এখন আমার বাড়ির সামনে ছেলেদের নাম ধরে কাবুলী এসে হাঁক মারে। শ্যামগঞ্জে এখন দুশো জন কাবুলী, তিন জায়গার আড়াই হাজার লোক এসে আছে। তাদের আগে কাজ দিতে হয়। তারা সবাই নাকি 'কমিউনিষ্ট'। অনেক 'বাঙাল'-বাবু এসেছে। এখানের লোকেরা কাজ পাচ্ছে না। তবে ইউনিয়ন হয়েছে, 'টেরাইবুনাল' হয়েছে—অনেক 'হপ্তা'—তবু আমাদের কালের মতন সুখ নেই। কারখানার লোকগুলোর চেহারা যেন মুখপোড়া হনুমানের মতন। আমার সেজো ছেলেটার এখন রাত কাজ। হঠাৎ সেদিন তাকে দেখে চিনতে

পারিনি। মুখ পুড়ে কালো হয়ে গেছে। দশ বিঘে করে ধানজমি দিয়েছিলুম সব্বাইকে—সবাই উড়িয়ে দিয়েছে। মেজোটা আবার মদ খায় নাকি! তওবা আস্তাগ্ ফেরুল্লা!'…

একটা মাঠ পারের বিস্তীর্ণ এলাকায় আজ অনেক কারখানা শ্যামগঞ্জে। চটকল, ফাইবার, লিনোলিয়াম, অ্যাসিটিলিন গ্যাস, ক্যালসিয়াম কারবাইড, কার্পেট, পাওয়ার হাউস কত কি! হাজার হাজার লোক কাজ করছে। বাঙালী, ওড়িয়া, বেহারী, চুলিয়া, ভোজপুরী—ছত্রিশ জাত—হরবোলার মতন ভাষা। ঝম্‌ঝম্‌ করছে কারখানার শব্দ রাতদিন।

হাজী আব্বাস হালদার এখনো মরে নাই কিন্তু তার সাদা পাকা কবরটা রাত্রির জ্যোৎস্নায় ধবধব করছে। কাঁটালী চাঁপার গন্ধ আসছে সেখান থেকে।

হেনরী মিচেলের চিঠির ভাষার জটিল বক্তব্যটা কেউ নাকি পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বলতে পারেনি আব্বাস হালদারকে। বড়বাবু পিয়ারীলাল থাকলে বলতে পারত। সে পাটের গাঁট চাপা পড়ে মরে গিয়েছিল সায়েব থাকতে থাকতেই। তার জন্যে একদিন ছুটি হয়ে গেল গোটা কারখানা। কত হাজার লোককে চিনত হালদার, কেউ চিঠিটা ভাল করে পড়তে পারেনি।

আমি পড়ে দিতে হাজী আব্বাস হালদার কাঁদতে লাগল চোখের পানি মুছতে মুছতে। চিঠিতে লেখা ছিল: 'প্রিয় আব্বাস, তুমি মানপাতা মাথায় দিয়ে কারখানায় এসেছিলে, তোমার মাথায় রাজচ্ছত্র তুলে দিয়ে এলাম। যদি কখনো বিপদে পড়, আমাকে লিখ। তোমার মধ্যে আমি একজন বীর্যবান, সচ্চরিত্র, মহৎপ্রাণকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। যদি তুমি লেখাপড়া জানতে তাহলে ভাল হত। কেন না কাঁচা মাটির পাত্রে কড়া মদ ধরে রাখা কঠিন। তোমার ছেলেদের মানুষ করতে না পারলে কাঁকড়ার বাচ্চার মতন তারা তোমাকে খেয়ে শেষ করে ফেলবে। তোমার খোলা পড়ে থাকবে। তুমি ফতুর হয়ে যাবে। অতএব সাবধান, পথে হঠাৎ ভাগ্য কুড়িয়ে পাওয়া—শ্যামগঞ্জের হে বড় সরদার!'…

চাষীবাড়ির সাদিয়া

চাষীর বাড়ির বুড়ী রূপজান বিবির দুহাত ভরা 'দায়মল কাটা বাতানা', নাকে ফাঁদি নথ, কানে ঝুমকো, কোমরে বিছে হার। পৈঁচি, গোট, হাঁসুলি, সিঁথেপাটি, আঙুল চুটকি, চুলের কাঁটা, তাগা, তাবিজ, মল সব খোলা আছে এখন। সবই রুপোর। শুধু নথটা সোনার। সব মিলিয়ে দু-সের ওজন! তার বাপ দিয়েছিল সাদীর যৌতুক হিসেবে; আর 'লৌকতা'য় (লৌকিকতায়) পাওয়া মণখানেক থালা, বাটি, গেলাস, ডাবর, জগ, লোটা, পিলসুজ, ছিলিমচি, গোলাপ-দানি, পান-ডাবর। একটা জারুল কাঠের তক্তাপোশ, জলচৌকি, ছোট আলমারি। একটা গাইগরু বাছুর সমেত। তিনটে বকরী ধাড়ি। শুধু কনে কালো ছিল বলে এত দিতে হয়েছিল। তখন নাকি কেরোসিন হয়নি, করোমচার দুর্গন্ধ তেল পুড়ত, না হয় রেড়ির তেল। হুহু করে কালি উঠে অন্ধকার হয়ে যেত চারদিক। আর মাটির পোড়ানো কালো মতন চুড়ি পরত মেয়েরা।

রাত আড়াইটা বাজতে বড় বউ আর বিধবা মেয়েটাকে ডেকে তুলে নিয়ে ঢেঁকিতে ধান ভানতে লাগিয়েছে বুড়ী আর ঢেঁকির গড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে ধান 'সেকে' দিতে দিতে সেদিনের গল্প বলছে সে। মশালজ্বালা লম্ফের আলোয় ঢেঁকির ছায়াটা গোয়ালের গায়ের দেওয়ালে ক্রমাগত ওঠানামা করছে আর বুড়ীর ফাঁদি নথটা একবার দুলে দুলে ঝুলে যাচ্ছে আবার গালে চেপে বসছে। গলায় গামছা বাঁধা আয়মনের পাঁচ-ছ বছরের ছেলেটা ধানের কুঁড়ো মেখে শীতে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে কাঁদছে আর ঢেঁকির ছায়াটা দেখছে।

বড় বউ আম্বিয়া আর বিধবা মেয়ে আয়মন সমান তালে ঢেঁকিতে 'পাড়' দিচ্ছে পা দিয়ে, ভারায় কনুই আর বুকের ভর রেখে পৈঠায় দাঁড়িয়ে। ঘেমে গেছে দুজনেই। গায়ের কাপড় খুলে রেখেছে ভারায়।

বড় বউয়ের মাথার চুল ভিজে। মাঝ রাত্রে সে ডুব দিয়ে এসেছে মাঘ মাসের কনকনে শীতে। ননদ মশকারা করে তাই নিয়ে। মুসলমান ঘরের মেয়েরা তাই করে। বাসি গায়ে হাঁড়ি ছুঁতে নেই, ছেলেকে ছুঁতে নেই, তার চোখ উঠবে, দুধ খেলে পেট খারাপ করবে, ধান চাল কোনো কিছুই ছোঁবার

উপায় নেই। শাউড়ী একবার জানতে পারলে গিধ্যড় নোংরা বউয়ের মায়ের ঝেড়ে কাপড় পরিয়ে দেবে।

বড় বউয়ের ঘাম ঝরে পড়ছে পা বেয়ে। পা হড়কে যায়। ঢেঁকি ঠিকরে ওঠে। বেতাল হয়। শাউড়ী রাগারাগি করে : 'হাতটা মোর ভাঙবি নাকি তোরা? 'কেলা' গাছেব পানা মোটা মোটা পা—পায়ের জোর কি 'গয়া'য় গ্যাচে লা বড় বউ? দিনে পাঁচবার সাত পাতরা ভাত মারিস—যায় কোথা?'

'হুঁ, মোর খালি ঘাম হচ্ছে! পা ভিজে গাছে।'

ক্রমাগত পা বদল করে বড় বউ। হাল্লাক হয়ে যায়: আয়মন হাড়-চিমড়ে মেয়ে। দুটি ছেলের মা। বড় বউয়ের চারটে ছেলে-মেয়ে। ভারি গতর। বাপের বাড়িতে ঢেঁকি ছিল না। মেজ, সেজ দুই বউ গেছে বাপের বাড়ি। তারা এক মায়ের পেটের দুই বোন। ছোট বউ আধা শহুরে মেয়ে। সে চাষীর বাড়ির কোনো কাজই জানে না।

বুড়ী বলে, 'বড় ব্যাটার মাথায় রোখ চাপল—বউ চাই সুন্দুরী। সুন্দুরী বউ লিয়ে কি ধুয়ে খাবে? ছোট বউ ইউ-পি পাস, কোরআন শরীফ পড়তে পারে, আম ফাঁকের মতন বড় বড় চোখ, ধনুকের মত ভুরু, বাঁশির মতন নাক, সরু পাতলা ঠোঁট—গায়ের রং দুধে-আলতা গোলা—কিন্তুন ওরে ব্যাটা, এখন কাজের বেলা? ধান কুটতে, ধান ভাপাতে, সেদ্ধ করতে, ধান চাখতে জানে নে, ভাতের হাঁড়ি নাবাতে পারে নে। ঢেঁকিতে 'পাড়' দিতে জানে নে। তবে জানে কি শুধু শুয়ে থাকতে আর খেতে, গোসল করতে আর পুঁথি পড়তে? আস্তে আস্তে শিখতে হবে তো সব। ওমা, মালসার আগুনে প্যাকাটির 'গোঁদরোক' (গন্ধক) পুড়িয়ে পিদিম জেলে ছোট বউকে ডাকতে গেনু, বউয়ের সাড়াই নেই।...বউয়ের সিল্কের শাড়ি, সোনার গয়না দিয়েছে তার মামারা—তাদের কলকাতার 'হক' সাহেবের বাজারে দোকান—বউ লেখাপড়া জানে—কত অহংকার—মাটিতে পা পড়ে নে। মোর বাপ কি দান-যৌতুক দেয় নে লা?'

এক-ছে' হয়ে গেলে বুড়ী ধান পাছড়াতে বসে গড়ে থেকে সব তুলে নিয়ে কুলো ধরে; আম্বিয়া আর আয়মন এলো-গায়ের ঘাম মুছতে থাকে পৈঠার ওপর বসে পড়ে। হাঁপাতে থাকে হাঁ করে—গাল ফাঁক করে।

আয়মনের ছেলেটা এসে তার কোলে বসে। তার গা হাত হিম হয়ে গেছে।

সকাল হবার আগেই দেড় মণ ধানের চাল হয়ে যায়। কাঁচের মতন চকচকে চাল।

সেদিন ঈদের দিন। তাই মসজিদে ক্ষীর পাঠাবার জন্যে আরো সের পনেরো বাসকামিনী ধান ঢালে বুড়ী আতপ চাল করবার জন্যে ঢেঁকির গড়ে। 'পো'-এর ওপরে 'আঁকসলি'-টায় শব্দ করছে বলে জল দেয় বুড়ী।

বড় বউ নেমে যায়, 'আমি আর পারবুনি' বলে। বুড়ী তার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে গালে হাত দেয়। মুখে বাক্ সরে না। আয়মন একাই 'পাড়' দিতে শুরু করে।

বুড়ী বলে, 'বেশ, আটটা বাজলে 'মজিদে'র ক্ষীর না হলে ঐ বড় ব্যাটা এসে 'চুলো' কুপিয়ে দেবেখন কোদাল দিয়ে। ত্যাখন যেতি বড়্কিকে ঝাঁটার বাড়ি মারে, কুন্ আভাগির বেটি যায় ছাড়াতে—দেখিস!'

ছোট বউ এসে ঢেঁকিতে উঠল। আয়মনের কাজের শেষ নেই। ছুটি নেই। স্বামীর মাথা খেয়ে সে ভাইদের বাড়ি এসে আছে; পেটের ভাতের জন্যে তার গতর থেঁতো হলেও কেউ 'আহা' করবার নেই। ভাইরা তার নিকে দিতে চাইলেও সে রাজী হয়নি দুটো ছেলের মুখ চেয়ে। ছোট বউ আস্তে আস্তে সব কাজ শিখে নিচ্ছে। একদিন ঘণ্টাখানেক সে ননদের সঙ্গে ঢেঁকিতে 'পাড়' দিয়ে দু-তিন দিন উরুর যন্ত্রণায় ঘুমোতে পারেনি।

সকাল সাতটা নাগাদ বড় ছেলে আশরাফ আলি হাঁটুর মধ্যে বালতি ধরে দুটো গাই দুয়ে দিলে। পাঁচ সের দুধ। আর সাত সের বাসকামিনী ধানের সুগন্ধ চালের ক্ষীর চড়ানো হল। তিন-চার সের সাদা বালি গুড় পড়ল তাতে। পাড়া মাত হয়ে গেল গন্ধে।

ধামায় ঢেলে দিতে মসজিদে নিয়ে গেল ছেলেরা। সাবান দিয়ে গা হাত ধুয়ে লুঙ্গি পাজামা পাঞ্জাবি পরে মাথায় টুপি দিয়ে কানে আতর গুঁজে সপ্ মাদুরী ঘাড়ে নিয়ে পুরুষরা সবাই নামাজ পড়তে চলে গেল। সিমাই রান্না করে দিতে তারা খেয়ে গেছে। দুপুরে চালের আটার রুটি আর মুরগীর মাংস রান্না হবে। লোকজন এলে সিমাই খেতে দিতে হবে।

নামাজ পড়ার পর চার-পাঁচজন লোক সঙ্গে করে আনলে আশরাফ আলী। তাদের সঙ্গে এলো নিয়ামত মৌলভী। মুখে চাপ দাড়ি। পান খাওয়া লাল ঠোঁট। মাথায় উঁচু জালী টুপি। হাতে রুপোর লাঠি। মৌলভীর অবস্থা ভাল। তিন জোড়া হাল চলে। দেড় শো বিঘে সম্পত্তি। ওর একটা

ছেলের সঙ্গে আশরাফের চোদ্দ বছরের মেয়ে রহিমার সাদীর কথা চলছিল। মৌলভী নিয়ামতের চোখ দুটো ছুরির ফলার মতন। চারদিকে ঘুরে ঘুরে টর্চের মতন দেখে। তার চাচার সঙ্গে ওর ছেলেটা এসে একদিন কনে দেখে রহিমার হাতে দুটো টাকা দিয়ে গিয়েছিল। তালপুকুরে জল আনতে যাবার পথে রহিমার সঙ্গে নাকি মৌলভীর ছেলে আসগারের দেখা হয়েছে। কথা বলাবলি করেছে দু'জনে।

নিয়ামতদের সিমাই ক্ষীর খেতে দিলে ছোট বউ। তার বাপের বাড়ির বিচিত্র বর্ণের আধুনিক প্লেট, কাঁচের জগ ইত্যাদি এনেছে। নিয়ামত শুধোয়, 'কতটা ধান-খড়-বাঁশ-পাট-কলাই-আনাজ হয় তোমাদের আশরাফ-ভাই?'

'সামান্য মুদিখানার বাজার ছাড়া আমাদের প্রায় কিছুই কিনতে হয় না। ১৮ জন লোকের খোরাকী লাগে ১৬২ মণ ধান। কিছু ধান বিক্রি হয়। পাঁচ হাজার নারকোল, হাজার দশেক বাঁশ, একশো মণ আলু, পাঁচশো মণ আনাজ, পঞ্চাশ মণ খেসারি, ছোলা, মুগ, অরহর বিক্রি হয়। খেজুরে গুড়, তালের গুড়, আখের গুড় বিক্রি হয় কমপক্ষে দুশো কলসী। সরষে আর তিল যা হয় তাতে তেলের অভাব হয় না। নারকোল ভাঙানী শাঁস থেকে নারকোল তেল পাই। লঙ্কা, হলুদ, সরষে, ধনে, পাট, শণ, কলা, মূলো, আলু, শসা, কাঁকুড়, তরমুজ, আনারস, আম, কাঁটাল, পেয়ারা, সবেদা, নারকোল, উলু, প্যাকাটি, পান, মাছ, দুধ, মধু, গুড়, হাঁস-মুরগী, ধানচাল, খড়ভুঁসি, গরু, বকরি সব আমাদের আল্লার রহমতে আছে। শুধু কাপড়টা আর জিরেমরিচ, নুন কিনতে হয়!'

নিয়ামত বলে, 'আমারো তাই। তবে ছেলেটাকে দিল্লীর মাওলানা করতে চাইলুম, হল না, ঐ এখন চাষবাস দেখে। তা মেয়ে তোমার পসন্দ আশরাফ-ভাই। কতকগুলো ঝামেলার জন্যে ক'মাস ব্যস্ত ছিলাম। এখন আমি রাজী।'

'আমি আজই রাজী। পারলে তোমার ছেলেকে 'নওশা' বেশে সাজিয়ে আনো।'

নিয়ামত বললে, 'পারবে? আছে হিম্মৎ?'

'বলো কী! এক্ষুনি তাহলে লাগাও। দেনা-পাওনা নেই। আমি যা দিই তাই নেবে—তুমি মেয়েকে যা দেবে তাই নেব। এই করিম-রহিম-আকবর, তোমরা বড় পুকুর থেকে মণ দুই মাছ ধরে দাও তো এক্ষুনি।

আমি বাঁজা 'টাঁড়' গরুটা জবাই করে দিচ্ছি। এই আয়মন, ধর তো সাতটা মোরগ-মুরগী। আবুল, তুই যা গোবর্ধন দাসকে ডেকে আন সে মিষ্টি বানাবে, ভোলা সাহার দোকান থেকে এক মণ চিনি দিয়ে যেতে বলে যাবি, এক্ষুনি গয়লা অখিল ভোঁড়কে দু' মণ দুধ দিয়ে যেতে বলে তবে দাসের বাড়ি যাবি!'

লেগে গেল রমারম কাণ্ড।

মৌলভী পকেট থেকে দুশো টাকা ছাদনাতলার খরচ দিতে গেলে আশরাফ হেসে বললে, 'কেন, আমি কি গরিব, হাঁ দাদা, আচ্ছা, ঐ টাকার একটা গয়না না হয় বাড়িয়ে দিও তোমার বউ-মাকে।'

নিয়ামত মৌলভী চলে গেল। কথা রইল বেলা বারোটার মধ্যে তারা বর আর শতখানেক বরযাত্রী নিয়ে আসবে। মাছ ধরা হল: দশ সের করে চারটে কাতলা, পাঁচ সের ছ'টা রুই, আর বাদবাকি মৃগেল, বাটা, কালবোস ইত্যাদি। এসব মাছই আয়মনের মৃত স্বামীর পুকুর থেকে মহাজাল দিয়ে ধরে এনে নিজেদের পুকুরে ঢেলে রেখেছিল আশরাফ আলী—এখন মাছগুলো বড় হয়েছে। দুধ চিনি এলো। ছানা কাটানো হল। গোবর্ধন দাস লুচি, পানতুয়া, মিহিদানা ছাঁকতে লাগল। আরশাদ হালুইকর গোশ্‌ত রান্না করতে লাগল বড় বড় 'দেগ' হাঁড়ি চড়িয়ে। পাড়ার আত্মীয়-স্বজন মেয়েরা এসেছে হঠাৎ ডাক পেয়ে। মেয়েরা ভাত রান্না করে হাঁড়ির পর হাঁড়ি ঝ্যাংলায় ঢালছে। বুড়ী রূপজান 'পাকান' (ভাজা পিঠে) ভাজছে আড়ালে লুকিয়ে। কেউ 'ভারলে' সব নষ্ট হয়ে যাবে। কতক মেয়ে কাগজের মতন পাতলা করে চালের আটার রুটি বেলছে 'খামির' ছেনে 'নেচি' কেটে 'জিনিস' তৈরি করে নিয়ে। রুটিবেলায় আয়মনের হাত সবচাইতে সরেস।

মেয়ে রহিমাকে গায়ে হলুদ মাখাতে মাখাতে গান জুড়েছে চাচাতো দিদি। সে ভীষণ রসিকা মেয়ে। নাচতে পারে। গলার স্বরও বেশ ভাল। সে গাইছে:

নয়া হাঁড়ি নয়া সরা
নয়া সাগরের পানি গো—
নয়া তোমার মনের মানুষ
বলবে, 'এসো রাণী গো'
নয়া ঘর নয়া সংসার
নয়া বিছানার ঘুম গো—

নয়া তোমার মনের নাগর
দেবে চাঁদ-মুখেতে চুম গো—

লজ্জা পায় রহিমা। মেয়েরা হেসে কুটিকুটি হয়। পুরুষরা সেদিকে যায় না। গানের ভাষা ক্রমে ক্রমে নিচুতে নামে। পরে খিস্তি আরম্ভ হয়। একখানা শাড়ি কাপড়, পাঁচটা টাকা, এক মালসা মিষ্টি দিলে তবে বুড়ীর হাত থেকে হলুদ-মাখা কনেকে উদ্ধার করা যায়। এর পর মেয়েরা—যারা ভাজ ননদ বা নাতনী-দিদিমা সম্পর্কিতা তারা রং খেলায় মাতে :

ঘোড়ায় চড়ে বাদশাহী বেশে বর আসে। সঙ্গে বহু লোকলস্কর।

বাইরের দলিজে মাদুর ঝ্যাৎলা সপ বিছিয়ে তার ওপর সতরঞ্চি কাঁথা বালিশ পেতে তাদের বসতে দেওয়া হয়। তারা প্রত্যেকে 'ওজু' করে পা-হাত ধুয়ে এসে বসে। বরকে কোলে করে নামিয়ে আনে ভগ্নীপতি সম্পর্কের কেউ। সবাইকে শরবত দেওয়া হয়। তারপর লুচি মিষ্টি হালুয়া। দেড় ঘণ্টা পরেই খানা ভাত। প্রত্যেককে একটা ডিশ দিয়ে হাত ধুইয়ে পাতে পাতে নুন দিয়ে যায় সবার। তারপর ভাত আসে সুগন্ধি গোলাপ-ভোগ চালের। মাছ ভাজা, ডাল, মাছের মুড়ো দিয়ে আলুঘণ্ট। বরের থাল আসে। বিরাট বড় খাঞ্চা। তাতে মাঝখানে ভাত, উপরে বিরাট দুটো মাছের মুড়ো, চার দিকে ভাজা মাছ, ভাজা মোরগের 'রান', 'পাকান' পিঠে, চালের আটার পাতলা রুটি ঢাকা দেওয়া সব কিছু। বরের সঙ্গে বসে তার বন্ধু, ভগ্নীপতি, দাদামশায় ইত্যাদি পাঁচ-ছজন। দশ-বারোজন লোক খাদেমদারী করছে। 'সবাই এবার 'বিসমিল্লা' বলে খেতে শুরু করুন'—বললে তবে খাওয়া আরম্ভ হয়। বরের থাল থেকে বিলি করা হয় সব রকমের জিনিস কিছু কিছু। দুটি ডিশে আসে 'ষোল আনা' আর 'রেইসে'র (প্রধান) মান। খাওয়ানোর শেষে বরের কাছ থেকে' হাত-ধোয়ানি' টাকা আদায় করে তার শ্যালক। খাদ্য-উচ্ছিষ্টের মধ্যেও টাকা দিতে হয় পাত্রে।

পাড়ার আত্মীয়-কুটুম্বদের খাওয়ানো হয় তারপর। কনের গোসল দেওয়ানো হবে তাই বরপক্ষ থেকে শাড়ি, ব্লাউজ, গামছা, চাদর, সাবান, তেল ইত্যাদি চেয়ে নিয়ে যায় কন্যাপক্ষের লোক। শাড়িটা নিয়ে গিয়ে দেখে সবাই। পাটের ঝলমলে বোম্বাই শাড়ি, সেই রকম চাদর, সায়া-ব্লাউজ। ছোট বউ শাড়ি দেখে হাসে। বলে, 'মৌলভী নেহাৎ সেকেলে লোক!'

গহনাগাঁটি দেয় বরপক্ষ। সবই অবশ্য সোনার। তবে পুরোনো।

বিকালে 'আসরের' নামাজের ওয়াক্তে বর-কনে পড়ানো হয়। বরপক্ষ

থেকে গাওয়া, উকিল, সাক্ষী নিয়ে যায় কনের কাছে, ওমুকের ছেলে অমুক, ওমুকের মেয়ে অমুক, গহনাগাঁটি বাদ হাজার টাকার 'দেন-মোহরে' সাদীর প্রস্তাবে রাজী থাকলে 'বিবি মজ্‌গুরা' 'এজেন' অর্থাৎ সাড়া দিন। অর্গলবদ্ধ গৃহের মধ্যে থেকে কোনো সাড়া পেলেন নাকি ? বার বার তিনবার বলা হল শব্দগুলি। প্রতিবার 'হুঁ' বলে একটি সাড়া পাওয়া গেল। 'গাওয়া', 'সাক্ষী', 'উকিল' বিবাহ-সভায় ফিরে এসে সালাম জানালে মোল্লা শুধোলেন, 'আপনারা সকলেই কন্যার সম্মতি জেনে এসেছেন ?'

উত্তর, 'জী হাঁ।'

তখন মোল্লা সাহেব সুর করে কিছু অংশ পবিত্র কোরআন থেকে পাঠ করে শোনালেন ; বরকে 'কলেমা' পড়ালেন। স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে দু'চার কথা উপদেশ দিলেন। তারপর প্রার্থনা করা হয় আল্লার দরবারে। 'হে আল্লা যেন এই নবদম্পতি সুখী হয়, শান্তিলাভ করে, তাদের বংশধরগণ যেন আল্লার এবাদত করে, বিশ্বের কল্যাণে লাগে…'

এর পর বরকে তার শ্বশুর বাড়িতে নিয়ে এসে মাদুর পেতে উঠোনে বসায়। বাতাসা শরবত দেয়। বর বোকা কিনা শ্যালকরা নানারকম পরীক্ষা করে। মেয়েরা মাদুরের নিচে 'গুণচট' পেতে দেয়—গুণের জামাই হবে বলে ! বরের অর্ধেক খাওয়া বাতাসার শরবত এনে কন্যাকে খাওয়ানো হয়। শ্বশুরমশায় সোনার আংটি পরিয়ে দেয় জামাইয়ের আঙুলে। ঘড়ি, বোতাম, সাইকেলের টাকা ধরে দেয় তাড়াতাড়ি কেনা হয়ে উঠল না বলে। দাওয়া-ভরা মেয়েরা পর্দার আড়াল থেকে বর দেখছে। মাঝে মাঝে ফুল আর বাতাসা এসে পড়ছে। মিতবর, বরের ভগ্নীপতিদের রুমাল, লুঙ্গি ইত্যাদি দিতে হয়। পরে বরকে ঘরের মধ্যে তুলে নিয়ে যায় হাত ধরে রূপজান বুড়ী। সেখানে কনের পাশে বসায়। কনের মা জামাই-মেয়ের হাত এক জায়গায় করে কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'বাবা আমার মেয়েকে তোমার হাতে তুলে দিলাম। আজ থেকে আমার রহিমা খাতুন তোমার। তার সুখ দুঃখ হাসি-কান্নার মালিক এখন বাবা তুমি।' তারপর মিষ্টি দুধভাত গালে দিয়ে দেয় দু'জনের। 'সেজদা' করায় আল্লার উদ্দেশে। সবার চাওয়া-পাওয়া মেটালে এর পর বর চলে এসে ঘোড়ায় ওঠে।

মেয়েদের কান্নাগোল পড়ে। পাল্কিতে ফুল-চড়ানী শাড়ি ঘিরে দিয়ে কনে, তার ছোট ভাইবোন, ধামাভরা কাপড়চোপড়, সাজপোশাক, আসবাবপত্র, খাবার-দাবার, শীতলপাটি ইত্যাদি ঠেসে দেওয়া হয়।

কন্যা বিদায় হতে সন্ধ্যে উতরে যায়।

চোখ মুছতে থাকে কনের বাপ আশরাফ আলী।

বুড়ী রূপজানের কাজের শেষ নেই। এর মধ্যে সে অপ্রত্যক্ষে গরুর খড় কুচিয়ে দেবার, মাঠ থেকে গরু আনার কাজে আয়মনকে ব্যবহার করেছে ঠিকই। কার খাওয়া হল না-হল দেখেছে। বাসন-কোসন জিনিসপত্র এবার গুটোতে হয়। কিন্তু একটা মিষ্টি চাওয়ার অপরাধে আয়মনের বড় ছেলে তার বড় মামার হাতের একটা চড় খাবার পর আয়মন আর তার ছেলে দুটো যে সারাদিন কিছুই খায়নি সে খবর কেউ রাখেনি।

খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে শুতে রাত এগারোটা বাজে। বুড়ী আদিখ্যেতা করে: 'ছোট বউটা আর খেলে না মা, জ্বর এসেছে, ঝকমারি করে ঢেঁকিতে উঠতে গেল! ভদ্দরলোকের মেয়ের এসব ধকল কি সয়? তার 'জইগুন বিবি'র পুঁথি পড়া পর্যন্ত বন্ধ হল, এখন মোর চোখে নিদ আসে কেমন করে?'

এই হল স্বাধীনতার আগের দিনের পল্লী বাংলার একটি চাষীর ঘরের চালচিত্র। চালচিত্র মানে কাঠামো। মৌলিক জীবনধারণের সত্তা বা অস্তিত্ব।

কিন্তু এখন সে চালচিত্র ভেঙে ছত্রখান হয়ে গেছে। বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে সাত-আটটা হয়েছে। আটটা উনোনে কাঠ পোড়ে, কাঠের টানা, কয়লা আনতে হয়। থ্রিপিস কাঠের জন্যে, বাটানগরের কারখানার জন্যে গ্রাম থেকে প্রতিদিন উধাও হয়ে যাচ্ছে গাছপালা। দুর্দিনে জমি বখয়া, বন্ধক, বিক্রি হয়ে গেছে। ঢেঁকি উঠে গিয়ে হাসকিং মেশিন এসেছে গ্রামে। সেই রূপজান বুড়ী মারা গেলে তার মেয়েদের শরিক বেরিয়ে গেছে। ব্যাটারা কাঁচা টাকার লোভে কারখানার শ্রমিক হয়েছে। চেহারা মলিন হয়ে গেছে। আজ আর তাদের দু'বেলা ভাত হয় না। শুধু আশরাফ আলীর পাকা বাড়ি হয়েছে। তার অনেক জমি। ধান বিক্রি হয়। যৌথ সম্পত্তি এবং পরিবারের কর্তা ছিল বলে নাকি সে বহু টাকাকড়ি আত্মসাৎ করেছে। তাই ভাইয়ে ভাইয়ে মামলা-মোকদ্দমা!

আর একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র ছিটকে পড়েছে এই সংসার থেকে। সে আয়মনের বড় ছেলে। আয়মনের মুখে গরু নেদে দিয়েছিল গোয়ালে কাজ করতে করতে ক্ষিদেয় অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকবার সময়—কেউ তাদের দেখত না।

পঞ্চাশ সালের দুর্ভিক্ষের পর ভাইদের একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে গেলে আয়মন দুটি ছেলে নিয়ে গতর খাটিয়ে খায়। বড় ছেলে জন খাটত—স্কুলে যেত। তার মা আয়মন কারখানার শ্রমিকদের গরম ভাতের ডিশ মাথায় করে বয়ে নিয়ে যেত। ছোট ছেলে হোটেলে কাজ করতে যায়। বাসন ধুয়ে ধুয়ে তার হাত-পা হেজে যায়। আয়মনের চোখে জল ঝরে। হায়রে কপাল! তার স্বামী ছিল একজন অতিভদ্র নম্র সৎচরিত্রের ইমাম।

দুর্ভাগ্য, আয়মনের বড় ছেলে পরীক্ষায় ফেল করে। মাত্র তিন নম্বর কম পেলে অঙ্কে। তার একটি ঘোড়ারোগ জুটেছিল। সে কবিতা লেখে, গল্প-উপন্যাস লেখে।

নুড়ির মতন গড়াতে গড়াতে আয়মন আজ আবার তার স্বামীর ভিটেতে এসে দু' কামরা খোলার ছাউনি ঘর বেঁধেছে। বড় ছেলে সত্যিকার লেখক তৈরি হয়েছে। তার একটা ছোট গল্পের বই ছেপে দিয়েছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত এবং সমালোচক কাজী আবদুল ওদুদ। সেই বই-বেচা টাকায় ঘরের খোলা হয়েছে। সেই মনীষীর কাছেই বছর ছয়েক থেকে পড়াশোনা করেছে সে। ছোট ছেলে এখন বিরলাপুর জুটমিলে 'ওয়ার্ড লুম' চালায়। ভাল সপ্তাহ পায়। দুই ছেলের বিয়ে হয়েছে। তাদের ছেলেমেয়ে হয়েছে। আয়মনের বড় ছেলের শুধু রোজগারের ঠিক নেই। তার একখানা উপন্যাস—'ইলিশমারির চর' বেশ নাম করেছে। সে এখন স্বপ্নের দিশারী। পাথর কেটে কেটে ছুটেছে অমৃতের সন্ধানে।

সাপ মন্ত্র এবং সাপুড়ে ঈশ্বর ঢালি

বাঁশের ভুঁইফোঁড় থেকে চোখে রুপোর টিপ বসানো কুমীরমুখো বেত বাঁধানো সরষের তেলে পাকানো লাল টকটকে ছড়ি তৈরি করেছে ঈশ্বর ঢালি। সেই ছড়িটাই তার হাতের অস্ত্র। আর পেটে আছে মন্ত্র—মন্ত্রের সমুদ্র। সে বিখ্যাত সাপুড়ে, আবার ওঝাও। গ্রাম নয় থানা নয় জেলা পার হয়ে তার নাম চলে গেছে কত শত মানুষের ঘরে ঘরে। কত মানুষের ঘরের মেঝে খুঁড়ে সে পদ্মগোখরো, খরিশকেউটে, কালকেউটে, উদয়নাগ, কালনাগিনী বার করে দিয়েছে। সাপে-কাটা মরা মানুষকে মন্তর ক্যাপনা করে বাঁচিয়ে তুলেছে,

সাপ খেলা দেখাতে গিয়ে বাঁশি বাজিয়ে নিজের তৈরি ছড়া-কবিতা শুনিয়ে কত মানুষকে সম্মোহিত করেছে তার ইয়ত্তা নেই।

ঈশ্বর ঢালি নাম শুনলেই সবাই ভক্তিভরে গড় করে। এযুগের সাক্ষাৎ শিবঠাকুর ও-বেটা। গলায় ওর সাপের মালা। 'বিষধর কাল ফণী'কে নিয়ে খেলা করে।

মাথায় চূড়োবাঁধা চুল ঈশ্বর ঢালির। তাতে ফুলের মালা জড়ানো। গলায় লাল কাঠির মালা। বাম বাজুতে রুদ্রাক্ষ। দক্ষিণ বাজুতে ওস্তাদ কালু কয়ালের বখশিশ দেওয়া রুপোর তক্তি। তাতে আরবী হরফে লেখা ইসলামের মূলমন্ত্র 'লা ইলাহা ইল্লাল্লা—মোহম্মদর রসুলাল্লা।' গেরুয়া লুঙ্গি, গেরুয়া পাঞ্জাবি গায়ে ঈশ্বর ঢালির। পাঞ্জাবির বোতাম নেই, যাত্রাদলের সাবেকী ঢঙের জামা। মুখে কটা রঙের গোঁফ-দাড়ি। চমৎকার গড়ন তার দেহের। তীক্ষ্ণ খাঁড়ার মতো নাক। চোখ দুটো দীর্ঘ, বিকশিত এবং বুদ্ধিদীপ্ত। যেন আঙরার আগুন জ্বলছে। কপালে একটা লাল ফোঁটা। এ মানুষকে চাষীবাসীরা যে-ই দেখে সে-ই গড় করে। তার চারপাশে ভিড় হয়।

বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায় ঈশ্বর ঢালি। সাপ ধরে বেড়ায়। হাজার হাজার গাছ ঘাস লতাপাতার নাম তার মুখস্থ। সে লেখাপড়া জানে।

রজব সেখের বড় বেটার বউকে সাপে কামড়েছে। ঈশ্বর ঢালিকে আনা হল। সে এসে মোড়ের মাথায় বসল। চা খেল। খবরের কাগজ পড়ল। একালের অনেক শিক্ষিত ছেলে মন্ত্রে বিশ্বাস করে না। তারা ঠাট্টা করে। ঈশ্বর ঢালি হাসে। তার কাছে একটা চামড়ার স্যুটকেশ আছে। একটা হাঁড়িতে বিরাট একটা গেঁড়িভাঙা কেউটে। পথে আসতে আসতে ধরে এনেছে। রজব বললে, 'মাঠের মাঝখান দিয়ে আসতে আসতে উনি একটা বিলের পাশে থমকে দাঁড়ালে। জাঙালের গর্তগুলোর ওপরে কান পেতে কী যেন শুনলে, বললে, রজব এর মধ্যে সাপ আছে। পাড়ার ছেলেরা এসে পড়তে বললে, একটা হাঁড়ি আন তো বাবারা। পরে উনি একটা গর্তের মধ্যে মন্ত্র পড়ে জোরে ফুঁ দিলে। একটা পানশিউলীর ডাল ভেঙে গর্তে ঢুকিয়ে নাড়া দিলে। তারপর গর্তের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে টেনে বার করে আনলে সাপটাকে! ল্যাজ ধরে শূন্যে চাগিয়েই মাটিতে ফেলে ছড়ি দিয়ে চেপে ছুরি দিয়ে বিষের ঠুলি বিষদাঁত উপড়ে ফেলে দিলে।'

সাপটা বার করে দেখালে সবার অনুরোধে ঈশ্বর ঢালি। তারপর খেলাতে লাগল। তার চোখে মায়া আছে, জাদু আছে। সাপটা সেদিকে চেয়ে থাকে। ফণা তুলে দোল খায়। ঈশ্বর বললে, 'একটা চোখ কানা। শিকার করতে গিয়ে বেজির নখের চোট খেয়েছিল। দেখো, সামনে কিছু নড়লেই তাকে সাপ ছোবল হানে। কেউটে ফণা ধরে। বোড়া ফণা ধরতে পারে না। ফণা না ধরতে পারলে কেউটে কামড়াতে পারবে না। সে শব্দ করে—জানান্ দেয়। হিস্‌হিস্ করে। সাপ ভয় করে। ভয়, মেরুদণ্ডের একটা গাঁট যদি একটা চোট খেয়ে ছেড়ে যায় তবে তার মুরোদ গেল। তাই ভয়ে এবং ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়। তেড়ে এসে ছোবল দেয়। সে তার প্রাণ বাঁচানোর ভয়ে।'

'সাপ নাকি তেড়ে কামড়ায় না, বইয়েতে যে লেখে ?' শুধোয় একটি শিক্ষিত ছেলে।

ঈশ্বর ঢালি বলে, 'বইয়ে অনেক কথা লেখে, সে-সব কি সত্যি ? তারা রিসার্চ করা পণ্ডিত, শহুরে লোক ! কেউটে জাতীয় সাপ, বিশেষ করে তেঁতুলে, খরিশ, গোখরো এরা তেড়ে কামড়ায় ! আসামের জঙ্গলে থাকে শঙ্খচূড়— বিরাট সাপ—সাড়া পেলেই ঝোঁড়ে ওঠে—দেখে তার চেয়ে কে আবার বিরাট বীর আছে ! তার জীবনসংশয় ব্যাপার কেউ ঘটাবে সন্দেহ করলেই তেড়ে এসে আগেভাগেই শত্রুকে ঘায়েল করে। সাপের যখন ক্রোধ আছে, সে যখন ছুটতে পারে তখন তার তেড়ে আসতে বাধা কিসের ? সাপ যদি কামড় দিয়ে বাঁ দিকে মোচড় মারে তাহলে বেশি বিষ ঢালে। ডান দিকে ওরা খায়। বাঁ দিকের বিষের থলি বাঁচিয়ে রাখে। কেউটে কামড়ালে আগুন লাগার মতন 'জ্বলে গেল পুড়ে গেল' বলবে।'

'আপনার হাতে এই যে রুদ্রাক্ষ, এটা কি 'শক্ত' ?'

'না, এটা 'নিরেট' !'

কাজেই ঈশ্বর ঢালির বুদ্ধি পরীক্ষা করতে যাবেন না—নিজে ঘায়েল হবেন। তার সঙ্গে লাগা মানেই কেউটে সাপের সঙ্গে খেলা করা। সে সাতঘাটের ঘেটো। আগে সমাজের কলঙ্ক থানার দালাল মদন দাসকে খুন করে সত্য স্বীকার করে সাত বছর জেল খেটেছে। তারপর সাপুড়ে ছিল বহুদিন, সাপ খেলা দেখাত। সখীর নাচের ছড়া কাটত আর বাঁশি বাজাত। আজ বিখ্যাত ওঝা। সাঁওতাল পরগণায়, কামরূপে ছিল সে বহুদিন। পাহাড়ী সাঁওতালী

এক মেয়েকে এনে রেখেছিল বছর দুই ওর ঘরে। এখন সাপ বিক্রি করে আসে চিড়িয়াখানায়। সাপ, ব্যাঙ, বেজি, উদ্‌বিড়াল, ভাম, খট্টাশ, গো-হাড়গেল —এসবের চামড়া বিক্রি করে আসে কলকাতার চামড়ার গুদামখানা-ভরা ফিয়ার্স লেনে।

ঈশ্বর ঢালি একটা মন্ত্রের বই লিখে ছেপেছে। সে-বই তার শিষ্য হলে তবে পাওয়া যাবে। চার আনা দাম।

ঈশ্বর ঢালি বললে, 'থিওরিটিক্যাল আর প্রাকটিক্যাল তফাত বাবা। প্রাকটিক্যালকে একটা থিওরিতে আনতে হয় সত্য কিন্তু উপন্যাস-গল্পের চন্দ্রবোড়া যখন প্রায় কঞ্চিহীন তল্লা বাঁশের ঝাড়ের মাথায় উঠে শিস দিয়ে পাড়া মাত্ করে তখন তাকে বাস্তব বলবে কেমন করে? চন্দ্রবোড়ার গায়ে ২৩ থেকে ২৭টা চাকা। লম্বা আড়াই হাত। কঞ্চিঠাসা জাওয়া বাঁশের ঝাড়ে হয়তো উঠতে পারে মানুষখানেক—কিন্তু কেন উঠবে—সাপটা যে নিরীহ—চুপচাপ পড়ে থাকে পাতাঘাসের মধ্যে। চোখে চোখ পড়লে তবে সনসন করে পালায়। হঠাৎ পা তুলে দিলে তবে কামড়ায়।'

'আপনি মন্ত্রে বিশ্বাস করেন?'

'মন্ত্র মানসিক ক্রিয়া করে—হিপ্‌নোটিজম। দ্রব্যগুণই আসল। দেখুন না, শিবঠাকুরের গলায় সাপ কেন? তিনি ছিলেন সেযুগের সর্পবিশারদ। সাপ নিয়ে তিনি খেলা করতেন। অনেক জড়ি-বটি জানতেন। সে-সব এখন আমরা প্রায় ভুলে গেছি। তবে বাবা তোমাদের বলি, সাপ কামড়ালেই 'তাগা' বাঁধবে—পুরোনো ঘি খাইয়ে দিয়ে চার ঘণ্টার মধ্যে হাসপাতালে নিয়ে যাবে। অন্ধ বিশ্বাসে হাতুড়ে বদ্যি ওঝাদের ডেকো না। এখন ভাল ভাল ইঞ্জেকশন হয়েছে। চন্দ্রবোড়া কামড়ালে নাক-মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে—গা ফেটে যায়—রস ঝরে। বোড়ার বিষ গাঁটে গাঁটে—এই আছে এই নেই যেন। গোখরো কামড়ালে ১৫ মিনিটের মধ্যে রোগী ঢলে পড়বে। তবে কেউটের বিষ যেমন দ্রুত ওঠে তেমনি দ্রুত নেমেও যায়। শিয়রচাঁদার বিষ ভয়ঙ্কর। বাঁচানো কঠিন। চামরকোষার বিষও খুব তীব্র। চ্যাংবোড়া বা বিঘুতেবোড়া চ্যাংমাছের মতন—লাফ দিয়ে কামড়ায়। আগে চন্দ্রবোড়ার কামড়ে সবাই মরত—এখন শতকরা ৯০টা বেঁচে যায় হাসপাতালে গেলে। আমি ইঞ্জেকশন ব্যবহার করি। বিষধর সাপ কামড়ালেই জানতে পারবে। ব্রহ্মতালু পর্যন্ত ইলেকট্রিক শক লাগার মতন লাগবে। কাটা জায়গায় পটাশ পারম্যাংগনেট

লাগিয়ে দাও। চুল দিয়ে দাঁত তুলে ফেলো। সবার আগে কষে দুটো বাঁধন দাও পর পর। তারপর ওঝা-বদ্যি-হাসপাতাল।'

একটি বুড়ী মেয়ে এসে বললে, 'হাঁ বাবা ঈশ্বর, তোর সেই সখীর নাচ শোনাবি না! এতকাল পরে এলি?'

ঈশ্বর ঢালি বুড়ীর পায়ে হাত দিয়ে গড় করলে। বললে, 'মা, সাপেকাটা দেখতে বেরিয়েছি। দেরি হয়ে যাবে।'

বুড়ী বললে, 'তোর নাম শুনলে সাপেকাটা রোগী ঝেড়ে উঠবে! গানটা বলে যা বাবা—সবাই শুনুক।'

ঈশ্বর ঢালি হাসলে। সুটকেস খুললে। লাল কাপড়ের দুটো সখী বার করলে। নাচাতে শুরু করলে। মুখের শব্দ করে ছেলে-কাঁদা শোনাতেই যে-যেখানে ছিল ছুটে এল। গান শুরু হল। অদ্ভুত ঢলানি সুর।

"র-সে-র বি-নো-দি য়ে
ভাল নাচবি খাঁদি॥
মরদ গেছে ধান কাটিতে
সতীন আছে ঘরে
দুই সতীনে ধান ভানিতে
চুলোচুলি করে।
র-সে-র বি-নো-দি-য়ে
ভাল নাচবি খাঁদি॥
বাঁজা খাঁদির হয় না ছেলে
পাছার ঢপ্‌ঢপানি
ছোটগিন্নীর হিজড়ে ছেলে
তাতেই কী বাখানি।
র-সে-র বি-নো-দি-য়ে…
ভাল নাচবি খাঁদি॥
কি শাক রাঁধলি খাঁদি
পাটশাকের ঝোল
খাঁদা নাকের ঘড়ঘড়ানি
পাড়ায় গণ্ডগোল!

র-সে-র বি-নো-দি-য়ে…
ভাল নাচবি খাঁদি ॥
টিপির টিপির পানি হয়
রথেরো মেলায়
দুই সতীনে যুক্তি করে
কাঁটাল কিনে খায় !
র-সে-র বি-নো-দি-য়ে
ভাল নাচবি খাঁদি ॥
এক বেটি বউ ছিল
কলা গাছের আড়ে
কলা পড়ে টিপির টাপির
বুড়ো ভাসুরের ঘাড়ে।
র-সে-র বি-নো-দি-য়ে
ভাল নাচবি খাঁদি ॥
মিন্‌সে এলে দুই সতীনে
এক বিছানায় শোয়
দুই সতীনের চোখে আগুন
জেগেই রাত পোয় !
র-সে-র বি-নো-দি-য়ে
ভাল নাচবি খাঁদি ॥”

গান শেষ হলে সবাই বাহবা দেয়। ঈশ্বর ঢালি উঠে পড়ে। সুটকেস আর সাপের হাঁড়ি নেয় তার সঙ্গের লোকটি।

রজব সেখের বাড়ি ভিড়ে ভিড়াক্কার। রজবের বউমা রমিশা খাতুনকে সাপে কেটেছে। অজ্ঞান হয়ে ঢলে পড়েছে। বছর আঠারো বয়েস। ঈশ্বর ঢালি তার চোখ দেখলে। নাড়ি দেখলে। বুকের মধ্যে হাত দিয়ে হৃদ্‌স্পন্দন অনুভব করলে।

‘কি সাপ কামড়েছে কেউ দেখেছ ?’

কেউ কিছু বলতে পারলে না। রজবের স্ত্রী বললে, ‘রাত বারোটা-একটার সময় পুকুরে গোপনে গোসল করতে গেছিল—এসে বললে ঘাটে তাকে কি কামড়ে নিয়েছে।’

'অতো রাত্রে 'গোসল' করা কেন ?' রসিকতা শুরু করলে ঈশ্বর ঢালি। শাশুড়ী মুখে কাপড় চাপা দিয়ে সরে গেল লজ্জা ঢাকবার জন্যে।

ঈশ্বর ঢালি উঠোনে একটা গণ্ডি দিয়ে মন্তর পড়ে। দুটো কাঠের পিঁড়ে আর একটা সুপুরি আনতে বললে। একটা পিঁড়ের ওপরে সুপুরি বসিয়ে তার ওপরে পিঁড়ে দিয়ে মন্তর ক্ষ্যাপনা আরম্ভ করলে। একটা ছেলেকে পিঁড়ের ওপরে তুলে দিলে। মজার কাণ্ড! নিচের পিঁড়ে মাটি ঠেলে এগোতে লাগল মানুষকে নিয়ে। ঈশ্বর বললে, 'বিষ অনেক দূর উঠে গেছে। কেউটে সাপ কামড়েছে মনে হচ্ছে। রোগীকে একটা ঘরের মধ্যে দিয়ে দাও।'

বন্ধ ঘরের মধ্যে ঢুকে ঈশ্বর মেয়েটির চেহারা দেখলে। সুন্দরী মেয়ে। সন্তানাদি হয় নাই এখনো। বাক্স খুলে ইঞ্জেকশন দিয়ে বেরিয়ে এসে বললে, 'বড্ড দেরি হয়ে গেছে। হাসপাতালে পাঠাওনি কেন ?'

রজবের বউ বলে, 'ও বাবা, হাসপাতালে কি বউমানুষকে পাঠাবো! তারা নাকি তেজী মানুষ পেলেই মেরে ফেলে 'তেল' করে! মাথা ধড় কেটে লেয়। বিক্রি করে! তুমি এয়েছ, ও বেটি বেঁচে যাবে।'

'না, আমি বাঁচাতে পারব না।'

পায়ে জড়িয়ে ধরে তখন বউটির আপন মা। পা ছাড়ে না। কাঁদতে থাকে।

যার বউ তাকে বলে ঈশ্বর ঢালি, 'কিরে তুই এই বউ চাস, না আবার বিয়ে করবি!'

'এই বউ চাই!' লজ্জার মাথা খেয়ে মুখ নিচু করে বললে ছোঁড়াটা।

'বেটা পীরিতের নাগর! দে একশো টাকা দে। না হলে আমি মন্তর ক্ষ্যাপনা করব না। এখানে কে একটা খুদে ওঝা আছে। ভেরেছে। তোর বউয়ের কোল্‌জেটা বার করে নিয়ে যেয়ে শালুক পাতায় ভাসিয়ে রেখেছে! একটা কাক সেখানে কা-কা করছে। যদি খেয়ে ফেলে তবে আর বাঁচানো যাবে না! নে টাকা ছাড়।'

তখন বউয়ের মা তার গলার সোনার হারটা ওঝা ঈশ্বর ঢালির পায়ের কাছে রাখলে। ঈশ্বর বললে, 'বাবা, একেই বলে মায়ের টান—নাড়ির টান।'

একটা নতুন সরায় জল দিয়ে তর্পণ করে কি সাপ দেখালে ঈশ্বর ঢালি! খরিশ কেউটে!

'মা-মাসীরা খুঁটি ছেড়ে দাও, চুলের গেরো খুলে ফেলো, মেয়েদের কারু শরীর খারাপ থাকলে এখান থেকে চলে যাও, না হলে রক্তস্রাব হবে, যদি কেউ 'ভেরে' থাকো এখনি কাটান দাও, নইলে 'বাণ' মেরে তার মুখ থেকে রক্ত বার করব ফিন্‌কি দিয়ে। ছাগল থাকলে সরিয়ে দিয়ে এস মাঠে। যারা মন্ত্রে বিশ্বাস করে না তারা সরে যাও। নইলে বিশ্বাস করো। মন্তর পড়তে শুরু করলে সে :

কচু পাতার জল
যেমন করে ঢলঢল
মা বাসুকি ধরে আছে
এই পিথিমির তল।
মা বাসুকির মাথায় জটা।
কালো চোখের মণি
ঈশান কোণে কালো মেঘের ঘটা
বিষের ধারা ঝরায় রে কালফণী!
কামরূপে ধাম তার কামরূপী কালী
শিবকে ফেলে পায়ের তলায়
করে ঢলাঢলি!

শিবকে জাগায় কে
কেউটে বোড়া অঙ্গে জড়ায় যে
শিবের চোখের আগুন মারে শিষ্‌
সেই আগুনে পুড়ে মরুক বিষ! [ফুঁক]

লাগ কামিক্ষের কালী মন্তর
শিব মন্তর, মন্তর পাথর ফুঁড়ে
কালীদহের করাল ময়াল
মারবো মন্তর ছুঁড়ে।
'খরিশ কেউটে'র বাঁকা দাঁত
আমার মন্তর তার করাত
লাগ লাগ লাগ মা মনসার বরে
জলের মতন যাক না বিষ ঝরে! [ফুঁক]

মা মনসার ডালা দোব
দোব জবাফুল
হল্‌দি সিঁদুর ঘুন্‌সি সরা
মেতি মাথা চুল।
চুলের বেণী ফণা
ফণায় মারি ঝাঁটা—
আমার মন্তর ফণী মনসার কাঁটা। [ফুক]

লাগ মন্তর লাগ
সাতালী পর্বত ফেড়ে লাগ
সাঁওতালের তীরের মতন লাগ,
সাঁওতালীর পাছা ফেড়ে লাগ
রক্ত পড়ুক ঝরে
মা কালীর নিশাচর শিয়াল থাক শুয়ে পড়ে পড়ে।
কালী বাসুকি মনসা শিব
মাথায় থাক।—মারি চাপড় পিখিমিতে
উড়ুক ধুলো।—কোন্‌ শালা ভারে?
তার মা
গোবর কুড়োনী মাগী—

তার ঝোঁড়ায় এ কি! চন্দুরে বোড়া? পদ্মগোখুরো, তেঁতুলে খরিশ, কালকেউটে, গেঁড়িভাঙা কেউটে, শিয়রচাঁদা, শাখামুটি, কালনাগিনী, উদয়-নাগ, শঙ্খচূড়, চামরকোষা, বরাচিতি, দুধে বোড়া, রক্তে বোড়া, বিঘুতে বোড়া, জল বোড়া, ময়াল···হাজার রকমের সাপ···

ওরে বাঁপরে বাপ!
চাংমুড়ি কানি!
কী বললি শালা?
পালা বিষ পালা। [ফুঁক]
কামরূপের কামরূপী
বামাচারী কালী

তার আজ্ঞে মন্তর বানাই
আমি ঈশ্বর ঢালি ॥ [ফুঁক]

রোগীর পায়ের সাপে দংশানো জায়গাটা ছুরি দিয়ে চিরে দিলে ঈশ্বর ঢালি। বসিয়ে ধরলে রোগীকে। গাল থেকে তার লালা ঝরতে লাগল। লোকে লোকারণ্য চারদিক। কলবল করছে তারা।

ঈশ্বর বোঝে রোগী বেঁচে যাবে। কতকগুলো শিকড় বাটতে দিয়েছিল সে। বাটা হলে রোগীর গালে ঢোকানো হল। আস্তে আস্তে রোগী নড়তে লাগল ঘণ্টা চারেক পরে।

মন্তর আওড়াতে লাগল ঈশ্বর ঢালি :

"ধা ধা কেউটে বনে তোর বাস
বনে থেকে বেরিয়ে কেউটে মানুষ কামড়াস!
বারোচিতি ষোল বোড়া
আস্তের কাহিনী
এই মন্ত্রে ঝাড়িলাম বিষ
মা মনসা জগতিনী।
রমিশা খাতুনের অঙ্গে নাই বিষ
বিষহরির আজ্ঞে
মা মনসার আজ্ঞে নাই…" [ফুঁক]

*

"শাক তুলতে গেল বউড়ী
শাকে লতাপাতা
কি সাপ কামড়ালো বউড়ী
ওঝা পাব কোথা ?
ওঝা হল ধন্বন্তরী মা মনসার বরে
চরা চৌষট্টি কালকুটি সাপের বিষ
এই মন্তরে মরে…
অমুকের অঙ্গে"…ইত্যাদি। [ফুঁক

*

"কাকা-কাকি উড়ে যায় সঙ্গ
তাহা দেখে আউলেরা বাপে ঝিয়ে
বড়ই রঙ্গ !
তাহা দেখে আউলেতে জন্মিল ঈষ
উড়ে যায় ভস্ম যায় অমুকের অঙ্গে
নাই বিষ···" ইত্যাদি। [ফুঁক]

রোগীর চেতনা ফিরল। চোখ মেলে তাকাল। সবাই তখন খুশী। ঈশ্বর ঢালি গোঁফে গোঁফে হাসতে লাগল। অনেক যুবতী মেয়ে জুটেছে দেখে সে এবার পচাল খেউড় অর্থাৎ বোড়ার বিষ ঝাড়া মন্তর শুরু করলে। সেসব ভীষণতম অশ্লীল। মেয়েরা পালাতে শুরু করলে। ঘরের মধ্যে আড়ালে থেকে শুনতে লাগল। খিল খিল করে হাসতে লাগল তারা।

অশ্লীল শব্দ তুলে দিয়ে একটি বোড়া সাপের মন্ত্রের নমুনা দেওয়া গেল :

"লাউ কাটতে গেল ছুঁড়ি
লাউ রইল 'মাচায়'
কোথা ছিল বিঘুতে বোড়া
কামড়ে দিল 'পাছা'য়।
'পাছা' 'পাছা' করে গেল
বদ্যিবুড়ীর কাছে,
বদ্যিবুড়ী বলে মোর
ঔষধ এক আছে।
এলপাতা বেলপাতা
নটের শিকড়,
একমালা বেটে দেহ
'পাছা'র ভিতর॥"

সন্ধ্যা পর্যন্ত রোগিনী সেরে উঠলে ঈশ্বর ঢালি খাওয়া-দাওয়া করে টাকা, নতুন কাপড়, চাল, মিষ্টি নিয়ে বাড়ি ফেরে। তার মুখে তখন কেমন যেন এক আনন্দের জ্যোতি !

ঈশ্বর ঢালি বাড়ি গিয়ে দেখবে হয়তো অন্য কোথাও থেকে ডাক এসেছে।

যেতেই হবে। কিছুতেই হাসপাতালে পাঠাবে না। অন্ধ বিশ্বাস। নিজেরও তার ভয় করে। কত লোক মরে। তবু বলে, 'দানা নেই—হায়াত নেই—নিয়তি।'...

যখন ডাক আসে না তখন সাপ গো-সাপ ইত্যাদির চামড়া নিয়ে ফিয়ার্স লেনে বিক্রি করে আসে। তারা ট্যানিং করে ঘড়ির বেল্ট, ব্যাগ, জুতোর নকশা কত কি করে।

ঈশ্বর ঢালি নির্ভীক। বাড়িতে থাকলে অধিকাংশ সময় সে বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়। জঙ্গল সে ভালবাসে। ছায়া, নির্জনতা, সরীসৃপের নড়াচড়া দেখা তার ভাল লাগে। সে-সব অকৃত্রিম। কৃত্রিমতায় সে বিরক্ত। মানুষ কথা বললেই সে রং চড়ায়, মিথ্যা বলে, তাই তার দিকে সে তাকায় কুটিল তীক্ষ্ণ চোখে।

সাঁওতালী মেয়েটা যে ছিল তার মন ভরে যৌবনের ভরা দেহের জোয়ার নিয়ে, সে যখন সাপের ছোবলে মারা গেল সাপ ধরতে গিয়ে সেই থেকে তার মনে যেন কেমন একটা জ্বলন্ত দাহ—একটা ভীতি। রাত্রে তাকে ভাল করে ঘুমুতে দেয় না।

কিন্তু প্রশংসার কেমন যেন একটা মোহ আছে—তাকে সবাই 'শিবঠাকুর' বলে—গড় করে—তাই সে মানুষের সত্য-মিথ্যায় অন্ধবিশ্বাসে সমাজকল্যাণে জড়িয়ে পড়েছে।

সে স্বপ্ন দেখে, একটা সাপের চিড়িয়াখানা যদি সে নিজে করতে পারে! আর গাছগাছড়ার বাগান। কিন্তু টাকা? হাঁড়ির মধ্যে শুয়ে আছে গোঁড়িভাঙা কেউটেটা চক্রাকারে। বাড়িতে আরো তিনটে আছে। কালকে তাদের কলকাতায় দিয়ে আসবে চামড়া ছাড়িয়ে। গো-হাড়গেলের চামড়া সবচাইতে বেশি দামে বিক্রি হয়, কিন্তু লোকজন দেখতে পেলে তার দুর্নাম হবে। গো-হাড়গেল সাপ খায়—মানুষের ক্ষতি করে না—ছোট্ট কুমীরের মতন দেখতে—তাকে দেখতে পেলে ঈশ্বর ঢালি যেমন করে হোক মারবেই। অন্য কাউকে মারতে দেখলে সে ভয় দেখায়, 'খবরদার মারবে না, কামড়ালে যতক্ষণ না আকাশ ডাকে ততক্ষণ ছাড়বে না। আকাশ না ডাকলে ঘোড়ার 'পেচ্ছাব' খেতে হবে, তবেই বাঁচোন।' তারপর হাসে ঈশ্বর ঢালি। তার হাসিটি ভারি মিষ্টি!

জনক

জঙ্গলের নরখাদক বাঘের মতো ভয়ঙ্কর আর হিংস্র—টেরিফিক এবং ফেরোসাস চরিত্র চাষী ইনসানের। গায়ে অসুরের মতো বল। চোখ দুটো হাঁসা। গোঁফ দাড়ি তামাক-পোড়া কটা রঙের, কোঁকড়া কোঁকড়া। গায়ের রঙ পাকা গমের মতো। অসংখ্য তিল তার গায়ে। মাথার চুলগুলোও লালচে। তাকে দেখতে অনেকটা তাতারদের মতো। মূলোর মতো মোটা মোটা আঙুলের মুঠি পাকিয়ে যখন সে কথায়-না-ফেরা বেয়াড়া গরু, ছেলে অথবা স্ত্রীর পাঁজরে ঘুঁষি সাঁটায়, এক ঘা'র বেশি দু-ঘা মারবার আগেই জিব বেরিয়ে পড়ে তাদের। পানের মোট বাসে তোলার ব্যাপারে শিখ কণ্ডাক্টরদের সঙ্গে বচসা মারামারি বেধে গেলে ইনসান তাদের তিনজনকে ছখানা ঘুঁষির অ্যাটম ছেড়ে শুইয়ে দিয়েছিল কিন্তু দুর্বল-হৃদয় বাঙালীরা তখনি তাদের মাথায় জল চাপড়ে ঠাণ্ডা করে দিতে মাথায় পক্কড় বেঁধে সরে পড়েছিল তারা একবার।

ইনসানকে সবাই ভয় করে। খুনী দুরন্ত বেহুঁশ লোক। ভীষণ রগচটা। পরীবানু তার বউ, হুর পরীর মতোই সে সুন্দরী, মেমেদের মতন ফরসা, শূনো দড়ির চাবুকের বাড়ি তাকে যখন মারে তার সর্বাঙ্গ পাকাল মাছের মতো ফালা ফালা হয়ে লাল হয়ে যায়। পান থেকে চুন খসবার জো নেই। কিন্তু তার বছর ষোল বয়েসের ছেলে আজাদ তার অবাধ্য। তাকে কতবার মারতে মারতে বেহুঁশ করে ফেলেছে তবু সে স্কুলে যাবে না। ক্লাস সেভেনে উঠল, কত টাকার বইপত্র কিনে দিলে, 'পেরাইপিট' 'বাঙাল' মাস্টার রেখেছে, তিনি প্রতি সন্ধ্যায় ম্যালেরিয়া ডিপার্টমেণ্টের ফাঁকির কাজ আর খাতাপত্র সেরে পড়াতে এসে দেখেন আজাদের পাত্তা নেই। তাকে ধরবার জন্যে একদিন পিছনে পিছনে ছুটল তার বাপ। গ্রামকে গ্রাম পার হয়ে গেল। তিনটে গ্রামের বড় বড় মাঠ পার হবার পর এক পল্লীতে এসে ইনসান পেট টিপে ধরে শুয়ে পড়ল। অজ্ঞান হয়ে গেল সে। সেই গ্রামের লোকজন তার মাথায় জল চাপড়ে জ্ঞান ফিরিয়ে বকাঝকা করলে। তাদের আশংকা, ছেলেকে ধরতে পারলে দুজনের যে হোক একজন মরত। অথবা দুজনে দুজনকে ধরে আধঘণ্টা ধরে শুধু হাঁপাত। ছেলেকে মারবার শক্তি

পর্যন্ত থাকত না ইনসানের—আর রাগে ক্লান্তিতে সে 'নট কা' মারা হয়ে গিয়ে হার্টফেলও করতে পারত। ছেলেটা ভয়ে আছাড় খেয়ে পড়লে মারা যেত।

আজাদ তখন একটা ভেড়ির কোলে শুয়ে পড়ে হাঁপাচ্ছে গাল হাঁ করে।

কেন এমন অবাধ্য হল ছেলেটা ভেবে পায় না ইনসান। দিন দু-তিন পরে হঠাৎ তাকে ধরে ফেললে ইনসান যখন সে লুকিয়ে ধানের গোলার মধ্যে কাঁদিভরা পাকা কলা খাচ্ছিল আরামসে পেট ভরে। 'বাকুলে' সেঁধতেই মা পরীবানু ইশারা করলে, তোর বাপ ঘরের মধ্যে নামাজ পড়ছে রে 'অভাগা'। কোথা আর লুকোবে, সট্ করে গোলার মধ্যে উঠে গেল আজাদ।

কিন্তু 'সেজদা' থেকে উঠে ইনসান দৃশ্যটা দেখতে পেলে। নামাজ শেষ করে একটা শিকল আর তালাচাবি নিয়ে নেমে এসে গোলার কাছে দাঁড়িয়ে হাঁক মারলে, 'নেবে আয় হারামজাদা! যদি এক কথায় নেবে আসিস, তোকে মারবুনি, আর যদি…'

নেমে এল আজাদ। দাঁড়াল এসে বাপের সামনে। ইনসান তার অবয়বটা চকিতে একবার দেখে নিল, ধুলোয় সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন। ছেলের কোমরে শিকল জড়ালে। বালার মধ্যে দিয়ে শিকল গলিয়ে এনে একটা গেরো দিলে। টানতে টানতে নিয়ে এল বাইরের দলিজে। একটা মণখানেক ভারী বাবলা কাঠের 'গোড়ে'-র সঙ্গে শিকলের অন্তপ্রান্তটা বেঁধে চাবি দিলে।

বন্দী করলে আজাদকে। মাস্টারমশায় সেই অবস্থাতেই সন্ধ্যায় পড়িয়ে গেলেন। পাড়ার লোকজন সবাই দেখে গেল। রাত্রে পরীবানু তাকে ভাত আর আধসেরটাক গরম দুধ খাইয়ে একটা বিছানা পেতে মশারি খাটিয়ে দিয়ে চোখের জলে অনেক কেঁদে অনুনয় করে বোঝালে, 'বাবা, তুই মানুষ হ, লেখাপড়া শেখ। তোর জন্যে তো মোর গতর থেঁতো হয়ে গেল। কেন, তোর লেখাপড়া শিখতে ভাল লাগে নে কেন?'

আজাদ গাঢ় গম্ভীর গলায় বললে, 'কি হবে লেখাপড়া শিখে?'

'মানুষ হবি।'

'লেখাপড়া শিখলেই সবাই মানুষ হয় না।'

'তবে তোর মতন গাছ-গরু হয়ে থাকলে কি মানুষ হয়?'

'হজরত মোহম্মদ, বাদশা আকবর, শিবাজী, এঁরা কি লেখাপড়া জানতেন?'

'সেইটাই বা তুই জানলি কি করে? ' তারা কি লেখাপড়া শিখতে বারণ করেছে?'

কোনো উত্তর নেই।

কিছুক্ষণ পরে আজাদ যা বললে তার মানে দাঁড়ায়: শিক্ষিত লোককে দেখলে তার রাগ হয়। তারা লোককে ঠকায়। মিথ্যে কথা বলে। চালবাজ। তাদের ফন্দি, চুরি আর বদমায়েশিতেই দেশের এত দুঃখ। 'আর ঐ 'বাঙাল' মাস্টার, বসে বসে মাইনে মারে, আর আমাকে এমন কোশ্চেন করে যাতে আমি জব্দ হই। সেদিন বললে, ৮০ হাত লম্বা আর ৮০ হাত চওড়া জায়গা যদি এক বিঘা হয়, তবে ৪০ হাত চওড়া ৪০ হাত লম্বা জায়গা কতখানি হবে? আমি বলনু, দশ কাঠা। সে চড় মারলে। বাপ তখন এখেনে বসে। মাস্টার বললে, ৮০-কে ৮০ দিয়ে গুণ করলে হয় ৬৪০০ আর ৪০-কে ৪০ দিয়ে গুণ করলে হয় ১৬০০। কাজেই এক বিঘের সিকি ভাগ। পাঁচ কাঠা!—এই অঙ্কটা যত শিক্ষিত লোককে জিজ্ঞেস করেছি সবাই বলেছে, দশ কাঠা। তবে? বাপ তার জন্যেও মারলে আবার!'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে পরীবানু উঠে চলে এল।

পরদিন সকালে দেখা গেল আজাদ তার শিকল বাঁধা মণখানেক ভারী কাঠ কাঁধে তুলে নিয়ে কোথায় সট্‌কান দিয়েছে। কাছাকাছি বন-জঙ্গল সব খোঁজাখুঁজি করলে। কোথাও পাওয়া গেল না তাকে।

গরু নিয়ে মাঠে হাল করতে চলে গেল ইনসান।

কাঠ কাঁধে নিয়ে বাড়িতে হাজির হয়ে আজাদ মাকে বললে, 'দে, খুলে দে।'

মা বললে, 'আমার কাছে চাবি নেই।'

অগত্যা কুড়ুল দিয়ে গায়ের জোরে ঘাকতক মেরে শিকলটা কেটে ফেলে নিজের বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেলে আজাদ। কিন্তু কোমরের শিকলের গিঁটটা এমন এঁটে গেছে যে তা কিছুতেই খোলা গেল না। শিকলটা কোমরে জড়িয়ে রেখে তাড়াতাড়ি খাওয়া-নাওয়া সেরে নিয়ে আবার পালাল সে। ইনসান দুপুরে ফিরে ছেলের খোঁজ পেলে না কিন্তু কাঠটা পড়ে থাকতে দেখে পরীবানুকে ধমকাতে লাগল। তখনো রান্না হয় নাই, গরুর গামলায় 'জাব' দেওয়া বাকি—এইসব অপরাধে পরীবানুকে খড়মের বাড়ি ঘাকতক দিলে বেশ করে। তার নাক দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। মারের চোটে সে

ছুটে পালিয়ে গেল খিড়কির দিকে। ইনসান টগবগ করে ফোটা হাঁড়ির ভাতগুলো এনে গরুর 'ম্যাচলা'য় ঢেলে দিয়ে এসে উনুনে জল ঢেলে নিবিয়ে দিয়ে কোদাল এনে উনুন কুপিয়ে দিলে। তারপর স্নান করে এসে 'জোহরে'র নামাজ পড়ে মাদুর পেতে শুয়ে পড়ল দলিজে।

পরীবানু তার হাতের সমস্ত চুড়িগুলো ভেঙে ফেলে ঘরের পিছনে বসে কাঁদতে কাঁদতে পাড়ার জায়েদের বলতে লাগল: 'আমি রাঁড (বিধবা) হইচি। আমার ভাতার মরেছে! সে মরুক। গোলার সব ধান 'পুতি' পোকা হয়ে উড়ে যাক। মেরে মেরে মোর 'খোলে' 'লোউ' (রক্ত) ফেলে দিলে 'বাঁ-পায়ের' মিনসে। ও মরুক।'...

কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকার নামতেই খিড়কির বাঁশবাগানে যখন উদাস ভূতুড়ে হাওয়া আড়মোড়া মেরে ছুটে যায়—শাঁকচুন্নি বা ভূতের ভয়ে বাড়িতে আসে পরীবানু। শিয়াল বা 'কটাশে' নিয়ে পালাবার ভয়ে হাঁস-মুরগীগুলো 'খোল্‌না'য় (খোঁয়াড়ে) তোলে। ঝাঁটপাট দেয়। সাঁজবাতি জ্বালে। আবার অন্য উনুনে রান্না বসায়।

ইনসান মাদুর পেতে 'মগ্‌রেবে'র নামাজ পড়ে পবিত্র কোরআনখানি খুলে পড়তে বসে। সুর করে সে পড়তে থাকে। উনুনের আগুনের আভায় পরীবানুর সাদা ফরসা মুখখানা কেমন লাল হয়ে উঠেছে আর নীরবে দু-চোখের জলের ধারা নামছে তাতে, দেখতে পায় ইনসান।

রান্না হলে এক থালা ভাত, ডিমভাজা, ডাল আর একটা মাছের তরকারি এনে সামনে দিলে ইনসান বিনা বাক্যব্যয়ে সমস্ত উদরসাৎ করে নিয়ে টর্চ হাতে করে পাড়ায় বের হয় ছেলের অন্বেষণে। আসলে সে যায় না—লুকিয়ে থাকে। ছেলে মায়ের কাছে আসে কিনা লুকিয়ে থেকে পরীক্ষা করে।

কিন্তু ব্যর্থ হয়। আজাদ তখন বাগানের বিরাট একটি নারকোল গাছের মাথায় 'মাঝপাতা'র মধ্যে নিজেকে শিকল দিয়ে জড়িয়ে বসে আছে। দাঁত দিয়ে ছোবড়া ছাড়িয়ে সারা বিকেল ভরে সে দুটো নারকোল খেয়েছে। কড়ি ডাবের জল খেয়েছে কয়েকটা। দিব্যি আরামের আজাদী জীবন! উপরে মুক্ত নীল আকাশে অসংখ্য তারা ঝিলমিল করছে প্রাণের স্পন্দনে।

হঠাৎ সংকল্প পালটালে আজাদ। সে গাছের মাথা থেকে দেখতে পেলে

তার মা সারারাত দাওয়ায় বসে আছে লম্ফ জ্বালিয়ে। তার জন্যেই এই কষ্টভোগ মায়ের।

ভোরবেলা গাছ থেকে নেমে এল সে। তার নামা মানে সাঁ করে আকাশ থেকে মাটিতে পড়ে যাওয়া! গাছের গলার কাছে নেমে হাত আলগা করে পায়ের পাতায় ভর রাখা মাত্র। নিমিষেই মাটিতে। তবে পায়ের তলা একেবারে জ্বলে যায়।

ভোরবেলা বাড়িতে ঢুকে আস্তে আস্তে এসে মায়ের কোলে মাথা রেখে দাঁড়াল দাওয়ার নিচে। পরীবানু তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল নীরবে। ছেলের গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে।

কয়েকদিন জ্বরভোগের পর উঠে আজাদ নিজেই কোদাল কাটারি কাস্তে নিয়ে কাজকাম আরম্ভ করলে। ইনসান আর কিছু বলে না তাকে। দেখা যাক স্বাধীনভাবে ও কি করে। ও আর পড়াশোনা করবে না সেটা বোঝা গেছে। তবে ইনসান লক্ষ্য করেছে, ও অনেক সময় খাতা কলম নিয়ে কি যেন সব লেখে। একদিন দেখলে, যত সব গাছপালার নাম, ধানের নাম, কলা, আম, মাছ, বাঁশ, আখ, কলাই, মাটি, ফুল, মানুষের উপাধি লেখা। খাতা ভরতি।

মাথা খারাপ নাকি!

একদিন দেখলে, বাঁশি বাজাচ্ছে আজাদ ঘাটের চাতালে বসে। আর একদিন দেখলে বেগুন বাড়িতে একটা মড়ার মাথা শ্মশান থেকে কুড়িয়ে এনে লাঠির মাথায় দিয়ে রেখেছে যাতে রাত্রে বেগুন চুরি করতে এসে চোরেরা ভয় পায়।

একদিন সকালে আজাদ ছেলেমেয়েদের নিয়ে ছড়া কেটে খেলা করছিল। সে বলছিল :

অ্যাকোড় ব্যাকোড তঁ্যাকোড় সলা
ধনুক ধানুক বাঁশের নলা,
চামচিকে চটার ডিম
বত্রিশ আঙুলের তেত্রিশ সিং!

ইনসান বললে, 'পড়াশোনার নামে অষ্টরম্ভা! ছড়া কাটছে! আয় হাল জুড়বি আয়। চাষার বেটা, চাষ করবি চল।'

আজাদ এল। লাঙল-জোয়াল কাঁধে নিয়ে গরু তেড়ে মাঠে আনলে। দু-বিঘেতে বীজতলা ফেলতে হবে। তার জন্যে 'তলাপোড়ে' চষতে হবে।

হাল জুড়তে বললে ইনসান।

আজাদ গরু জোড়াকে 'হাও বাবা—হাও বাবা' বলে দাঁড় করাতে চেয়ে গরুকে বাবা বলার পর বাপের মুখটা কেমন হয় একবার দেখলে। ইনসান অন্যমনস্ক ছিল। দইখই গাছগুলো উপড়ে ফেলে দিচ্ছিল। তারপর কাটারি দিয়ে বেড়ার জীবদণ্ড গাছ ছিয়োতে আরম্ভ করে সে। বললে, 'খেতের জন্যে বেড়া দিলাম, বেড়া ক্ষেত খায়।'

আজাদ গরুর কাঁধে জোয়াল চাপিয়ে জোয়ালের মুখের দড়ি এনে তার লোহার ফলকে বেঁধে দিলে। 'আঁজ' দড়ি জোয়ালের মাঝখানের খাঁজে রেখে তার মধ্যে লাঙলের 'ঈশ' গলিয়ে দিয়ে আঁজের মধ্যে 'আঁকড়া' আটকে দিলে। এইবার আঁকড়ার তলায় বাঁধা ডবল গরুর-দড়িটা এনে লাঙলের 'মুটের' নিচে একটা ফের দিয়ে নিয়ে জড়িয়ে বাঁধলে। তার লাঙল জোড়া হচ্ছে কিনা লক্ষ্য রাখছিল ইনসান। ঠিক হয়নি দেখে কাছে এল। কান ধরে ছেলেকে সরিয়ে দিয়ে লাঙল জুড়তে জুড়তে বললে, 'চাষার বেটা চাষা! নাকের তলায় কালো 'রোঁ' (পশম) গজিয়ে গেল—বে' দিলে সাত ছেলের বাপ হয়ে যেতিস—এখনো তুমি 'হাল' জোড়া শেখনি। এই—এই রকম করে জুড়তে হয়। খালি আধসের তিনপো চালের ভাত মারা নয়! আচোট মাটিতে লাঙল 'খরো' করে জুড়লে গরুর কাঁধে 'ঝটকা' লাগবে। গরু টানতে পারবে নে। 'খবো' জুড়বি 'একচাষ' ধরা হয়ে গেলে। এখন 'দাবায়' চলবে। লে চালা। 'আঁতড়' বাড়। লাঙল চলে গেলে চষা মাটির যে দাগ পড়বে তার নাম 'সিরুলি' আর হাত ছয়েক জায়গা একবার ভেতরে যাবে আবার বাইরে আসবে—ভেতর পুরে গেলে আবার 'আঁতড়' বাড়তে হবে। এমনি করে সবটা জায়গা হয়ে গেলে আড়াআড়িভাবে, একে বলবে 'একচাষ'। ফের লম্বা দিকে শেষ হলে বলবে 'দুচাষ'। তারপর ঘাস উপড়ে ফেলতে হবে। কোদাল দিয়ে আগাছার গোড়া কেটে 'গাসতে' করতে হবে। তারপর আবার চাষ দিয়ে মই দিয়ে ধান ফেলতে হবে। এক বিঘেতে আট সের ধান লাগে। বীজতলা ঠিক হলে আষাঢ় মাসে 'আগো' ভেঙে 'বোড়ানী' দিয়ে, 'কাদা' করে বীজতলা উপড়ে, তার মানে 'বেঙোন' ভেঙে জমি রুইতে হবে। ভাদ্দর মাসে ধান জমিতে নিড়েন দিতে হয়। শ্যাওলা, ভট্কা, কালেয়া ঘাস, পাঁতি, চেঁচকো,

শ্যামা ঘাস, কুলপো গাছ, ওকড়া গাছ এসব উপড়ে ফেলতে হবে—জড়ো করে 'ভাঁটি' দিতে হবে। চাষার ছেলে কাজ শেখ। জনের পয়সা নেই। তিন টাকা জন। আমরা দুবেলা ভাত মুড়ি দুধ কলা মাছ আণ্ডা ঘি নারকোল খাই —পাড়ার লোক কি খায় র‍্যা? গমের আটাও পাচ্ছে না তারা। সপ্তায় একদিন ভাতের মুখ দেখতে পায় না। দশ বিঘে জমি আছে, তার পেছনে খাটলে আমাদের ভাতের অভাব হবে না। মন দিয়ে কাজ করো।'

কিন্তু ডাইনের গরুটা আজাদের হাতে চলতে চাইছে না। মার দিলেও না। খোঁড়াচ্ছে যেন। খানিকটা চলে আবার দাঁড়িয়ে যায়। ব্যাপার দেখে ইনসান এসে হালের মুটে ধরলে। ঘা কতেক চাবুক সাঁটলে কালো গরুটার পিঠে। বয়েস-ভারি গরু। পেট ঝোলা হয়ে গেছে। 'মাঝের ভরা'য় পড়েছে। গরুটা বদলাতে হবে এ সনে চাষটা তুলে নিয়ে। কিন্তু দাঁড়ায় কেন গরু? বেশ করে মার দিতে টুস্ করে সে শুলো! ইনসানের মেজাজ জ্বলে গেল। অন্য চাষী কেউ দেখলে অপমান! তার গরু শোয়? ভাল গরু কিনতে পারে না? কৃপণ লোক! তাই চাবুক ভাঙলে, ঘুষি! তারপর গরুটা উঠল।

আজাদ বললে, 'ওর পায়ে বোধহয় লেগে আছে। কবে বোধহয় কাঁকড়ার গর্তে পা ঢুকিয়ে পায়ের কল্ সরিয়ে রেখেছে। পায়ে হাত দিতে আমাকে একবার লাথি মেরেছে।'

'হাঁ, তোর মাথা! ফাঁকিবাজের মতলব কত রকম হয়।'

কিন্তু গরুটা আবার শুয়ে পড়ল। তখন মই এনে শূন্যে তুলে সজোরে তার পিঠে ফেললে ইনসান। 'শালা মরে মরুক—আজ না হাল করলে 'জবাই' করে দোব।'

গরুটা আণ্ডা-আণ্ডা চোখ বার করে গল্‌গল্ করে গোবর বার করতে লাগল শুয়ে শুয়ে।

আজাদ বিরক্ত করুণ স্বরে বললে, 'গরুর 'অসুখ' করেছে যে!'

তখন তাকে তেড়ে গেল ইনসান চড় হাঁকিয়ে। গরু খুলে দিলে সে। ছেড়ে দিতেই উঠে বাড়ির দিকে টং টং করে চলল গরু দুটি।

হাল-লাঙল আনতে বলে ইনসান গোঁ-ভরে গরুর পিছনে পিছনে বাড়িতে চলে এল। এসেই ভাল গরুটাকে 'গড়ায়' বেঁধে রেখে অসুস্থ অকেজো গরুটাকে শিং ধরে ঘাড় মুচড়ে মুখটা শূন্যে তুলে ধরতে মাটিতে পড়ে গেল ধমাস করে। তার চার পায়ে বেশ করে বেঁধে রেখে ঘর থেকে 'ছোরা' বার

করে আনলে। তারপর 'ওজু' করে এল। আর বেটাকে বললে, 'ধর শালার গলার নালীটা বেশ করে চেপে!·'

অগত্যা আজাদকে ধরতেই হল। ছোরা চলল। রক্ত ফিন্‌কি দিয়ে বেরিয়ে ইনসানের বুক হাত ভিজিয়ে দিলে!...বাড়ির জন্যে কিছুটা রেখে দু-টাকা কেজি দরে পাড়ার মুসলমানদের মধ্যে বিক্রি করে দিলে ইনসান মাংসগুলো।

কিন্তু চাষের মরশুম নেমেছে। গরু চাই! একটা গরুর দাম সাড়ে তিনশো চারশো টাকা। একশো বাঁশ বেচলে ইনসান একশো টাকায়, নারকোল বেচলে দুশো একশো টাকায়। এবার? স্ত্রীর গলার হারটা বেচে আরো দুশো টাকা হল। তারপর দিনসাতেক পরে বহু দূর দূর গ্রামে ঘোরাঘুরি করে একটা গরু কিনে আনলে সাড়ে তিনশো টাকা 'গোচ্চা' দিয়ে। কিন্তু গরুটা হল পছন্দসই।

পরীবানু স্বামীর খোসমেজাজ দেখে খাবার পর বললে, 'মেরে মেরে বউকে, ছেলেকে বিগ্‌ড়েছ, এবার নতুন গরুটাকে কালই হালে জুড়ে মার দিয়ে ভয়-'তরাসে' করে বিগড়ে দিও! আল্লা তোমাকে বনের বাঘ করে দিত যদি তাহলে ভাল হত! সদাই যার-হোক-না যার-হোক ঘাড় মট্‌কে রক্ত চুষে সুখ পেতে।'

ইনসান হেসে বললে, 'পরীবানু—বিবি আমার—কত ধানে কত চাল হয়, তুমি কি বুঝবে!'

'বুঝে আমার দরকার নেই। সাতটা ছেলের ছ-টা মরেছে, একটা আছে তাকেও তুমি খাবে। বাস্তুতে 'জীন' আছে, তাই ছেলে হলেই 'পেঁচোয়' পেয়ে মরে যায় শুনে হাসপাতালের মেম ডাক্তার বললে, 'ওসব বাজে কথা। মাদুলি কবচে—বাড়ি 'বন্ধ' করে 'নিশান' পুঁতে—'সরা' পড়া 'মাল্‌সা' পড়া দিয়ে কিছু হবে না—তোমার স্বামীর 'তিকিজ্জে' করাও। রক্তে 'সিবলিসে'র রোগ আছে। ছেলে-পেলে বাঁচলেও পাগলাটে, বোবা, কানা, খোঁড়া, নিরেট বোকা হবে। তোমার স্বামী খুব গরম মেজাজের না? আমি বলেছিনু, হাঁ!'

ইনসান বলে, 'ঐসব মেয়ে ডাক্তাররা মন্দ! ওদের কাছে বেশিদিন গেলে তোর ছেলেপুলে হওয়ার 'ফুলঘর' কেটে লেবে নাকের গোড়ায় 'ভিমৃরি'-লাগা 'ওষুধ দিয়ে অজ্ঞান করে!'

পরীবানু কিন্তু বিশ্বাস করে না। সে একদিন হাসপাতালে গিয়েছিল পাড়ার একটি মেয়ের সঙ্গে—মেম-ডাক্তারদের ব্যবহার, কথাবার্তা অত্যন্ত মধুর, মোলায়েম। তবে তারা বলেছিল বটে 'লুপ' নেবার কথা!···

সে যাহোক, ইনসানের নতুন গরুটা ভাল পিঠ দিল কিন্তু! হালে মইয়ে সমান। ইনসানের খুব আনন্দ। ছেলেও এখন তার বেশ বাধ্য হয়েছে। কাজকাম করছে। সে হাজার রকমের গাছ চেনে, একশো রকম ধান চেনে, মাটি চেনে। দুর্বার—দুঃসাহসিক। তবে, বড় একরোখা। কিছুদিন পরেই জোয়ান হয়ে উঠলে বোধহয় বাপের সঙ্গেই মারামারি লেগে যাবে। আর তার শার্দূলের মতো বাপকেও সে হার মানিয়ে দেবে। একটা বড় মোরগ, আর কাগজের মতন পাতলা চালের আটার ৮০ খানা রুটি খেতে পারে ইনসান। আজাদও তা পারবে। কেননা সে গোটা একটা ইলিশ মাছ ভাজা খেয়ে হজম করে ফেলেছে গতকাল। এক সের গুড়, এক সের দুধ আর একট' ঝুনো নারকোল হজম করতে পারে সে। পেট ফাঁপে না তার। এক পণ আমন ধানের 'বীজতলা' ভাঙতে পারে। রুয়েও দিতে পারে সবটা।

কিন্তু ইনসান হঠাৎ একরাত্রে স্বপ্ন দেখলে, তার ঘর পড়ে যাচ্ছে হুড়মুড় শব্দে। ঘুম ভেঙে উঠে ছেলে, বউকে দেখলে, তারা ঘুমোচ্ছে, ঘরও ঠিক আছে। গোয়ালে গেল আলো নিয়ে। গিয়ে দেখলে নতুন সাদা গরুটা দাঁড়িয়ে আছে, 'পাঁজ' করছে না, পেট ফুলে দম্‌সম। গরুটা ড্যাবডেবে চোখে হুঁ-ম্-ম্ শব্দে তার ব্যথা-কাতর অবস্থা জানালে। দুচোখ বেয়ে তার জল ঝরছে। ছুটে গেল ইনসান গো-বদ্যির কাছে। গোবদ্যি এল। বললে, 'গরু বিষ খেয়েছে! বাঁচানো যাবে না।'

গো-বদ্যির পায়ে ধরে কাঁদতে লাগল ইনসান। 'এমন গরু মারা গেলে আমি মারা যাব লক্ষ্মণবাবু। আপনার পায়ে ধরি, ওষুধ দাও, ২৫ টাকা দেব আপনাকে।'

ওষুধ বেটে খাওয়ানো হল। হাতীশুঁড়ের শিকড়, আড়াইটা গোলমরিচ, তুলসীপাতা, হলুদ, গঙ্গাজল। কিন্তু ভোর রাতে গরুটা মারা গেল গোঁ-গোঁ করে গোঙাতে গোঙাতে জিব বার করে। দেখলে কষ্ট হয়। ইনসান, আজাদ, পরীবানু সবাই কাঁদতে লাগল হাউ হাউ করে। একটা ছেলে মরার শোক লেগেছে যেন ইনসান আর পরীবানুকে। কপালে হাত চাপড়াতে লাগল ইনসান গরুটাকে জড়িয়ে ধরে বসে।

গলার সোনা-বেচা সোনার গরু ছিল পরীবানুর। কতদিন সে খড় খোল ভূঁষি ভাত খাইয়েছে! এমন লক্ষ্মী গরুটাকে কে বিষ খাইয়ে মেরে দিলে! তারও যেন এমনি পুত্রশোক হয়। অভিশাপ করে পরীবানু।

গরুটাকে সকালে ভাগাড়ে ফেলে দিয়ে সকলে চলে এলেও আজাদ লুকিয়ে বসে রইল একটা বাঁশবনের মধ্যে। শকুন নামার আগেই একটা কালো মতো লোক তখনি কোথা থেকে যেন উড়ে এসে গরুটার 'ছাল' ছাড়াতে শুরু করে দিলে। আজাদ আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে সেখানে দাঁড়ালে। পাঁচ মিনিটও লাগল না মুচিটার চামড়া ছাড়াতে।

আজাদ শুধোলে, 'চামড়াটা কত দিয়ে বেচবে?'

'পনেরো টাকা।'

'গরুটার দাম কত?'

'তা আমি কি জানি! তিন-চারশো টাকা হবে।'

'তাহলে?'

মুচি দ্রুত হাতে চামড়াটা মুড়ে নিয়ে সরে পড়বার মতলবে ছিল। আজাদ হঠাৎ তার ছুরিটা নিয়ে গরুর পেটটা ফেড়ে ফেলল, পাকস্থলী চিরে বার করে আনলে আধসিদ্ধ কাঁচা কলা পাতা। বললে, 'কিরে শালা, এ কার কাজ? কাল সন্ধ্যার আগে রাস্তার ধারে গরু বাঁধা ছিল, তুই শালা না সেঁকো বিষ খাইয়ে গেলে গরু মরার সন্ধান শুকনির আগেই বা পেলি কি করে?'

মুচির হাত চেপে ধরে গোটা দুই ঘুঁষি মারতেই সেও আক্রমণ করলে। তার ইচ্ছা ছোট ছেলেটাকে মেরে দিয়ে চোখের আড়ালে মাঠ পার হয়ে সরে পড়বে। কিন্তু আজাদ তাকে শুইয়ে ফেলে চেঁচাতে লাগল। মুচি কামড়ে ধরলে আজাদের গলার নালীতে। তখন আজাদ বাধ্য হয়ে মুচির ছুরিটা হাত দিয়ে হাতড়ে নিয়ে তার পেটে আমূল বসিয়ে দিলে।

মুচি মারা গেল। গরুর বিদীর্ণ লাস পড়ে রইল।

লোকজন জুটল চারদিক থেকে। ইনসান ছেলেকে জড়িয়ে ধরলে। 'বাহঃ—শেরের বাচ্চা শের! সাবাস্!'

কিন্তু পুলিস ধরে নিয়ে গেল আজাদকে। তার জামিন দিলে না। ক'মাস পরে বিচারের রায় বেরুল 'একের অপরাধে অন্যকে হত্যা এবং অবশ্যম্ভাবী প্রাণ বাঁচানোর দায়ের লঘু অপরাধে আজাদের ছয় মাসের কারাদণ্ড।'

তা হোক, ইনসান খুশী। তার ছেলে প্রতিশোধ নিয়েছে, বাঘের বাচ্চা বাঘ হয়েছে।

আবার কায়ক্লেশে টাকা যোগাড় করে গরু কিনলে ইনসান। আবার তেমনি একটা গরু।

তবু বাপের প্রাণ। ছেলেটার জন্যে হু-হু করে। কবে ছ-মাস কাটবে? শক্ত কঠিন মাটি বিদীর্ণ করে চলে বাপ—তার চোখের জল পড়তে থাকে পৃথিবীর মাটিতে। দিন গুনছে সে কবে ছেলে ফিরে এসে ধামাভরা বীজ বুনবে সেই বাপের চষা মাটিতে।

দর্জিপাড়া মেটিয়াব্রুজ

ঘষরঘষর শব্দে সেলাই কল চলছে। ঘরে-ঘরে 'কামকাজ' হচ্ছে। প্রতিটি বাড়ির দলিজে দলিজে। কারো একটা মেশিন, কারো বা দুটো—কারো আবার দশ-বিশখানা। যাঁরা বড় 'ওস্তাগার' তাঁদের পুরনো ঢেঁকিকল উইলসন মেশিন বাতিল হয়ে গেছে। এসেছে সিঙ্গার বা উষা মেশিন। যারা দরিদ্র, বাজারের চালানী 'রেডিমেড' মাল সাপ্লাই দেয় তাদের সেই মান্ধাতা-কালের মেশিন চলছে। তাদের যে কার্টার সেই মেশিনম্যান, সেই আবার 'খিলে' 'টেঁকে' নেয় জামা-ব্লাউজ। বড় বড ওস্তাগার দর্জিদের পাকা বাড়ি। বাইরে দলিজভরা 'কামকাজ'-এর লোক। চকচকে কাঁচি (দর্জিদের ভাষায় 'কেঁচি') চালিয়ে বুড়ো পাকা 'ম্যাট' অর্থাৎ কার্টার থান কাপড় কাটছে ক্যাঁচ্‌ক্যাঁচ শব্দে। মিটার বা গজ ধরে মাপ নিয়ে পেন্সিল অথবা গিরিমাটি দিয়ে দাগিয়ে নিচ্ছে। কানে আতর গোঁজা, পাকা দাড়িওয়ালা, এলো গা, ভোঁড়ের উপর চওড়া চামড়ার বেল্ট দেওয়া, পাট করে সিঙ্গাপুরী লুঙ্গিপরা ওস্তাগার চা খেতে খেতে ম্যাট্‌কে সতর্ক করছেন যাতে হিসেবের ভুলে কাপড় বাজে খরচ না হয়। 'ফুচ্‌ড়ো' (কাটা কুঁচো-ছাঁট কাপড়গুলো) দেখছেন। যারা হাতের কাজ করছে অর্থাৎ হাতা লিখছে, 'প্যাঙ্কো' জুড়ছে, পটি জুড়ছে, বোতামের ঘর তৈরি করছে—তাদের তাড়া লাগায়। বড় বাড়ির সামনে মোটর দাঁড়িয়ে আছে, অথবা ঘোড়ার গাড়ি। কর্তা যাবেন কলকাতার দোকানে। অথবা কোনো সমাজ-কল্যাণের মিটিংয়ে।

পাড়ায় পাড়ায় সুতোর দোকান। মনিহারি আর মিষ্টিদোকান।

গোশ্‌ত দোকান। খড়ম পায়ে দর্জিরা চলেছে এ-দলিজ থেকে ও-দলিজে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ফিরছে মাদ্রাসা থেকে। দর্জিদের বাড়ি ঘরদোর ঘেরা। পুকুরঘাট ঘেরা ছামাড় দিয়ে। নারীরা এখানে 'অসূর্যম্পশ্যা'।

কলকাতার পশ্চিমে মুন্সি, জগতলা, চন্দননগর, চটাবাঁশতলা, রায়পুর, বাঁড়ুজ্জে হাট, আখড়া, সন্তোষপুর, কানখুলি, বটতলা, পাঁচুড়, কাঁটালবেড়িয়া, রাজাবাগান, ধোপাপাড়া, হালদারপাড়া, থানাদারপাড়া, মালিপাড়া, মোল্লা-পাড়া, কীলখানা, প্যাকপাড়া, বাঙালী বাজার, মুদিয়ালী—কলকাতা-১৮ আর কলকাতা-২৪—কয়েকটি থানার বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষরা শতকরা ৯০ জন দর্জি। দর্জিশিল্প তাঁদের একমাত্র জীবিকা। লক্ষ লক্ষ মানুষ। শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ মুসলমান।

মেটিয়াব্রুজ, বড়তলা, আখড়া, মহেশতলা, জগতলা থানার এই বিশাল ভূভাগ সারা ভারতে একমাত্র দর্জিশিল্পের আদি পীঠস্থান।

পাইওনিয়ার, হরলালকা, ওয়াসেল মোল্লা, মুবিদ আলী, কমলালয়, এল মল্লিক সম্ভ্রান্ত যে দোকানেই আপনি দামী স্যুট কিনুন তার পিছনে মেটিয়াব্রুজের পাকা বুড়ো দর্জির হাত আছে। তাদের অনেকের শিক্ষা আবার সুদূর রেঙ্গুনে। এদেশে যখন লালমুখো সাহেব-মেমরা রাজত্ব করত তাদের ছিল বাঁধা দর্জি। সেই দর্জি সেলাই করত মেমেদের গাউন—সাহেবদের কোট-প্যাণ্ট। কোনো কোনো দর্জি বা ওস্তাগার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বাড়িতে কাজ করত। এক বাড়িতে কাজ করলেই সংসার চলে যেত তাদের। জামা পছন্দ হলে দাম তো দাম—উপরি বকশিশ! দেশবন্ধুর পাঞ্জাবির সার্জের কাপড়ের গজ ছিল নাকি তখনকার বাজারে একশো টাকা। আর সেলাইয়ের দাম দিতেন তিনি আড়াইশো টাকা। তাঁর কাছে যদি একবার সাহস করে জোড়হাতে বলা যেত, 'হুজুর, আমার ডাগর মেয়েটা বিদায় করতে পারছি না—বড় টাকার অভাব ··একটা ছেলে জুটেছে···'

ব্যাস—কাজ ফতে!

সে দিনকাল আর নেই। বড় বড় মিল-মালিক বা ব্যবসাদাররা এখন বিলেত, প্যারিস, নিউইয়র্ক থেকে পেট্রো-কেমিকেলের কোট-প্যাণ্ট আনছেন। বাঙালী বাবুরা কেমব্রিক বা আদ্দির পাঞ্জাবি দুখানা আর ধুতি চারখানাতেই সন্তুষ্ট। শীতে বড়জোর একটা সার্জ আর শাল লাগে। কিন্তু টেরিলিন টেরিকট

আমদানির সঙ্গে সঙ্গেই হিপিদের চুস্ত প্যান্ট আর হাওয়াই দ্বীপের খাটো কোর্তা জাতীয় বুশ শার্ট আমদানি হওয়াতে দর্জিদের ফ্যাশান সম্বন্ধে পুরাতন ম্যাট বা কাটার পাল্টাচ্ছে। পুরাতন দর্জিদের জাত গেল, ভাত গেল। তাদের মধ্যে তাচ্ছিল্য ভাব। অশ্লীল পোশাকের যতই বাহাদুরি থাক ইংলিশ কাটিং কোট-প্যান্টের কাছে এসব অতি হীন। জঘন্য। এসব কাজ শিখতে দু'দিন লাগে না—কিন্তু ইংলিশ কাটের কাজ শিখতে দশ বছর লাগে। হাতীর কাছে ছাগলছানা!

বুড়ো দর্জি রশীদ মিয়া ছেলেবেলায় রেঙ্গুনে গিয়ে বর্মী মেয়েদের সঙ্গে ঘরকন্না করে ত্রিশ বছর পরে দেশে ফিরে বড় বড় বাড়িতে কাজ করেছে। হাড়পাকা বুড়ো। 'কেঁচি' ধরে ধরে আঙুলে 'ঘ্যাঁটা' পড়ে গেছে। সে কলকাতার বড় বড় নামজাদা সাহেববাড়িতে কাজ করত। মেম প্যারিসের একটা 'অ্যালবাম' খুলে নতুন ডিজাইন দেখিয়ে দিত। অনেক দামের সিল্ক কাপড় দিত। শুধু ব্রেসিয়ার গায়ে সবুজ-আলোজ্বালা-ঘরে দাঁড়াত পরীর মতন। রশীদ মিয়া ফোকলা দাঁতে স্তিমিত চোখে হাসতে হাসতে বলে, 'হাত আমার কাঁপত। মেমের মাথাভরা সোনালী চুল। যেন আঙুরের থুলো। আর চল্লিশেও 'যৈবন' যেন একটু টসকায়নি 'করো'! বুকের ওপর দিয়ে ফিতে ধরে মাপ নিতাম। নিটোল পাছার মাপ নিতাম। শুধু 'নিকৃসেস' পরে থাকত। সাদা গোলাপী উরু দুটো যেন চাঁদের জোছ্না ধোয়া। এখানের মেয়েদের সে পাছাও নেই, সে রূপও নেই। থাকলেও সে দু'দিনের জন্যে। আজকের গাউন তার কালকে হবে না। মেম মাপ দিয়ে আবার পোশাক পরে কাপড় কম পড়বে কিনা জিজ্ঞেস করত। আমি কাপড় দেখে বলতাম—বেশিই আছে। মেম হেসে বলত, তোমার লেড়কির ফ্রক বানিয়ে দিও ওস্তাগার মিয়া। সেই মেমের একখানা গাউন তৈরি করতে লাগত পনেরো দিন। 'স্টোমে' চড়িয়ে ৯ নম্বর সুঁই দিয়ে তিল তিল করে খিলতে হত। টেকেন দিতে হত। একটু গোলমাল হলে আড়াইশো টাকার কাপড় নষ্ট হয়ে যাবে। 'গ্র্যাণ্ড হোটেলে' কিংবা লাটের বাড়ির কোনো ভোজসভায় গিয়ে মেম যদি দেখে হুবহু তার মতো একই ডিজাইনের গাউন পরে এসেছে অন্য একটি মেম—তখনি সে ফিরে এসে দর্জিকে ডেকে তার সামনে পড়পড় করে গাউন ছিঁড়ে ফেলে দেবে। লেডিজ কাজে কারু সঙ্গে কারু মিল 'হতি পারবে নি 'করো'।' সেইখানেই ওস্তাদী। এ তোমাদের ছুঁচলো পাতলুনের 'ছুঁচোবাজী'

নয়। মেমের গায়ে পরিয়ে হাতে-খেলা গাউন দেখিয়ে ট্রায়াল দিয়ে আসতে হত। গাউন পরিয়ে দিলে সাহেব পাইপ টানতে টানতে নীল চোখে যেন 'দূরমী' কষে দেখত। একটু 'তিরুটি' হলে দেখাত আঙুল দিয়ে। বুক আর পাছা ঠিক করা—একেবারে 'সেম সেম খেলানো' কঠিন কাজ! কোথায় 'তিরুটি'—মদ খেলেও সাহেব ঠিক ধরতে পারত। হেসে শুধোত, তোমার কেমন লাগছ?

বলতাম, 'পাছা, কোমর, পেট, পিঠ ঠিক আছে 'পেরায়'। বুকটা খুলতে হবে।'

'কোথায় দেখাও—হয়ার, ফিক্স বাই দা ফিঙ্গার। দেখাতেই হত। তারপর মেম জামা খুলতে পারত না—কোথায় বোতাম? আমি খুলে দিতাম। সেই জামাতে মজুরী পেতাম দু'শো টাকা। সাহেব দিত, উপরি পঁচিশ টাকা বখ্‌শিশ। সে যুগ চলে গেছে। নটে শাক পুঁই ডাঁটা চিবোনো বাঙালী সাহেব বাবুরা তাদের মেমেদের বিবিদের বগলকাটা 'ছেলেধরা' ব্লাউজ আর হ্যামিলটনের সায়ার উপরে বড় জোর বেনারসী কিংবা তাঁতের শাড়ি পরায়। এখন আমাকে সাত টাকা রোজ দিয়ে বড বড ওস্তাগারঁরা মিলিটারী, পুলিস বা নেভির পোশাক কাটতে ডাকে! আরে বাবা, এসব তো ট্যাংরার মেশিনে যেমন গরু কাটে একসঙ্গে পাচ-সাতশো শুইয়ে দিয়ে, তেমনি কয়েক হাজার থান পাট করে কেটে নিলেই হয়! আর 'মোকে' ডাকে হাওড়া মঙ্গলা হাটের '.রডিমেট' চালানী 'কাম' কাটতে। আমি এসব করতে পারব না 'করো'। 'প্যাটে ভাত নেই তো নেই। অনেকে পাকিস্তানে চলে গেল। বড় বড় ওস্তাগাররা সেখানে দোকান করেছে—নামজাদা দর্জিদের নিয়ে চলে গেছে কত। আমি মাটি কামড়ে পড়ে আছি এখনো। এখানে বাপ-দাদার কবর আছে। এসব ফেলে যাব কোথা?'

রশীদ মিয়ার বাড়ির ফাটা ছাদের ফাঁক দিয়ে পানি পড়ে। ঘরে তিরিশ বছরের অনূঢ়া মেয়ে ফুলের নক্‌শায় মেসিন চালায়। ছেলে চারজন পরের দলিজে কাম-কাজে যায়। তারা অসৎ—ভাল করে কেউ কাজ শেখেনি। সবাই ঝড়ের বেগে মিলিটারী পোশাকের মেশিন চালায়। পাঁচ টাকা রোজ। কত লোকের কাছে দেনা, টাকা নেয় আর ফাঁকি দিয়ে অন্যের কাজে চলে যায়।

মেয়ে সফিয়ার ওপরই রশীদ মিয়ার একমাত্র বাঁচা মরা নির্ভর করছে। তাকে বিদায় দিলে বুড়ো খাবে কি?

সারা মেটিয়াব্রুজ অঞ্চল দুঃস্থ অসুস্থ আবহাওয়ায় ভরা। শতকরা ৯০ জন মানুষ দরিদ্র। ১০ জন যাঁরা ধনী ওস্তাগার তাঁদের কাজকাম করে দরিদ্ররা। মাঝারি স্তরের দর্জিরা বড় বড় সরকারী অর্ডার ধরতে পারে না। সেসব করতে গেলে পুঁজি চাই, বড় বড নেতা বা মন্ত্রী হাতে থাকা চাই।

তাই যারা দিন আনে দিন খায়, তাদের অ্যাসোসিয়েশন গড়ে উঠেছে। তারা দারিদ্র্যের চাপে বস্তি অঞ্চলের খুপরি খুপরি ঘরে থেকে মশা, ছারপোকা, ধোঁয়া, ধুলো, কাদা, নর্দমার মধ্যে সুখ-শান্তির খোঁজ না পেয়ে 'কমিনিষ্টি' হয়ে গেছে। কথায় কথায় তাদের ক্ষোভ মালিক বা বড়লোকদের বিরুদ্ধে। তারা তিন মাথা হয়ে গেছে বুড়ো শকুনের মতো ঘাড় মুড়ে বসে বসে সর্দি টেনে সারা জীবন বুভুক্ষু থেকে কাজ করে করে।

মেটিয়াব্রুজ, বটতলা, আখড়া, কানখুলি, চটাতে হাইস্কুল আছে। আখড়ায়, বটতলায় মুসলিম ধর্মীয় শিক্ষার পঠনপাঠনের রীতি আজো চলছে ঢিমে তালে। এখানের মানুষজন মুসলিম পোশাকে-আশাকে অভ্যস্ত। তবে সুট-প্যাণ্টও আধুনিকদের মধ্যে চালু হয়েছে। জনসংখ্যার অনুপাতে এখানের মানুষদের শিক্ষার হার অত্যন্ত নগণ্য। শতকরা দুজনও হবে না। কেননা অধিকাংশ দরিদ্র পরিবার তাদের সবে 'মাইছাডা' বাচ্চাদের হাতে 'সুই' তুলে দেয়। পরের দলিজে বোতামের ঘর সেলাই করতে নিয়ে যায়—যা চার আনা পয়সা পায় তাতে দুখানা চাপাটি রুটি অথবা দুটো শিক-কাবাব হবে।

এখানের রাস্তাঘাটের অবস্থা চিরকালই জঘন্যতম। কসাইখানার পচা রক্ত যখন গাড়ি বোঝাই হয়ে চলে যায় তখন লক্ষাধিক লোক দুর্গন্ধে কয়েক মিনিট প্রায় জ্ঞানহারা হয়ে থাকে দম বন্ধ করে।

রশীদ মিয়া বলে, 'মেটিয়াব্রুজের অবস্থা ফেরানো কঠিন। এখানে যে ইতিহাসের কলঙ্ক 'লাট কেলাইভ' সাহেব 'পেরথম' 'জাহাদ' থেকে মাটিতে পা দেয়! এখানে হাসপাতাল নেই। নানান রোগের ডিপো। এটা দুঃখের গারদখানা। মেয়েরা তাদের আব্রু নিয়ে আজীবন ঘরের কোণে বন্দী। এখানে পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ আছে, নামাজ পড়া হয়, মোল্লা-মুসল্লী অনেক কিন্তু কিছুতেই মানুষের দুঃখ ঘুচছে না। সন্ধ্যা হতে না হতেই শয়তান 'নমরুদ' বাদশাকে জব্দ করার জন্যে যেমন খোদা মশার ঝাঁক ছেড়ে ছিল তেমনি মশা নামে এখানে।'

আধুনিক শিক্ষিত ছেলে যারা দু'চারজন বি-এ, এম-এ পাস করেছে তারা

বলে, 'আমরা মুসলমান বলে কোথাও চাকরি পাচ্ছি না। (?) নিজেদের ব্যবসাপাতিও ডকে উঠছে। হাওড়া মঙ্গলা হাটে যারা ব্যবসা করত তারা প্রতিযোগিতায় পূর্ববঙ্গের শিক্ষিত বিচক্ষণ লোকদের কাছে দাঁড়াতে পারছে না। সেখানেও নাকি নানান 'সাম্প্রদায়িক' 'রাজনৈতিক' চক্রান্ত। তারপর সবই বাকিতে বিক্রি। দামী টেরিলিন, টেরিকট, সিল্ক, সার্জ সবই ছাড়তে হয় পাইকারী। পরের হাটে যদি আসাম, গৌহাটি, কটক, পাটনা, দার্জিলিং, নৈহাটি, তমলুক, বর্ধমান, দমদম—এসব জায়গা থেকে পাইকের না-এলো তো চক্ষু ছানাবড়া! টাকা আটকে গেল। দর্জিরা 'হপ্তা' পেলে না। তাদের হাঁড়ি চুলোয় উঠবে না। স্টলের ভাড়া বাকি পড়লে মঙ্গলা হাটের মালিক তালা লাগিয়ে দেবেন। প্রতিযোগিতার দিনে চারচোখ না থাকলে, বিদ্যে না থাকলে নতুন আগন্তুকদের সাথে পাল্লা দিয়ে পারবে কেন? দিব্যি স্যুটপরা ছেলে ঘষা কাঁচের মতো চোখ, মুখে মেচেতা পড়া দাগ—দেখলেই বুঝতে পারবেন—এ ছেলে মেটিয়াব্রুজের দর্জিদের—আদৌ লেখাপড়া জানে না। তারাই পৈতৃক অভ্যাসে দর্জির কাজ আর ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। এই যে চাঁদে যাবার এত বড় একটা বৈজ্ঞানিক কাণ্ড ঘটে গেল, এখানের ইমানদার মুসলমানরা আদৌ বিশ্বাস করতে পারছে না। চাঁদে গেলে নাকি আল্লা ফেলে দেবে। কোন্ যুগে কোন্ মেজাজে তারা বাস করছে বুঝুন। সিনেমা দেখাকেও তারা 'পাপ কাজ' মনে করে।'

অথচ 'হাওড়া মঙ্গলা হাটের মালিক মুরলীধর সরাব কিংবা কেবলচাঁদ মিনানীর কাছে খোঁজ নিয়ে দেখুন, শতকরা কত হারে মুসলিম দর্জি তার ব্যবসায় ফেল মেরে হাট থেকে পাত্তাড়ি গুটিয়ে নিয়ে গিয়ে সাধারণ দর্জি হয়ে কোনোক্রমে জীবিকা চালাতে বাধ্য হচ্ছে। আর কত বাড়ছে উদ্বাস্তু সম্প্রদায়ের হিন্দু ব্যবসায়ী। হাওড়া গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের গায়ে যে পুরাতন হাটটি আছে তার বয়স এখন দেড়শো বছর। বর্তমান মালিক মুরলীধর সরাব। এই হাজার হাজার স্টলওয়ালা লক্ষ লক্ষ ব্যবসায়ীদের রুজি-রোজগারের পীঠস্থানটিতে স্থান সংকুলান হয় না বলে হাওড়া এক নম্বর স্ট্রাণ্ড রোডে আর একটি হাট তৈরি হয়েছে। এর বয়সও আধ শতাব্দীর উপর। মালিক কেবলচাঁদ মিনানী। কংক্রীটের গাঁথুনি দোতলা আর একটি হাট তৈরি হয়েছে সম্প্রতি। আড়াই হাত স্টলের সালামী তিন হাজার টাকা। ভাড়া বছরে এক শো আশি টাকা। কিন্তু হাওড়া মঙ্গলা হাট—যেটি মেজো

—তার ভাড়া বত্রিশ—আগে ছিল চব্বিশ টাকা।

এই তিন হাটেও কুলোয় না। হাসপাতালের সামনে আরো একটি হাট বসেছে ছোট মতন। তার সঙ্গে হাট অ্যাসোসিয়েশনের অফিস। তবুও স্টল পায় নি বহু লোক। পথের পাশেই দোকান ফেঁদেছে প্রকৃতি আর পুলিসের হাতে নিজেদের মান-ইজ্জৎ বা দায়-দায়িত্ব সমর্পণ করে।

দর্জিদের কী ভীষণ কষ্ট এই তিনটি হাটে তা দেখতে গেলেই টের পাবেন; যদি আপনার পায়খানা বা পিপাসা লাগে। পাঁচ মিনিট স্টলগুলো দেখতে দেখতে বেরিয়ে আসুন, ঘেমে আপনি নেয়ে যাবেন। মনে হবে এ এক 'হাবিয়া দোজখ'।

এখানে খুচরো বিক্রি নেই। ডজন ডজন, গাঁটকে গাঁট মাল পাইকিরি হয়। ভারতের দিকে দিকে ছড়িয়ে যায় এইসব জিনিস: ফ্রক, শার্ট, কোট, পেনি, ব্লাউজ, রুমাল, গেঞ্জি, গামছা, মশারী, তোয়ালে—নিত্য ব্যবহার্য হাজার রকমের জিনিস।

যার পাইকের এলো না তার একগাল মাছি। আবার নতুন পাইকের ধরো। বিশ্বাস করে মাল ছাড়তেই হবে। সেও বার-দুই দেওয়া-নেওয়া করার পর হঠাৎ হাওয়া! অন্যখানে মাল নিচ্ছে দেখলে—'ধরো শালাকে!' তারপর হাতাহাতি—মারামারি। বিচার-আচার। মালিকপক্ষ সুযোগ পেলেই দিলেন দোকানে ঝাঁপ ফেলে। নতুন সালামী বিলিতে অনেক টাকা।

খ্যাতিমান দর্জিরা পাকিস্তানে চলে যাবার পর অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু কারো জন্যে সময়, কাল বা ফ্যাশানের গতিরুদ্ধ হয় না। শিক্ষিত দর্জির চাহিদা এখন বাড়ছে, যেমন কাটিংয়ের স্মার্টনেসের দিক থেকে তেমনি ব্যবসায়-বুদ্ধিতে।

মেটিয়াব্রুজের হাড়পাকা বুড়ো দর্জি রশীদ মিয়া, তোমাদের মেমসাহেবরা আর ফিরবে না—কালের জটিল প্রতিদ্বন্দ্বী গতিপথে যেখানে মোটর ছুটেছে সেখানে লাঠি ধরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটলে ভিখারীই বনতে হবে—অতএব সাবধান।

বৃহন্নলা সংবাদ

মহাশূন্যচারী আকাশের শকুনদল যেমন তাদের দূরবীন চোখে পৃথিবীর মাটিতে পরিত্যক্ত, মৃত জীবজন্তুদের দেখে ঝড়ের বেগে নেমে আসে তেমনি গাঁ-ঘরে কোনো গেরস্থ-বাড়িতে সন্তান হলে কলকাতার টালীগঞ্জ, খিদিরপুর, ধর্মতলা, ট্যাংরা, তালতলার বস্তি বা ফুটপাতবাসী হিজড়েরা কেমন করে সংবাদ পেয়ে ছুটে আসে তা খোদা জানেন।

কোনো 'অ্যাসোসিয়েশন' না থাকলেও হিজড়েদের মধ্যে একটা বোঝা-পড়া আছে কে কোন্ কোন্ থানায় যাবে। আসলে তারা পাড়ায় নাচ গান করতে এলে যখন সব মেয়ে-বউরা রঙ্গ-তামাশা দেখতে এসে ভিড় করে দাঁড়ায়, তাদের মধ্যে কার কার সন্তান হবার আশু সম্ভাবনা আছে তা লক্ষ্য করে আসে।

একে এ বছর চাষবাসের অবস্থা খারাপ, 'চাঁদে মানুষ নামাব পাপে' জল-বৃষ্টি হচ্ছে না, ভাদ্র মাসের অর্ধেক হয়ে গেল, খাল-বিল থেকে জোয়ারের জল তুলে ধান রোয়া হচ্ছে, এমন দুর্দিনে হিজড়েদের একটা দল এলো গাঁয়ে! ফুঁই ফুঁই ইল্‌শে গুঁড়ি ঝরছিল। চাষীদের শিক্ষিত ছেলেটা গামবুট পায়ে, গায়ে ওয়াটারপ্রুফ জড়িয়ে আলের ওপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খবরের কাগজ পড়ছে। তার পাশেই একটা মানপাতা চাপা ট্রানজিসটর সেট রেডিও থেকে রবীন্দ্র-সঙ্গীত হচ্ছে—দশ-বারোজন জনমজুর জমিতে কাজ করছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। হঠাৎ হিজড়েদের আসতে দেখে তারা হইহই করে চিৎকার করতে থাকে—যেমন পাগল বা মাতালকে দেখে মানুষজন আমোদ পায়।

রূপো, বাঁশি আর ময়না তিনজন হিজড়ে পথ দিয়ে আসছিল কাওয়ালী গাইতে গাইতে। রূপো গাইছিল মূল গানটা—ধুয়া ধরছিল ময়না আর বাঁশি। ঢোলকে তাল দিচ্ছিল ময়না আর হাতের তালুতে কড়া কিন্তু সুডৌল আওয়াজ তুলছিল বাঁশি।

রূপো পুরুষ-জাতের হিজড়ে। সে আয়না ক্ষুর ধরে রোজ সকালে চচ্চড় করে কড়া দাড়ি গোঁফ চাঁচে। বাঁশি আর ময়নার দাঁড়ি গোঁফ হয় না। তারা দুজন মেয়ে-জাতের। তিনজনেই শাড়িপরা, হাতভরা তাদের কাঁচের চুড়ি। ময়নার কোমরে রূপোর চন্দ্রহার। রূপোর কোমরে বিছেহারের গোছা।

তাতে লকেট ঝুলছে। রূপো তাদের সরদার। গলার স্বর মোটা। বয়েস পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন হবে। গায়ে ব্লাউজ। কৃত্রিম স্তন। ঠোঁটে রঙ দেওয়া।

ময়নার গায়ের রঙ ফরসা। তার বয়েস বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ। মুখটার আদল কাঁচাকচি-নারীসুলভ। চোখ দুটি মায়াময়। দেখলেই মনে হয় কোনো সম্ভ্রান্ত ঘর থেকে এসেছে। তার চলনভঙ্গী এবং কণ্ঠস্বরও কিছু রমণীয়।

রূপোর কথায়, 'ময়না আমার চন্দনা আর বাঁশি হল কালনাগিনী কঙ্কাবতী কালিন্দী!'

পথে একজন পুরোহিত ব্রাহ্মণ নামাবলী গায়ে জড়িয়ে যজমান-বাড়ি বেরিয়েছিলেন পূজোয়, হঠাৎ সামনে হিজড়েদের দেখে 'রাম রাম' করে উঠলেন।

রূপো হেসে শুধোলে, 'যাত্রানাস্তি! ও ঠাকুরমশায়, হরি ঘোষালের বাড়ি যাব—এই পথে তো?'

ঠাকুরমশায় কোনো উত্তর না দিয়ে তাদের খানিকটা দূর দিয়ে, মাঠে নেমে তাদের একেবারে ছায়া এড়িয়ে, দ্রুত সরে গেলেন। ময়না তার সায়া চাগিয়ে ধরে ঠাকুরমশায়ের পিছু পিছু ধাওয়া করলে: 'হেই মরদ, শুনে যাও ..'

কিন্তু ময়না জানে না ঐ ব্রাহ্মণটি কে!

রূপোও চিনলে না হরি ঘোষালকে। অনেক বছর এদিকে আসে নি। সে ঐ ময়নার জন্তেই। এই রায়পুর গাঁয়েই যে তার জন্ম।

অবশেষে হরি ঘোষালের বাড়ির দোরগোড়ায় এসে রূপো হাঁক মারলে 'ওলো দিদিরা, আয় লো তোরা! হালি হালি বিদায় দে লো, হালি হালি বিদায় দে!'

তারপর তারা ঢোলক বাজিয়ে গান জুড়ে দিলে। পাড়ার যত ছেলে মেয়েরা ছুটে এল। ঘোষাল-বাড়ির সামনেটা মানুষজনে ভরে গেল।

ঘোষালগিন্নী এসে দাঁড়ালেন তাঁদের পাকাবাড়ির দোরগোড়ায়। তাঁর ছোট মেয়ের একটা খোকা হয়েছে মাস তিনেক হল। কচি খোকাটাকে নিয়ে আসতেই রূপো ছুটে গিয়ে রমলার কোল থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে তুলে দিয়ে আবার লুফে নিয়ে রমলাকে ফিরিয়ে দিয়ে গেল, ছেলেটা কেঁদে ককিয়ে উঠতেই।

নাচ জুড়লে তিনজনে। গান গাইতে লাগল :

'মাটির ধরায় আজ এল চাঁদ
সে চাঁদ সোনার খনি
কত রাতের গোপন চুমায়
তৈরি সে ধনমণি !'

তাদের গান শুনে মেয়েরা হেসে গড়াগড়ি খায়। মাঝে মাঝে হিজড়েরা তাদের সম্পূর্ণ আব্রু উন্মোচন করে। ব্যাটাছেলেদের সরিয়ে দিয়ে মেয়েরা ঘিরে ধরে ময়নাকে। রূপো বউগুলোর চিবুক ধরে অশ্লীল কথা বলে তামাশা করে। তাদের পেটে হাত দিয়ে দেখে। কাতুকুতু দেয়।

তারপর তারা ঢোলক আর ঝনঝনি বাজিয়ে কাওয়ালী জোড়ে।

ময়নার দিকে সবাই তাকিয়ে থাকে। অবিকল যেন ঘোষাল-বাড়ির ছোট মেয়ে রমলার মতোই দেখতে, একই রকম মুখের আদল। সেকথা দু-একজন মেয়েও বলাবলি করে।

কাওয়ালী ওরা ভাল গায়। মেয়েরা পয়সা দেয়। ঘণ্টা দুই পরে রূপো নাচগান থামিয়ে দিয়ে দুয়ারে-গম্ভীর-মুখে-দাঁড়িয়ে-থাকা ঘোষালগিন্নীর পায়ের কাছে এসে বসে তাঁকে গড় করে বলে : 'মা গিন্নী মাগো—আমাদের এবার বিদায় দাও। তোমার নাতি দেশের রাজা হবে। মন্ত্রী হবে। বড় মানুষ হবে।'

ঘোষালগিন্নী বললেন, 'তোমার নাম রূপো ?'

'হাঁ মা, তোমার মনে আছে দেখছি।'

দীর্ঘশ্বাস মোচন করলেন ঘোষালগিন্নী। তিনি অন্দরে চলে গেলেন। কুলোভরা চাল, পাঁচটা টাকা, পানসুপুরি, কয়েকটা বাতাসা আর সন্দেশ এনে দাওয়ায় রেখে তিন থামের গায়ে মাথা রেখে কাঁদতে লাগলেন।

রমলা মাকে কাঁদতে দেখে অবাক হল।

শুধোলে, 'কাঁদছ কেন মা, কি হল ?'

'আমার কমলা ! আ-হা-হা…ঐ যে ফরসা মতো হিজড়েটা তোর আগে হয়েছিল—আমার কোল খালি করে এই রূপো ওকে নিয়ে গিয়েছিল ঠিক কুড়ি বছর আগে।'

'ওঃ ! কমলা…দিদি‥ আমার দিদি…'

মা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'অবাঞ্ছিত, অসামাজিক জীব। ওদের কেউ ঘরে ঠাঁই দেয় না। ওরা অভিশাপ। কিন্তু আমি মা···ভুলব কেমন করে···'

রমলা রূপোকে বাড়ির মধ্যে ডেকে আনলে। পৈঠার উপরে বসে আঁচল পাতলে রূপো। মা চোখ মুছে কুলোর চাল নিয়ে ঢেলে দেবার সময় শুধোলেন, 'হাঁরে বাবা রূপো, তুই যে আমার কমলাকে নিয়ে গিয়েছিলি, সে কি ঐ ময়না ?'

'না মা না, সে মারা গেছে। বস্তিতে একবার কলেরা লাগল

'সত্যি কথা বল্ বাবা, আমি মা, আমি চিনতে পেরেছি। ঐ তো ওর বোন রমলার মুখের আদল।'

রূপো দেখলে মহা মুশকিল ! এ হল অচ্ছেদ্য স্নেহের বন্ধন ! তার আঁশা উচিত হয়নি এখানে। বললে, 'হাঁ মা। সেই কমলা !'

মা এবার ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

রমলা বেরিয়ে এসে ময়নার হাত ধরে টেনে আনলে বাড়ির মধ্যে। সে কিছুই বুঝতে না পেরে হাঁ করে রইল। বাঁশি বাইরে বসে বিড়ি টানতে লাগল। হঠাৎ ঘোষালগিন্নী ছুটে এসে ময়নাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে তার মাথায় মুখে চুমো খেতে লাগলেন। আর বলতে লাগলেন, 'আমার কমলা ! আমার ময়না ! তুই আমার নাড়ী-ছেঁড়া ধন ! ওরে তুই কোথায় থাকিস ! কত কষ্ট পাস্ !···'

রূপো মাথা হেঁট করে বসে আছে। তারও চোখ থেকে টপটপ করে জল পড়ছে সিমেণ্টের ওপর।

রমলাও কাঁদছে।

কিন্তু ময়না তখনো ভাল করে বোঝেনি। ঝড়ের বেগে সে যেন কচুগাছের মতো দলিতমথিত হচ্ছে পরম প্রাকৃত এক স্নেহে।

ঘোষালগিন্নী যখন বলে উঠলেন, 'আমি যে তোর মা—ওই রূপো তোকে কুড়ি বছর আগে আমার কোল শূন্য করে নিয়ে গিয়েছিল'—তখন ডুকরে কেঁদে উঠে মাকে জড়িয়ে ধরে তাঁর বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে একসময় হঠাৎ বসে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল ময়না।

রমলা আর মা মাথায় মুখে জলের ঝাপটা দিতে দিতে তবে তার জ্ঞান ফিরল।

মা বললেন, 'রূপো, বিকেলে যাস বাবা, তোরা স্নান করে দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করবি। যা, এখন বাইরে যা।'

রূপো চলে এসে বাঁশিকে সব ঘটনা বললে। বাঁশি বললে, 'শালা! তোর মাথায় বাজ পড়বে। কেন এলি এখানে? ময়নার মনে আগুন জ্বলবে চিরকাল। তোম শালে বুঢ়বাক কাঁহা-কা!'

'মাইরি বাঁশি, খোদার কসম, আমি মনে করেছিনু, ওরা চিনবে না।'

'না শালা, মা আবার চিনবে না! এ কি তোর হিন্দী সিনেমা?'

রূপো নারকোল ছোবড়া মুচে তাল পাকিয়ে আগুন জ্বেলে ট্যাঁক থেকে সরু কোলকে বার করে গাঁজা ধরালে। বাঁশি আর সে টানতে লাগল। ছেলেরা কাছে এলে রূপো বললে, 'খাবি একটান?'

ছেলেরা খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠল।

রমলা তার হিজড়ে দিদিকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। খাটপালং আসবাব-ভরা ঘর। রমলার ছেলেটাকে কোলে নিলে ময়না। সে যদি মেয়ে হত এমনি তারও সন্তানাদি হত। স্বামী হত। ঘর হত। ভাগ্যের দোষে কোথায় টালীগঞ্জের বস্তিতে আজ তার বাস! মশা আর ছারপোকার জ্বালায় কোনো রাত্রেই ঘুমোতে পারে না। নোংরা পরিবেশ। রূপো মারে। নোংরা প্রকৃতির লোকজনদের কাছে তাকে ভিড়িয়ে দিয়ে পয়সা নেয়।…

মা তাকে অনেক কথা জিজ্ঞেস করেন। আর কাঁদেন। মুখ ধরে চুমু খান। মাথার চুল দেখেন। রমলা সুগন্ধী তেল দিয়ে চুল খুলে আঁচড়ে দেয়। পাঁচ-ছখানা শাড়ি ব্লাউজ দেয় তাকে।

হরি ঘোষাল পুজো করে বাড়িতে ফিরে দেখেন, সেই হিজড়েরা! অন্দরে ঢুকলে রমলা বাবাকে সব ঘটনা বলে ময়নাকে ধরে আনলে তাঁর সামনে। ময়না দেখলে সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক—যাঁর পিছনে সে ধাওয়া করেছিল কাপড় তুলে, 'হেই মরদ, শুনে যাও' বলে।

লজ্জায় সে মাথা নামালে।

বাবার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ। বললেন, 'তোমার কপাল মা। ভগবান…'

আর কিছু বলতে না পেরে চোখে হাত চাপা দিয়ে তিনি আড়ালে সরে গেলেন।

দুপুরে তিনজনকে বসিয়ে পেট ভরে খাওয়ালেন ঘোষালগিন্নী।

বেলা গড়িয়ে গেল ক্রমে।

এবার বিদায়ের পালা।

বাবা, মা, বোন সবাই কাঁদতে লাগলেন।

অবশেষে ময়নার হাত ধরে রূপো জোর করে টেনে নিয়ে এলো। সে কিছুতেই আসতে চায় না। 'মা-মা'—বলে কেবলই কাঁদে। আবার দৌড়ে পালাতে চায়। হাতে কামড়ায় রূপোর।

রূপো মার দেয়। গালাগালি করে: 'শালা হারামজাদা মাগী! চল্। তোর বাপ-মা তোকে নিয়ে কি ধুয়ে খাবে? তোর কি ছেলে হবে—ভাতার হবে—আছে সে-সব তোর? থাকলে মানুষ তোকে আদর করত। মেয়েমানুষ যতই রূপসী হোক তার যদি দেহটা বেকল হয়—পুরুষমানুষ দেবতা হলেও ছুঁড়ে ফেলে দেবে। বেশ্যা হলেও মানুষের সমাজে তার তবু দাম আছে। আমাদের কি দাম আছে? কেন দাম দেবে তারা? আমরা হলাম জগতের অভিশাপ!'

কাঁদতে কাঁদতে চোখ-মুখ লাল করে একসময় শান্ত হয় ময়না। রূপো বলে যায়, 'আমিও তো এক ধনী মুসলমান বাড়িতে জন্মেছিলাম। মুরশিদাবাদে তাদের এখনো পাকা দালান-কোঠা আছে। আমার বড় ভাই এখন একটা থানার বড় দারোগা। তাই বলে কি আমি সেখানে যাব? আমরা গেলে তাদের মান যায়। ঐ একবেলার আদর দেখালে মা—দু'মাস কই রাখুক তো! আমাদের কথা কেউ ভাবে না। ধর্ম পর্যন্ত আমাদের কথা ভাবেনি। আমরা মরলে স্বর্গে যাব না নরকে যাব তা কোনো ধর্মের বইয়েও লেখা নেই। আমাদের সামনে কেউ খুন হলেও আমরা সাক্ষী হতে পারব না। আদালতও আমাদের 'মানুষ' বলে গণ্য করেনি। তবে বড় দয়া, কেউ মারতে পারবে না!···আমাদের মন্ত্রী নেই, দল নেই, সমাজ নেই, সংসার নেই, বাপ নেই, মা নেই, স্বামী নেই, বউ নেই, ছেলে নেই, মেয়ে নেই,—আমরা হিজড়ে! নপুংসক! কিন্তু আমাদের পেট আছে, খিদে আছে, রোগ আছে, তাপ আছে, বাসনা-কামনা আছে।···আমি রোজা করতাম, নামাজ পড়তাম, খোদার কাছে কত কাঁদতাম—কিন্তু সে-সব ছেড়েছি। কি হবে ওসব করে? হিজড়ের আবার ধর্ম! এই যেমন নকল মেয়েমানুষ সেজে আছি। দুধের স্বাদ কী ঘোলে মেটে? যা হোক, তোকে মা-বাপের মুখটা দেখিয়ে গেলাম, আমার একটা ঋণ শোধ হল!'

বাঁশি বললে, 'আমাকে তো দেখাসনি স্যাঙাত?'

'তুই বাগদির ঘরে পয়দা হয়েছিলি। তোর বাপ-মা পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষে মরে গেছিল।'

ওরা তিনজনে গাঁয়ের মোড়ে একটা দোকানে চা খেতে বসল। ছেলে-ছোকরারা মস্‌কারা করতে লাগল। ময়নার দিকেই তাদের লক্ষ্য। মানুষ কামনায় কতখানি অন্ধ রূপো তা বেশ বুঝতে পারে।

গ্রামের মোড়ে কোলাহল। ভিড। লাল পতাকাবাহী যুবকরা চিৎকার করছে। একজন বলছে, 'চাঁদে নামল যেসব বীরপুরুষরা তারা এক-একজন ৯৯ বার করে অ্যাটম বোমা বিস্ফোরণ করে কোরিয়াব মানুষদেব ধ্বংস কবে এসেছিল—কোরিয়াবাসীদের হাত পা চুল চোখ খসে খসে পড়েছে বছরের পর বছর ধরে। মনে আছে হিরোসিমার কথা! এই সব আর্মস্ট্রং কলিন্সবা সেই যুদ্ধে বোমারু জেট পাইলট ছিল! চমৎকার ইতিহাসের বিচার!'

রূপো কথাটা শুনে মাথা নাড়তে লাগল। ঠিকই তো। হঠাৎ বলে উঠল, 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ!'

সবাই হেসে উঠল। রূপো ভড়কে গেল। তার ধ্বনির কোনো মূল্য নেই। তারা যে হিজড়ে। কেউ তাদের চায় না।

বাস আসতেই তারা তিনজনে উঠে পড়ল।

ময়না ফেলে-আসা-প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে আবার কাঁদতে লাগল। তার জন্মস্থান, বাপ-মার দেশ-গাঁ ফেলে রেখে চলে যাচ্ছে—আবার কখনো আসতে পারবে কিনা কে জানে। তার এক ভাই আছে নাকি—কলকাতার সদাগরী অফিসে বাবুগিরীর কাজ করে। তাকে কখনো দেখেনি—দেখলেও চিনতে পারবে না। ময়নাকে দেখলে হঠাৎ ঘৃণায় হয়তো সরে যাবে!

বাসায় ফিরে মুসলিম হোটেল থেকে খানকতক চাপাটি আর শিক-কাবাব আনালে রূপো। ময়না কিছু খেলে না। শুয়ে পড়ল আপাদমস্তক বোনের-দেওয়া-একটা শাড়ি পাট করে মুড়ি দিয়ে। মাথার চুলে তার মা আর বোনের হাতের মধুর গন্ধ পাচ্ছে যেন এখনো।

বস্তিবাড়ির পাশে শূকর চরে বেড়াচ্ছে। তাদের ঘোঁতঘোঁত শব্দ কানে আসে মাঝে মাঝে। পাশের ঘরে থাকে বেশ্যারা। তাদের নিত্যকার মতো মুখখিস্তি শোনা যায় আজও। ময়নার চোখে ঘুম আসে না। ছিটেবেড়ার একটা ছোট্ট ঘর। বারো টাকা ভাড়া। বাঁশি আর রূপো ঘুমোচ্ছে। নাক ডাকছে তাদের।

ময়না উঠল। সে পালাবে বলে আস্তে আস্তে টিনের দোর ঠেলে বেরিয়ে পড়ল। মা আর বোন ক'টা টাকা দিয়েছিলেন আলাদা করে, সেগুলো তার নাইকোঁচড়ের খুঁটে বাঁধা আছে। ময়না এসে ট্রামে উঠল। তারপর লাস্ট বাস ধরে কলকাতা থেকে আবার এলো সে রায়পুর গ্রামে।

রাত তখন বারোটা বাজে প্রায়।

কেউ লোকজন নেই পথে। অন্ধকারে বন-জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পথ হাতড়ে হাতড়ে এলো সে ঘোষাল-বাড়ির দোরগোড়ায়। কয়েকবার পড়ে গেছে খানা-ডোবায়। গা-হাত-পা ছিঁড়ে গেছে। রক্ত বার হচ্ছে বোধহয়। তা হোক। তবু তো এসেছে।

কিন্তু ডাকবে কাকে? এখন রাত বোধহয় দেড়টা হবে। নিশ্চুপ নিষুতি গ্রাম। মাকে ডাকতে গিয়ে গলার স্বর ফুটল না ময়নার। কে যেন কণ্ঠ রোধ করে আছে তার। দোরগোড়ায় বসে রইল সে। বসে বসে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল কার যেন কাশির শব্দ পেয়ে। তার বাবা কাশছেন। রমলার ছেলেটা কাঁদছে।

ভোর হয়ে এল। হঠাৎ ময়না উঠে পড়ল। তার মধ্যে ভাবান্তর এসেছে। মা-বাপ তাকে রাখতে পারলে কি বিদায় দিতে পারতেন! রাখতে পারবেন না। দুদিন বাদেই চলে যেতে বলবেন। নইলে সমাজ একঘরে করবে। তার বাপকে আর কেউ পুজো করতে ডাকবে না।

চোখের জল শুকিয়ে গেছে ময়নার। সে উদ্দেশ্যহীনভাবে চলতে চলতে নদীর ধারে এসে গেল। নদীতে তখন পূর্ণ জোয়ার। হুড়হুড় খলখল শব্দে করাল আঁধার গর্ভে জল ভীমগর্জনে আবর্তিতে হচ্ছে। নদীতে ঝাঁপ দেবে বলে মনস্থির করলে ময়না। কেউ জানবে না, কেউ দেখবে না। বেঁচে থেকে লাভ কী?

কিন্তু বড় ভয়—বড় প্রাণের মায়া হয়। মরতে এত ভয় হয় কেন? আবার সে কাঁদতে লাগল। শেষবেলা যখন সকাল হয়ে গেল, লোকজন দেখতে পেয়ে তার যেন খানিকটা ঘোর কেটে গেল।

আবার সে চলতে চলতে এসে একসময় বাসে উঠে বসল। বাস এসপ্ল্যানেডে এসে থামল। তারপর আবার সে ফিরে গেল টালিগঞ্জে রূপোর বাসায়।

রূপো তাকে খোঁজাখুঁজি করছিল। ময়নাকে আসতে দেখে আপাদমস্তক

একবার দেখলে। ঝড়ে বিধ্বস্ত গাছের মতন। কপালে হাত দিয়ে দেখলে ভীষণ জ্বর এসেছে ময়নার। কাঁপছে সে।

তাকে শুইয়ে চাপা দিয়ে রুপো জড়িয়ে ধরে বলতে লাগল, 'ভাবিস না, পাগল হয়ে যাবি। আমরা অদ্ভুত এক জীব। আমাদের কথা ভগবানও ভাবে না। আমিই তোর মা বাপ স্বামী ভাই—সব কিছু।—যাই তোর ওষুধ আনি।'

ময়না কিন্তু রুপোকে ছাড়লে না। তার গলা জড়িয়ে ধরে উভরায় কাঁদতে লাগল।

জলভরা চোখ দুটো চকচক করতে লাগল রুপোর।

তিয়োর বোনে বাঁশের আটল

পচিশ-তিরিশ হাত লম্বা এক 'বেগোত' মোটা 'বাঁশনী' বাঁশ পাঁচ-সাত মাইল দূর থেকে কাঁধে করে বয়ে আনতে 'হেড়ো সেঁকে' যায়। গাড়ি-টানা গরুর কাঁধের মতো কড়া পড়ে যায় কাঁধে। একহাঁটু কাদাদোঁক ঠেলে এগোতে হয় এই বর্ষাকালে। পাঁকাল মাছের মতন পিছল এঁটেল মাটি, হাজার বুড়ো আঙুল টিপে টিপে চললেও—যদি একটু পা 'হড়কা'য় তো চিৎপটাং। বাঁশ সমেত পড়লে কোমরের খিলের দফা রফা!

'ঘুঁনি', 'আটল', 'মুগ্‌রি', 'ঝাঁঝরি', 'পোলো' তৈরির জন্যে দরকার বাঁশনী আর 'তল্‌তা' বাঁশ। একখানা বাছাই বাঁশনী বাঁশের দাম তিন টাকা। 'তল্‌তা হলে দু-টাকা। কাটারি হাতে 'তিয়োর' বা 'ডোমে'রা বাঁশ কিনতে এসেছে দেখলে চাষীরা কামড় দিয়ে দর ধরবে। নইলে 'ঢুলি ভেল্‌কো', 'গুঁড়ি ভেল্‌কো' বাঁশের দাম একশো-পচিশ টাকা শ। প্রমাণ বাছাই বাঁশ। সরু তড়পি বাঁশ ষাট টাকা। মাঝারি আশী। 'ভেল্‌কো' বাঁশ বেশি শক্ত, কাজের বাঁশ। 'জাওয়া' বাঁশের গাঁটে গাঁটে হয় প্রচুর কঞ্চি। সেগুলো ছাতার মতো চারদিকে ছড়িয়ে থাকে তির্যক রেখায়। 'জাওয়া' বাঁশের বড় একটা উপকার পাওয়া যায় না, তবে লাউ, সিম, বরবটি, কুমড়ো, পালা ঝিঙে, করলা ইত্যাদি লতানে গাছের ছাঁদলার জন্যে এ বাঁশ খুব কাজে লাগে। কঞ্চি বেশি বলে এর 'জটলাই'য়ে গাছ তার 'শুঁড়' বা আঁকড়ি জড়িয়ে বেয়ে চারদিকে প্রসারিত হতে পারে।

'বাঁশনী' বাঁশ পাকলে গুড়ে লাল হয়। তিন পো এক হাত ছাড়া 'পাব' হয় এর। কঞ্চি হয় পাত্‌লা। তিন 'সনে' বাঁশ ঘরের কাজে লাগে। কাটারি মেরে মেরে ফাটিয়ে 'ছ্যাচা' তৈরি করে 'আগোড়' বা দোর অথবা বেড়া করা হয়। খুঁটির কাজেও লাগে তবে গোড়ার দিকটা। নচেৎ এ বাঁশ ফাঁপা। জেলেরা ইলিশের জালের 'চোঙা' তৈরি করে এ বাঁশ থেকে। 'তল্‌তা' একেবারেই ফাঁপা। ঢলঢলে নরম প্রকৃতি এর। এ বাঁশও চোঙার জন্যে জেলেরা ব্যবহার করে যদি খুব মোটা হয়। এর জটা বা ভুঁইফোঁড় থেকে ভাল 'ছিপ' হয়। মাছ মারা চৌকির 'ছড়' এবং 'আড়বাঁশি' তৈরি করা হয় 'তল্‌তা' বাঁশের সরু ভুঁইফোঁড় থেকে। পূর্ব বাংলার মানুষরা 'তল্‌তা' বাঁশকে 'মুলি' বাঁশ বলে। মুলি বাঁশ থেকে সুন্দর সুন্দর 'ছামাড়' দরমা তৈরি করতে ওস্তাদ পদ্মাপারের মানুষরা।

চাষীবাসীদের কাছে বাঁশের চাইতে উপকারী বস্তু আর দ্বিতীয় কিছু নেই। কথায় বলে, 'হলে বাঁশ মলে বাঁশ'। সন্তান জন্মের পর তার নাড়ি কাটার জন্যে চাই বাঁশের 'চ্যারিটি', আর মরলে চাই হরিবোল দিয়ে কাঁধে তোলার জন্যে বাঁশের 'খাটুলি'। আর মুসলমানদের পিছনে তো বাঁশ ধাওয়া করে একেবারে কবর পর্যন্ত!

'ঢুলি ভেল্‌কো' অথবা 'গুঁড়ি ভেল্‌কো' বাঁশের চাহিদাই বেশি সংসারে। তাই গ্রামে গ্রামে প্রতি চাষীরই এ বাঁশের ঝাড় থাকে। 'বাঁশনী' বা 'তল্‌তা' তেমন কোনো কাজে লাগে না বলে ঝাড়ে পড়ে থেকে পেকে যায়। ডোম বা তিয়োরদের দরকার হয় এক সনের বা দু'সনের কাঁচা বাঁশ। কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরে—তাই ঘর-বাড়ি তৈরির কাজে পাকা বাঁশ চাই। কিন্তু পাকা বাঁশ এখন পাবে কোথা? পান বরোজ আর কলকাতার বড় বড় ইমারত তৈরির কাজে সমস্ত কাঁচা এবং মোটা মোটা এক-সনে দু-সনে বাঁশ গাড়োয়ান খদ্দেরদের লাভের ব্যবসায় 'মূলে হাবাত' হয়ে যাচ্ছে। কাজেই কাঁচা বাঁশে ঘর তৈরি করো, খুঁটি দাও, আড়কাঠা, 'লাদ্‌না' দাও, সরদাল, পাড়োন, দাঁত্‌নে, বাঁখারি, বাটাং করো, সব ছ' মাসেই ঘুণ ধরে ভেঙে পড়বে।

শুধু দিনের বেলাই নয় প্রতি রাত্রে—এই বর্ষাকালেও—গাড়ি গাড়ি বাঁশ যাচ্ছে গ্রাম থেকে শহরে। পাকা বাঁশ পাবার উপায় নেই। তিন সন পার না হলে বাঁশ পাকে না। পাঁচ সনের পর বাঁশ শুকিয়ে যায়। শহরের ব্যাপারীরা মোটা আর লম্বা বাঁশের বেশি দাম দেয়। তারা ফিতে দিয়ে গোড়া

মাপে। কাজেই কাটো কাঁচা বাঁশ। আর কাঁচা বাঁশও বেশিদিন টিকবে না—তাতে ব্যবসায় লাভ বেশি। কাঁচা বাঁশ কাটলে ঝাড়ের সর্বনাশ হয়। কেননা এক সনের এবং দু'সনের বাঁশের মূল বা 'মুড়ো' থেকে 'তেউড়' বার হয়। তিন সনের হয় না। সেটাই কাটার নিয়ম। এর পর ডোমের ছেলেরা কঞ্চি কিনতে এসে যদি মস্তকশূন্য বৃহৎ কঞ্চিবিশিষ্ট 'কাকমরা' বাঁশের কঞ্চি কেটে নেয় আড়াই টাকা তিন টাকা পণ দরে তবে একরাত্রের গুলোনি ঝড় খেলেই ঝাড়ের সমস্ত বাঁশ ছিটকে পড়ে যাবে চারদিকে ছত্রখান হয়ে।

তখনকার বুড়ো বাপ-ঠাকুরদাদারা বলত, 'ওহে কাঁচা বাঁশ কেটো না, পাপ হবে। শনি-মঙ্গলবারে বাঁশ কাটতে নেই।' কিন্তু এখন কে সেসব কথা শোনে! মুসলমান গাড়োয়ানরা তাদের আড়াই সের ওজনের ভারী কাটারি মেরে এক কোপে যতই কাঁচা বাঁশ কাটুক, ডোম বা তিয়োররা কিন্তু তা করে না। তারা বাঁশ চেনে। তবুও লোকে বলে, 'বাঁশবাগানে ডোম কানা!' তার মানে একটা বাঁশ দর দিয়ে সে ঝোড়া, চুবড়ি, কুলো, ধুচুনি, চালুনী তৈরি করবার জন্যে কিনেছে, বেছে নিতে হবে তো? কোনটা নেবে না নেবে ঠিক করতে তার সময় লাগবে বইকি। কিন্তু পাকা বাঁশ সবাই চেনে।

তিয়োর আর ডোম—এ দুটি সম্প্রদায় ভিন্ন। তিয়োর সম্প্রদায় নিম্নবর্ণের হিন্দু। এরা বাঁশ থেকে বাঁখারি ফেড়ে সরু সরু 'সলা' বা কাঠি দিয়ে মাছ ধরা 'ঘুনি', 'আটল', 'মুগরি', 'ঝাঁঝরি', 'পোলো' ইত্যাদি তৈরি করে হাটে-বাজারে বিক্রি করে। 'বাঁশনী' এবং 'তল্‌তা' বাঁশ থেকে এসব তৈরি হয়।

ডোম সম্প্রদায়ের লোকরাও নিম্নবর্ণ হিন্দু। এরা 'ঢুলি ভেলকো' বা 'গুঁড়ি ভেলকো' থেকে তৈরি করে 'ঝোড়া', 'কুলো', 'চুবড়ি', 'চ্যাঙারি', 'ধুচুনী', 'ছাকনি' জালের 'কেঁতে' ইত্যাদি।

ফলতা থানার উত্তর-পূর্বদিকের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে সতোল, কলসা, হরিশপুর, রামনোখা, কলাগাছিয়া, হিঞ্চেবেড়িয়া, শ্বেতকালনা, ঢোলটুকারী কয়েকটি গ্রামে প্রায় দু-হাজার ঘর তিয়োরের বাস। এদের উপাধি মাল, সরদার, দাস, মণ্ডল, মালিক, প্রামাণিক ইত্যাদি। পাশের গ্রামগুলিতে বাস করে ডোমেরা। পশ্চিমপাশের রুকে, গোপালপুর, সরার হাট, সোনা-ডিয়া, মোহনপুর ইত্যাদি গ্রামে বারোশো ঘর মুসলমান জোলার বাস।

তারা নিজেরা চরকায় সুতো পাক দিয়ে হাতের তাঁত চালিয়ে গামছা, মশারী, ধুতি, শাড়ি বোনে।

যেখানে তিয়োর সম্প্রদায়ের বাস সেসব জায়গা সারা বর্ষার জলে ডোবা। পথঘাট বিরল। দু-চারটি কাঁচামাটির কর্দমবহুল আলপথ। পাড়া থেকে পাড়ায় যোগ। ভারি বর্ষা হলে সেসব পথঘাটও ডুবে যায়। শালতি বা তাল গাছের ডিঙি তখন ভরসা। চারিদিকে গ্রামের পর গ্রাম, মাঠের পর মাঠ—সবুজ ধানক্ষেতের লিলি-করা দিগন্ত। মাঝে-মধ্যে ছোট ছোট গ্রাম—তাল-নারকোল-আম-কলা-খেজুর-বাবলার ঝোপ। তিয়োর লোকদের ব্যবসা হল বর্ষায় মাছধরার যন্ত্রপাতি বিক্রি করা। বাকি সময় বেড়জাল, মহাজাল, খেপলাজাল, ফাঁদিজাল, ছাঁকনিজাল, পোলো দিয়ে মাছ ধরার কাজ। যারা একটু অবস্থাপন্ন, জমিজিরেত আছে, তাদের আছে বাঁশের ঝাড়। গরিব গেরস্থদের পাঁচ-সাত মাইল দূর থেকে বাঁশ কিনে কাঁধে করে বয়ে আনতে 'হেড়ো সেঁকে' যায়। কাঁধ ফুলে ওঠে। এছাড়া মোনপুর বা মোহনপুরের রবিবারের হাট থেকে বাঁশ কিনতে হয়। চারদিক থেকে প্রচুর বাঁশ আসে শালতি করে অথবা 'লেদ' বেঁধে জলের ওপর দিয়ে টেনে টেনে। মেলা দর। যাদের বড় ব্যবসা, বেশি টাকা - তারাই সে-সব বাঁশ কিনতে পারে।

পাড়ায় ঢুকলে দেখতে পাবেন ঝোবড়া ঝোবড়া কুঁড়েঘর। খড় বা উলুর ছাউনি। খোলা বা টিনের ঘর যাদের তাদের অবস্থা মাঝারি। পাকা বাড়ি এক-আধজনের। সতোল গ্রামে আছে একটি হাইস্কুল। শ্বেতকালনা, ঢোল-টুকারী আর সতোল গ্রামে বাস করেন দু-এক ঘর ব্রাহ্মণ। তাঁরাই পূজো-আচ্চা করেন এদের।

ঘুনি, আটল, ঝাঁঝরি, মুগরির মাল তৈরি হলে মেয়েপুরুষ মিলে কাছাকাছি দু' মাইল থেকে পাঁচ-সাত মাইলের মধ্যে মোহনপুর, সরার হাট, গোপালপুর, হরিণডাঙা, বাথরার হাটে বিক্রি করতে আসে। পুরুষরা কাঁধে বাঁক নিয়ে গোয়ালাদের মতো ভারী মালের পেটি বয়ে নিয়ে আসে। বাঁকটা ধাপতে থাকে চলার তালে তালে। মেয়েরা পাঁচশো গজ কাপড় বাণ্ডিল করার মতো 'চিড়িবাড়' বা 'পাটা'-র বোঝা মাথায় নিয়ে কাদা-দোড় ঠেলে কনুই দুলিয়ে দুলিয়ে ছুটতে থাকে হুহু করে। শনিবারের হাট ধরবার জন্তে তারা বৃহস্পতি, শুক্রবার ভোরবেলায় দঙ্গল ভরে পথ জুড়ে ছুটতে থাকে। কখনো কখনো হাল্লাক হয়ে গেলে বটতলায় বোঝা নামিয়ে খালের জলে নেমে

কোমর পর্যন্ত 'ফোচকে' বা 'ফিচকিরি'-মেরে-ওঠা কাদা ধুয়ে নিয়ে সকলে জটলা করে উবু হয়ে বসে বিড়ি টানে। রায়পুরে গিয়ে তবে নৌকো ধরবে। তারপর যাবে দশ মাইল দূর উলুবেড়ে। সেখানের হাটে বসে মাল বুনবে চাহিদা মতো। একটা আড়াই হাত লম্বা, দেড় হাত চওড়া পাঁচ-সাত টাকা দামের ঝাঁঝরি বা আটল হলে তৈরি মাল যদি সবাই খান কুড়ি করে রাখে তবে হাটে জায়গা পাবে কোথা? পাঁচ-সাতশো তিয়োর আসে যে প্রতি হাটে! চোদ্দ নম্বর হণ্টের পাইকেরদেরও কেউ কেউ মাল পাইকিরি দেয় যাদের হাটবাজারে যাবার লোক নেই।

সতোল থেকে পাঁচ মাইল দূরে সরার হাট—এ হাট বসে বৃহস্পতিবার আর রবিবার। দু' মাইল দূরে শুক্কুর সোমের হাট গোপালপুর। আর নিত্য হাট অর্থাৎ বাজার বসে পাঁচ মাইল দূরের হরিণডাঙায়। মোহনপুরের হাট বুধ-রবিবারে। বাখরার হাট বৃহস্পতিবারে। আর আমতলার হাট মঙ্গল-শনিবারে। কোথায় মাল বেচতে যাবে যাও—প্রতিদিন হাট আছে। সমাজকর্তাদের দ্বারা এসব হিসেব কবে দিন ঠিক করা আছে সেই মহাভারতের যুগ থেকে। হরিণডাঙায় যাবে? চালের দাম সস্তা। সাড়ে তিন টাকা 'দোন' বা 'পালি।' পালি মানে আড়াই সের। মাল বেচে চাল ডাল নুন তেল আনাজ কিনে আনতে হবে সারা সপ্তাহের মতো হাট থেকে। কিছু ফুরোলে আর পাবে না। গ্রামের খুদে খুদে দু-একটা মুদি দোকানে যাও—সাতকে সতেরো দাম।

পাড়ায় পাড়ায় বিস্তর হাঁস আর মুরগী চরে বেড়াচ্ছে তিয়োরদের। মৎস্য ব্যবসায়ী হিন্দু সম্প্রদায় হল তিয়োর আর মুসলমান হলে তাদের বলা হয় 'নিকিরি'।

[ফলতা থানায় 'পাইকান' গ্রামের ঘন ঘন, গায়ে গায়ে লাগোয়ো বস্তি হল কয়েক হাজার গোয়ালাদের—তারা গরু মোষ পেলে দুধের কারবার করে শহরের ছানা যোগান দেয় প্রতিদিন শত মণ করে। কাছেই কয়েক মাইল দূরে বজবজ থানার রায়পুর গ্রামে সব চাইতে পাতলা (একশোখানায় এক কেজি) পাঁপর তৈরির আড়ত বড়বাজারের আগরওয়ালা ঝুনঝুনওয়ালাদের—চোদ্দটা কারখানা—মাসে কয়েক লক্ষ টাকার মাল উঠে সারা ভারতের দিকে দিকে ছড়িয়ে যায়। পাঁপরের 'বেসম আসে কলকাতা থেকে মাসকলাই, মুগ কলাই ভাঙিয়ে, যে কলাই আসে সুদূর রাজস্থান উত্তরপ্রদেশ, বিহার থেকে।

তার পাশে বিরলাপুরের চটকল—কোটি কোটি টাকার ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান। কিছু দূরে বজবজের কেরোসিন তেলের ডিপো। বাটা নগরের জুতোর কারখানা। কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে খোঁজ নিলে জানবেন, সব চাইতে ভাল কলসী তৈরি হয় বজবজ থানার ডোঙ্গাড়িয়া গ্রামে কুমোর পাড়ায়—আর নার্সারীগুলোয় কলম বা টবের গাছপালা যোগান দেয় এই থানার মুচিসাহা গ্রামের লোক।]

তিয়োর, ডোম, মুচি, মালি, জোলা, গোয়ালা—সব সম্প্রদায়ের মানুষেরা আজ পতঙ্গের মতো পেটের জ্বালায় ছুটেছে জাত-ব্যবসা ছেড়ে কলে-কারখানায়। কুষ্ঠ রোগের মতো তাদের দেহে কাবুলী বা মহাজনের দেনার যন্ত্রণা—মুখে প্রতীকী পতাকার জয়ধ্বনি। বর্ষায় নদী থেকে খালের জলে যেমন কোটি কোটি 'কেঁকো'র (কাঁকড়ার) বাচ্চা এসে ছেয়ে যায় চারদিক—তেমনি সর্বত্র, সমাজের অলিতেগলিতে রাজনীতি ছেয়ে গেছে আজ। যেখানে অভাব দারিদ্র্য ক্ষোভ সেখানেই রাজনীতি।

বুড়ো মাহিন্দ মাল কাটারী চালিয়ে বাঁখারি ফাড়তে ফাড়তে গালাগালি করে: 'শালা একটা জন পাওয়া যায় না যে বাঁশ ফাড়ব। মেয়েটাকে বলি আমি চেরা বাঁশ তুলে ধরছি তুই বেটি কাটারী মার। তা সে কাটারী চালাতে যেয়ে শালীর বেটি দিলে ফাড়া বাঁশের ভেতরে হাত চালিয়ে। কেটে ফাঁক হয়ে গেল দুটো হাত। খাসী কাটার মতন রক্ত দেখে আমার 'ভিমবি' লেগে গেল!…পাড়ার চা দোকানে কে রাজা হবে কে উজির হবে তাই নিয়ে 'গাড্ডাই' মারছে ছোঁড়ারা 'রেডিও কল' বগলে নিয়ে—কাজে ডাকো, বলবে সাত টাকা রোজ দেবে? আড়াই টাকা রোজ, সাত টাকা চাইবে! ক'টা আটলের মাল বুনবি? আর কাজও জানে না কিছু। ফালতু সব। জাতটাকে বেকার করে দিলে। ভাল যারা কাজ শিখতে চায় ওদের পাল্লায় পড়ে গোল্লায় যাচ্ছে!'

মাহিন্দ বুড়োর বয়েস নাকি চার কুড়ি পাঁচ। তবু এখনো কোমর ভাঙে নাই, দাঁত পড়ে নাই, মড়মড় করে খেসারি কলাই ভাজা চিবোয়। চোদ্দটা ছেলে আর সাতটা মেয়ে তার। ছেলেরা, ছোট দুটো বাদে সবাই আলাদা। মেয়েদের ছ'জনের বিয়ে হয়ে গেছে। তার সংসারে এখন বউ হিঙ্গেলতা, মেয়ে কালিন্দী আর ছোট ছেলে দুটো আছে। তারা উলুবেড়েয় মাল নিয়ে গেছে। বয়েস তাদের কুড়ি-একুশ।—'প্রতি বছরে একটা করে ছেলে

বিইয়েছে হিঙ্কেলতা। একুশ ছেলের মা সে! মুবগী যেমন রোজ একটা করে ডিম পাড়ে অমনি। সে তবু তেরো-চোদ্দটা ডিম পেড়ে ক্ষ্যান্ত হয়—এ শালা একেবারে পাঁচগণ্ডা একটা।'—আজো তাগ্‌ডাই চেহাবা আছে হিঙ্কেলতার। ছেলে বা বউদের সাথে বচসা লাগলে মাল-কোঁচা মেবে ছুটে যায় লড়াই লেগে যায়। তুলে আছাড দেয় জোয়ান-মদ্দ ছেলেদেব। সে কোমবে আঁচল জড়িয়ে হেঁসো চালিয়ে বাঁখাবি থেকে সরু কাঠি তৈরি করে নিয়ে 'তাল-চোঁচ' দিযে 'পাটা' বুনছে। পাশাপাশি ছোট ছোট খোপঘরেব ভিজে দাওয়ায পিঁড়ে বা চট পেতে বসে বাবোটা ছেলের বউ আব তাদের ছেলেমেয়েরা 'পাটা', 'চিডিবাড', 'চাল' বুনছে। বাঁখাবি ফাডছে, কাঠি চাঁচছে, তাল-ডাঁটাব 'বাগডা' পিযে থেঁতো করে চোঁচ তৈরি কবছে। চকবন্দী বাড়ি। মাঝখানে উঠোন। প্যাচপেচে কাদায় হাঁস-মুবগী চরে বেডাচ্ছে। হাঁসগুলো কাদায় মুখ ঢুকিয়ে চবচব কবে শব্দ তুলছে।

মাহিন্দ মোটা খাটো চেহারার লোক। তুটো কাঁধে কডা পড়া কালো দাগ। পঁয়ষট্টিজন লোক তাব ছেলেমেয়ে নাতি নাতকুড নিয়ে। সে যেন এক বিরাট মহীরুহের মূল।

মাহিন্দ বলে যায়: 'আমাব ঠাকুরদা ছিল সখেব 'নোক'। বেতেব বাঁধন দিয়ে ফুলবাঁখারি চেঁছে উলু দিয়ে ছাউনী করে একটা 'উলুটি' করা ভাল আটচালা বেঁধেছিল গায়ে-গতবে খেটে। জমিদাবেব নায়েব আব বড দাবোগা এসে সেই আটচালায় বসে নাকি বলেছিল—'বাঃ! এ যে সাহেব-পছন্দ বাংলো!' তা সেই বাংলো-বাড়ির ফুলবাঁখাবি তৈবি কবতে এসেছিল নাকি সুন্দববন অঞ্চলেব একটা লোক। -- অঞ্চলেব লোক একটু দুর্দান্ত ধবনের হয। ইংরেজ আমলের প্রথমে যাবা খুনী আসামী ছিল তাদেব ছাড়ান দেবাব লোভ দেখিয়ে সোঁদরবন আবাদের জন্যে পাঠিয়েছিল। তাদেব রক্তেব রক্ত ওর দেহে। লোকটা সবাইকে 'তুই' বলত। জাতে মুসলমান। ভাবি কাজের লোক। ফুলবাঁখারি এমন সগোল করে সে চাঁচতে পাবত যে দেখলে অবাক হতে হয়। কিন্তু সারা বেলায সে তিনটেব বেশি চাঁচতে পাবত না। সেই একখানা বাঁখারি নাকি আমাব বাবা ভেঙে ফেলে। তা সেই সোঁদরবনেব বুড়ো করলে কি জানো? ভাঙা বাঁখারি দিয়ে দিলে ঘা-কতেক কষিয়ে। ঠাকুরদা লোকটাকে বকাবকি করতে সে চলে গেল। আব এল না। কিন্তু ফুলবাঁখারি চাঁচবে কে? কেউ পারে না তেমন-ধারা কবতে।

'এক্কেরে' 'সোঁগোল। শেষে বেটাকে হাতে ধরে 'কস্থর' মেনে আনতে হয়। এই যে এক-আধজন কাজের লোক সংসারে পাওয়া যায় তারা আজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে!'

মাহিন্দ কিন্তু ভোট দেয় কমিউনিস্টদেরই। কারণ তারা নাকি গরিবদের বন্ধু। কংগ্রেস বড়লোকদের। যাদের দালানকোটা আছে তারা করুক না কংগ্রেসী, তাতে তার আপত্তি নেই।

ছেলেরা সবাই গেছে উলুবেড়ের হাটে মাল নিয়ে। বুড়ো তবু দুটো একটা মাল বেচবার জন্যে তাড়াতাড়ি করে। নোদাখালীর ঋষি ঠাকুর বলে রেখেছে থান দুই 'যন্তর' করে দেবার জন্যে।

বুড়ো গামছা পরে পাটা, চাল, চিড়িবাড়, চোঁচ আর ছুরি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। ডিঙি বেয়ে বেয়ে লগি ঠেলে ধানবন চিরে এসে ওঠে মোহনপুরে। সেখান থেকে হেঁটে হেঁটে নোদাখালী। ভোলা সাহার কণ্টোল আর মুদিখানার সামনে—যেখানে পাল্কিবওয়া বেহারারা থাকে—সেখানে বাবা পঞ্চানন্দের চাতালে বসে গাঁজা টানছিল ঋষি অধিকারী। মাহিন্দ এসে বাবাজীর পায়ের 'কাদা' নিয়ে জিবে ঠেকিয়ে (বর্ষাকালে বাবাজীর পায়ে ধুলো ছিল না) গাঁজার কোলকেটা নিয়ে বারকতক দম মেরে বল্‌বল্ করে কড়া কটুগন্ধ নীলচে ধোঁয়া বার করে নাক-মুখ দিয়ে।

ঋষি ঠাকুর বলে, 'তোমার আসতে দেরি হল হে মালের পো। দাও দুটো বড় আটল তৈরি করে। পোলের মুখটাতে বসাব।'

'জোড়া জোড়া দর—পুঁটুলে ঘুনি এক টাকা, ঝাঁঝরি পাঁচ টাকা, বড় ঘুনি সাড়ে তিন টাকা, আটল ছোট দেড় টাকা, বড় আড়াই টাকা আর বড় 'মুগ্‌রি' দশ টাকা। পাঁচ টাকা করে দশ টাকা দিতে হবে বাবাজী আজই নগদ।'

'হাঁ হাঁ—তুই কর না। এই নে, টাকা নে। এক্ষুনি সাপে-কাটা রোগী দেখে উপায় করে আনুনু। শালা, ঝাঁঝরিতে বড় 'ভেকৃটি (ভেকুট) মাছ পড়েছে মনে করে পদ্দানদের ছেলেটা ভেতরে হাত ঢোকাতেই দিয়েছে ছোবল —গেঁড়ি-ভাঙা কেউটে ঢুকেছিল মাছ খাবার জন্যে ঝাঁঝরির মধ্যে। ভাল করে দিয়ে এলুম। 'মনিরাজ' গাছের শিকড় দুধ দিয়ে ফুটিয়ে খাইয়ে দিতেই বিষ নেবে গেল। আর পচাল মন্তর ক্ষ্যাপানো করে হাসিয়ে হাসিয়ে ছুঁড়িগুলোকে একেবারে হিসি করিয়ে ছেড়ে দিয়ে এনু হে মালের পো! আমার নাম হল ঋষি ঠাকুর! হে হে··!'

মাহিন্দ বুড়ো বলে, 'বাবাজী, 'গেঁড়িভাঙা' কেউটে আমাদের ওদিকে বড্ড বেশি। যেখানে মাছ ও শালা সেখানে আছেই। তবে বেশি আহার করেছিল বলে বোধহয় বিষ তেমন জোর ধরেনি।'

হা-হা করে হাসে ঋষি ঠাকুর। মুখে তার দাড়ি গোঁফ। মাথায় সব চুল। এলো গায়ে মোটা পৈতে! পরনে গেরুয়া কাপড়।

মাহিন্দ যন্তর দুখানা জুড়ে তৈরি করে দেয় 'এড়ো', 'চাপনা', 'চাল', 'পাটা' জুড়ে, তাল চোঁচ দিয়ে বেঁধে। সন্ধ্যার পরও বসে থাকে। ছেলেরা তার ফিরবে হাট থেকে এই পথেই। তাদের সঙ্গে যাবে। ততক্ষণ বাবা পঞ্চানন্দের বেদীর চাতালে বসে করতাল বাজিয়ে ঋষি ঠাকুরের সাঙ্গপাঙ্গদের সঙ্গে হরিনাম করতে বসে।

বড় ছেলে লক্ষ্মণ ফিরলে মাহিন্দ উঠে পড়ে সবাইকে প্রণাম জানিয়ে। হ্যারিকেন জ্বালে লক্ষ্মণ। অন্য ভাইরা তার আসে। ছোট ছেলে নন্টু আর মন্টু হিসেব দেয়। দেড়শো টাকার মাল বিক্রি হয়েছে। লক্ষ্মণের আলোতে সবাই গেলেও বুড়ো মাহিন্দ তার সঙ্গে কথা বলে না। তার সঙ্গে বুড়োর 'ফৌজদারী' মামলা। বুড়োর খোয়াড় থেকে মুরগী চুরি করে নিয়ে নাকি লক্ষ্মণ তার দোরগোড়ায় পুঁতে রেখেছিল। কুকুরটা টেনে বার করে ফেলে। মুরগী নিয়ে ঝগড়ার পর এই কাণ্ড করে লক্ষ্মণ। তারপর বাপবেটায় মারামারি। থানা-পুলিস। কোর্ট-কাছারী।

আগামীকাল মামলার দিন আছে। বাপবেটায় তারা যাবে একই নৌকোয়। আজ টাকার যোগাড় হয়েছে দু-পক্ষেরই।

শহরে এসে মাহিন্দ বুড়ো পথ ভুলে যাবার ভয়ে ছেলে যেদিকে যায় তার পিছনে পিছনে সেও যায় সেদিকে। ছেলে হোটেলে ঢুকলে সেও হোটেলে ঢোকে। লক্ষ্মণ বাপকে খাবার দিতে ইঙ্গিত করে। খেয়েদেয়ে সে বেরিয়ে এলে বুড়োকে হোটেলঅলা দামের জন্যে আটকালে বুড়ো দাম দিয়ে দেয়। তারপর বাইরে এসে গাল দেয় : 'শালা হারামি একেবারে তিয়োরের বাচ্চা।'

ধানের নাম লক্ষ্মী

এ বছর চাষের মরসুম ভাল নয়। বর্ষা নামল অনেক দেরিতে। জষ্টিমাসে জল হয়েছিল বেশি। 'তলাপোড়ে' তৈরি করে, ঘাস 'গাসতে' করে ধান বুনে দেওয়া হয়েছিল। সেই 'বীজতলা' বেড়ে গেল জল পেয়ে ফলফলিয়ে। কিন্তু আষাঢ়ে গেল ধুলোট। কড়া রোদ্দুরে ধানচারা জ্বলে যেতে আরম্ভ করল। ফুঁইফুঁই ইলশেগুঁড়ি প্রতিদিনই ঝরতে লাগল। দু-একদিন একটু মুষলধারে হলেও পৃথিবীর মাটি তৃষ্ণার্ত গরুর মতো সে জলটুকু শুষে নিল। শ্রাবণ মাসেও খানা-ডোবা ভরল না এমন কখনো কি হয়েছে? কলিকাল, উল্টে যাচ্ছে হাল! আষাঢ়ের রথ দেখতে যেতে হয় জমিতে প্রথম 'গোছ পুণ্যে' করে। 'কে জানে তোর পাঁজিপুথি, আষাঢ় মাসের সাড়ে সাত দিনে অম্বুবাচি!' অম্বুবাচির দিন পর্যন্ত প্রবাদ আছে যে পিথিমির মাটি সাড়ে সাত হাত নিচে অব্দি ভিজে যাবে। বসুমাতা রসবতী, ঋতুমতী হবে। কিন্তু সে আধুনিকা শুঁটকিনীদের মতো দুর্ভাগ্যের আকাশে তাকিয়ে রইল। তার চুলে পাক ধরল—ভেতরের আগুনের তাপে বুকের অহঙ্কারের পাহাড় ধসে পড়ল। বুড়ো বরের সঙ্গে তার বিয়ে হল অদিনে। সন্তান হবে কেমন করে? পাকা বুড়ো 'বীজতলা' শ্রাবণের শেষ সপ্তার অঢেল জলে থই পেলেও তার দেহ জ্বলে গেছে—সেই তলা রোয় হচ্ছে 'বোডানী' দিয়ে 'কাদা' করে। ম্যাট্রিক পাস শিক্ষিত চাষী সুরেশ ভোঁড় যে নিরাশ করে দেয় তার কথায়! সে বলে, 'ভাদ্দর মাস পড়ে গেল, তাড়াতাড়ি চাষ গুটোতে হবে। হালজনের এখন দারুণ চাহিদা। কিন্তু চাষ করলে কি হবে, ধান ভাল হবে না, তলা তো বুড়ো হয়ে পেকে গেছে। বকেও ঘেঁটে ফেলেছে। তলাবাড়িতে যেয়ে দেখ, ভেতরে ফাঁকা। মাল যে ঠাস হয়ে উলুঘাসের মতন আছে মনে হচ্ছে ঐ দূর থেকে—ভেতরে শূন্য। সব জ্বলে পুড়ে গেছে। আমি যদি দু-হাজার টাকার টান কিনে রাখি এখন, সেই ধান আগামী সনে বেচলে আরো বেশি লাভ পাব। দু-হাজার খরচা করলে ঐ টাকা চাষ থেকে উঠবে না।'

লক্ষ্মণ বাগ খলিফা লোক। পাঁচটা বিচারে বসে। কথায় তার হীরের ধার। সে বলে: 'মা জানে বাপ, মন জানে পাপ'! তুমি তো ভোঁড়ের পো মনকে ফাঁকি দিয়ে কথা বলছ। তাহলে চাষ করছ কেন? এই তো বাপু

হাল লাঙল করে, পায়ে 'হাজা' খাইয়ে, ডাঁশের কামর, জোঁকের শোষণ, কাদা-জল-ঘাম ভেঙে জমি থেকে উঠে এসে চা দোকানের মোড়ে গামছার খুঁটে মুড়ি বেঁধে নিয়ে এসে বসেছ জনেদের দামকড়ি দেবে বলে লোভ দেখিয়ে—এসব কেন? না, চায তুলতেই হবে এক সপ্তার মধ্যে। জনেরা আবার অন্য চাষীর কাছ থেকে আগাম টাকা লুকিয়ে গায়ে নিয়ে না কাল ভোরবেলাতেই সটকে পড়ে—তাই। আরে বাবা চাষা কখনো আশা ছাড়তে পারে? অন্য বছর যখন 'টক পান্না' খেয়েও ভাদ্দর মাসের শেষে রোয়া শেষ করো তখন বসুমাতা ফসল দেয় কি করে? যার কাজ সে করবে, তোমরা অসময়ে 'উদ্-গবনো' হও কেবল।'

সারাদিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর পাকা রাস্তার মোড়ের চা দোকানগুলোতে আড্ডা দেয় চাষীবাসীরা। দোকানে রেডিও বাজে। কেউ কেউ খবরের কাগজ দেখে। গাঁজা বিড়ি খায়। গরান ছালের গুঁড়ো মেশানো 'সোমরস' পান করে। (লক্ষ্মণ বাগের ভাষায়: 'ঘোড়ার পেচ্ছাব'কে আধুনিক ভাষায় 'চা' বলে!) জনেরা আড়াই টাকা হিসেবে রোজের দাম নেয় চাষাদের কাছ থেকে। আট টাকা হাল। যার হাল-লাঙল নেই অথচ জমি আছে তাদের হালের জন্যে প্রতিদিন দুবেলা ধর্না দিতে যেতে হয় এক হাঁটু কাদা ভেঙে। 'কি হবে দাদা, কালকে দেড়খানা হাল দিতেই হবে। টাকা দিয়ে যাচ্ছি।'

হেলো হয়তো বললে, 'ধরম বাপ বললেও হবে না, গরু 'আলা' মেরে যাচ্ছে, কাল সেই সেখেদের দেবো, বিকেলের হাল পাবে না। শালা, নিজেরই জমি পড়ে রয়েছে, সেই কথায় বলে না 'ঘরামির ঘর ফাঁকা'—সেই দশা আমার।'

সকালে এক দুপুর হাল চললে 'একখানা' হাল। বিকেলে চললে 'আধখানা'। একখানা হালে আট টাকা আবার বিকেলে চার টাকা। কিন্তু চাষীর লাভ বিকেলের আধখানা হালে। তা দিতে চায় না হেলো। নিজেরটাই চাষ করে। যার গাড়ি গরু আছে কণ্ট্রোলের বা মুদিখানার, মাল আনা বাদে বাকি দিনগুলো হাল লাঙল করে দিনে বারো টাকা রোজগার করে নাও চুটিয়ে। ক-দিনের বা উপায়?

লক্ষ্মণ বাগ বলে: 'রাঁঢ়ের 'যৈবন' দাদা, যে কদিন আছে ভাল করে বেচে নাও!'

শ্রাবণের শেষের রোয়া ধানে 'নিড়েন' পড়বে ভাদ্রের শেষে। ভাদ্দরে গরমে জমিতে জল বেশি না থাকলে 'রোষণা', 'ঝাঁজ', 'ভটকা', শ্যাওলা হবে। মাটি শক্ত পিঁড়ে হয়ে যাবে। নিড়েন দিয়ে 'রোষণা', 'চেঁচকো', 'পাতি', 'ওকড়া', 'কালেয়া', 'কানছিঁড়ে', 'কুল্‌পো' ঘাস টেনে উপড়ে ধানগাছের গোড়া পরিষ্কার করে মাড়িয়ে মাটি চটকে দিলে আশ্বিনের অবিরল হালকা বর্ষণে ধানগাছ মেঘের মতো ঘনশ্যাম হয়ে উঠবে। আশ্বিনের শেষে ধান গাছের বুক ফেড়ে 'থোড়' আসবে। মোটা ধান ফুলবে কার্তিকের প্রথমে।

ধান ফুলবার মুখে যদি মাটিতে জল না থাকে—সাধারণত থাকেই—এবং আকাশের জল না পায় তবে শিশিরেও অনেকখানি কাজ দেয়। তবে সেসব ধানে অনেক 'চিটে' হবে। অপরিপক্ব হবে ধান।

কার্তিকের ঝড়কে সব চাইতে ভয় বেশি। কাঁচা ফসলের ভারে আমন ধানের হাত-দুই-আড়াই গাছ যদি সটান লম্বা হয়ে জলের ওপর শুয়ে পড়ে তাহলে 'ভরা দিনমাসে পোয়াতি মেয়ের জলে ঝাঁপ দেওয়ার মতন অবস্থা হবে'। পচে 'ডাল-ভরতা' হয়ে যাবে সমস্ত ধান এবং গাছও।

কার্তিক কাটলে আর ভয় নেই। আর একটা কথা আছে, 'পাকা ধানে মই'। এর অর্থ, হওয়া জিনিস নষ্ট করা। গরু মই টেনে গেলে পাকা ধান ঝরে যাবার ভয়, এ ছাড়া জমিতে জল না থাকলে পাকা ধান শুলেও ভয় নেই। 'নাবাল' বা 'ডহর' জমির জল নামতে সেই পৌষ মাস। ডহর জমির ধান কাটতে হয় বড় বড় 'নাড়া' রেখে; তার উপর ধানের 'বিচুলি' রাখতে হয় গুণের চিহ্নের মতন এদিক ওদিক করে।

সরু ধান অগ্রহায়ণের প্রথমেই কাটা যায়। যেমন দাদখানি, চামরমণি, বাঁকতুলসী, রূপশাল, কলমকাটি ইত্যাদি।

মাঝারি ধান কাটা হয় অগ্রহায়ণের শেষে। পাটনাই, ছিলেট, কলমা, দুধকলম, আঙুরশাল, কনকচূড়া, নোনাগাজি।

পৌষে কাটা হয় মুড়ির ধান। মোটা। পান-কলস, সূর্যমুখী, হোগলা, হামাই, কলামোচা ইত্যাদি।

আমন ধান পাকে শীতকালে। জাড়ে ভোরবেলা কাস্তে নিয়ে শিশিরে ভিজে পায়ের হাড় কনকন করে। দু-মুঠোয় এক 'হালা'। দু-হালায় এক আঁটি। আঁটিগুলো পর পর 'পাই'য়ে গুছিয়ে ফেলে রাখতে হয়। প্যাচপ্যাচ শব্দে কাস্তে চলে। খেসারি কলাইগাছ কেটে আসে মুঠো ভরে। ধান

কাটতে না জানলে 'বারহালা' কাটলে 'কড়ে' আঙুল ধারালো কাস্তের বাদ চলে যাবে।

দিন আষ্টেক পরে নল শুকোলে ধান 'এঁটো'তে অর্থাৎ আঁটি বাঁধতে অথবা 'গলটা'তে হবে। এক গোছা শুকনো ধানগাছ তুলে নিয়ে বিশেষ প্রণালীতে দুহাতে ধরে পাক মেরে খুঁসে দিয়ে 'নেউলী' ধরে পড়পড় করে টান মেরে এঁটে দাও। প্রথম প্রথম নখের কোণ ছিঁড়ে যাবে খড়ের ঘষা লেগে লেগে। রক্ত বার হবে।

বিকেলে ছ-আঁটিতে 'গজ' দিয়ে 'তানা' দড়িতে রথের মতো বোঝা সাজিয়ে মাথায় তুলে নিয়ে এসে খামারে ফেলো। ধান বওয়া হলে 'কাঁড়ি' বা 'গাদা' দিয়ে দিতে হবে সন্ধ্যার পর। এর কোনো বাড়তি রোজ নেই।

তারপর মাঘ-ফাল্গুনে ধান ঝাড়ার পালা। 'পাটা' বা বাঁশের 'আগড়ে' দুটো করে আঁটি একসঙ্গে ধরে মাথার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে আছড়ে ধানের আঁটি থেকে ধান ঝেড়ে কুলোর হাওয়া দিয়ে 'ধান সেরে' বস্তায় বা পালি করে গোলায় তুলে দাও। ভাগচাষের ধান হলে আধাআধি ধান খড় বখরা করে দাও। ভাগচাষের জমি অবশ্য এখন আবাদকারীরাই দখল করে নিয়েছে। দু-একজন ভাগচাষা যা আছে তারা অত্যন্ত বিশ্বাসী—তবু আগাম টাকায় জমি আবাদ করছে বলে মাত্র এক বছরের জন্য কবুলিয়তী লেখা হয়। কেননা তিন সাল পর পর একই জমি চাষ করলে খাসদখল হয়ে যায় ভাগচাষীর।

এরপর ধান থেকে চাল তৈরি করার পালা। কড়ায় জল দিয়ে ধান ঢেলে উনুনে জ্বাল দিয়ে দিয়ে ভেপে উঠলে ধান ঢেলে দিতে হয় মাটির তৈরি 'ম্যাচলা'য়। তাতে জল ভরে দিতে হয়। পরদিন 'ভাপানো' ধান 'সিদ্ধ' করতে হয়। ধান ফেটে ভাত বেরিয়ে পড়লে তবে উঠোনের রোদে ঢেলে, মেলে দিয়ে শুকিয়ে নিতে হবে। পাড়ার কোনো মেয়ে ধান 'চাখতে' জানলে গোটা চারেক ধান নিয়ে যেয়ে মাটিতে রগড়ে চাল বার করে দাঁতে ফেলে চিবিয়ে তাক করে দেখো। 'চিঁড়ে-বেতে' হলে আর একপিঠ রোদ পাইয়ে তুলে নাও। বেশিক্ষণ রাখলে সব চাল কেটে যাবে! ভাত না খেয়ে খেতে হবে তাহলে খুদের জাউ!

চাষীবাড়ির ছেলেরা আজ লেখাপড়া শিখেছে। জুতো পরতে শিখেছে। গায়ে এখন তাদের 'সাপের খোলসের' মতো কাপড়ের ষাট-সত্তর টাকার জামা আর টেরিকটের প্যান্ট। বগলে রোমান্টিক প্রচ্ছদের নভেল।

লক্ষ্মণ বাগ তাদের রাজনৈতিক বচসা, আর উপন্যাস সিনেমার গল্পে বিরক্ত হয়। বলে 'বাবারা, বড় বড বই তো পড়ছ সব, জ্ঞানলাভ কিছু হচ্ছে? আচ্ছা, কতরকম ধানের নাম তোমরা জানো বলো দিকিনি। তোমরা তো চাষীর বাড়ির ছেলে। তোমরা তো ধানগাছের তক্তায় শুয়ে বোতলের দুধ টেনে মানুষ হয়ে বোতল-বিলাসী হওনি—বলো দেখি বাছাধনরা!'

দু চারটি ছেলে ধানের নাম বললে কয়েকটি। লক্ষ্মণ বাগ নীরবে হাসতে হাসতে আঙুলের গাঁট গুনতে লাগল। বললে, 'দশটা হল। কিন্তু শোনো, আমি একশো দশটার নাম বলছি—লিখে নাও, আমন ধানের নাম কতরকম আছে আমাদের দেশে।'

যে সব ধানের ভাত, পিঠে, পায়েস, পোলাও, চিঁড়ে, খই হয়:

'বাসকামিনী, বাসমতী, গোলাপসরু, বাদশাভোগ, গোবিন্দতুলসী, পর্বতজিরে, মাগুরডিমে, কর্পূরশাল, পেশোয়ারী দেরাদুন, কনকচূড়া।'

ভাত, চিঁড়ে, খই হয়:

কাটারীভোগ, কমলভোগ, দুর্গাভোগ, গোপালভোগ, কিশোরীভোগ, বাঁকতুলসী, চামরমণি, সীতাশাল, রূপশাল, ঝিঙেশাল, রাজঝিঙেশাল, কৈউটেশাল, সাবানশাল, কুমড়োশাল, কলমিশাল, মরিচশাল, আঙুরশাল বা নাজানি, অর্জুনশাল, কালাশাল, লাঠিশাল, পালকশাল (একটি ধানের মধ্যে দুটি চাল হয় এই ধানে), এড়াশাল, জিরেশাল, ছিলেট, কোটে ছিলেট, কার্তিকে ছিলেট, ট্যাংরা ছিলেট, ভুঁড়ো ছিলেট, রাশিময়ূরলতা, ময়ূরপঙ্খী, মউলতা, মউলো, কলমকাটি, ঝাঁটিকমল, দুধকমল, দুধেশ্বর, দুধসাগর, বালাম, মুগিবালাম, শশীবালাম, হররকুলি, ধোবোলুচি, জামাইনাড়ু, লক্ষ্মীকাজল, আকাশ পালি, বন-কামিনী, বনরাঙি, মোষেরাঙি, কার্তিকেরাঙি, চেঙোরাঙি, চিত্তরাঙি, মতিচূড়, ভজনা, কাঁচ, পয়াবালি, রাজসাহেব, ধলে, গাঁদি, পাটনাই, ধুলোগোড়, কুমড়োগোড বা কোটে ছড়ো, নোনাগাজি, নোনাবোগড়া, আগুনবান, হরিমতী, বাগদি সাবান, রাশফুলি, চন্দ্রফুলি।'

মুড়ির ধান হল এই সব:

'হামাই, হোগলা, পানবটি, পানকলস, ভাসাকলম, ভাসামানিক, বাছাকলম, কলামোচা বা দো-রাঙি, রাবণ, ঘোটাব্যানা, পোলবিড়ে, গেঁড়িমুটি, রামকানাই, পাতাবাহার, বাঁশকাঠ, কালিন্দী, সাদামোটা, কালাহেঁড়ে, সোমরা, মালাপতি।'

'জলী' আর 'ঝাঁঝি' ধান হল আউষ।'

বিদেশী আধুনিক ধান হল :

'বারোশো একাশী (মাসিপিসি), আই আর এইট (সোহাগী), তাইচুঙ (বামনঝাঁটি), তাইনান (বিদেশিনী)। এসব বাংলা নাম আমি দিয়েছি। তারপর নতুন এসেছে পদ্মা, জয়া।'

লক্ষ্মণ বাগ বলে যায় : 'মাছের নাম, গাছের নাম, মানুষের নাম, ধানের নামের শেষ নেই। 'লক্ষ্মীচরিত্র' পড়েছ ? পড়ে দেখো, তাতে ১০।৮০টা ধানেব নাম বোধহয় আছে। 'যার গোলাভরা ধান, তার কথায় আছে টান।' এম-এ পাস করেছ, করো না, হাল-লাঙল ছাডবে কেন ? ধান চিনতে কি কলকাতার যাদুঘরে যেতে হবে ? সেখানে বহুকালের বিবর্ণ ধান আছে চারটি চারটি করে। বাংলা দেশ ধানের দেশ, ধানের আলাদা কোনো বিজ্ঞানভবন অথবা মিউজিয়ম আছে কি ? সভ্যজাতির জন্যে এসব চাই ই। কৃষি ব্যাপারে লেখাপড়া শেখার জন্যে বিদেশে যাই আমরা কিন্তু আমাদের বাপ-ঠাকুরদাদারা কি কি ধানের চাষ করে তার ভাত খাইয়ে আমাদের মানুষ করেছে তার খোঁজ রাখি না। 'দেড় মণ ধানে এক মণ চাল, বাকি আধ মণ ভুঁষিমাল'। গেঁড়া, চ্যাপটা, মোটা, সরু, খুদে খুদে—লাল, কালো, সাদা—কত রকমের ধান আছে। 'ধান ভানতে শিবের গীত' গাইলে তো হবে না।'

লক্ষ্মণ বাগ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। চোখ দুটো তাব ধকধক করে, যেন বুদ্ধির দীপ্তিতে জ্বলে। তেষট্টি বছরের ঝড়-বাদলে হাড়পাকানো মানুষ। তাকে সবাই শ্রদ্ধা করে। চা খাওয়ায়। বিড়ি দেয়। চাষবাস, মামলা-মোকদ্দমা, রোগশোক, পুজো-পার্বণ সব ব্যাপাবে গ্রামের মানুষরা তার কাছে যুক্তি নেয়—সলাপরামর্শ করে। বিচারে বসে লক্ষ্মণ বাগ 'হয়কে নয়' করে দিতে পারে তার তর্কের জোরে—জেরার ধমকে। তার রাশিটা নাকি সিংহের।

লক্ষ্মণ বাগ বলতে থাকে : 'ধর্ম, আইন, সাহিত্য, রাজনীতি, ইতিহাস যাই বলো—এদেশে অবাস্তবের এসব আঁস্তাকুড়। আবার ঢেলে বাছাই করতে হবে। মাঝে মাঝে মহাপুরুষেরা আসেন বাছাই করে দিয়ে যান—আবার অনেককাল গেলে সব গুলিয়ে যায়। সবাই সমান হয়ে যায়! বাজারে যাও না, সরু বাঁকতুলসী চাল দু'টাকা, মোটা ভাসাকলম চাল এক টাকা বারো

আনা কেজি। কেন তফাত কেন? 'বিপ্লব' করতে হয় তো করো নিজের সঙ্গে, মাটির সঙ্গে, মনের সঙ্গে, মানের সঙ্গে, ধানের সঙ্গে। নইলে ব্যর্থ হবে গানের পশরা! ও দাদা, আজ তুমি কি ধানের চালের ভাত খেয়েছ দুপুরে? ফালতু 'অসাধারণ' উপন্যাস পড়বে আর দিনগত পাপক্ষয় করবে—বাংলা দেশটার আপদ তো তোমরাই হে! তার চাইতে রাত অনেক হল, পথ হাতড়ে হাতড়ে চলো ভূতের মতন ঘরে যাই—যেয়ে মার্কিন গমের গরুর চামড়ার মতন রুটি ছিঁড়ি গে চলো।' তরজার সুরে হাতের তালুতে চপেটাঘাত করে গান জুড়ে দেয় লক্ষ্মণ বাগ:

> গোলাভরা ধান গোয়ালভরা গরু পুকুরভরা মাছ
> তোর কোথায় গেল ওরে বাঙালী!
> তোর ধর্ম গেল কর্ম গেল সব তো খোয়ালি!
> রাজনীতির শিকার হয়ে হলি কাঙালী!

সাগরদ্বীপের মহাজন

'দরিয়ার পাঁচপীর বদর বদর!'

বিকেলে হুগলী নদীতে ভাঁটা পড়তেই সাতখানা বহর নৌকোর পাল তুলে দিলে মাঝিমাল্লারা শ্যামগঞ্জের গরানকাঠের মহাজনের আড়ত থেকে। তিরিশজন লোকের মা-বোন-বউ-মেয়েরা চোখের জল মুছতে মুছতে তাকিয়ে রইল যতক্ষণ না নৌকোগুলো নলদাঁড়ির বাঁকের আড়ালে চলে যায়।

'সেদো' অর্জুন কয়াল সুন্দরবন অঞ্চলের লোক। পাথর-কোঁদা নিরেট চেহারা তার। গুলি-ভাঁটা করঞ্জ চোখ। তিনদিন আগে সে এসেছে বহর নিয়ে যেতে। সাগরদ্বীপ আর জঙ্গলের সে হল 'গাইড'। তার বাপ, ঠাকুর্দা, ঠাকুর্দার বাপ অর্থাৎ 'পরদাদা' সবাই বাঘের সঙ্গে লড়াই দিয়ে, জঙ্গল আবাদ করে, গরাণকাঠের মহাজনদের 'সেদো'গিরী করে অথবা বারদরিয়ায় শুকুটি-মারা মাঝিদের সরদারী করে 'ইন্তেকাল' করেছে। 'পরদাদা' ছিল মস্ত ডাকাত, খুনী আসামী। যাবজ্জীবন তার জেল হয়েছিল ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে। খালাসের লোভ দেখিয়ে সরকার তাকে সুন্দরবন আবাদের জন্যে পাঠিয়ে দেয়।

এমনি আরো অনেককে দিত। কেউ কি এমনি প্রাণের মায়া ছেড়ে বাঘের হাতে 'জান' দিতে আসে! জেল-খালাসীরা তাদের রক্তের গরম কাটাত বাঘের সঙ্গে মিতালী করে! সুন্দরবন কি এমনি আবাদ হয়েছে? সুন্দরবনের আদিবাসীদের রক্তে কি বন্য দুর্ধর্ষতা এসেছে এমনি-এমনি? অর্জুন কয়াল বলে, 'ডাকাত, খুনী আসামীদের বংশ যে আমরা। জঙ্গল আমাদের মা। তাকে বন্দনা করে বশ করি। আমার বাপ সেদো আহির কয়াল জঙ্গল-বন্দনা করে য্যাখন জঙ্গলে নাবতো বাঘ এসে তার পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে বসতো পোষা বেড়ালের পানা!'

অর্জুন কয়ালের কথা শোনে সকলে। গরাণকাঠের মহাজন তোরাব বফাদান মিট্‌মিট করে হাসে নৌকোর 'টোঙে'র ভিতরে তাকিয়া ঠেস দিয়ে গদিতে বসে। হাতে সিগারেট। পাশে তার ক্যাশ-বাক্স। অল-ওয়েভ রেডিও সেট। দু-নলা বন্দুক। এক বাক্স কার্তুজ। পাঁচ সেলের ফ্ল্যাশ লাইট। কতকগুলি ড্রাই ব্যাটারি! ওপাশে রাঁধুনী লালু খানসামার আঁচ, দেগ্‌হাঁড়ি, চাল ডাল আটা মশলা, কয়লা, তেঁতুলের ভাঁড়, নৌকোর খোলে বসানো মিঠে জলের দুটো জালা। বালতি, করাত, কাটারী কত কি!

এক ভাঁটায় রায়পুর, গদাখালি, নলদাঁড়ি, কাঁটাখালি, বুড়ুল, ফলতা, নূরপুর হয়ে ডায়মণ্ডহারবার। তারপর জোয়ার উঠলে নঙ্গর করে থেকে রান্না-খাওয়া সেরে নিতে হয়। ছ'ঘণ্টা জোয়ার, ছ'ঘণ্টা ভাঁটা। কিন্তু জোয়ার চার ঘণ্টা ওঠার পর যখন স্থির জোয়ার আরম্ভ হয় জেলে-মাঝি-মাল্লারা তাকে বলে 'সরানি জোয়ার'। সময় সংক্ষেপ করার জন্য সরানি জোয়ারেই দাঁড় টানতে শুরু করে দেয় সকলে। জোয়ার নামার মুখেই আবার পাল তুলে দাও। প্রতিকূল বাতাস থাকলে দাঁড় টানতে হবে। ভরা ভাঁটার টান নামলে তীরের বেগে ছুটিয়ে নিয়ে যাবে নৌকো। সাগর যেন টেনে নিয়ে চলেছে তাদের। দ্বিতীয় ভাঁটায় ভোরের দিকে এসে বহরকে আবার নঙ্গর করাতে হল কাকদ্বীপে। তারপরের ভাঁটায় বড়তলা নদী দিয়ে নামখানা হয়ে একেবারে ফ্রেজারগঞ্জ।

সেদো মহাজন সবাই নেমে যায় বাজারে। যার যা দরকার নিয়ে নেয়। মিঠে জল ফুরোলে টিউবওয়েলের জল নিতে হবে জালা ভরে। নুন তেল মরিচ-মশলা পানসুপুরি চুন যা যা দরকার সব নিয়ে নাও। পরে আর পাবে না।

সেদো রায় দক্ষিণা রায়ের পূজো দেয়। বদরগাজি আর ঘোড়ামারা

দ্বীপের বাবা মসলন্দরি পীরের মানত সোধে। জলপুলিসের দপ্তরে যেতে হয় মহাজন তোরাব রফাদানকে। ফরেস্ট অফিসারের ছাড়পত্র দেখাতে হয়। বন্দুকের লাইসেন্স দেখাতে হয়। সবাই চেনাজানা লোক। তোরাবকে সবাই সম্মান করে। মহাজনও কয়েক প্যাকেট সিগারেট খরচ করে তাদের পিছনে। তারা বলে, 'সংরক্ষিত এলাকার গাছ কাটবেন না, পশুপাখি মারবেন না। যাবার সময় মধু, হরিণের মাংস, মাছ, কচ্ছপের ডিম দিয়ে যাবেন। কতজন লোক যাচ্ছে আপনার? কি কি নাম- ঠিকানা? তিরিশ জন? ছ-খানা গাদা বোট? একখানা পানশি নৌকো? দেড় হাজার মণ করে মাল ধরে এক-একখানা গাদা বোটে? দেখবেন তোরাব সাহেব, গতবারের মতন এবারেও যেন জনাদুয়েক লোক খুইয়ে আসবেন না। এ বছরও বাঘের দৌরাত্ম্য বড্ড বেশি। কোন্ দ্বীপে আপনারা গরাণ কাটবেন? গোসাবা নদী আর হরিণ-ভাঙ্গা নদীর মাঝের দ্বীপটাতে তো? আচ্ছা আমরা লঞ্চ নিয়ে একদিন রাত্রে যাব। হরিণ খাওয়াবেন তো?'

তোরাব রফাদান হাসে দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে। অনেক টাকার লোক সে। দোতলা পাকাবাড়ি। নিজের, স্ত্রীর, ছেলেমেয়েদের নামে করে দুশো বিঘে জমি, দুখানা বন্দুক, হগ্ মার্কেটে একখানা পারফিউমারি দোকান, সেখানে থাকে বি-এ ফেল-করা বড় ছেলে, মেজো ছেলে য়ুনিভারসিটিতে পড়ে, দুটো মেয়ে পড়ে কলেজে, ধানচাল কাঠের আড়ত, হাসকিং মেশিন চলে দু-খানা। কয়েক লাখ টাকার মালিক সে। তাকে চেনে সরকারের বড় বড় অফিসাররা, থানার দারোগা পুলিসরা, এমন কি মন্ত্রীরা পর্যন্ত। আজ অর্থ প্রতিপত্তি হলেও যে গরাণ ব্যবসায় তার উন্নতি—বাপকেলে একটা টিনের ঘর আর একখানা নৌকো পেয়েছিল মাত্র সে—সেই কঠিন দুঃসাধ্য ব্যবসা সে ছাড়েনি। জঙ্গলে প্রতি বছর সে দু'বার করে যাচ্ছে আজ বিশ বছর হল। এর মধ্যে বাঘের হাতে, নোনাজলের ভেদবমিতে, সাপে কেটে আর কুমীরের মুখে প্রাণ হারিয়েছে তার বহরের জনপঁচিশেক মানুষ। তবু মন নরম, হৃদয় দুর্বল, শরীর কাহিল হয়নি তোরাব রফাদানের। সাগর পাড়ি আর জঙ্গল-বিলাস যেন তার এক রকমের নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বহু শার্দুলকে সে মেরেছে গুলি করে। ভয়ঙ্কর চরিত্রের 'সেদো' আর 'বাউলী', মাঝি-মাল্লারা তাকে ভয় করে। শ্রদ্ধা করে। তোরাব মিয়া কথা বলে কম। টাকা পয়সাওলা ভারী লোকেরা যেমন গম্ভীর প্রকৃতির হয়।

ফ্রেজারগঞ্জ থেকে এবার জোয়ার ভাঁটা না মেনেই বহর ছাড়তে হয়। তীরের কোল বেয়ে বহর চলে। সমুদ্রের ভীম গর্জনে নৌকোগুলো মোচার খোলার মতন দুলতে থাকে। আকাশে চৈত্র-শেষের কালো মেঘের চূড়ো ভাসতে ভাসতে এগিয়ে আসছে। তিরিশজন মানুষ সাগরের বৃহৎ পটভূমিকায় নিজেদের অস্তিত্বকে ক্ষুদ্র ধূলিকণার মতোই মনে করে। বিশাল প্রকৃতির কাছে তারা কত অসহায়!

রাত পেরোলেই সাল বদল। বৈশাখের প্রথম দিনে বহর পুবদিকে সপ্তমুখী, ঠাকুরান, মাতলা, ডাঙাডুনি, গোসাবা নদী পার হয়ে এসে গোনা নদীর মুখে ঢুকে নিবিড় জঙ্গলভরা দ্বীপের মধ্যে চলে এল। এই দ্বীপের পুবে হরিণভাঙ্গা নদী। তারপরে খুলনা জেলা, পূর্ব পাকিস্তানের সীমানা। ঠাকুরান নদী আর মাতলা নদী সবচেয়ে চওড়া। দুইয়ের মাঝে ছোট ছোট দ্বীপ। সবুজ অরণ্যানী। মাতলার তীরে বাসন্তী, ক্যানিং পোর্ট। বালিগঞ্জ থেকে সোনারপুর হয়ে ক্যানিং পর্যন্ত রেল লাইন আছে। মাতলার আর এক শাখা বিদ্যাধরী নদী। হরিণভাঙ্গার শাখানদী রাইকমল আর কালিন্দী।

২৪ পরগণার বড় ম্যাপ খুলে মহাজন সবাইকে দেখায় তাদের অবস্থানস্থলটা। কম্পাসের কাঁটার দিকে লক্ষ্য রাখে।

সন্ধ্যার মুখে জঙ্গলের মধ্যে নদীর বাঁকে বহর নৌকোগুলো নঙর করে। সরু নদী। জোয়ারের বেগ তবু প্রচণ্ড। কেবলই একটানা ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। ঢেউ আছাড় খাচ্ছে নৌকোর গায়ে।

পান-পায়রা, বাদুড়, শামুক-খোল, মানিকজোড়, জলডাহুক উড়ে চলে জঙ্গলের মাথার ওপর দিয়ে সন্ধ্যা সমাগত দেখে। পাখির ডাকে মাত হয়ে আছে জঙ্গল। কালবৈশাখীর ঝড় ওঠার পর বৃষ্টি এল ঝমঝমিয়ে। সবুজ অরণ্য ক্রমে ছায়াছন্ন হতে হতে অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। তীরে শুয়ে পড়ে আছে অসংখ্য ছোট বড় কুমীর। দীর্ঘ করাতে সাপ বেয়ে চলেছে জলের ওপর দিয়ে।

ঝড় জল থেমে যায় একটু পরেই। গাঢ় অন্ধকার। নতুন লোকেরা ভয় পেয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে বু-বু করে কাঁপতে থাকে। যদি কুমীর কিম্বা সাপ নৌকোর গলুই বেয়ে উঠে আসে?

টিমটিম করে আলো জ্বলছে নৌকোয়। ক্রমাগত ঢেউয়ের গর্জন।

বৈশাখের মাঝরাতেও কাঁথা-কম্বল মুড়ি দিতে হয়। গরানকাঠের মহাজন তোরাব রফাদান দু-নলা বন্দুকে টোটা ভরে নিয়ে পাশে রেখে খাতা লিখছে। রেডিওতে বাগদাদ সেণ্টারের সুললিত কণ্ঠের পবিত্র কোরআন পাঠ হচ্ছে এক গাম্ভীর্যপূর্ণ আবেগে। ধারালো তলোয়ার, বল্লম, সড়কি, চৌকি, টাঙি, কাটারীগুলো ঘুমন্ত মানুষজনদের পাশে পাশে রয়েছে। ছ-খানা বোটের তিরিশজন মানুষ মহাজনের বন্দুক আর বীরত্বের ওপর ভরসা রেখে প্রাণ হাতে করে ঘুমোচ্ছে। চার-পাঁচদিনের পরিশ্রমের ক্লান্তিতে সবাই অবসন্ন। এই গভীর রাতের সুষুপ্তিতে বহু বছরের সুদক্ষ অভিজ্ঞ মহাজন তোরাব রফাদানের চোখ দুটোতে যদি ঘুমের ঘোর লাগে তাহলে সকালে খাতায় হাজিরির সময় দেখা যাবে একজন লোক কম পড়েছে!

সেদো অর্জুন কয়াল বলে, 'জানিস তোরাব, শালারা সবাই জেগে আছে। শের আলিটা 'নিদ' যাচ্ছে গাল হাঁ করে! বেচারা! ওর মা কী 'কান্‌তেছ্যালো' বল্‌! ষোল বচ্ছরের 'চিগনে' ছোঁড়া। ওর বাপজীকে গত সনে বাঘে লিয়ে গেল! তবু ছেলেটা 'কেলানতি'তে চিতিয়ে পড়েছে! অ্যার নাম 'প্যাটের' দায়।'

অর্জুন কয়াল সবাইকে 'তুই' বলে। সুন্দরবনের মানুষরা তাই বলে। জাতে অর্জুন মুসলমান।

পাঁচ সেলের ফ্ল্যাশলাইট মারে রফাদান। জঙ্গলে জড়াজড়ি নিবিড় গাছ-পালা। মোটা মোটা লতা। ফণীমনসা, হেঁতাল, হরকোচ, তেকাঁটাল, বনঝামা, নখাশিরে, মনসা, বাজবরণ, পানশিউলী, জলডুমুর, ম্যাড়ামারা, সেঁয়াকুল, বঁইচির কাঁটাভরা ঝোপঝাড়। আলো দেখে ভয় পেয়ে গরুর কানের মতো নরম নধর সাদা খরগোশগুলো তুড়ুক তুড়ুক করে ছুটে পালায়। বিভ্রান্ত হয়ে কেউ-বা জলের মুখে এসে পড়ে! মুখে আড়-ট্যাংরার যন্ত্রণা নিয়ে কুমীর তার লেজ সাপটায় বেলাভূমির ভিজে বালিমাটিতে।

সুন্দরবনের মধ্যরাত্রির শব্দ বড় ভয়ঙ্কর! ঢেউ আছড়ানির শব্দ, জঙ্গল-জোড়া গভীর তানের ঝিঁঝিঁর ডাক, মাঝে মাঝে বনমোরগের চিৎকার, শিয়াল-খট্টাশের ডাক, পাখিদের কলকাকলি, হনুমান-বাঁদরের চিৎকার, বাঘের গর্জন, গোসাপের ফটফট শব্দ এবং কোনো আক্রান্ত পশুর ভয়ঙ্কর আর্তচিৎকার—সব মিলিয়ে ভয়াবহ, রোমহর্ষক! জঙ্গলের ঘাস-লতা-গাছ-জীবজন্তু-পোকামাকড়, সাপ-কুমীর-মাটি-কাদা-শিকড়-কাঁটা-জল-মাছ-আকাশ-

মেঘ-তারা-জোয়ারভাঁটা-খাঁড়ি-অসুখ-বিসুখ-ঠাণ্ডা-গরম—সমস্ত কিছুর নিখুঁত বর্ণনা দেওয়া দুঃসাধ্য। এর জন্য কয়েক বছরের পরিশ্রম প্রয়োজন। আর পরিসর চাই মহাভারতের চাইতেও বেশি। সে অলিখিত মহাকাব্যের জনক একমাত্র বিধাতা, যিনি সৃষ্টি করে রেখেছেন সুন্দরবনকে সুন্দর আর ভয়ঙ্কর করে। সেই ভয়ঙ্কর সুন্দরকে উপভোগ করবার সাধ্য কী ক্ষুদ্র মানুষের অনুভূতি দিয়ে! বিশ বছরের অভিজ্ঞতায় তোরাব মহাজনই বা তার কতটুকু জানে! তার কাছেও তো সেই অনাদি অরণ্য আজো তেমনি চিরনূতন। চিরদুরন্ত দুর্দম!···

হঠাৎ কাছেই বাঘের গর্জন শোনা গেলে সবাই উঠে বসে। অস্ত্রপাতি হাতে নিয়ে তৈরি থাকে। মহাজন বন্দুক ধরে ফ্ল্যাশলাইট ফেলে। সেদো ক্যানাস্তারা পিটতে বলে। অর্জুন কয়াল গালের মধ্যে পেট্রল ভরে নিয়ে হপ্কা আতসবাজির মতো রক্তাক্ত আগুন ছেড়ে দেয় বারকতক।

আলো বা আগুন দেখে বাঘ ভয় পায়। আর গর্জন শোনা যায় না। ফাঁকা দুটো বন্দুকের আওয়াজ করে মহাজন। তার চোখ চারদিকে ঘুরে বেড়ায় তীরভূমি ধরে। সুন্দরবনের বাঘ অত্যন্ত ঘড়েল। ধীরস্থির তার গতি। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই কোথায় কোন্ গোলপাতা, শরখড়ি আর হাগ্লা, হেঁতালের জঙ্গলের মধ্যে ছুটি মেরে লুকিয়ে পড়ে, কারো সাধ্য নেই যে খুঁজে বার করে। নৌকোয় সবাই ঘুমিয়েছে বুঝলে আস্তে আস্তে নিঃশব্দে বাঘ জলে নামে। চোখ-কানটুকু জাগিয়ে সাঁতরে এসে নেস্নো বাড়িয়ে ধরে নৌকোর গলুই। তারপর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সব দেখে নেয়। মহাজন তন্দ্রায় ঢুলছে দেখলে সট করে একটু উঠেই কাছের মানুষটার গলার নালীতে কামড়ে দিয়ে টুঁ শব্দ করবার আগেই টেনে জলে নামিয়ে এক ডুব দিয়ে উঠে গিয়ে অনেক দূরে—তারপরে পিঠে করে তুলে নিয়ে চলে যায় জঙ্গলের ভিতরে।

তাই রাত্রে মহাজন বা সেদোর ঘুমোনো নিষেধ। রাত জাগার জন্যে 'বাউলী'দের (যারা মধু সংগ্রহ করে তাদের 'মাউলী'ও বলে) মধ্যে একজন মাথায় বাবরি চুল, বাহুতে রুপোর পদক, গলায় বাঁধা রুপোর তক্তি, লখিন্দর দাড়ি—অপূর্ব সুরেলা গলায় পুঁথি পড়ে। সবাই মন দিয়ে শোনে। তার কাছে এক সুটকেস পুঁথি আছে। 'কাসাসল আম্বিয়া', 'হাতেম তাই', 'জঙ্গে শাহানামা', 'জঙ্গে বদর', 'জঙ্গে অহোদ', 'খয়রল হাসার', 'গোলসানে রুম

কেচ্ছায় দীল খোশ'—কত রকমের পুথি। পুথির গল্পের মতো গল্প আর হয় না। বাঙলার মুসলমান সমাজের মধ্যে 'পুথি-সাহিত্য' নামে একটি উদার কল্পনা এবং অপূর্ব মজাদার কাহিনীর জগৎ আছে যার খোঁজখবর অনেকেই তেমন রাখেন না। গরাণকাঠের মহাজন, গণ্ডা-গণ্ডা বাঘ-মারা নির্দয় নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষও তার রেডিও বন্ধ রেখে চুপ করে বসে পুথির কাহিনী শোনে আর সিগারেট ফোঁকে একটার পর একটা।

ভোর হয়ে এলে মোরগের চিৎকার শোনা যায়। পাতলা কুয়াশায় চারদিক ঢাকা।

খানিকক্ষণ ড্রাম পেটা চলে। তারপর সকাল হলে সেদো মন্তর পড়ে জল ছিটিয়ে প্রথমে মাটিতে নামে একলা খালি হাতেই। সে চিৎকার করে জঙ্গল বন্দনা গাইতে গাইতে ঢুকে যায় জঙ্গলের মধ্যে। যতখানি জায়গায় গাছ কাটা হবে গণ্ডি দেয়। সেই গণ্ডি ভেঙে বাইরে যেতে গেলে সেদো সঙ্গে যাবে। অবশ্য মহাজন নিজে যদি হরিণ শিকারে যায়। সেদো অর্জুন কয়াল গাইছে :

'বনদেবী মা,—
তোমার ভরসায় এলাম মাগো
যেন বাঘে ছোঁয় না॥
জঙ্গল দেবী মা—
তোমার কোলে এলাম মাগো
যেন কালে কাটে না॥
রায় দক্ষিণা রায়—
চোখের মণি উপড়ে দেবো
যেন বহর বেঁচে যায়॥
বদর গাজি বাপ—
কেউটে কুমীর বাঘ ভাল্লুক
যেন করতে পারি সাফ॥
বনদেবী মা—মাগো—মা'—

উচ্চগ্রামের চিৎকার—আর বুক-চাপড়ানির শব্দ—করুণ আর্তস্বর—সেদোর চোখের জলে বুক ভেসে যায়—সবাই প্রাণের কতখানি দাম উপলব্ধি করে—সেই ভয়ঙ্কর পরিবেশে অপূর্ব জঙ্গল-বন্দনার সময় হাউমাউ করে কাঁদতে

থাকে। কারো ছেলেমেয়ের, কারো বা বউয়ের, প্রিয়জন সংসার সম্পত্তির কথা মনে পড়ে।

শুধু মহাজন তোরাব রফাদান নীরব। হাতে বন্দুক নিয়ে জঙ্গলের জমাট সবুজের দিকে তাকিয়ে থাকে অপলক চোখে। ফাঁকা আওয়াজ করে দুটো একটা কাছাকাছি কোনো বাঘের গর্জন শুনলে। মন্ত্রবিশ্বাসী এমন বতো সেদোকে সে হারিয়েছে। দেবদেবী বা মন্ত্রে বিশ্বাস করে না রফাদান। সে খাটি মুসলমান। পাঁচওয়াক্ত নামাজ পড়ে পড়ে তার কপালে কালো একটা দাগ হয়েছে—'সেজদা' দেবার সময় বার বার যেখানটা তার ভূমিস্পর্শ করে। বিচক্ষণ বুদ্ধি লোকটির। পরিবেশ আর লোকাচারের মধ্যে অর্থহীনতার সন্ধান পেলেও নিজের স্বার্থহানি হবার সম্ভাবনা থাকলে চুপ করে থাকে। সাধারণত নিয়ম যেদিন জঙ্গলে পৌছবে সেদিন সেদো ছাড়া আর কেউ নৌকো থেকে নামবে না। কিন্তু মহাজন বন্দুক হাতে নিয়ে নেমে যায় সেদোর পিছনে পিছনে—তখন নৌকোর লোকগুলো অসহায় বোধ করে। সবাই অস্ত্র নিয়ে খাড়া থাকে। সেদো পাছে শার্দুলের থাবায় ঘায়েল হয়, তার মন্ত্রে বিশ্বাস নেই বলে মহাজন তাকে পাহারা দেয়। ব্যাপারটা কিন্তু সেদো জানতে পারলে মহাজনের ওপরে ভীষণ ক্ষেপে যায়-- গালাগালি করে। মহাজন চুপ করে থাকে। হাসে।

কুয়াশা থাকলে জঙ্গলে গরাণ কাটতে নামতে দেরি হয়। বেলা দশটা বেজে যায়। তার আগে খেয়েদেয়ে নেয় সবাই। তারপর ক্যানাস্তারা পেটে। করাত-কাটারী, লাঠি-বল্লম সড়কি, বন্দুক নিয়ে সকলে নেমে আসে আস্তে আস্তে দল বেঁধে। মাঝে মাঝে বালিয়াড়ী চোরাবা'লব দহ। সুঁদরীর ভয়ঙ্কর 'শজাল' চারদিকে। সেদো আর মহাজন চলে সবার আগে আগে। নদীপথে নামবার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে আগাছা, কাঁটাগাছ, তেউড সমস্ত কাটারী চালিয়ে কেটে ফেলা হয়। পঁচিশ-ত্রিশ হাত উঁচু ভীষণাকার ভীমরুল চাক। তিনটে ভীমরুল কামড়ালে একটা কেউটে সাপের বিষের সমান যন্ত্রণা হবে। বড় বড় চক্রাকার বোলতার চাক। গাছের ডালে ডালে মধুর চাক। মাউলীরা আগুন জ্বালে। ভীমরুল বোলতা মৌমাছি ভোঁ ভোঁ শব্দে আকাশ ছেয়ে উড়ে পালাতে থাকে তাদের বাসা ছেড়ে ডানা পুড়ে যাবার ভয়ে। পীর আলি আর লখিন্দর গাজি 'মউলে' দুজন মধু সংগ্রহ করে বাল্‌তি ভরে নৌকোয় পাঠায়। সবাই মধু খায় যে যতটা পারে। বেশি খেলে আবার গা-হাত জ্বালা করবে।

গরাণগাছ কাটা শুরু হয়ে যায়। দমাদম কুড়ুল চলে। সঙ্গে সঙ্গে ডালপালা ছিইয়ে ফেলে কাঁধে কাঁধে নৌকোয় উঠে যায় সেই গাছ। সেদো বিরাট ফলার চকচকে বল্লম হাতে নিয়ে চারদিকে ঘোরাফেরা করে। মহাজন বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কড়া মোটা গাছে করাত টানতে হয়। তবে গরাণগাছ বেশি মোটা হয় না। অনেক জায়গা তখনো জলে ডোবা। সেখানে মোটা মোটা হিজল আর সুঁদরী গাছ, তলায় চুপি গাছ আর তেউড়ভরা। হিজলের সরু সরু ঝালর ফুলে তার তলার মাটি লাল হয়ে আছে। জঙ্গল জলে জলময় হয়ে গেলেও হেঁতাল, জলডুমুর, হরকোচ, সুঁদরী, গরাণ, পানশিউলী তেঁকাটাল, গেঁয়ো, বাজবরন, লঙ্কাশিরে, ফণীমনসা, বনঝামা, ম্যাড়ামারা, বঁইচি, ঢোল-সমুদ্র, শ্যাওড়া—এসব গাছ মরে না।

গরাণ খুব শক্ত কড়া গাছ। এর খুঁটি হয়, ডালপালা জ্বালানি হয়, তাই গরাণের কদর বেশি। সুঁদরি আর গরাণই সুন্দরবনে বেশি। শতকরা আশী ভাগ।

বেলা চারটের পর জঙ্গলে ছায়া নামলে সকলে কাজ ছেড়ে নৌকোয় চলে এসে বালতি করে জল তুলে গা-হাত ধুয়ে খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ে। লালু খানসামা আগেই রান্না করে রাখে। দুপুরে যখন একঘণ্টার জন্য সকলে কিছু জলখাবার খেতে এসে বিশ্রাম করে, তখন হরিণ শিকারের সুযোগ আসে। তাই সেদো আর মহাজন সবুজ ফতুয়া সবুজ লুঙ্গি পরে কাটা-গাছের-পাতা-খেতে-আসা হরিণের দলের অপেক্ষায় হেঁতাল অথবা শরখড়ির বনের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে। সিগারেট বিড়ি খাওয়া বন্ধ। গন্ধ তেল সাবান মেখে হরিণ শিকারে আসা নিষেধ। হরিণের ঘ্রাণশক্তি ভয়ঙ্কর তীব্র। কিছু গন্ধ পেলে হরিণ মুহূর্তেই পালাবে। জলডোবা অংশ বা বালিয়াড়ি খাঁড়ির মধ্যে সুন্দরবনে প্রচুর মাছ থাকে। সাপ, গোহাড়গেল ঘুরে বেড়ায়। যেখানে মাছ সেখানেই সাপ। মাছ খাবার লোভে আসে কেঁদো বাঘ। বড় বাঘ সেই ডোবার ধারে জল-খেতে-আসা হরিণের জন্যে ওৎ পেতে থাকে শরখড়ি বা হেঁতালের জঙ্গলে। বাঘ এত সতর্ক যে দখিনে হাওয়া বইলে সে থাকবে উত্তরে। কেননা সে জানে তার গায়ের উগ্র গন্ধ বাতাসে ভেসে গেলে হরিণ সেই গন্ধ পেলেই পালাবে।

কথা বলাও নিষিদ্ধ। করাতে, শাঁখামুটি, গোখরো, গেঁড়িভাঙা কেউটে বেয়ে চলেছে—চলে যাক—কোন সাড়া করো না। সাপে-নেউলে যুদ্ধ লাগলে

বসে দেখো। নেউলের তীক্ষ্ণ নখের ধারে যদি লাফ দিয়ে যাবার সময় সাপটা দু' টুকরো হয়ে যায়, তবে লেজের দিকের অংশটা নিয়ে সে ছুট মারবে। নাভির পরে কাটলে সাপটা পালাবে। সাপ কামড়ে দিলে নেউল ছুটে গিয়ে 'ঈশ্বরমূল', 'হরকোচ', মণিরাজ' অথবা 'গোলঞ্চ' জাতীয় এক রকমের লতাগাছের মূল খুঁড়ে বার করে চিবোতে থাকবে। এসব সেদোর কথা। এ কথায় মহাজন হাসে।

কাঁচা কচি পাতা খাবার জন্যে হরিণ আসে বকের মতন টুক্‌টুক করে অল্প অল্প জল পার হয়ে। পাঁচটা—দশটা · মুখে পাতা নিয়ে চনবনে চোখে তাকিয়ে থাকে। কান খাড়া করে রাখে। তোরাব রফাদান বন্দুক সোজা করে ধরে হরিণের বুক লক্ষ্য করে। তাদের পিছনে অনিবার্য বাঘ থাকবে বলে সেদো লক্ষ্য রাখে সেদিকে। বাঁদর-হনুমানের দল এসে লাফালাফি করে বড় হিজলগাছের ডালে ডালে।

হঠাৎ গুড়ুম করে শব্দ হয়। অব্যর্থ লক্ষ্য রফাদানের, হরিণটা লাফ দিয়ে ছিটকে পড়ে। শব্দের সঙ্গে সঙ্গে অন্য হরিণগুলো চকিতে যেন উড়ে যায়। হঠাৎ দেখা যায় তাদের পিছনে বাঘ ছুটে যেতে। কাছেই কোথাও ওৎ পেতে ছিল। ঘাসের বনের খানিকটা ফাঁকা জায়গার উপর দিয়ে রোদে-ঝলমল-করা বিদ্যুৎগতি সেই বাঘের শিকার-দৃশ্য যে কী ভয়ঙ্কর সুন্দর তা যে না দেখেছে তাকে ভাষায় বোঝানো কঠিন।

কিছুক্ষণ পরেই ছটফট-করা হরিণটার কাছে আসে দুজনে। গলা চেপে ধরে সেদো। পকেট থেকে ছুরি বার করে জবাই করে ফেলে রফাদান। মায়াময় বড় বড় চোখ দুটো বার করে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে ঠাণ্ডা হয়ে যায় হরিণটা। তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে চলে আসে সেদো।

হরিণের মাংস, মাছ, ভাত, মধু, মুরগীর ডিম যে যতখানি পারে খেয়ে নিয়ে সবাই সন্ধ্যার সময় শুয়ে পড়ে। একটু ঘুমিয়ে নেয়। মহাজনও ঘুমোয়। সেদো তখন প্রহরী। রাত নটার পর মহাজন জেগে উঠে রেডিও চালায়। সকলে গল্প করে। পুথি পড়ে লখিন্দর গাজি। সবাই মন দিয়ে শোনে পায়ের হাতের কাঁটা বার করতে করতে। কার আমাশা ধরেছে কার বা সর্দি—মহাজন ট্যাবলেট দেয়। নোনা জলের আবহাওয়ায় হঠাৎ কলেরা ধরবার ভয়ে সবাই তেঁতুল গোলা জল খায়। রাত্রে শীত করলে কাঁথা-কম্বল মুড়ি দেয়।

দিন দশেক পরে এক রাত্রে আসে ফরেস্ট অফিসের জলপুলিসের লঞ্চ।

মহাজন দু-হাত গালের কাছে এনে জোরে চিৎকার করে তাদের ডাক দেয়— 'ও-ও-ও-ও-ও-ও—হোই-ই-ই-ই-ই!' সার্চলাইট ফেলে তারা আঁতি-পাতি করে দেখে নিয়ে কাছে আসে। সিগারেট খায়; মধু, হরিণের মাংস, কচ্ছপের ডিম, বনমোরগ ইত্যাদি নিয়ে চলে যায়।

জঙ্গলে কুড়িদিন থাকবার কথা। পনেরো দিনের দিন সবাই যুক্তি করে কাজ বন্ধ করলে। সেদো অর্জুন কয়াল মহাজনের তরফের লোক। তার রোজ সাড়ে তিন টাকা খোরাকি সমেত এবং কাঠগোলায় পৌঁছে দিলে পাবে পঁচিশ টাকা উপরি। সে কাজ করে না, গুল-গল্প মারে আর পাহারা দেয়— জঙ্গল-বন্দনা গায়। হাজার দু-হাজার লাইন তার মন্তরের ছড়া! কিন্তু যারা প্রাণের ভয় তুচ্ছ করে কাঁটা-জোঁক-ডাঁস-ভীমরুল-সাপের কামড় খেয়ে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করছে তাদের রোজ আড়াই টাকা থেকে তিন টাকায় বাড়াতে হবে। সেদো প্রথমে অরাজি ছিল। পরে সেও ঘুরে গেল। সে-ই যেন আগে 'পায়ে পা-তুলে দিয়ে' ঝগড়া বাধাতে চাইলে। পীর আলি, লখিন্দর গাজি, লখাই করাতি, বলাই সেখ, ইসমাইল ঘরামি, লালু খানসামা, পরাণ ঢেঁকি, বনমালী ঘোড়া, বিশু হাজরা, নন্দ মাঝি, এবাদত সরদার- সবাই এক ঐক্য।

সেদো বললে, 'কাঠের দাম বেড়েছে, সকলের রোজ বাড়াতে হবে, নইলে আজ থেকে সবাই কাজ বন্ধ করবে।'

মহাজন বললে, 'অসম্ভব। হিসেব করো, তিরিশজনের রোজ তিন টাকা করে হলে দিনে নব্বুই টাকা। আর খোরাকি। নৌকো ভাড়া, লাইসেন্স ফি, ঘুষ, তোমার উপরি পাওনা, এসব খতিয়ে দেখে তবে কথা বলো। আমার লোকসান করতে চাও কি তোমরা? হঠাৎ তোমাদের যদি সাপে কাটে কিম্বা বাঘে ধরে নামখানা নাহয় ক্যানিং হয়ে কলকাতার হাসপাতালে পাঠাতে খরচ দেবে কে?'

সবাই নীরব। মহাজনের টাকার বাক্সটার দিকে লক্ষ্য। তাদের গতর-মাটি-করা টাকা। মহাজন লাখোপতি টাকার মানুষ।

মহাজন মনে মনে সব হিসেব করে। দেড় হাজারী বোটে ছ-খানায় ন-হাজার মণ মাল ধরবে। এক হাজার মণ শুকনো হলে কমবে। দু-নৌকো খুঁটির দাম আলাদা। চার নৌকো গরাণের সাড়ে তিন টাকা মণ। ফাড়াই-চেরাই আছে। তবু ইচ্ছে করলে ওদের তিন টাকা করে দেওয়া যায়, তবুও

লাভ থাকবে। বললে, 'আচ্ছা, ভেবে দেখি, কাজ করো সব।'

সেদো বললে, 'আমাদের এক কথা।'

মহাজনের ক্রুর চোখে কেউটে খেলা করল। সেদো তা বুঝল না। মহাজন নিম-রাজি হয়ে কথা দিলে যেন। কাজ চলল।

দুপুরে মহাজন বললে: 'আজ একটা হরিণ শিকার করব মনে করছি। চল অর্জুন—যাই।'

সেদোর হাতে ধারালো বল্লম। মহাজনের হাতে বন্দুক। দুজনে গেল তারা জঙ্গলের ভিতরে। একটা জলাশয়ের পাশে দুজনে বসল। সাপ বেয়ে চলেছে জলের ওপর দিয়ে। কথাবার্তা নেই। আধঘণ্টা পরে এল তিনটে হরিণ। পিছনে গোটা পাঁচেক। জল খেতে নামল তারা। দূর থেকে ছুটে আসার পর ক্লান্তিতে সব ধুঁকছে। একটু করে জল খায় আর আনচান করে চারদিকে তাকায়। কী অপূর্ব সুন্দর চোখ আর চাহনি তাদের। মায়া হয় মারতে। একটা গুলি ছুঁড়লে তোরাব রফাদান। মোক্ষম লাগল। ঘুরপাক মেরে শূন্যে লাফ দিয়ে উঠে ছিটকে পড়ল। অন্যগুলো পালিয়ে গেল পলকের মধ্যে। রফাদান ইশারা করলে সেদোকে, ছুটে গিয়ে হরিণটাকে আনতে, মরার আগেই যেন জবাই করা যায়।

সেদো ছুটে গেল জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। হাতে তার বল্লম। হরিণটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে যখন সেদো আসছে মহাজন হঠাৎ গুলি ছুঁড়লে। বললে, 'এই অর্জুন—বাঘ তোর পেছনে!' ··সেদো চিৎকার করে উঠে খানিকটা ছুটে এসে পড়ে গিয়ে বনজঙ্গল আঁচড়াতে কামড়াতে লাগল। সে মারা গেলে তাকে টেনে তুলে এনে ফণীমনসার জঙ্গলের মধ্যে ফেলে দিলে তোরাব রফাদান। · সেদোর রক্তের চিহ্ন, যা তার গায়ে লেগেছিল, জবাই-করা-হরিণের রক্তে তা একাকার হয়ে গেল। হরিণটাকে নিয়ে নৌকোয় ফিরে এল মহাজন। বললে: 'দুর্ঘটনা ঘটেছে! সেদো অর্জুন কয়ালকে বাঘে নিয়ে গেছে! শিকারের পর সে যখন হরিণ আনতে একা ছুটে গিয়েছিল, হঠাৎ তার ওপরে বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ে! আমি গুলি করলাম বটে কিন্তু বোধহয় লাগেনি। বাঘটা তাকে ঘাড়ে তুলে নিয়ে সাঁ করে জঙ্গলে ঢুকে গেল। ভয়ে ভয়সায় এগিয়ে গেলাম। সমস্ত শরীর ভয়ে থরথর করে কাঁপছে!···যাবে নাকি তোমরা?'

সবাই নীরব। শুধু লথাই গাজি বললে, 'চলো যাই—দেখি শালাটাকে'···

কিন্তু কেউ নড়ল না। মহাজন একবেলার ছুটি ঘোষণা করে দিলে।

মহাজন সিগারেট ধরিয়ে বললে, 'কোনোমতে হরিণটাকে নিয়েই পালিয়ে এসেছি। কী ভয়!…আমার ভয় করল, তোরা হলে তো কাপড়ে-চোপড়ে করে ফেলতিস কিংবা জঙ্গলেই বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকতিস।'

অতএব দামকড়ি বাড়াবার আর প্রশ্ন নেই। দুঃসাহসী সেদো ছাড়া কে আর সে কথা তুলবে? নিমরাজি হলেও মহাজন তার কি দেবে? সেদো নেই, কিন্তু তার জঙ্গলবন্দনার ছড়াগুলো সবাইয়ের মনে প্রভাব বিস্তার করে রইল।

পাঁচদিন পরেই—বিশ দিনের দিন—নৌকো ছাড়া হল। ছ-খানা গাদা বোট বোঝাই মাল। একখানা পানশি নৌকোয় মালপত্তর মহাজন আর লোকজন। সবায়ের মনে তখন বাড়ি ফেরার আনন্দ। দাঁড় পড়ছে ঝপাঝপ ঝপাঝপ শব্দে। সমুদ্রের ফেনাভাঙা গর্জমান ঢেউ ঠেলে হলদে-পাল-তোলা নৌকোর বহর চলেছে তীর ধরে পশ্চিমে। আকাশে মেঘের বিচিত্র পাহাড়।

মহাজন সাজানো কাঠের মাথায় এসে বসে আছে ছবির মতন। মুখে তার সুন্দর দাড়ি। মাথায় টুপি। কোলের ওপরে কোরআন শরীফ। সূর্য অস্ত যাচ্ছে…

কালবৈশাখীর কালো মেঘ উঠছে আকাশে।

ঝড় হতে পারে দেখে মহাজন তাড়া লাগায়। গোসাবা থেকে দু'দিনের পথ নামখানা। ডায়মণ্ডহারবার, ফলতা, বুড়ুল, বাগাণ্ডা, নলদাঁড় হয়ে শ্যামগঞ্জের কাঠগোলায় পৌঁছতে তাদের আরো দুদিন লাগে জোয়ারের জন্যে অপেক্ষা করে করে আসতে। গোলায় মাল তুলে দিয়ে সবাই দামকড়ি নেবার জন্যে বসে থাকে। দরিয়ার ধারে এসেছে সবাইয়ের মা-বউ-মেয়ে-বোনরা। শুধু সেদো অর্জুন কয়াল ফিরতে পারেনি। সবাইয়ের গায়ে বিষাক্ত জলের 'পানটিপ' (ফুসকুড়ি) হয়েছে। গায়ের রঙ পোড়া কাঠের মতো হয়ে গেছে নোনাজলের আবহাওয়ায়। মেয়েরা সবাই কড়িভাব আর মানসিকের বাতাসা এনেছে।

সেদোর অনুপস্থিতি সম্বন্ধে সবাই গুজগাজ করছে দেখে মহাজন বুঝতে পারে সেদোকে বাঘে নিয়ে যাবার ঘটনাটি ওরা বিশ্বাস করেনি বোধহয়। তাই চার আনা করে প্রত্যেককে বেশি দেয়। সেদোর উপরি পাওনা যেটা। নইলে আগামী বছরে আবার লোকজন পাওয়া যাবে না।

দামকড়ি ট্যাঁকে খুঁসে নিয়ে সবাই চলে যাবার সময় শুধু অনেক পুথির পাঠক লখিন্দর গাজি বলে, 'শালা, গরাণ সংগ্রহকারী সুন্দরবনের মহাজনের চরিত্র সুন্দরবনের বাঘের চাইতেও ভয়ঙ্কর।'

থানার দালাল

আল্লাকে পেতে গেলে যেমন পীরের দরকার তেমনি দারোগাকে ধরতে গেলে চাই থানার দালাল। যদি বলেন, কি দরকার এই মাধ্যমের? তাহলে যাতে খোদকর্তা সন্তুষ্ট হয় সে ভাষা, ইঙ্গিত বা ব্যাপার আপনার জানা থাকা চাই। তাছাড়া আপনি অপরিচিত, দারোগারা পদাধিকার বলে কিছু পেয়ে থাকে, সেটি আপনার কাছে চাইবে কেন?

তাই সংসারে মাধ্যমের দরকার। থানার সেই এক মাধ্যমমণি হল এ অঞ্চলে নবকৃষ্ণ দাস। অন্ধকার থানার আসলে সে বড় দারোগা। তার ক্রিয়া-কলাপ থাকে গোপনে। তার মতো আরো অনেকে আছে কিন্তু দীর্ঘ চল্লিশ বছর প্রত্যেক নতুন নতুন দারোগাকে বশীভূত করে আধাআধি বখরা নেওয়ার হিম্মত হয়েছে একমাত্র নবকেষ্টরই। গুরুতর অপরাধ করেও যদি বাঁচবার আশা থাকে তবে তখন একমাত্র রক্ষাকর্তা নবকেষ্ট। মানুষ খুন করে ছুটে যাও তার কাছে সে বাঁচিয়ে দেবে।

সে তখন বলবে, 'দেখ রহমান, ভগবানের নাম হল টাকা। চাঁদির জুতো মারলে সব 'সিদে' (সোজা) হয়ে যায়। কত হাজার হাজার লোককে দেখলুম। তুই এখন হাজার খানেক টাকা ছাড। আমার পাঁচশো—বড়বাবুর পাঁচশো। ব্যাস—তোকে জানে বাঁচিয়ে দোব। কেস হালকা করে দোব। নবকেষ্ট পারে না এমন কাজ নেই। এই তো তিন বছর আগে তুষ্টু সাঁতরাকে কিরাত গায়েন খুন করলে—হেঁসো দিয়ে পেট চিরে নাড়ীভুঁড়ি বার করে দিলে—বেচারা কিরাত রাতদুপুরে ছুটে এসে আমার দুটো পায়ে জড়িয়ে ধরলে, ডাক্তারবাবু আমাকে বাঁচাও। তুষ্টুকে খুন করে এসেছি। বললাম, এ তো অন্যায় কথা। তোকে সে খাইয়ে ধুইয়ে মানুষ করেছে বলতে গেলে। তুই তার কণ্ট্রোলের মাল মাপতিস। তোর চরিত্র নষ্ট, তার সুন্দরী বাঁজা বউয়ের সঙ্গে গোপনে 'আসনাই' করিস জেনে তোকে কণ্ট্রোল

থেকে বার করে দিলে বলেই তাকে খুন করলি? আমি বাপু তুষ্টুর অনেক টাকা খেয়েছি, তার শত্রুতা করতে পারব না। তখন সে পায়ে ধরে কি কান্না। একছড়া সোনার হার দিলে। তবু স্বীকার নই। তখন একশো টাকা বার করে দিলে! তখন বলনু, এক বিঘে জায়গা দিতে হবে। বললে, কই জায়গা ডাক্তারবাবু, ঐ এক বিঘে তিন কাঠা পৈতৃক জায়গা মাত্তোর। মাগছেলে আছে—ভেসে যাবে! তখন তাকে লাথি মেরে সরিয়ে দিনু। হার টাকা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে পড়নু। তখন ছুটে গিয়ে পায়ে জড়িয়ে ধরে শিশুর মতন উভরায় কী কান্না তার! মানুষের অনুশোচনা, দুঃখ, পাপ, কান্না, বাঁচার কী তীব্র আকাঙ্ক্ষা—এসব আমি যত দেখেছি কেউ দেখেনি। কিরাত তখন বললে, জায়গা দোব ডাক্তার, আমাকে প্রাণে বাঁচাও। তখন ডেমি কাগজ এনে তার একটা টিপ সই করে নিলুম। তবে বেইমানী করিনি, তিন কাঠা বাদ দিয়ে তার এক বিঘে জমি লিখে নিলাম। বললাম, পালিয়ে যা। পরশুদিন বেলা চারটের পর থানায় হাজিরি দিবি। তাই বলছি রহমান, কাশেমকে খুন করেছ, বাঁচতে চাও, এখন টাকা, গয়না নাহয় জমি ছাড়ো—কেস হালকা করে দোব দারোগাকে বলে।'

রহমান বাধ্য হয় তার বাস্তুভিটেটুকু লিখে দিতে।

এমনি বহু লোকের জমি আজ থানার দালাল নবকৃষ্ণ দাসের কবলে। যে জমির দিকে তার লোভ পড়বে সে জমি সে নেবেই। পাশের আটনের লোককে ফুস্‌লে দিয়ে, মারামারি খুন-জখম বাধিয়ে দিয়ে মামলা লাগাবে। মামলা দেখাশোনা করবে নবকেষ্ট। তার খরচ যোগাবে কোথা থেকে? জমি বেচে ফেল। খদ্দের তখন নবকেষ্টই। নগদ টাকায়? আরে রামো! তারই তো পাওনা তখন হাজার খানেক। উকিলের ফি, মুহুরী, পেশকার, হাকিম, কোর্ট-ফি, টেলিফোন, ট্যাক্সি, রসগোল্লা, হোটেল, সিনেমা, মা-কালীর পুজো—এ সবের খরচ দিলে কে?

তাই নবকেষ্টকে সবাই ভয় করে। সবাই তোয়াজ করে। আজ সে আড়াই লাখ তিন লাখ টাকার মালিক। একশো বিঘে সম্পত্তি। দোতলা পাকাবাড়ি। মাটির দেওয়াল খোলার চাল ফেলে দিয়ে এখন করেছে পাকা বৈঠকখানা। ভিতরে ভাল চেয়ার টেবিল বিছানা। একদিকে অ্যালাপাথিক ডিসপেনসারি। বৈঠকখানার সামনে জোড়া চারটে শিবমন্দির। দশ-বারো হাত করে উঁচু। বাড়ির সামনে খালের উপরে পুল। রঙিন বাদাম গাছ,

পাতাবাহার আর ঝাউয়ের ঝাড়। সরকারী বেসরকারী বহু প্রতিষ্ঠানের বড় বড় কত অনারারী পদে সে অধিষ্ঠিত হং চং ভব্লু বি—সেক্রেটারী হোম-গার্ড ২৪-পি ইত্যাদি লেখা মানুষ-সমান শ্বেতপাথরের নেমপ্লেট! মস্ত চেহারা নিয়ে সে কার্পেটের ইজিচেয়ারে শুয়ে থাকে আর চুরুট টানে। লোকজন 'জনধন' কথা বলে। নারকোল, বাঁশ, উলু, পাট, প্যাকাটি, ধান, সুপুরি ইত্যাদি বিক্রির দাম নেয়। নাগাড়ে-দেড়-টাকা রোজের বাগ্‌দি জনেরা দিনের বেলা তার পাট কাচে, ধান রোয়, কোপায়, হাল-লাঙল করে আর রাত্রে পার্শ্বচর হয়ে হ্যারিকেন, লাঠি আর বাবুর ক্রিজ-ঢোকানো ছড়ি বয়ে নিয়ে যায় সঙ্গে। কলকাতা থেকে একটা অ্যাটাচি ব্যাগ আর ডায়েরি বই কিনে এনেছে নবকেষ্ট। কার কবে মামলার দিন—কত ধারায় মামলা চলছে সব লিখে রাখে। পালিত-পুত্র মোহন বি-এ পাস করেছে। চোঙা প্যান্ট পরে সে টুইস্ট মারে! নবকেষ্টর দুটো বিয়ে তবু একটাও বাচ্চা তারা দিতে পারে নি। মা শেতলা দাসী মাজাভাঙা বুড়ী পঁচিশটা ছাগল খাসী নিয়ে মাঠে বের হয়। তার ছাগলের পাল বেড়ে চলেছে। নবকেষ্ট একটাও খাবে না বা বিক্রি করতে দেবে না। হাঁসমোরগও তাই। বুড়ী শেতলা জড়িবটি বেচে রোজগার করে। পাড়ার মেয়েরা তাদের ছেলেদের পিলেজ্বর, হ্যাবা, আমাশা, 'রসভাঙ্গা', স্বামীবশ, মেয়ে-বারকরা 'ছিটে' ইত্যাদির ওষুধ নেয় স-পাঁচ আনা পয়সা দিয়ে। ঘুঁটে, কাঠ-কঞ্চি, ছোবড়া এসব বেচেও বুড়ীর অনেক পয়সা জমে। তার পয়সাতেই নাকি মন্দির চারটে হয়েছে। বাবা শিবঠাকুরের মাথায় জল পড়ছে।

অথচ কি ছিল ঐ নবকেষ্টর? মা শেতলা ছ-মাসের পোয়াতি অনূঢ়া-কুমারী বেলায় নবকেষ্টকে পেটে নিয়ে এসে গলায় পড়ল দুখীরাম দাসের। দুখীরাম জাতে ধোপা ছিল, কিন্তু জাতব্যবসা ছেড়ে সে মানুষের ঘর ছাইত, ঢেঁকি চাঁচত, গরুর গাড়ির 'লাপা,' 'ঠেকনো,' 'তকাঠ,' 'পাকি' এসব তৈরি করত। যাঁতা-শিল কাটাত। চাষে জন খাটত, জেলেদের লোকের টান পড়লে দুখীরামকে 'নৈকোয়' নিয়ে যেত। তার বউ ছিল না। ঝোবড়া একটা কুঁড়েয় থাকত। শেতলা থাকল তার কাছে। বিয়ে হয়েছিল কিনা কেউ জানে না। তবে তখনকার সমাজকর্তাদের যে ধর্মপরায়ণতাবোধ ছিল তাতে শেতলা তাদের 'শেতল' করেছিল নবকে পেটে নিয়েই—তারপর মুচি-কোরোয়াঁর ভঙ্গ বামুন ডেকে তারাই হয়তো চন্দন-গঙ্গাজল-তুলসী ছিটিয়ে দুখীরামের দুঃখ শেতলার হাতে তুলে দিয়েছিল। সে যাহোক একটা হবে।

কিন্তু চার মাস পরেই শেতলার ছেলে হল কেমন করে? 'বাওয়া ডিম'! শেতলা খলখল করে হাসত: 'ভগমান দিয়েছে!' শুনে দুখীরামের পিত্তি জলে যেত। সেই শেতলার চুল পেকেছে, মাজা ভেঙেছে তবু এখনো কোনো পীরিতের নাগর যদি তার কাছে কোনো মেয়েকে বার করে নিয়ে পালাবার জন্যে 'ছিটেমারা' ওষুধ চায়—তবে শেতলা তিন সন্ধ্যে একটা তুলসী-মূলে মাটির পিদিম জ্বালিয়ে 'সন্ধ্যে' দেবে। চার দিনের দিন সম্পূর্ণ ন্যাংটো হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে দাঁত দিয়ে তুলসীগাছের শিকড় তুলতে হবে। শেতলা বলে, 'ভারি শক্ত কাজ! ভূতে ঘাড় মোচড়াতে পারে। গাছের গোড়ায় শাঁখামুটি সাপ জড়িয়ে থাকতে পারে।' সেই শিকড় এনে ভোমরার মাথা, গঙ্গাজল, বনচাঁড়ালের পাতা বেটে একটা শিশিতে করে নিয়ে গিয়ে মনোমোহিনীর পাছায় পিছন থেকে ছিটিয়ে দাও। ব্যাস! পরদিনই তোমার সঙ্গে পালাবে! এর জন্য দক্ষিণা দিতে হবে পাঁচ টাকা!

কিন্তু যদি কাজ না হয়? শেতলা গুলমাজা কালো দাঁতে খলখল করে হাসবে! তার আর কি করবে তুমি? এমন ছু-মন্তর বিড়বিড় করে একমুঠো ধুলো নিয়ে ছিটিয়ে দেবে সে যে তুমি অন্ধ হয়ে যাবে! তাছাড়া বাড়াবাড়ি করলে থানার টাউট নবকেষ্ট আছে তার!

নবকেষ্ট এই মায়ের পিতৃপরিচয়হীন সন্তান। অবশ্য স্কুলে সে বলত, 'আমার বাবার নাম দুখীরাম দাস।' কিন্তু ছেলেরা বলত, 'দুস্ শালা, তোর বাপ হল সেই ভগবান, ঐ নীলনাল আকাশের নিচের দিকের অন্ধকারে তার বাস!' শম্ভু মাস্টার বললে, 'তার নাকি ইয়াবড় বেরদ্দো গোঁফ। সেই গোঁফ দিয়ে সে জমিদারের ঘোড়ার আস্তাবল ঝাঁট দেয়!'...তারপর ছেলেরা হাহা করে হাসত। খুব অপমান বোধ করত নবকেষ্ট। তার শরীর ছিল ভাল। এসব কথা বললে সে তাদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ত। মারামারি করে মার খেয়ে বাড়ি ফিরত। ক্লাস এইটে উঠে তার পড়া ছেড়ে গেল। দুখীরাম মারা গেল। একজন ডাক্তারের কাছে কম্পাউণ্ডারী শিখলে সে বছর পাঁচেক। তারপর ডাক্তারী করতে শুরু করলে। স্বাধীন ব্যবসা। তবে তার হাতে রোগী সবাই মরতে থাকলে লোকজন ডাক্তারী বিদ্যেটা তার ভাল করে আর ফলাতে দিলে না। এক বিধবা মেয়ের গর্ভপাত করতে গিয়ে ধরা পড়ে বেদম মার খাবার পর সে ফাঁড়ির 'ডাণ্ডি-ধরা পুলিসে' নাম লেখালে। দারোয়ানের মতো তারা খাকি রঙের কাটা পোশাক দিলে। হাতে একটা রুলবাড়ি! সে হরদম কেস দিতে

লাগল। তাড়ি মদ ধরে মারধর করতে কী আরাম! উপরি দু-এক টাকা। নবর জন্যে 'ঝারা'র খেজুর গাছ কাটা বন্ধ হয়ে গেল। রস একটু ঘোলা হলেই ধরবে সে ফাঁড়ির পাঁচজন 'নিম্‌কি' 'পুলুস' এনে। ভাঁড় খুলে আনবে তারা। কুয়াশা পড়লে রস ঘোলা হয়—তা বলে এত? লেখো ওর নামে কেস? তোমার কি তাড়ি কাটার 'পাস্‌' আছে? তাড়ি খেতে চাও? আমরা 'পাস্‌' করে দোব, খেজুরগাছে মেরে দোব—দাও টাকা দাও!

নব 'উপরি-পাওয়ার' পেয়ে গেল। সে মাথা খাটিয়ে বুদ্ধি বার করলে। যারা বড় বড় সমাজকর্তা, তাকে নিন্দে করে, তাদের জব্দ করতে হবে। রাত্রে সে দু-এক বোতল মদ নিয়ে গিয়ে লোকের ঘরের পাশের খড়ের টালের মধ্যে কিম্বা গোয়ালে লুকিয়ে রেখে এসে সকালে পুলিসের ভ্যান নিয়ে গিয়ে হাজির হত। মদের বোতল তার গোয়াল থেকে বের হতে দেখে তো গৃহকর্তার গাল হাঁ! বুঝত এ নবকেষ্টর কারসাজি! হয় টাকা দিয়ে মান বাঁচাও নয়তো চলো থানায়!

এই রকম করতে থাকলে একদিন কয়েকজন যুবক তাকে অন্ধকারে ধরে বেদম মার দিয়ে অজ্ঞান করে মোড়ের মাঝখানে ফেলে রাখলে। তার মা ছেলের অবস্থা দেখে ফাঁড়ির পুলিসের কাজ ছাড়ালে।

কিন্তু 'স্বভাব যায় না মলে', 'ইল্লত্‌' যায় না ধুলে'! থানায় যাতায়াত করতে লাগল নবকেষ্ট। তখন ইংরেজ আমল। লাল পাগড়ি দেখলেই ভয়ে লুকোত সব। পুলিসের সঙ্গে ঘোরাফেরা করে দেখে থানার কাজ তাকে দিয়ে করাতে লাগল সবাই। নবকেষ্টর কথা দারোগা শোনে। তাকে কিছু দিতে হয়। বড় পোনা মাছ, ডাব, নারকোল, ডিম, মোরগ এসব দারোগা বেশি করে পেতে লাগল নবকেষ্ট যে কেস আনে তা থেকে। কাজেই থানার দালালদের মধ্যে এক নম্বর হয়ে গেল সে। যেই বড় দারোগা আসুক, তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে জমাদাররা! প্রথম আলাপেই বড় দারোগা মুগ্ধ হবে নবকেষ্টর আইন-আদালতের জ্ঞান দেখে। কোন্‌ কেস কত ধারায় পড়বে সব তার মুখস্থ। থানায় লোক নিয়ে গিয়েই সে বলবে, 'বড়বাবু ৩২৬ ধারার একটা কেস এনেছি! এই সিগারেট আর একশো টাকা নিন। আসামীকে বাঁচালে পাঁচশো টাকা পাব—হাফ আপনার হাফ আমার।' অন্যদিন হয়তো একটি কান-ছেঁড়া কাপড়-চোপড়ে-রক্তমাখা মেয়েকে সঙ্গে করে এনে বললে, 'এ বেটি বললে নিমাইদের কুকুর আমার বাড়ি নোংরা করেছিল, সেই নিয়ে

গালাগালি। আমাকে মারলে। আমি বলি এ-কেস হালকা হবে। তাই পট্ করে কানের মাকড়ি ছিঁড়ে দিনু। দিন ছিনতাই কেস করে। তার সঙ্গে মারপিট।'

কাল গড়িয়ে চলল। নবকেষ্টর বয়েস বাড়ল। দেশ থেকে ইংরেজ চলে গেল। নবকেষ্ট খদ্দর কিনে গায়ে চড়ালে। মণ্ডল কংগ্রেসের মেম্বর হল। তার হাতে বাগদি পাড়া, সরদার পাড়া, অধিকারী পাড়া বশ। ভোটের সময় কত কত টাকা পেলে সে।

কিন্তু ইউনিয়ন বোর্ডের ভোটে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকবার হেরে গেল সে। মনে তার ক্ষোভ রয়ে গেল। আজ তার একশো বিঘে জমি—দোতলা বাড়ি—বন্দুক, কিন্তু লোকে তাকে ভোট দেয় না!

শেষে এল পঞ্চায়েত। গ্রাম-পঞ্চায়েতে যে পঁচিশ-ত্রিশজন জিতবে তারা ভোট দিয়ে কয়েকজন অঞ্চল-পঞ্চায়েত-মেম্বর করবে। কাজেই তাদের পাঁচ-সাতজনকে বশ করে অঞ্চল-পঞ্চায়েতের মেম্বর হল নবকেষ্ট। শেষে এক তপশীলী তরুণ গ্রাজুয়েট ছোকরাকে 'প্রধান' করে সে উপপ্রধান হয়ে গেল। সে কয়েকখানি গ্রামের সিংহাসনে বসল। তারপর কংগ্রেস তাকে জেলা কংগ্রেসে নিলে। পরিষদের স্বাস্থ্যদপ্তর দিলে। যারা বি-ডি-ও-কে সাহায্য করবে।

কিন্তু কপাল মন্দ। উপপ্রধান হয়ে চিৎকার দম্ভ অহঙ্কার তার মাত্রা ছাড়াল। কণ্ট্রোলের মাল এম-আর ডিলারের সঙ্গে যুক্তি করে ব্ল্যাক করতে লাগল। রাত বারোটার সময় তারা নিজের লোকদের সেই মাল পাচার করার সময় জনসাধারণ ধরলে। অপমান করলে নবকেষ্টকে। পরদিন অঞ্চল-অফিসে এলে শত শত লোক তাকে ঘেরাও করলে। সে মাল অথবা টাকা ফেরত দেবে বললে কিন্তু কসুর মানতে নারাজ। জনসাধারণ অঞ্চল-অফিসে ইট পাটকেল ছুঁড়লে কিন্তু নবকেষ্ট বসে ছিল না—সঙ্গে সঙ্গে থানায় লোক পাঠিয়েছিল। পুলিস এলে সবাই রণে ভঙ্গ দিলে। কয়েকজনকে ধরপাকড় করালে। সাতাশজন। সবাই জামিন নিলে।

রাত্রে কণ্ট্রোলে মাল দেওয়া নিষেধ। মাল দেওয়ার রসিদ দেখালে ফুড অ্যাণ্ড সাপ্লাইয়ের ইন্সপেক্টরবাবুকে। সে খাতাপত্র কেড়ে নিয়ে গেল। ঘুষ নিলে না। লোকে মনে করলে ফাঁদে পড়েছে এম-আর ডিলার।

কিন্তু এম-আর ডিলার দু-দিন পরে কলকাতা থেকে ফিরে এসে হাসতে লাগল। বললে, 'শালা, ঘুষ নেবে না আবার!'

নবকেষ্ট খালি-খামাখা আবার আসামীদের ধরপাকড করাতে থাকলে তাকে মোড়ের মাথায় একজন খ্যাতিমান তরুণ তার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড কর্কশ ভাষায় আক্রমণ করলে। সে বললে, 'বনদেশে কটাশ রাজা' হয়েছ, না? জানো তোমাকে আমি সিকৃনির মতো আছাড় মারতে পারি! অন্যায় করবে আবার চোখও বাঙাবে? মতেহাবকে অ্যারেস্ট করালে কেন, তার বউ ছেলেমেয়েরা কেঁদে কেঁদে যাচ্ছে! শয়তান, জুতো মেরে তোমার মুখ ভেঙে দেব।'

সেদিন নবকেষ্ট বেশি বড়-ফট্টাই করেনি তরুণটির সামনে যদিও কয়েকবার গাঁক গাঁক করে উঠেছিল। এম-আর-ডিলার তাকে চেপে দেয়। কারণ তরুণটির পিছনে নাকি সেন্ট্রালের মিনিস্টার পর্যন্ত ছিলেন। তবু তার নামে থানায় ধান চুরি করবার অভিযোগ দিয়ে ডায়েরি দেয় নবকেষ্ট। কিন্তু তরুণটি থানায় গিয়ে তার পরিচয়পত্র ইত্যাদি দেখালে নতুন দারোগা—যিনি মুর্শি-দাবাদের নবাব পরিবারের লোক—সৎ এবং অমায়িক—অভয় দেন, 'ঐ নবটা কিছু করতে পারবে না—ওর বিরুদ্ধে অনেক কেস আছে আমার পকেটে—আপনার সঙ্গে লাগলে আমি ওকে জেলা-ছাড়া করে দেব।'

খ্যাতিমান তরুণটির দ্বারা এই অপমানের পর নবকেষ্ট তার অঞ্চলের গদি হারাল।

তার বিরুদ্ধে সকলে অনাস্থা দিলে। উপপ্রধান হল একজন তরুণ স্কুলমাস্টার।

এরপর আব বেশি দম্ভ নেই যেন নবকেষ্টর। তবু ভারি ভারি খুন-জখমের কেস সে এখনো দেখাশোনা করে। দু-তরফ থেকে টাকা খায়। সে হল শাঁখের করাত।

হঠাৎ কেউ যদি প্রশ্ন করেন, 'কোন্ থানায় এসব লোক নেই!'

আমি তেমন থানার একটিও নাম বলতে পারলাম না বলে দুঃখিত। ক্ষমা করবেন। কেননা অন্ধকারে থানার অন্তরালে আর একটি থানা আছে—যেখানে যাত্রাদলের নায়ক (নবকেষ্ট খুব ভাল যাত্রা-অভিনয় করতে পারে) দুর্যোধনরা বীরদর্পে তাদের সসাগরা মেদিনী কাঁপিয়ে গুরুনিনাদে এখনো বলছে: বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী!'

একশ বিঘা মেদিনীর রাজার হাতে ক্রিজভরা ছড়ি থাকে, থাকে পার্শ্বচর। আইনের হাতীকে যারা মাহুতের মতো লোহার খোঁচা মেরে রাজপথে ঘোরায়, ফেরায়, মা শেতলা দাসী খলখল করে হাসে, ছেলে আমার এখন লাখ লাখ টাকার মালিক, অতএব এসব লোকের আসল পরিচয় দেওয়া মানেই কেউটে

সাপের মুখে পা দেওয়া !

ভগবান এইসব থানার দালাল নবকেষ্টদের শতায়ু করুন, নইলে এদেশে খুন-জখম বন্ধ হয়ে যাবে ! বন্ধ হয়ে যাবে অনেক হোমরা-চোমরাদের বাঁ হাতের উপায় ।

কান্না কবর কিয়ামত

সাঁঝবাতি জ্বলবার সময়ে হঠাৎ কাজী-বাড়িতে কান্নাগোল পড়ে গেল । সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল মুখে মুখে চারদিকে ! কাজী দৌলত হোসেন 'ইন্তেকাল' করেছেন । মেয়েরা চিৎকার করে আসমান ফাটিয়ে কাঁদছে । পাড়ার যে যেখানে ছিল ছুটে গেল । যে শুনল সেই বললে : 'ইন্ না লিল্লাহে···রাজেউন' —তাঁর আত্মার শান্তিলাভ হোক ।

কাজী সাহেব ছিলেন বি-এ পাস, সৌম্যদর্শন, সদালাপী, মিষ্টভাষী মানুষ । সমগ্র পবিত্র কোরআন তাঁর ছিল মুখস্থ । আরবী ফারসী উর্দু বাংলা ইংরেজী জানতেন তিনি । নামাজ পড়তেন—রোজা করতেন—মিথ্যে কথা বলতে তাঁর ভীষণ অস্বস্তি বোধ হত । সুদখোর, মামলাবাজ, চরিত্রহীনদের তিনি দেখতে পারতেন না । যেসব ভাষা তিনি জানতেন সেসব ভাষার কবিরা ছিলেন তাঁর প্রিয়জন । যেমন সেখ শাদী, হাফিজ, খৈয়াম, ইকবাল, রুমী, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সত্যেন্দ্রনাথ, শেকসপীয়র, শেলী, কীটস, বায়রন । কাজীসাহেব তাঁর শখের গোলাপ-বাগানে বসে সাদা পালকের কলমে জাফরানের লাল কালি দিয়ে সুন্দর করে কি সব লিখতেন । অনেক সময় দেখা যেত তিনি বুঁদ হয়ে ঈজিচেয়ারে পড়ে আছেন চক্ষু মুদে আর কোরআন শরীফের বাংলা তর্জমা পড়ে শোনাচ্ছে তাঁর কলেজে-পড়া নাতনী । বড় মেয়ের মেয়ে আম্বিয়া খাতুন । ছবিটি বড় স্নিগ্ধমধুর !

কাজী দৌলত হোসেন যৌবনে নাকি থানার দারোগা ছিলেন । ঘোড়ায় চড়ে গ্রাম-গ্রামান্তের পথ পাড়ি দিয়ে যেতেন থানার জরুরী কাজে । কখনো ঘুষ নিতেন না । সেসব অভিজ্ঞতা তাঁর বিচিত্র । খুনের কেস, আসামী থানায় এসে পায়ে ধরত, ঘুষ নিয়ে কেস হালকা করে দেবার জন্যে জোঁকের মতন পায়ে-হাতে জড়িয়ে ধরত । তিনি ভয় দেখাবার জন্যে বাতাসে চাবুক

আন্দোলিত করতেন। কিন্তু অন্য সব দারোগা পুলিসরা বিরক্ত হত। তারা ঘুষ নিত আর হাত কচলাতে কচলাতে অনুরোধ করত, 'হ্যান স্যার, বেচারীর কেসটা একটু 'মিসটিক' করে। মানে 'ধোঁয়াটে' করে।' একটি নারীঘটিত ব্যাপারে তিনি দারোগাগিরি ত্যাগ করেন। নারীটি যুবতী বধূ। স্বামী আবেদন করে তার স্ত্রীকে যেন তার বাপের বাড়ি থেকে পুলিস উদ্ধার করে এনে দেয়। স্ত্রীর বাপ কন্যাকে আটক করে রেখেছে। পুলিস গিয়ে উদ্ধার করে এনে মেয়েটিকে থানায় একরাত্রি রেখে দেয়। তার স্বামীর বদলে দেবর মেয়েটিকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে গেলেও তার হাতে ছাড়া হয়নি এই জন্যে যে স্বামীর হাতে সোপর্দ করার কথা ছিল। স্বামীকে সংবাদ দেওয়া হয়েছিল লিখিতভাবে যে সে যেন আগামীকাল তার স্ত্রীকে নিয়ে যায়।

কাজীসাহেব সেদিন থানায় ছিলেন না। কোর্টে গিয়েছিলেন একটি সেসন মামলার ব্যাপারে। রাত এগারোটায় ফিরে তিনি প্রহরী পুলিসের কাছে শোনেন একটি অদ্ভুত ব্যাপারের কথা। যুবতী নারীটির উপরে নাকি যৌন-অত্যাচার করা হচ্ছে মুখে কাপড় বেঁধে কয়েদখানার মধ্যে।

কাজীসাহেব তাঁর চেম্বারে ঢুকেই শঙ্করমাছের ছড়িটি নিয়ে প্রহরীকে ইঙ্গিতে ডেকে নিয়ে গিয়ে তিনজন অত্যাচারীকে এমন চাব্‌কালেন যে তাদের গা-হাত ফেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ল। মেয়েটিকে মুক্ত করে দিতে সে কাজী সাহেবের পায়ে ধরে কেবলই কাঁদতে থাকল: 'তুমি আমার ধরম বাপ! আমার গলায় পা তুলে দিয়ে মেরে ফেল।··· এ জীবন আমি বার করে দোব। আমার স্বামী যখন জানবে তখন আমার কি হবে?···অন্য পুরুষরা আমাকে নষ্ট করেছে···আমার তালাক হয়ে গেছে···এখন সেই স্বামীর ঘর আমি কেমন করে করব···'

কাজী দৌলত হোসেন কাঁপছেন তখন, উত্তেজনায় আর ক্ষোভে, দুঃখে। তাড়া দিলেন তিনি: 'চুপ করো। তালাক তোমার হবে না, এটা তোমার ইচ্ছাকৃত পাপ নয়। তুমি স্বামীকে কিছু জানাবে না। তুমি আমাকে 'ধরম বাপ' সম্বোধন করেছ, কাজেই বাপের হুকুম মানতে হবে। নচেৎ তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।'

মেয়েটি সারারাত কাঁদার পর সকালে স্বামী আসতেই চোখমুখ মুছে ফেলে বললে, 'আমি যাব।'

কাজীসাহেব খুশী হলেন। মেয়েটি 'কদমবুসী' (মাথা হেঁট না করে বসে পায়ে হাত দিয়ে সালাম) করে উঠলে তিনি মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন : 'এস মা !' তারপর কাজীসাহেব থানার কাজ ছেড়ে দিলেন নিজের স্বাস্থ্যের দুর্বলতা দেখিয়ে। কেননা তাঁকে খুন করবার চেষ্টা চলছিল।

এরপর তিনি কয়েকটি উর্দু পত্রিকায় মুন্সীজীর কাজ করতেন। লিথোয় ছাপার আগে তিনি তাঁর সুন্দর হস্তাক্ষরে সবটা লিখে দিতেন। আর বাকি সময় আরবী ফারসী পড়াশুনো করে কলকাতায় দিন কাটাতেন।

তাঁর পৈতৃক নাখারাজ সম্পত্তি ছিল একশো ষাট বিঘে। সাদি করেছিলেন দুটি। সন্তান-সন্ততি তাঁর মোট বারোটি। অনেক আত্মীয়স্বজন —পাড়া-প্রতিবেশী। সবাই আহা জারী করতে লাগল তাঁর মৃত্যুতে। কয়েকদিন নাকি তাঁর শরীর ভাল যাচ্ছিল না। জ্বর ··পদ্মপলাশ চোখ দুটি লাল কুঁচের মতন হয়েছিল। তিনি যখন মারা যান তাঁর বুকের ওপরে পবিত্র কোর আন খোলা ছিল। তাঁর মৃত্যুর সময় কেউ কাছে ছিল না। এক হাতে কাঁচের রঙিন বাতি আর এক গ্লাস গরম দুধ নিয়ে আম্বিয়া খাতুন ঘরে এসে ডাকলে, 'দাদু ·'

কোনো সাড়াশব্দ নেই। হঠাৎ আলো-পড়া মুখটা দেখে তার হাত থেকে দুধের গ্লাসটা পড়ে গেল।

তারপর কান্নাগোল। সন্ধ্যাবাতি জ্বলে উঠেছে সবে তখন ঘরে ঘরে।

কাজী দৌলত হোসেনের নব্বুই বছরের বুড়ো মা এখনো বেঁচে। তিনি কাঁদছেন :

আমার বাছার সমন এল
সাত আসমান,
সাত সাগরের পারে থেকে রে···
আকাশ ভেঙে বাজ নামল
'আজরাইলে'র
সোনার ডানায় ভর করে রে···
আমার বাছার 'রুহু' (আত্মা) যাবে
'বোর্‌রাকে' (স্বর্গীয় পক্ষীরাজ ঘোড়া) চড়ে
রামধনুকের পাহাড় পার হয়ে রে···

ও আল্লা, তোমার বিচার কেমন হল—
মা রইল চাঁদের বুড়ী
অশথ তলায় বসে,
ছেলে গেল অচিন দেশের
সদাগরীতে রে
ও আল্লা, তোমার 'আজরাইল' (যম)
ভুল করেছে রে—
তুমি আমাকে আমার দৌলত কাজীর
সঙ্গের সাথী করো রে'

কাজী দৌলত হোসেনের প্রথম স্ত্রী কাঁদছে :

'আমার হাতের চুড়ি কে ভাঙলে গো
কে উদোম করলে গো
আমার দুনিয়ার 'লেবাস'। (পোশাক)
কে আমাকে করলে রাতের বিবাগী,
তার নামাজ রোজার সোনার সাঁকো বেয়ে
সে চলে গেল।
আর 'অভাগী' 'কমবক্তি' পড়ে
রইল দুনিয়াদারীর 'বালা-মসিবত' (বিপদ-আপদ)
ভোগের জন্যে গো—
আল্লা আমাকে তুমি নিলে না কেন গো—'

কাজীসাহেবের দ্বিতীয় পক্ষের যুবতী স্ত্রী কাঁদছে :

'ওগো আমার দেহের মালিক
মনের মানুষ ওগো—
ওগো আমার এই 'যৈবনে'র বাগানের মালি
আমার মালাকর—
কোথায় গেলে আবার তোমাকে পাবো—
আমার মনের আঁধারে মই ঠেকিয়ে
আকাশে উঠব আর শয়তান বেহেশ্‌তের

সে-মই কেড়ে লেবে গো—
আল্লার বিচার কি এই হল ?
এই সব বাচ্ছাদের মুখ চাইবে কে ?
তোমার পালকের কলম, তোমার কোরআন,
তোমার পীরহান আর কে 'ব্যাভার' করবে ?
তুমি ছিলে মহৎ
কখনো পাঁচটা আঙুল বসাওনি গায়ে…
তোমার সাথী হতে পারি যেন বেহেশ্‌তে…

বলা বাহুল্য, কাজী বা সৈয়দবাড়ির ভাষা অনেক মার্জিত গ্রামের চাষীবাসী গেরস্তদের চাইতে।

কলেজে-পড়া-মেয়ে আম্বিয়া খাতুন সাপ-খেলানো সুরে তেমন করে কান্না শেখেনি। তার লজ্জা পায়। শুধু খাটের বাজু ধরে বসে আঁচলে চোখ মুছে কাঁদছে। তার মুখটা লাল হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে হাঁ করে শ্বাস ফেলছে। সুতো কেটে যাচ্ছে তার দুটো ঠোঁটের মাঝে। মনে হচ্ছে সেই সব চাইতে বেশি দুঃখ পেয়েছে। সে দাদুকে বুঝত, তাঁর সব কথা জানত। দাদু মাত্র গতকাল তাকে তিন হাজার টাকা, একটা হীরের আংটি আর একটা নেকলেস দিয়ে গেছেন। বলেছেন, 'এসব তোমার বিয়ের উপহার। আমি হয়তো আর বেশি সময় বাঁচব না। দীপ নিবে আসছে।'

আম্বিয়া দাদুর বুকে মাথা রেখেছিল। তখন তিনি অদ্ভুত এক ব্যবহার করেছিলেন। মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে মুখটা তার টেনে এনে চুমো খেয়েছিলেন। একেবারে ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে, মধুপানের মতো।

আম্বিয়া বাধা দেয়নি। দাদুর ব্যবহার কখনো অশালীন ছিল না। হয়তো মধুর এক স্নেহের দান এ তার জীবনে! এ চুম্বন ছিল পবিত্র—নিষ্কাম। হয়তো বাঁচার আকাঙ্ক্ষা, তাপ আহরণের ক্ষুধা!…

সেই কথাই তো ভুলতে পারছিল না আম্বিয়া। চোখের পানিতে তার বুক ভেসে যাচ্ছিল।

কিন্তু মৃত্যু বড় নিষ্ঠুর!

দুজন লোক এসে বুক থেকে কোরআন শরীফখানা চুমো খেয়ে তুলে রাখলে লাল কাপড়ে জড়িয়ে আলমারির মধ্যে। মেয়েদের সরিয়ে দিলে। বারান্দায় চার-পাঁচ আঁটি খড় এনে তার বাঁধন খুলে বিছিয়ে কাজী সাহেবের

মৃতদেহ তুলে এনে পশ্চিমদিকে মাথা করে সেই 'যমঘাসে'র ওপরে শুইয়ে একটি চাদর চাপা দিয়ে দিলে তার আপাদমস্তক।

থানার অত্যাচারিতা ধরম মেয়েটি এল তার পুত্রকন্যা আর স্বামীকে নিয়ে। সে খুব কাঁদতে লাগল। এল জামাই মেয়েরা। সকল ছেলে, ছেলেদের শ্বশুর-শাশুড়ী।

আম্বিয়া তার বাপের হাতে দিলে একটি কাগজ। দৌলত কাজীর উইল। কাকে কতখানি সম্পত্তি বা জিনিসপত্র, ঘর-দুয়ার দিতে হবে তার নির্দেশ। আম্বিয়াকে যা দেওয়া হয়েছে দেখলে তারও উল্লেখ করা আছে। এটি গতকাল পর্যন্ত ছিল না। আম্বিয়াকে দেওয়ার পর কখন লেখা হয়েছে। তাঁর নিজের হাতের লেখা। ছড়ানো অক্ষর। বাকি সবটা আম্বিয়ার হাতের লেখা। এক সপ্তা আগে এটি লেখা হয়। তাঁর বালিশের নিচে কাগজটি থাকত।

ভাগচাষে অনেক জমি বেরিয়ে গিয়েছিল তবু পঁচিশ-পঁচিশ পঞ্চাশ বিঘে জমি তিনি দুই স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের মধ্যে বখরা করে দিয়ে গেছেন। কাউকে হতাশ করেননি। সুবিচার করে গেছেন। একশোটি গিনি সোনা ছিল—সেগুলো সবাইকে বখরা করে দেবার কথা বলে গেছেন। এসব করবে বড় জামাই।

পাড়ার কারো মৃত্যু হলে সংবাদ শোনামাত্র আহাদ আলা আর রহমত সেখ আসে কবর খুঁড়বার জন্যে। তারা কোদাল কাঁধে নিয়ে এসে দাঁড়ালে গোরস্থানে গেল বড় জামাই আনোয়ার আলী। সেখানে এল হ্যাজাক লাইট। আনোয়ার আলী পায়ের জুতো খুলে দাঁড়িয়ে দোওয়া-দরুদ পড়তে লাগল। সে যা বললে তার অর্থ: 'হে কবরবাসিগণ, আপনাদের উপর আল্লার আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। সুসংবাদ নিন যে 'কিয়ামত নজ্‌দিগে' অর্থাৎ শেষ বিচারের দিন কাছেই এসে পড়েছে।'

তারপর সে কবর খুঁড়বার জায়গাটা দেখিয়ে দিতে আহাদ আলী তার পায়ের সাত 'পাউড়ী' জায়গা মেপে নিয়ে উত্তর দক্ষিণে লম্বা করে কবর খুঁড়তে শুরু করলে। 'সিথেনে'র (শিয়রের) মাটি সিথেনের একপাশে রাখলে আলাদা করে 'বিসমিল্লা' বলে প্রথম কোদাল মেরে। পায়ের দিকের মাটি রাখলে পায়ের দিকে। কবরের মাটি কবরেই দিতে হবে। অন্যখানের মাটি দেওয়া চলবে না। রহমত শুধোলে, 'কবর ছোট হবে না তো, কাজীসাহেব যে রকম লম্বা লোক!'

আহাদ বললে, 'যে যায় হাতের চোদ্দ পো মানে সাড়ে তিন হাত। কাজী সাহেবের হাত ছিল আঠারো ইঞ্চি—আমার সমান। ঠিক সাত পা মাপেই হবে।'

আনোয়ার আলী চলে এল।

একটা নতুন মাটির সরায় কুল-কাঠের আগুনে 'লোবান' ধুনো পুড়ছে। মোল্লাসাহেব মাদুরী পেতে বসে তের গজ কাফনের নতুন কাপড় ফেড়ে 'খেল্‌কা', 'পীরহান', চাদর তৈরি করছেন মাথায় টুপি দিয়ে। যে সুঁচ দিয়ে কাফনের কাপড় থেকে সুতো তুলে সেলাই করা হচ্ছে সে সুঁচ আর ব্যবহার করা চলবে না।

কান্নাগোল চলেছে মেয়েদের।

টর্চ জ্বেলে হিন্দু গণ্যমান্য লোকরা আসছেন পাশের গ্রাম থেকে। তাঁরা দেখে সহানুভূতি জানিয়ে চলে যাচ্ছেন। বাড়ির মধ্যে এই রাতকালেও লোক ধরে না।

'চুলোয়' বিরাট তামার দেগ হাঁড়িতে পানি গরম করা হচ্ছে। তাতে দু-চারটে কুলপাতা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। 'গোসলে'র (স্নানের) ব্যবস্থা হচ্ছে। কাটারি মেরে বাঁশ কাটার শব্দ হচ্ছে সামনের ঝাড় থেকে।

দরদালানের একদিকে কাপড় দিয়ে ঘিরে দেওয়া হল। যারা 'গোসল' দেবে তারা 'ওজু' (পবিত্র হয়ে হাত মুখ ধুয়ে) করে এসে কাজী সাহেবের লাসটা অতি যত্নে ধরে তুলে আনল ঘেরা জায়গার মধ্যে। এর মধ্যে গোসলের সময় শোকবিহ্বল হয়ে চোখের পানি ফেলা নিষিদ্ধ। দোওয়া-দরুদ পড়তে থাকে সকলে। পুরুষরা পুরুষদের গোসল দেবে। মেয়েরা মেয়েদের—এই বিধি। একটি তক্তার ওপরে লাস শোয়ানো হবে।

কাজীসাহেবের দেহের পোশাক খুলে ফেলা হল। লোটায় করে অল্প একটু গরম-করা-পানি আস্তে আস্তে একজন ঢালতে লাগল মাথা থেকে পা পর্যন্ত 'লা ইলাহা ইল্‌লাল্‌লা মোহম্মদর রসুলাল্‌লা' বলতে বলতে। সবাই তাই পড়তে লাগল অস্ফুটস্বরে গুনগুন করে। সুগন্ধি সাবান মাখানো হল সারা দেহে বিশেষ প্রক্রিয়ায় পেটের মধ্যের ময়লা বার করে দিয়ে। পানি ঢালা হতে লাগল। মোল্লাজী কয়েকটি ছোট ছোট টুকরো কাপড়ে মাটির ঢেলা বেঁধে 'কলুপে'র (পায়খানা প্রস্রাবের দ্বার মোছার জন্য ব্যবহৃত দ্রব্য) দুটি পাঠালেন। এমনভাবে শরীর পরিষ্কার করতে হবে যেন এতটুকু একটু ময়লা

কোথাও না থাকে। গোসল দিতে ঘণ্টা দুই সময়ও লাগতে পারে। গোসলের নোংরা পানি গড়িয়ে এসে পড়বার জন্যে ছাঁচের নিচে কোদাল দিয়ে গর্ত খোঁড়া হয়েছে। সেই গড়ানো পানির দিকে তাকালে এক বিষাদ ভাব মনকে আচ্ছন্ন করে।

গোসল শেষ হলে মোল্লাজী কাফনের 'খেল্‌কা', 'পীরহান', চাদর, 'তহবন' পাঠিয়ে দেন 'লোবানে'র ধোঁয়ায় সেঁকে আতর, গোলাপপানি ছড়িয়ে-মাখিয়ে দিয়ে। খুব সাবধানে নোংরা পানির স্পর্শ বাঁচিয়ে লাস তুলে ধরে 'খেল্‌কা' 'পীরহান' ইত্যাদি পরানো হবে। তারপর চাদরে ঢেকে ফেলে পায়ের দিকে একজন এবং মাথার দিকে আর একজন ধরে তুলে এনে অঙ্গনের-উপর-রাখা-খাটের মধ্যে শুইয়ে দিলেই মেয়েরা শেষবার শেষ বিদায়ের কান্নায় ফেটে পড়বে। যাদের 'ষোল আনা'র (সমাজের) বাঁধানো কাঠের খাট থাকে না তারা আনে কাঁচা বাঁশের খড় দিয়ে বাঁধা খাটুলি। ছেলে জামাই ভাই ভাগনে ভাইপো যারা থাকে, গোসল করে, 'ওজু' করে, ভাল কাপড়চোপড় পরে এসে খাটে কাঁধ দেয়। দরুদ শরীফ পড়তে পড়তে লাস নিয়ে চলে যায় পুরুষরা সকলে কবরখানার উদ্দেশে। একজন লোক মৃতের বুকের উপর হাত দিয়ে চলতে থাকে।

কবরস্থানের সন্নিকটে কোনো পরিষ্কার জায়গায় খাট থেকে লাস মাটিতে নামিয়ে রাখা হয় উত্তরদিকে মাথা করে। মোল্লাজী 'জানাজা' পড়ান মৃতের কোনো নিকট আত্মীয়ের অনুমতি পেয়ে। প্রবাদ এই যে, কোনো জ্যান্ত মানুষকে শুইয়ে এই 'জানাজা'-র নামাজ পড়া হলে তার প্রাণবায়ু নাকি উড়ে যাবে!

এরপর কবরের কাছে আনা হবে লাসকে।

কবর খোঁড়ার কাজ শেষ হলেও শূন্য কবর ছেড়ে যাওয়া নিষিদ্ধ। যারা কবর খুঁড়বে তারা স্নান করে না-আসা পর্যন্ত 'জানাজা' পড়া হয় না। লাস এলে দুজন লোক নেমে যায় কবরের দু' মাথায়। কবরের ভিতরটা চমৎকার মসৃণ। একবুক নিচু। লাস ধরে নিয়ে নামিয়ে আস্তে শুইয়ে দেওয়া হলে হাতের ওপর ভর রেখে পায়ের দিকের লোকটি উঠে আসে। মাথার দিকের লোকটিকে মোল্লাজী 'মুর্দা'র মুখের কাফন খুলে ফেলতে বলেন। তারপর পবিত্র কোরআন থেকে একটি আয়াত পাঠ করেন তিনবার। লোকটিকে তা আবৃত্তি করতে হয় আর প্রতিবার মৃতের মুখের কাপড় খুলে আবার চাপা

দিতে হয়। একে বলে 'শেষ মুখ দেখানো'। আয়াতের ভাবার্থ সম্ভবত এই: এই পৃথিবীর আলো বাতাস, যেখানে তুমি ছিলে, আজ তা ছেড়ে তুমি বিদায় নিয়ে যাচ্ছ!

তারপর মুখটি যেদিকে মক্কার কাবাশরীফ (ভারতের পশ্চিমদিকে) সেদিকে ঈষৎ হেলিয়ে চাপা দিয়ে উঠে এলেই কাঁচা বাঁশের 'পাড়ন' বা পাটাতন বিছিয়ে দেওয়া হবে কবরের উপর-মুখে লম্বালম্বি। তারপর 'এড়ো' বাঁশের ফালি দিয়ে তার উপর দিতে হবে কাঁচা তালপাতা, মাদুর অথবা খড় বিছিয়ে। কোথাও যেন ফাঁক না থাকে।

এরপর সবাই এক মুঠো মাটি হাতে করে ধরলে মোল্লাজী পবিত্র কোরআনের ২০ নম্বর সুরা 'তা হা'-র তৃতীয় অনুচ্ছেদের ৫৫ নম্বর আয়াতটি তিন অংশে ভাগ করে করে বলবেন: 'মিন্‌হা খালাক্‌নাকুম' [এই (মাটি) থেকে তোমাদের আমি সৃষ্টি করেছি] সকলে মাটি দেবে এই কথাটি বলে প্রথম।

আবার মাটি নিয়ে দ্বিতীয়বার: 'অ-ফিহা নোয়িদোকুম' [আর এতেই (এই মাটিতেই) তোমাদের ফিরে পাঠাবো] বলে মাটি দেবে কবরে।

তৃতীয়বার বলতে হবে: 'অ-মিন্‌হা নোখরেজোকুম তারাতান ওখারা' [আর এর (এই মাটি) থেকেই আমি তোমাদের দ্বিতীয়বার তুলব]।

তারপর শিয়রের মাটি শিয়রে, পায়ের মাটি পায়ের দিকে বসিয়ে দিয়ে কবরের উপর মাটি টেনে দেওয়া হবে। কোদাল ধরে মাটি টেনে দিতেও দোষ নেই। কবর উঁচু হলে হাত দিয়ে চেপে চেপে সমান করে এক ঘড়া বা এক বালতি পানি মাথার দিক থেকে পায়ের দিক পর্যন্ত আস্তে আস্তে ঢেলে দিতে হবে। নারীর কবর হলে বুকের সোজা একটা ছোট ঢিবি করে দেওয়া হয়। মেয়েদের কাউকে কবর দিতে আসতে নেই। এরপর চারটে খেজুর পাতা ধরবে চারজন। সুরা ফালাক, সুরা কাফেরুন, সুরা নাস, সুরা ইখলাস (যে কোনো চারটি সুরা) থেকে একটি করে আয়াত পাঁচ বার বা সাত বার পড়ে কবরের চার মাথায় সেই খেজুরপাতা পুঁতে দিয়ে তাদের জটা বেঁধে দিয়ে যে যা জানে দোওয়া-দরুদ পড়ে 'মোনাজাত' বা প্রার্থনা করে সারা কবরস্থানে গোলাপপানি ছড়িয়ে দিয়ে চলে আসবে। অনুপস্থিত ব্যক্তি সংবাদ পেয়ে ফিরে এলে তিন দিন পর্যন্ত কবরে মাটি দেওয়া যাবে।

মৃতের বাড়ির লোকজনকে গোসল করিয়ে খাওয়া-দাওয়া করানোর জন্যে

আত্মীয়স্বজন বা প্রতিবেশীরা ধরে নিয়ে যাবে।

সাত দিন, একুশ দিন বা একচল্লিশ দিন পরে 'ছোলা পড়ানো'। 'কাঁধি কোদালে' খাওয়ানো। কবরের ব্যবস্থা বাদশা থেকে ফকিরের পর্যন্ত ইসলামে একই বিধি—সারা বিশ্বের মুসলমানের জন্য। 'ছোলা পড়ানো' ব্যাপারটা হল, কিছু ছোলা আগের দিন ভিজিয়ে রাখা হয়। 'দাওয়াত' (নিমন্ত্রণ) দেওয়া মোল্লা বা মৌলভীরা এসে কয়েকজন সেই ছোলা একটা একটা নিয়ে 'লা ইলাহা' বলে পড়তে থাকেন। আগে ক'হাজার ছোলা আছে গুনে নিয়ে কতবার পড়লে তবে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার বার পড়া হবে তা ঠিক করে নিতে হয়। কেননা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর গত হয়েছেন হজরত আদম থেকে হজরত মোহম্মদ পর্যন্ত। এরপর আর পয়গম্বর হবেন না। ছোলা পড়বার সময় শুধু 'লা ইলাহা' বলা না-জায়েজ। কেননা এর অর্থ 'নাই আল্লা'। বলতে হবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লা'—বাকিটা মাঝে মাঝে বললেও চলবে।

মৌলভীরা আগেই কোরআন শরীফ পড়ে 'খতম' করে রাখেন। পড়তে বাকি থাকলে এসে পড়ে নেন। ৩০ সেপারা পাঁচ-সাতজনে ভাগ করে নিয়ে পড়েন। এ সব কাজ শেষ হলে কবর 'জিয়ারত' করতে যেতে হয়। তারপর 'খানা' খাওয়ানো হয়। যার যেমন ক্ষমতা সেই অনুসারে ব্যয় করে।

দৌলত কাকার ছেলেরা, তার খানার-জন্যে-রেখে-যাওয়া তিন হাজার টাকা ব্যয় করে। পাড়ার লোককে খানা খাওয়ায়। খতম পড়ায়। 'মিলাদ মহফিল' দেয়। 'আতথ'-'মিসকিন'দের কাপড় টাকা-পয়সা দেয়। মৌলভী মোল্লাদের টাকা দিতে হয়। যদিও তাঁরা তা চান না।

মৃতের আত্মা 'ইল্লিন' অথবা 'সিজ্জিন' দুই স্থানের যেখানে হোক লটকানো থাকে। প্রথমটি পুণ্যাত্মাদের, দ্বিতীয়টি পাপীদের জন্য।

আল্লা বলেছেন, আবার আমাদের কবর থেকে তোলা হবে।—আমাদের আত্মা এসে দেহ খুঁজে নেবে। কিয়ামতের ময়দানে বিচারের ফলাফল ভোগের জন্য সকলে দাঁড়াবে। পৃথিবী তার আগেই, ইস্রাফিল ফেরেশ্তা শিঙ্গা বাজালে, ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। পাহাড় পর্বত তুলোর মতন উড়তে থাকবে। সর্বত্র সমতল হয়ে যাবে। মাথার ওপরে সূর্য নেমে আসবে। আর তার হাজার মুখ খুলে দেওয়া হবে। ঘামের দরিয়া বয়ে যাবে। যে যত পাপ করেছে তার হাত পা ইন্দ্রিয় সব সাক্ষী দেবে। আত্মা সঠিক উত্তর

দেবে যখন প্রশ্ন করা হবে। পাপিষ্ঠদের মূর্তি হবে বিকৃত। মাথা থাকবে উল্টো দিকে। পুণ্যাত্মাদের মুখমণ্ডল হবে জ্যোতির্ময়। এ সব বর্ণনা আছে 'খয়রল হাসার' নামক বাংলা পুঁথিতে। রোমহর্ষক সেসব বর্ণনা। কোরআন শরীফের সুরায় বহু স্থানে পাপীদের প্রতি কিরকম কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে আর 'মোমিন' বা পুণ্যাত্মাদের শীতল নদী, সরাবন তহুরা বা সুরা, স্থিরযৌবনা, কিশোরী বা যুবতী, রেশমের পোশাক, প্রবাল মণিমুক্তার প্রাসাদ আর আঙুর, খেজুর দান করা হবে তার বর্ণনা আছে। কিয়ামতের বিচারের পর পাপীদের উদ্ধার করবেন সে সময় একমাত্র ব্যক্তি তাঁর সানুনয় রোদন আর সুপারিশের দ্বারা—তিনি চিরদুঃখী দরিদ্র অসহায় পাপাত্মা মানুষের বন্ধু—আল্লার পিয়ারা দোস্ত হজরত মোহম্মদ (তাঁর উপরে আল্লার করুণা বর্ষিত হোক)।

পাপী আর পুণ্যাত্মাদের সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনে আল্লা বলেছেন :

'অপরাধীদের সেদিন চেনা যাবে তাদের লক্ষণের দ্বারা, আর ধরা হবে তাদের চুলের ঝুঁটিতে আর পায়ে।' [৫৫ : ৪১]

'এই সেই জাহান্নাম অপরাধীর দল যাকে মিথ্যা বলত।' [৫৫ : ৪৩]

'ছুটোছুটি করবে তারা এর (আগুনের) আর টগবগ করে ফোটা পানির চারদিকে।' [৫৫ : ৪৪]

'(বেহেশ্‌তবাসীরা) তাকিয়া হেলান দিয়ে বসবে ফরাশে, তার ভিতরের আস্তরণ কারুখচিত রেশমের, আর দুই উদ্যানের ফল সব হাতের নাগালে।' [৫৫ : ৫৪]

'সে সবের মধ্যে থাকবে নতনয়নাগণ—স্পর্শ করেনি তাদের এর পূর্বে মানুষ অথবা জিন।' [৫৫ : ৫৬]

'তারা যেন পদ্মরাগ ও প্রবাল।' [৫৫ : ৫৮]

কিন্তু একটি প্রশ্ন থেকে যায় কাজী দৌলত হোসেনের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর পক্ষ থেকে—যে তার কান্নায় 'মনের আঁধারে মই ঠেকিয়ে বেহেশ্‌তে উঠতে চায়'—যদি শেষ বিচারের পর বেহেশ্‌তে যেতে পারে তবে সে কি পাবে? বহু নারীই বেহেশ্‌তে যাবেন—তাঁরা কি পাবেন তার পরিষ্কার কোনো নির্দেশ আমরা পাইনি। 'হুর'-'গেল্‌মান' কথাটি পাওয়া যায়। 'হুর' যদি নারী হয়

(যাদের মানুষ অথবা জিন ছোঁয়নি কখনো। বলা বাহুল্য, পৃথিবীর কোনো নারীই 'হুর' হতে পারবেন না) তাহলে 'গেল্‌মান' কি পুরুষ-জাতীয় ? যারা লীলা করবে আপনার স্ত্রী, আমার বোন, অন্যের মায়ের সঙ্গে। বেহেশ্‌তে কি কাণ্ডটাই না হবে তাহলে। প্রার্থনা করি, সেদিন যেন আমরা জ্যোতির্ময় চেহারা পেয়ে কেউ কাউকে চিনতে না পারি! কিন্তু কিয়ামতে যখন সারাজীবনের পাপপুণ্যের হিসেব দিতে হবে তখন আমাদের স্মৃতি বিলুপ্ত হবে কেন ?

তাহলে ?

তাহলে আপনার কালো স্ত্রী আলোময়ী হবেন বেহেশ্‌তে গিয়ে আর রূপবান 'গেল্‌মান' (কিশোর ?) পাবেন আপনি তা সইতে পারবেন না বলেই আল্লা খুলে কিছু বলেননি। কেননা আমাদের মনের খবর তিনি তো জানেন!

জিব্রিলের ডানা

['জিব্রিল' বা 'জিবরাইল' হল স্বর্গীয় দূত যে হজরত আদম থেকে হজরত মোহম্মদ পর্যন্ত এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বরের কাছে আল্লার বাণী বয়ে এনেছিল বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য। তার ছিল সোনা-রুপো-হীরে-মণি-মুক্তো-চুনী পান্নায়-খচিত বিচিত্র বর্ণের অপূর্বসুন্দর 'পর' বা ডানা। সেই ডানায় লাগত মহাকাশের ঝড়। সে আসত 'কোকাফে'র অন্ধকার ভেদ করে পৃথিবীতে আলোর বার্তা নিয়ে।]

চার-পাঁচ বছর বেলার স্মৃতি, যত দূর মনে পড়ে আমার বাবার মূর্তিটা ছিল অনেকটা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের মতন। তাঁর ব্যবহার ছিল শান্ত মধুর। বত্রিশ বছর হল তিনি মারা গেছেন, কিন্তু তাঁর কথা আজো কেউ ভোলে নি। আমাকে কেউ কেউ বলে : যতই চেষ্টা করো, লেখাপড়া শেখো, তোমার বাপের মতন মিষ্টভাষী, সদালাপী, জ্ঞানী-গুণী, ধার্মিক পুরুষ তুমি হতে পারবে না। তিনি কখনো কাউকে 'তুই' বলতেন না। অশ্লীল কথা বলতেন না। বিড়ি পর্যন্ত খেতেন না। নেশার মধ্যে ছিল পান, জর্দা, চা আর

কায়দা-কেতাব পড়া—যে-লোককে সামনে পাবেন ধর্মোপদেশ দেওয়া—সদ্যুক্তি দেওয়া। তিনি পাঁচওয়াক্ত নামাজ পড়তেন। রোজা করতেন। মসজিদে ইমামতি করতেন কালো লম্বা পীরহান গায়ে দিয়ে, মাথায় সুন্দর সাদা পাগড়ি জড়িয়ে। মিলাদ শরীফ হলে তিনি সুরেলা 'জেহেনে' কোরআন পাঠ করে তার ব্যাখ্যা করে দিতেন উর্দু ভাষায় আর বাংলাতে। হাফেজের গজল ছিল তাঁর প্রিয় জিনিস। ভাল ফারসীও তিনি জানতেন। এসব শিখেছিলেন বজবজের চটকলে তাঁতে কাজ করবার সময়ে—রেলপোলের পাশেই চটকলের গেটের কাছেই যেখানে ছিল একটা মুসলিম হোটেল, আর বেদী বাঁধানো একটা নিম গাছ, সেই গাছে ছিল রাজ্যের কাকের বাসা, সেখানে বাসাবাড়িতে থাকতেন তিনি। তাঁর পাশের বাসায় থাকতেন একজন সহকর্মী, তিনি ছিলেন আরবী উর্দু ফারসীতে দক্ষ। তাঁর কাছেই এসব ভাষা শেখেন তিনি। শনিবারে কারখানার 'সপ্তা' পেলে বাড়িতে আসতেন। রবিবারে তাঁর কাছে ভিড় হত লোকজনের। পাড়ার বিচার, ধর্মের নির্দেশ, সন্ধ্যার দিকে পুঁথি পড়া শোনা, মুরগী খাসী গরু তাঁর হাতে জবাই না হলে নাকি ঠিক 'হালাল' (পবিত্র) হত না। তারপর তাঁর ছিল অনেক বাড়ির 'দাওত' (নিমন্ত্রণ)। শাদি পড়াবেন তিনি। মৃতের 'জানাজা' পড়াবেনও তিনি। তাঁর মুখে ছিল সুন্দর চাপ-দাড়ি। ঠোঁট দুটো পানের রসে রাঙা আর হাসি মাখা। মাথায় ঈষৎ একটু টাক। ছোট ছোট চুল। গায়ের রঙ ফরসা। বুক ভরা লোম। চোখ দুটি বিকশিত, গোলাপী—বুদ্ধির কুটিল তীক্ষ্ণতার চাইতে তাতে ছিল একরকম স্নিগ্ধ সরসতা।

আমার এই বাবাকে হারাই আমি আমার ছ-বছর বেলাতে। মনে পড়ে তাঁর সঙ্গে একদিন গিয়েছিলাম বজবজের চড়িয়াল বাজার আর রেলপোল দেখতে। পথে পাথর আর সোডার বোতলের মুখের ছিপি কুড়িয়েছিলাম পকেট ভরে। বাওয়ালীর বড়পোল থেকে বাগমারির জটাধারীতলা পর্যন্ত পিঁড়েয় বসে শাল্‌তিতে করে গেলাম। তখন পাকা রাস্তায় মোটর বাস ছিল না। কি সুন্দর জল চিরে চিরে মানুষ নিয়ে খালের ওপর দিয়ে সেই যাওয়া! একটা জোয়ান লোক, খুব কালো, মস্ত এক ধজি-বাড়ি পুঁতে শাল্‌তি ঠেলে চলল। তোলার সময় ধজিটার জল ছিটকে পড়তে লাগল রোদে ঝরে পড়া রুপোর দানার মতন। লোকটা তারস্বরে গান করছিল 'জয়কালী জয়কালী বলে ভাসালাম তরণী ..' পিঠের চাল কনকন করতে লাগল। বেলাভর যেন

শাস্তি চলেছে, কখন শেষ হবে বার বার শুধিয়েছি বাবার মুখ ধরে। তিনি বলেছিলেন, 'এই তো বাবা, এসে পড়েছি, এবার রেলপোল দেখবে। কলের চিম্‌নি দেখবে!' তারপর বোধহয় বাবার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে আমার মায়ের গলার দোলনায় গাওয়া সেই গানটা শুনতে পেতে লাগলাম:

'কোথায় দিয়ে যাব মাগো
শিবতলার ঘাট
শিবতলার ঘাটে যেতে
গলা হল কাঠ।
ঘাটে যেয়ে দেখি মাগো
জল থই থই করে,
চাতালে তার শিউলী বকুল
ডালিম ঝরে পড়ে।'...

আগুনে লাল রঙ দেওয়া সেই রেলপোল দেখা ছিল সেদিন আমার এক চরম বিস্ময়! বাবার বাসার ঠিক দুটো বাসা পরেই দোরের ওপরে ছিল একটা জয়ঢাক টাঙানো! হোটেলের মালিক আর দুজন কাবুলী বাবার হাত ধরে কতকক্ষণ গুনগুন করে গদগদ ভাষায় কিসব যেন বললেন! কী খুশী তাঁরা। কারা যেন খাবার দিয়ে গেল। সেই ন্যাড়া হাজী সাহেব এলেন, যিনি নাকি আমার নাম রেখেছিলেন। উর্দু আরবী ফারসীর জাহাজ! তিনি আমাকে বুকে চেপে কানে কানে বলেছিলেন যখন আমার বাবা টিউকলের জলে মাথা ধুতে গেছিলেন: 'তোমার বাবাজীর মাথা গরম হয়ে গেছে! তোমরা সাবধানে ওঁকে ছাড়বে!'

মাথা গরম!..... সে আবার কি রকম জিনিস?

কখন কেমন করে আমরা বাড়িতে ফিরেছিলাম তা সঠিক আমার মনে নেই। পরদিন সকালে দেখি ঘৃতকুমারীর শাঁসঅলা পাতা মাথায় দিয়ে বাবা বসে আছেন, আর তাঁর চোখে জল ঝরছে, মা ক্ষুব্ধ হয়ে বলছে, 'কি করে চলবে সংসার, আধমণ ধান নিয়েছিলে তোমার বড় ভাইয়ের কাছ থেকে, তোমার বড় ভাজের কি মুখসাপ্‌টা—'টাকাটা দেবার কি আজো সময় হয়নি...'

আমি পাড়ার হানিফ আর তার বোন জিনাত-উন-নিসার সঙ্গে গেলাম

বাম গুরুমশায়ের পাঠশালে। এদিকে মা নাকি আমাকে কী খোঁজাখুঁজি! নিজের ইচ্ছায় পাঠশালায় যাচ্ছি দেখে একদিন লাঠি ঠুকে ঠুকে বাবাও গেলেন গুরুমশায়ের কাছে। তিনি যেতেই বাম গুরুমশায় বললেন: 'কে রে তাজিম এসেছিস, আয় বস্! তুই কি এখন চোখে দেখতে পাস্‌নে? তোর নাকি মাথা গরম হয়েছে?'

বাবা ছিলেন বাম গুরুমশায়েরও ছাত্র। তিনি নাকি পাঠশালায় এসে মাথা গুঁজে সেই যে লিখতে বসতেন একেবারে 'বুড্‌কে' শেষ না হওয়া পর্যন্ত মাথা তুলতেন না। বাম গুরুমশায় তাঁকে বড় পছন্দ করতেন।— এসব কথা বলত করিম গাড়োয়ান। সে ছিল বাবার সহপাঠী।

আর বড়মামা পাঠশালায় না এলে তাকে বাম গুরুমশায় ধরে আনতে ছেলেদের পাঠাতেন। বড়মামা ভাতের হাঁড়ি জড়িয়ে ধরে বসে থাকত। হিন্দু ছেলেরা কেউ এগোত না!

আমাদের এদিকের দশখানা গ্রামের লোক যারা কিছু লেখাপড়া জানে —সেই ঠাকুরদাদা থেকে নাত্‌নী পর্যন্ত—সবাই ঐ বাম গুরুমশায়ের ছাত্র। সবার পিঠে পড়েছে বাম গুরুমশায়ের তেঁতুলে বিছের-গায়ের-মতন লাল আর তেলপাকানো মোটা বেতের চাব্‌কানি। তাঁরই উক্তি, 'তাজিমকে আমি কখনো এক-ঘা মেরেছি বলে মনে পড়ে না। অমন ভাল ছেলে আমি দেখিনি।'

সেই তাজিম সাহেব আজ চল্লিশ বছর বয়সে মাথা গরম হয়ে চোখের দৃষ্টি হারিয়ে তাঁর পাঁচ বছরের ছেলেটার হাত ধরে এনে গুরুমশায়ের পায়ের কাছে বসে বলছেন: 'গুরুমশায়, আপনি আমার যে চোখে আলো দান করেছিলেন তার দৃষ্টিশক্তি আজ খোদা কেড়ে নিয়েছেন! আমার মাথার ভিতরটা কন্‌কন্ করে। মাঝে মাঝে এত যন্ত্রণা হয় যে মনে করি জীবনটা বার করে দিই। কিন্তু আত্মহত্যা মহাপাপ! তাছাড়া বাচ্চা দুটো রয়েছে—অবলা স্ত্রীটা রয়েছে ঘরে···যাহোক, আপনি আমার প্রথম জ্ঞানগুরু, আমার পিতৃতুল্য, আপনার ঋণ আমি কি দিয়ে শোধ করব! তবে আমার এই সন্তানটিকে আপনার পায়ে দান করে গেলাম। এ আমার একটি রক্তজবা! এর ডাক নাম জবা! আমার শেষ প্রার্থনা, একে মানুষ করবেন!···'

বাম গুরুমশায় বৈষ্ণব হলেও সেদিন বোধহয় যবন হরিদাসের স্মৃতি তাঁকে বিহ্বল করেছিল—তাই নিজের উড়ানির প্রান্ত দিয়ে আমার রোরুদ্যমান

বাবার চোখমুখ মুছিয়ে দিয়ে, নিজেও কেঁদে ফেলে বলেছিলেন, 'আচ্ছা আচ্ছা, তাজিম, তোমার কোনো ভয় নেই, তোমার ছেলেকে আমি লেখাপড়া শেখাব - মাইনে-পাতি কোনো কিছুই লাগবে না।'

তারপর বাবা বিচিত্র লাল-কাঁকড়ারা-সুট্‌সুট্‌-করে-গর্তে-ঢোকা—গেঁয়ো, সাঁই-বাবলা, করোমচা, পানশিউলী, বাটাং-বন-ঘেরা খালধারের পথ ধরে লাঠি ঠুকে ঠুকে একাই বাড়িতে চলে এসেছিলেন কেমন করে আমি তা জানি না!

আমার কোলের বোনটি, যার নাম ছিল নাকি নাজিয়া খাতুন, সে যে কবে মারা যায় তাও আমি জানি না। আর একটি ছোট ভাই ছিল কোলে। তাকে আমি কোনো এক অন্ধকার রাত্রে লম্ফের আলোয় আমাদের সেই মাটির কুঁড়েঘরের মধ্যে হতে দেখেছিলাম।

এরপর আমার জীবনে সেই এক চরম ভোরবেলা! কারা যেন চিৎকার করছে। শীতকাল। কাঁথা খুলে ন্যাংটো ভোঁদড় হয়ে বাইরে এসে দেখলাম, কী কুয়াশা! ছাঁচের ধারে কতকগুলো পাণ্ডবপোড়া শুক্‌নো (দেওয়ালের) মাটির ঢেলা। বাবা প্রস্রাব করার পর 'কুলুপ' নিতেন এই ঢেলা দিয়ে জল না পেলে। একটা তামার লোটা উল্টে পড়ে আছে নলটা পৃথিবী-মুখো হয়ে। চাচাদের বাড়িতে হই-চই। বড়চাচী বললে: 'ওরে, তোর বাপ গলায় দড়ি দিয়ে মারা গেছে রে! হায়, কি হল রে……তোর মায়ের কাছে যা-না' ভোরবেলা তোর বাপ ডেকে দিতে সে তোর মামার বাড়ি ধান 'কুটতে' (ভানতে) গেছে যে রে '

দেখলাম গোয়ালের 'আড়কাটায়' সেই কার যেন মৃত্যুর পর 'জানাজা' পড়ানোর কাপড়টা—যেটা শীতের সময় মা আমার গলায় বেধে দিত—সেইটা পাকিয়ে গলায় দিয়ে ঝুলে আছেন আমার জ্ঞানীগুণী বাবা। তিনি কখন লুকিয়ে আমাকে ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন করে রেখে কাঁথা চাপা দিয়ে মুখে মাথায় চুমু খেয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে এসে 'এককড়া' একটা মই খুঁজে নিয়ে উঠে গলায় ফাঁস পরিয়ে দিয়ে মইটা পা দিয়ে সরিয়ে ফেলে দিয়ে ঝুলে পড়েছেন!

যখন তিনি নাকি ছট্‌ফট্‌ করছিলেন তখন দেখতে পায় আমার জ্যাঠতুতো ভাই। সে বলতে, বড় চাচা ছুটে গিয়ে চাগিয়ে তুলে ধরতে যাচ্ছিলেন কিন্তু বড়চাচী তাঁকে জড়িয়ে ধরে রেখেছিল, যেতে দেয়নি। কারণ, আগের দিন

নাকি মা আর বড়চাচীর মধ্যে বিষম ঝগড়া হয়েছিল এক টাকায় সেই যে আধ মণ ধান দিয়েছিল ওরা, তাই নিয়ে। মা নাকি বলেছিল, 'আমাদের কত টাকা গেল ভাসুরের পিঠে 'বাগি ফোঁড়া' উঠে যখন তিনমাস শয্যাশায়ী ছিল—আমরা কি টাকা চেয়েছিলুম ?' ঝগড়া চরমে উঠতে চাচী ঝাঁটা নিয়ে আমার মাকে মারতে তেড়ে এল! আমার বাবা চুপ করে দেখলেন! বড় চাচাও কিছু বললেন না। বাবা নাকি বলেছিলেন, 'বড় ভাইয়ের দোজ-পক্ষের নিকের বউ! আদুরে! বলবে কী! তার কথায় ওঠে বসে! হায়রে কপাল! সামান্য একটা টাকার জন্য আমার সামনেই আমার স্ত্রীকে ঝাঁটা মারতে এল—আর আমি বেঁচে থেকে সেই দৃশ্য দেখছি—এর চেয়ে না-বাঁচাই ভাল!…কাল তো আমি খোকার হাত ধরে ভিক্ষে করেও এলাম! আমার মরণ ভাল।'… তারপর মাকে তিনি তাঁর হাতের ছড়ি দিয়ে মেরেছিলেন!

পাশের গ্রামে মামাদের বাড়িতে সেই ভোরবেলা, শীতের সময় কুয়াশা ঠেলে ঠেলে, ছ-বছরের ছেলে, সম্পূর্ণ উলঙ্গ, বুকে হাত বেঁধে কাঁপতে কাঁপতে, কাঁদতে কাঁদতে কেমন করে যে মায়ের কাছে গিয়েছিলুম বাঘ ভূত শিয়াল শাঁকচুন্নির ভয় ভুলে, আজ আর সেসব কিছু মনে নেই! মনে করতে গেলে ভিতরের চোখের জলে সবটা কেমন যেন লবণাক্ত হয়ে যায়। কুয়াশা আরো ঘন হয়ে ওঠে।…

মা আর বড়মামী ধান ভানছিল। নানী (দিদিমা) ঢেঁকির গড়ে হুমড়ি খেয়ে খেয়ে ঢেঁকি পড়ার পর ফাঁক পেলেই নেয়ো বাড়িয়ে স্থটস্থট করে ভানা ধান তুলে নিচ্ছিল। হঠাৎ আমাকে আসতে দেখে ঢেঁকি বন্ধ হয়ে গেল। মা বোধহয় আতঙ্কিত ছিল কোনো কিছু দুর্ঘটনার জন্যে। ছুটে নেমে এল ঢেঁকির 'পেতেন' থেকে। আমাকে জড়িয়ে ধরে শুধোলে, 'কিরে, কি হয়েছে বাবা, কাঁদছিস কেন ? এঃ! গা একেবারে হিম হয়ে গেছে যে রে…একলা কি করে এলি!…'

আমি মায়ের বুকে লুকিয়ে পড়ে একটু গরম খুঁজতে খুঁজতে বললাম: 'বাবাজী গলায় দড়ি দিয়ে মারা গেছে!'

সংবাদটা শোনা মাত্রেই মায়ের চোখের ডিম দুটো যেন ঘুরতে লাগল কিছুক্ষণ। তারপর আমাকে ছিটকে সরিয়ে দিয়ে বুক চাপড়ে কাঁদতে লাগল। মাথা কুটতে লাগল মাটিতে। নানী চিৎকার করে আকাশে হাত তুলে আমার বাবার উদ্দেশে বলতে লাগল: 'হায় বাবা, একি করলি তুই! আমার কাঁচা

মেয়ের 'যৈবন'টা তুই অকালে কোথায় ভাসালি রে! হায় বাবা, তুই ছিলি জ্ঞানমান ব্যক্তি, তুই অপঘাত মরণে কেন মরতে গেলি রে!...'

আমার একটা বড়বোন আছে, তাকে আমি ছোটবেলায় বেশি দেখিনি। কারণ 'হুড়গুড়ি'র বছরে নাকি পাঁচ বছর বেলায় তার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল আমার এক মাসতুতো ভাইয়ের সঙ্গে। 'হুড়গুড়ি' জিনিসটা কি? মা বলে, 'চারদিকে জোর গুজব রটেছিল 'গরমেণ্টো' একটা আইন করতেছে ১৪ বছরের কম বয়েসের মেয়েদের এরপর থেকে আর বে' দেওয়া যাবে নে! তাই তোর বুবুর বে' হয়ে যায় 'কোচ চিগ্‌নে' বেলাতেই।

মামাবাড়ির পাশেই ছিল মেসোদের বাড়ি। সেখানেই থাকত আমার বড় বোন। বড় কেঁদেছিল সে বাবার জন্যে।

মামাবাড়ির সবাই এল ঝেঁটিয়ে। মহা কান্নাগোল পড়ল। লাস তেমনি ঝুলছে। বাবার জিভটা একপাশে বেরিয়ে রয়েছে। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে পড়েছে!

মৃত্যু কী ভীষণ! বাবা একবার জবির মল্লিকের একটা কালো দামড়া গরু জবাই করার সময় তার অমনি সাদা আমড়া আমড়া চোখ বেরিয়ে পড়েছিল! (আমি ভয়ে চিল-চিৎকার করে পালাতে সবায়ের সে কী খলখল করে হাসি!)

বড়মামা থানা থেকে পুলিস আনলে। বড়চাচা হাতে ধরে অনুনয় করাতে ঝগড়া ফাসাদের কথাটা আর তুললে না বড়মামা। বললে, 'যে গেছে তাকে তো আর পাওয়া যাবে না। তবে লোকটা যখন নড়ছিল, এমন অমানুষ তোমরা যে তাকে তুলে ধরতেও গেলে না!'...পুলিসকে মেজমামা বললে, 'মাথা গরম ছিল, যন্ত্রণায় বিষম কষ্ট পেত। আমরা একবার কলকাতার মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাচ্ছিলুম, মাঝেরহাটে রেলগাড়ি থামলে কিছুক্ষণ। আমি জল খেতে ইস্টিশনে গেলে উনি নেবে যেয়ে কোথায় পালিয়ে যায়—খুঁজে পাইনি। পরের দিন ঘরে আসে। হাসপাতালে দিলে নাকি তারা মাথা কেটে লেবে এই ভয়ে 'বোনাই' (ভগ্নীপতি) আমার পালিয়ে আসে!...'

পুলিস কবর দেবার হুকুম দিয়ে গেল।

কবর হয়ে গেলেও প্রতিদিন মাকে আমি আমাদের ভিটেয় বসে উত্তর দিকের গোরস্থানের দিকে মুখ করে বসে উভরায় কাঁদতে দেখতাম।

এরপর আমি মামাদের বাড়ি চলে যাই। সেখানে থেকে পাঠশালায় যেতাম। মা থাকত ছোট ভাইকে নিয়ে আমার বাপের সেই কুঁড়ে ঘরে। নির্জন বন-জঙ্গলের পথ ধরে একাই পাঠশালায় যেতাম। একখানা প্রথম ভাগ বই দিয়েছিলেন বাম গুরুমশায় মোড়লদের ছেলে হৃষিকেশের কাছ থেকে চেয়ে। আমি তালপাতার দাগা বুলোনো ছেড়ে ক-খ লিখতে শিখলুম। মা ছিলেট পেন্সিল কিনে দিলে। তারপরের বছর দ্বিতীয় ভাগ—ঐক্য বাক্য মানিক্য অখ্যাতি। শাঠ্য জাঢ্য মূর্খ। লম্বা কলাপাতায় লিখে নিয়ে যেতাম মায়ের গুলে-দেওয়া বেগুনী-সোনালী কালি দিয়ে এ মাথা থেকে সে মাথা পর্যন্ত। বাম গুরুমশায় দুষ্টু ছেলেদের ভীষণ মারতেন। বড়মামার পিঠে এখনো তাঁর বেতের চিহ্ন পড়ে কালসিটে দাগ হয়ে আছে! একটা ছেলে ছিল, নাম তার ভীম—কালো মোষের মতন চেহারা—বড় বড় সাদা চোখ—ভেড়ার গায়ের মতন কোঁকড়া কোঁকড়া চুল তার মাথায়—সে তার ভাই অর্জুনকে নিয়ে রোজ রোজ পড়ত বিষম বিপদে। অর্জুনকে এক ঘা বেত মারলেই সে তার মাদুরীতে ভড় ভড় করে বাহ্যে করে ফেলত। আর ভীম রোজ, কলাপাতার লেখা আমরা যেখানে ফেলে দিতাম গুরুমশায় দেখার পর, সেখানে মাদুরীটা ফেলে দিয়ে যেত। পরদিন আবার দু' পয়সানে একটা মাদুরী আনত সে। আবার তার ভাই মারের ভয়ে পায়খানা করলে ভীম ফেলে দিতে দিতে বলত, 'কালকে আবার যদি বাহ্যে করে, শালার পেটে 'নাতি' মারবো!'

কি জানি কি হল বাম গুরুমশায়ের পাঠশালা বিষ্টুবাবুদের বৈঠকখানা থেকে পাশের গ্রামের দুর্গা মণ্ডলদের বাড়ির বৈঠকখানায় চলে এল। আমাদের বাড়ি এবং মামার বাড়ির মাঝখানে হল জায়গাটা। মায়ের সঙ্গে প্রায় দেখা হত। ছুটির সময় সরস্বতীর স্তোত্র পাঠের পর 'বিদ্যাং দেহি মা সরস্বতী' বলেই যে যার বইপত্র নিয়ে ছুট মারতুম মায়ের কাছে। মা ভাত খাওয়াত আলু আর মাছের কাঁটা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে গালে দিয়ে। মা এক আনায় একটা ইলিশ মাছ কিনেছিল। আঃ! কী অপূর্ব স্বাদ ছিল তার!

তারপর একদিন হল কি, মাও আমার ছোট ভাইকে নিয়ে মামাদের বাড়ি চলে এল! কিন্তু কেন এল? সে কথা আমি জানতে পারি অনেক পরে যখন ক্লাস টেনে পড়ি।

আমার বাবার সেই ঘর ভেঙে ফেললে মামারা। বাবার যত বইপত্র

কোরআন-কেতাব হাদিস-পুথি সব দখল করলে ছোটমামা। উলুর ছাউনি চাল কেটে এনে লাগালে তাদের গোয়ালে। মামার বাড়ি মা গোয়াল কাড়ত, গরুর খড় কুঁচোত, রান্না করত। দাসী'র মতো খাটত কিন্তু সময়ে খেতে পেত না। দেওয়ালের গায়ে লিখে হিসেব করে রেখেছিলাম, এক বছরের মধ্যে আমি পঞ্চান্ন দিন না খেয়ে স্কুলে গিয়েছিলুম! আর মা? ··

মামাদের বাড়ি যদি না মা আসত তাহলে পাড়া-প্রতিবেশীর ধান ভেনে দিয়ে যে চাল পেত তাতে বোধহয় একটা দেড়টা পেটের ভাত তার চলে যেত। আর বাস্তুভিটেতে হত ওল, কচু, কলা, পেঁপে, বেগুন কত কি! গরু ছাগল পালত মা। তবে কেন এল?

এল এই জন্যে—যে-কথা আমি ছেলে বলে জানার কথা নয়—মা একদিন বলেছিল যখন মামারা আলাদা হয়ে গেল আর আমি সাময়িকভাবে পড়া ছেড়ে দিয়ে মেটিয়াব্রুজে দর্জির কাজ শিখতে গেলাম ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে—পথে বিদায় দিতে এগিয়ে এসে মা আমার মুখটা চোখের জলে ভাসিয়ে দিয়ে বলেছিল: 'তোরা বড় হ বাবা, আবার তোর বাপের ভিটেয় যাব তখন। তোর মামার বাড়ি কি যেতুম বাবা, একলা মেয়েমানুষ থাকতুম আর পাশের বাড়ির অমুক লোকটা একদিন রাত্রে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরতে গেল! আমি তোর ছোট ভাইকে নিয়ে সেই রাত্রেই পালিয়ে গেলুম আমার মামীর কাছে। তারপর বড়দাদাকে সব বলতে তবে সে তোর বাপের ঘর ভেঙে দিয়ে আমাকে নিয়ে গেল! তোর বড়মামা আমার নিকে দিতে চেয়েছিল কিন্তু তোদের মুখ চেয়ে আমি রাজি হই নি। বড় হয়ে তোরা আবার তোর বাপের ভিটেতে আলো জ্বালিস!'

মা আমার লক্ষ্মী মা, সে-আলো সে নিজেই জ্বেলেছে আমার বাপের ভিটেতে।

হলদে টাকা : সোনালী চাঁদ

ষোল বছরের ডাগর মেয়ে। দেহ পুরে গেছে যৌবনে। রাত দুটোর সময় উঠে পুকুরঘাট থেকে মুখে একটু সাবান ঘষে আসে। কপালে একটা লাল টিপ দেয়। ঠোঁটে হালকা একটু রঙ বুলিয়ে নেয়। বেণী বেঁধে বুকবাঁধা

এঁটে ব্লাউজ-শাড়ি পরে ঝুড়ি কাঁকে নিয়ে বের হবার সময় চুক্‌চুক্-শব্দে-মাইটানা-ভাইটাকে-নিয়ে-অঘোর-নিদ্রায়-পড়ে-থাকা সন্থ বিধবা মাকে ডেকে বলে যায়, 'যাচ্ছি মা রায়পুরে, পাঁপরের নেচির জন্তে।'

ঘুম ভেঙে গেলে মা হয়তো বলে, 'এখন যাবি? কত রাত? পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে যাস। একলা যেন য'সনি মা উর্মিলা।'

উর্মিলা জানে মা কেন তাকে সতর্ক করতে চায়। কিন্তু ভোর রাত্রে তখন পুরুষরা কেউ পথে থাকে না। পাড়ার মেয়েরা বের হবে তিনটের পর। পাকা রাস্তা ধরে দু-মাইল পথ হেঁটে তখন সে এসে পড়বে একেবারে হুগলী নদীর তীরে—রায়পুরের হাটে। খুপরি খুপরি চালাঘর সেখানে। তারই এক চিলতে দাওয়ায় মচ্ছড আর খাটমলের অত্যাচারের কাছে আত্মসমর্পণ করে খাটিয়ায় পড়ে আছে কুকুর-কুণ্ডলী-পাকিয়ে বেহারী ম্যানেজার। তাকে জাগাতে হয়। শত ডাকেও যখন ঘুম ভাঙে না তার, যুবতী মেয়ে হয়েও তাকে হাত দিয়ে ধাক্কা মারতে হয়। লোকটা তখন উঠে বসে। চোখ কচলায়। পৈতে সামলায়। আবার শুয়ে পড়তে গেলে উর্মিলা বলে, 'আঃ। মিন্‌সের মরণ। মাল দেবে তো! এতদূর থেকে এলুম, দেরি হলে ভিড় হয়ে যাবে, তখন বলবে'খন, যা উর্মিলা, এই এক হাজার মাল নিয়ে যা—আর বেশি মাল নেই আজ।'

ম্যানেজার নড়েচড়ে চাদর-মুড়ি দেয়। বলে, 'তো এখোন কেনো আসছ? ফজিরে আসবে। এখোন চলা যাও।'

কোথাও কেউ নেই। ভেতরের ঘরে হুম্ হুম্ শব্দে তখন শুধু পাঁচ-সাতজন কালো হুমদো চেহারার বেহারী ঘর্মাক্ত হয়ে শূন্যে-বাঁধা একটা করে দড়ি ধরে নেচে নেচে খামির ঠাসছে পা দিয়ে। মশলা, সাজি জল, নুন দিয়ে সন্ধ্যার পর যে বেসম ভিজিয়ে রেখেছিল সেইগুলোই এখন খামির তৈরি হচ্ছে। নেচি কাটছে কয়েকজন লোক ওপাশে বসে, সাপের মতন সেই খামির লম্বা করে নিয়ে একটা করে বাঁধা সুতোয় ফেলে কচ্‌কচ করে। অবিকল গজার মতন হলদে হলদে টিকলি। ছিটে বেড়ার জানলা দিয়ে উর্মিলা দেখতে পায় সব। পায়ে বেসম জড়াতে থাকলে টিন থেকে তেল ঢেলে নিচ্ছে বেহারীরা। ন্যাড়া মাথায় তাদের গেরো বাঁধা মোটা মোটা গোপাভর চৈতন। 'অবহর ডাইল আউর রোট্টি' হজম করা গামার-গোবিন্দ চেহারা। লোকগুলোর শরীর থেকে ঘাম ঝরে পড়ছে খামিরের ওপরে। হ্যারিকেনের আলোয় তাদের ভূতের মতো মনে হয়। তারা নাচছে, কেবলই নাচছে।

ম্যানেজারকে সবাই 'পণ্ডিত' বলে ডাকে। বর্ণে নাকি সে ছত্রী। ফর্সা। দেখতে বেশ।

উর্মিলা এবার তার খাটের বাজুতে বসল। তার শরীর কাঁপছে। পণ্ডিতের গায়ে হাত দিলে। ডাকলে, 'পণ্ডিতবাবু।'

পণ্ডিত এবার ওর হাতটি ধরে। উর্মিলা চুপ করে থাকে। পণ্ডিত ওকে কাছে টেনে নিতে যায়। উর্মিলা বলে, 'ধেৎ! মুখপোড়া মিন্‌সে আগে আমাকে 'মাল' দাও। তিন হাজার মাল দিতে হবে!'

পণ্ডিত বলে, 'এখোন তো মাল সব হয় নাই। তোমারে দিব তিন হাজার। এসো ময়না-পাখি! টাকা দিব। শাড়ি দিব।'

উর্মিলাকে আদর করে নিজের কোলের ওপর শোয়ায় ম্যানেজারবাবু। উর্মিলার কাতুকুতু লাগে। ছটফট করে। তার যে প্রথম যৌবন! কিন্তু ম্যানেজার হঠাৎ এক 'দঙ্গল' মেয়েদের আসতে দেখেই উর্মিলাকে ছেড়ে দেয়। চেঁচাতে থাকে, 'কা ভৈল রে, এই হরি! মাল হুয়া কী নেই? আদমি তো আগিয়া।'

ভাল করে তখনো অন্ধকার কাটেনি। 'ঝুঝ্‌কো' বেলা। মেয়েগুলো এসে লাইন দেবার আগে উর্মিলার মুখটা ভাল করে দেখে নেয়। তারা গা টেপাটিপি করে। হাসে। লাইনের 'মাথো' প্রথমে বসে উর্মিলা। একটি মাজাভাঙা বুড়ী বলে, 'পণ্ডিত-বাবা, আমি বুড়া মানুষ বলে যেন মাল কম দিও না।' সবাই হেসে ওঠে। বুড়ীর একটিও দাঁত নেই। গলার স্বর কাঁপে, ঢেউয়ের মতো দোল খায়।

পণ্ডিত বলে, 'কাহে বুঢ়া মায়ি, সব আদমি-কো হাম সমান সমান 'সামান' দেগা।'

উর্মিলা রাগে গোমরাতে থাকে তার দিকে ক্রুদ্ধতির্যক একটু দৃষ্টি হেনে নিয়ে।

সকাল ছ'টা পযন্ত চোদ্দটা পাঁপরের কারখানার সামনে লাইন পড়ে কয়েক হাজার মেয়ে ছেলে-বুড়ো-আণ্ডা গুষ্টির। কাকচিলের মতো চিৎকার জোড়ে তারা সকলে। ঝগড়া করে। চিৎকার গালাগালি শুরু হয়। সকলের কাছে একটি করে ছোট তেলের টিন, প্লাসটিকের কাগজ বিছোনো ঝোড়া।

খাতা পেন্‌সিল নিয়ে মাল দিতে বসল ম্যানেজার। নতুন লোক হলে তাদের চাকি বেলুনী দিতে হয়। কানে গোঁজা পেন্‌সিলের মাথায় থুথু লাগিয়ে

পণ্ডিত শিউপ্রসাদ সরু লম্বা খাতায় হিন্দীতে নাম ঠিকানা লিখে নেয়। ইচ্ছে করলেই সে মালের হিসেব বাড়াতে কমাতে পারে। দাম দেবার সময় পয়সা বেশি দিতে পারে।

উর্মিলাকে সে তিন হাজার মালই দিলে। তেল দিলে তার মতো তিনটে ডিবেতে।

অন্য মেয়েরা বেশি বেশি মাল চাইতে কিছুক্ষণ দিলে ম্যানেজার।

তারপর কমিয়ে দিলে। ঝগড়া চেঁচামেচি বাধল। দুটো মেয়ে ঝগড়া মারামারি চুল ছেঁড়াছিঁড়ি করতে করতে ফস করে কোমরের কাপড় খুলে ন্যাংটো হয়ে পড়ল।

লাইনের অর্ধেক লোককে মাল দিতেই তিন মণ বেসমের নেচি ফুরিয়ে গেল। তখন চিৎকার গালাগালি করতে করতে 'হসস্তিকা' কোম্পানির কাছ থেকে সবাই চলে গেল 'নন্দাবাবু'র কারখানায়। সেখানে না পেলে আছে 'জয়হিন্দ', 'তারা মার্কা', 'রঞ্জন' কোম্পানি। চোদ্দটা কারখানা। রোজ আড়াই শো কুইন্টল্ মাল বিলি হবে সকালে। সন্ধ্যায়ও এখন আবার মাল তৈরি শুরু হয়েছে চাহিদার জন্যে। যারা দূর থেকে আসে বেলা শুকনো পাঁপর দিয়ে আবার ঝুড়ি ভরে নেচি নিয়ে যায়।

নোদাখালীর মোড়ে সাধন সাঁফুইয়ের ডাক্তারখানায় কিংবা আজেহার হালদারের চা দোকানের বেঞ্চিতে বসে থাকো, দেখতে পাবে, সন্ধ্যার পর চাঁদের আলোয় বেসমের নেচি-ভরা ঝুড়ি কাঁখে নিয়ে দলকে দল নানান বয়েসের মেয়েরা আসছে পাকা রাস্তা ধরে হেঁটে হেঁটে। কেউ বা নামছে বাস থেকে। অনেকেই কিশোরী এবং বিধবা। ষোড়শী কুমারী আর সিঁথিতে সিঁদুর দেওয়া মেয়েও আছে দু'চারজন।

হাউড়ী, ধঞ্চেবেড়িয়া, বাহিরচড়া, চকদৌলত, চকবাঁশবেড়িয়া, আলমপুর, রায়পুর, গাদাখালি, বারাতলা, পোয়ালী, ছাগুলিয়া—আশপাশের সব ক'টি গ্রাম থেকে দুঃস্থ দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েরা রায়পুর থেকে পাঁপরের নেচি এনে বেলে শুকিয়ে দিয়ে হাজার পিছু এক টাকা নব্বুই পয়সা করে মজুরী পায়। একটা মেয়ে সাতশো পর্যন্ত পাঁপর বেলতে পারে। মুসলমান মেয়েরা পারে হাজার পর্যন্ত, তাদের চালের আটায় কাগজের মতন পাতলা রুটি বেলার দ্রুত অভ্যাসের জন্য। রুটি বেলার মতো বেলে একসঙ্গে থালায় জমিয়ে রাখা যায় না, তেল দিয়ে বেলতে হয় আর সঙ্গে সঙ্গে খেজুরচটি বা ঝাংলামাদুরীর ওপরে

বিছিয়ে রোদে দিতে হয়। খামার উঠোন দাওয়া ডাঙা সমস্ত জায়গা শুকোতে-দেওয়া পাঁপরের সুদৃশ্য সারিতে ভরে যায়। ঘরকন্না মানে তখন 'লেতুড়'! কাক-চিল তাড়াতে হয়।

উর্মিলার মা পাঁপর বেলতে বেলতে তাকে বলে, 'তুই যে রাত দুটোর সময় একলা উঠে চলে গেলি, কোন্ ভরসায় বল্? সোমত্ত মেয়ে! তুই চলে যেতে ঝাড়া এক ঘণ্টার পর তিনটের ভোঁ হল 'বিল্লাপুর' চটকলের। তারপর সবুর আলির বউ, নন্দা, বিন্দে, পটলি ওরা তোকে ডাকতে এল। বললুম, সে তো চলে গেছে। তাবা এসে বললে, তুই নাকি ম্যানেজারের সঙ্গে একলা ঢলাঢলি করছিলি? মাগীকে ঝাঁটার বাড়ি দোব। মেয়েছেলের একবার বদনাম রটলে তা আর যাবে হাঁ-লা মুখলুকোনি ধাড়ি? ছেলেদের বদনাম জলে তলোয়ার মারার মতন মিলিয়ে যায়। তোকে আর পাঁপরের নেচি আনতে যেতে হবে নে।'

উর্মিলা বলে, 'তবে তুই যাবি। মাল পাবি মোষের পানা ঘুম দিয়ে সেই সকাল আটটার সময় উঠে গেলে। যে মাগীরা মিছে মিছে বদনাম দেবে তাদের মুখে নুড়ো জ্বেলে দোব। আমাকে মাল বেশি দিয়েছে, সবাইয়ের 'অগ্‌গেরে' গেছিনু বলে তাই অতো 'রিষ'! আভাগী 'কম্‌বক্তি'রা!'

হঠাৎ বেলুনীর বাড়ি উর্মিলার মা আতুরী দাসী তার পিঠে এক ঘা কষিয়ে দিয়ে চিল্লে ওঠে, 'মর আভাগী বাপখাকী, চুপ কর! ছেঁচ্‌ড়ি মাগী, আবার গাল পাড়ছে!'

উর্মিলা উঠে পড়ল। আর সে পাঁপর বেলবে না। তিন হাজার মাল ঐ চোদ্দ বছরের মেয়ে অঞ্জনাকে নিয়ে বেলুক, দেখি কেমন 'বিদ্যে'! ঐ মাল যদি সব বিকেলে দিয়ে না আসতে পারে তো পণ্ডিত আর মাল দেবে না। মুখখিস্তি করবে।

উর্মিলাকে পাড়ার দিকে চলে যেতে দেখে আতুরী চেঁচিয়ে বলে দেয়: 'যা লো মুখপুড়ী, বেরিয়ে যা কাউকে নিয়ে, আর এ ঢিবেয় উঠিস নি, আমার মাথার দিব্যি রইল। থাক, আজ আর রান্নাও বসাবুনি। কি খাস দেখব।' ছোট দেড় বছরের ছেলেটি আতুরীর বগলের মধ্যে দিয়ে মাথা গলিয়ে তার মাই চুষছিল বাদুড়-ঝোলা করে। কচি কচি দাঁতে সে মাঝে মাঝে কুট্ করে কামড়ে দেয় ঝুলন্ত স্তনের বোঁটায়। বাচ্চাটাকে তখন টেনে হিঁচড়ে বার করে নিয়ে পটাপট ঘা কতক চড়-চাপড় সেঁটে দেয় আতুরী। ছেলেটা

তারস্বরে চিৎকার ছাড়ে। আহ্লরী বলে, 'মিনসে মরল, আর জ্বালাতে রেখে গেছে এদের। কলে কাজ করতে করতে ধর্মঘট পাকাতে গেল 'কমিনিস্টিগিরী' করে—মারামারি করলে কোম্পানির পোষা দালালদের সঙ্গে। ঠ্যাং ভেঙে এসে তিন মাস বিছেনায় পড়ে রইল। দলের বন্ধুরা বার দুই দশ টাকা দশ টাকা করে চাঁদা তুলে দিয়ে গেল। সেই নিয়ে সাতটা প্রাণী প্রাণে বাঁচবে না তাকে হাসপাতালে পাঠাবে? মিন্সের পায়ের হাড় ভেঙে গিয়েছিল—পেকে পুঁজ হয়ে ফুলে ঢোল হয়ে মারা গেল। এখন এই পাঁচটা ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি কি করে সংসার চালাব? এমনি পেটের দায়ে মরি তার ওপর আমার মেয়ের আবার 'যৈবনে'র ডাক এয়েছে। দুর হ—বেরিয়ে যা।...' চোখের জল মুছতে মুছতে এরপর অশ্লীল মন্তব্য করতে থাকে আহ্লরী।

ছোট ছেলেটা এবার রাগে বোধহয় মাকে জব্দ করবার মতলবে ফুন্‌ফুন করে 'ফুতু' করে দিলে বেলা পাঁপরের ওপরে। দশ বছরের ছেলেটাকে পাঁপর বেলতে হুকুম করলে তার মা ছোটটাকে নিয়ে পালাবার উদ্যোগ করতেঃ। ছোটটাকে দিলে আবার ঘা কতেক। সে গড়াগড়ি খেতে থাকল।

রান্না আর হল না সারাদিন। বড়মেয়ের পাত্তা নেই আর। পাঁপর বেলতে বেলতে গা-গতর ব্যথা হয়ে গেল আহ্লরীর। সকাল বেলা হতে বিকেল গড়িয়ে গেল। ছেলে-মেয়েরা খিদেয় কাঁদছে তখন। অঞ্জনাকে খানচার খোলাচি পিঠে তৈরি করতে বললে যে ক'টা আটা আছে হাঁড়ি থেকে ঢেলে নিয়ে নুন জল গুলে। চান করে এসে সেই একখানা খেয়ে রোদে শুকোনো পাঁপরগুলো তুলে বেঁধে নিয়ে সে চলে গেল রায়পুরে। প্রত্যেক নেচি থেকে একটু একটু করে কেটে নিয়ে জল খাওয়ালে এক কেজি মাল বার করা যেত। লোক অভাবে তা আর আজ হল না।

কোন্ কারখানা থেকে মাল নিয়েছিল উর্মিলা তা তো সে জানে না! কার মাল কাকে দিয়ে যাবে? পাড়ার একটি মেয়েকে শুধোলে সে, 'উর্মিলা কোন্ কারখানা থেকে মাল নিয়ে গেছিল তুই জানিস না বিন্দি?'

সে কারখানাটা দেখিয়ে দিতে এসে বেহারী ম্যানেজারকে নাম ধাম বললে ম্যানেজার বলে, 'তিন হাজার মাল আছে। তিরিশ কেজি হবে। ওজন করে গুনে নে তো হরি।' মাল ওজনে ঠিক মিলল। একশো খানায় এক কেজি। একটু মোটা মোটা হয়েছে বলে মৃদু অনুযোগ তুললে ম্যানেজার।

পাঁচ টাকা সত্তর পয়সা দিয়ে দিল সে। তখনি আবার মাল পাওয়া যাবে কিনা শুধোতে ম্যানেজার হেসে বললে, 'না মা, এখোন আউর লিও না। রাত জাগলে 'বুখার' হোবে, মানে, 'অসুখ' করবে। কাল 'ফজিরে' আসবে—মাল দিব।'

রাত নটার সময় ফিরে এল আতুরী কিছু ডাল নুন মরিচ মশলা কিনে নিয়ে। এসে শুনলে তখনো উর্মিলা আসে নি!

রান্না বসিয়ে অঞ্জনাকে শুধোলে ছোটটাকে স্তন দিয়ে চুম্ খেয়ে আদর করতে করতে, 'গেল কোথা রে উর্মিলাটা?'

'পিসিদের বাড়ি!'

'থাক। আর ডাকিস্ নি। পিসির কতো ভাত হয়েছে খাক।'

রান্না হতে রাত্রে কিন্তু লম্ফ হাতে নিয়ে আতুরী নিজেই গেল ননদিনীর বাড়ি। ঝুটি ধরে টেনে আনলে উর্মিলাকে। ঠোকন-ঠাকন দিয়ে ভাত খাওয়ালে। পিসিদেরও নাকি হয়নি সারাদিন। শুধু একটা রুটি দিয়েছিল দুপুরে।

মার্কিন গমের রুটি ছাড়া এখন আর বাংলা দেশের কারখান-অঞ্চলের গ্রামগুলোয় চাল বা ভাতের তেমন ভরসা নেই 'ক' শ্রেণীভুক্ত গরিব মানুষদের।

কিন্তু পাপর-কারখানার বেহারীগুলো এদেশে থাকলেও—সেসব ভাবনা নেই। ভাত না হলে ছাতু লঙ্কা খাবে। ভুট্টা যব খাবে। ওদের লিভার এত কড়া যে বোধহয় সিমেণ্ট গুলে খেয়েও ওরা হজম করতে পারে। বাঙালীদের অম্বল হয়। লিভার খারাপ। পেটে তাই শতকরা ৯০ জনের বড় বড় কৃমি জন্মেছে। চোখ মুখ ঢুকে যাচ্ছে দিনকে দিন। ডাঃ সাধন সাঁফুইয়ের কাছে কোনো রোগী এলেই তিনি নাকি প্রথমে এক আউন্স অ্যাণ্টিপার খাইয়ে দেন। আর ইয়া বড় বড় কৃমি বার হয়ে যায়! কিন্তু বেহারীদের তো তা হয় না এদেশে থেকেও!

রায়পুর বাজারের মদ-আফিম-গাঁজা দোকানে বসেন বি-এ পাস তিলক সাহা। তিনি বলেন, 'এক একটা পাপর-কারখানায় বারোজন হিন্দুস্থানী লোক! বারোশো টাকা মাইনে। মাইনের টাকার দরকার নেই। ছ-মাস ধরে জমুক কলকাতার বড়বাজারের মালিকবাবুর খেরো খাতায়। সেই টাকা থাকবে ব্যাঙ্কে, সুদটা অবশ্য পাবে মালিকই কিন্তু যখন চাইবে এককালীন পাবে দেশে পাঠাবার জন্যে। সেই টাকায় জমি কেনা যাবে। এখানের প্রতিদিনের খোরাকী হবে পঞ্চাশ কেজি পাপরের টুকরী লরীতে তুলে দেবার মজুরীতে

বা সাপ্তাহিক যত টাকার কাজ হবে তত দু'আনার কমিশনে। এই উপরি পাওনাকে বলে 'ধরাটি'। 'ধরাটি' যা পায় তাতেই 'অরহর ডাইল আউর রোট্টি' হয়ে যায়। বাকি সারা বছরের জন্য মালিক পক্ষ থেকে দুই সেট্ পোশাক দেওয়া হয়—দু-খানা নতুন গামছা এবং দু-খানি সুন্দর টকটকে লাল রঙের ল্যাংগট !'

আট-দশ বছরের মধ্যে এই কুটির-শিল্পের প্রভাব বেড়েছে প্রচণ্ডভাবে। ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার পাট উঠে গেছে। পাঁপর-বেলা কাঁচা পয়সার লোভে কিশোরী যুবতী বউ-মানুষ সবাই আসছে। ভোজপুরীগুলো—যারা এখানে ঐ পতিতালয়ের পাশে চিরকাল বাসাবাড়ি বেঁধে রঙসিঁদুর বেচে খেত তারাও এখন রাঙা রাঙা শাড়ি বেলাউজ টাইটবডি বিক্রি করে টু-পাইস পাচ্ছে ওদের কাছ থেকে। পা হড়কালেই এখানে খদ্দের-মক্কেল আছে—আছে বাসাবাড়ি আর মাসিদের ছোট্ট কুট্‌রি। তাদের ভাল খদ্দের এখন পাঞ্জাবী শিখ, বেহারী, উত্তরপ্রদেশী বাস-ড্রাইভার কণ্ডাকটরগুলো। গত সনে যেসব দুঃস্থ পরিবারের মেয়ে-বউরা খিদিরপুরের ডক এলাকা থেকে চোরাই গম এনে, গ্রাম থেকে শহরে চাল বেচে আসার কারবার করত, কর্ডন-পুলিস তাদের ধরে রাত্রে রেখে দিত। তাদের পয়সার লোভের কাছে আর নির্যাতনের দায়ে বহু মেয়ে চরিত্র হারাল। বাসে এখন আর তাদের ভাড়া লাগে না। তাদের দু'চারজনকে তো প্রায়ই আনে কণ্ডাকটররা। একটি মুসলমান মেয়ে তো এ অঞ্চলে খুবই চোখে পড়া। সে চাল গম বেচে আগে বাপ মা স্বামী সন্তানদের জন্যে রাঙা রাঙা আপেল কিনে আনত। এখন আর চাল গমের পুঁটলি বইতে হয় না। বিনা পুঁজিতেই তার ব্যবসা।…এ বছরটা একটু চালের দাম সস্তা থাকলে কি হবে, যুক্তফ্রণ্টের প্রথম রাজত্বকালে দরিদ্র পরিবারের যার যা ছিল সব গেছে। ঝাঁকের কই ঝাঁকে চলে গেছে। জমি, বাস্তু, লোটাঘটি সব বন্ধক। তারপর বউগুলো বেরুল চোরাই চাল গমের ব্যবসায়। মেয়েমানুষের লাজলজ্জা ভাঙলে সে যে কি ভীষণ চীজ হয়ে পড়ে যাদের পাড়ায় এসব মেয়েরা আছে তারাই তা ভাল জানে। স্মাগলারদের চরিত্র যেমন হয় আর কি! এখন ব্যবসা মন্দা, সবাই পাড়া ঝেঁটিয়ে আসছে পাঁপর বেলার জন্যে বেসমের নেচি নিতে। এখানে হাজার দুই ছেলেমেয়ে আসে যারা আদৌ লেখাপড়া শিখছে না, শিখবেও না আর কোনোদিন—দে আর প্রবলেম চাইল্ড—শুধু পেটের দায়ে নয়—এর উপরেও কিছু রং ঢং আছে—মাড়োয়ারীবাবুরা

এইভাবে বাংলার বেকার-সমস্যা দূর করছেন! অথচ এই মাস ছয়েকের মধ্যে সবেরা, হাসিনা, সুন্দরী, উর্মিলা নামের চার-পাঁচটা যুবতী মেয়ে নৌকো পাড়ি দিয়ে কোথায় উধাও হয়ে গেল তারা তার খোঁজ রাখে কি?…

তিলকবাবু সিগারেট দিয়ে নিজেও একটা ধরালেন। তিনি 'স্টেট্স্‌ম্যান' খবরের কাগজ পড়েন, 'ক্যাপস্‌টান' সিগারেট খান। চেহারা আর পোশাকে বোঝা যায় তিনি সৌখিন লোক। এই 'কেয়স'—এই চেঁচামেচি আর আদিরসের অসামাজিক বৃত্তিতে তিনি বিরক্ত। বলেন, 'মহাআশ্চর্য হবেন এদের কথাবার্তা শুনে। লাইনে বসে এরা হিন্দী সিনেমার হেলেন-আগা কাপুর-সায়রাবানুর গল্প করে! মস্তান দুটি চারটি ছোকরা এদের পিছু পিছু ঘোরে—তারা নাকি রিকশায় করে সপ্তায় অন্তত একবার করে টকী-বায়স্কোপ দেখাতে নিয়ে যায়। দেশ আধুনিক হচ্ছে, লেখাপড়া না শিখলেও এদের নির্লজ্জ বাপমারাও আধুনিক হচ্ছে! মেয়েমানুষের উপায়ে যার সংসার চলে সে পুরুষ গাড়োল! মাত্র এক টাকা নব্বুই পয়সা দিয়ে এক হাজার অর্থাৎ দশ কেজি পাঁপর বেলে নিচ্ছে মাড়োয়ারীরা এই বাংলা মুলুক থেকে এখানের দরিদ্র অভাজনদের দিয়ে। কিন্তু এতে কত মুনাফা জানেন? প্রতিদিন এখানে পাঁপর তৈরি হয় আড়াইশো কুইন্টলের মতো। সপ্তায় সাড়ে সতের শো কুইন্টল মাল চালান হয় বড়বাজারে একটা গ্রাম থেকে—যে গ্রামের নাম রায়পুর। ৭৫ নং বাস কলকাতার হুগলী নদীর তীরের বাবুঘাট বা আউটরাম ঘাট থেকে এসপ্লানেড, খিদিরপুর, বেহালা, ঠাকুরপুকুর, বাখরাহাট, নোদাখালী হয়ে আবার সেই হুগলী নদীর কিনারে যেখানে এসে শেষ হয়েছে সেখানে এই রায়পুর গ্রাম। এর পাশেই বিড়লাপুর জুট মিল, অ্যাসিটিলিন গ্যাস, ক্যালসিয়াম কারবাইড, লিনোলিয়াম, স্টেব্‌ল ফাইবার—যেসব কারখানা আর কোথাও নেই। বজবজ থানায় যা আছে সারা ভারতেও নেই। এনশোখানায় এক কেজি এত পাতলা পাঁপর আর কোথাও হয় না। তামিল-নাড়ু প্রদেশে এই পাঁপরের টান খুব বেশি। মাড়োয়ারী অথবা রাজস্থানীরা এই পাঁপরের কারবারী। বড়বাজারের এয়ার কণ্ডিশন ঘরে তারা বসে আছে। মোটা ভুঁড়িদার চেহারা কিন্তু ছোট্ট মাথাটার মধ্যে তাদের ঘিলু অনেক। সামনের দেওয়ালে তাদের ভারতের ম্যাপ টাঙানো। দূর পাঞ্জাব, হরিয়ানা রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার থেকে মাইনে-করা ফড়েরা খেসারী, মটর, বিউলি কলাই সংগ্রহ করছে চাষীদের কাছ থেকে চার-পাঁচ আনা কেজি

দরে। রেলগাড়িতে করে সেই কলাই আসছে কলকাতায়। মালিকের কারখানায় সেই কলাই থেকে ডাল হচ্ছে—ভাঙা ডাল বা বাজে ছাঁট মাল থেকে মেশিনের যাঁতায় গুঁড়িয়ে হচ্ছে বেসম। সেই বেসম লরী ভর্তি হয়ে চলে আসছে রায়পুর গ্রামে। আসছে মুস্নে বা শিয়ালকাঁটার টিনভরা তেল, চাকি-বেলুনী, পঞ্চাশ-কেজি-পাঁপর-ধরা বাঁশের চ্যারাটির টুকরী।···ম্যানেজারবাবুর খাতা কলমে চুরি আছে। সেই চুরির পয়সায় সে বাস-তেল মাথায় দেয়, বাস-সাবান মাখে, ফিন্‌লে ধুতি কেনে, আদ্দির পাঞ্জাবি পরে, বাঙালীবাবুদের মতন পকেটে দশ টাকার নোট দেখিয়ে রিকশায় করে টকী দেখতে যায়। আর দেশের গ্রামে ৫০।৬০ হাজার টাকার পাকাবাড়ি হাঁকায়।'

'আর মালিকপক্ষ কতটা পায় হিসেব করবেন? ধরুন, এক কুইণ্টল কলাইয়ের দাম মোট সত্তর টাকা উতোর। ডাল তৈরি করে পঁচাত্তর টাকা। বেসম করতে আশী টাকা। এক কুইণ্টল বেসমে পাঁপর হবে এক কুইণ্টল কুড়ি কেজি। এক টাকা পঁচাত্তর পয়সা পাঁপরের কেজি। তাহলে এক কুইণ্টল কুড়ি কেজির দাম দু'শো পঁয়ষট্টি টাকা। আশী টাকায় মাল মজুরী তেল লোকজনের মাইনে গাড়িভাড়া ইত্যাদি বাদ দিলে একশো আশী টাকা হতে পারে। বাকি পঁচাশী টাকা কুইণ্টল পিছু লাভ থাকে। সপ্তাহে যদি সতেরশো কুইণ্টল মাল ওঠে তাহলে মাসে ওঠে ছ'হাজার আটশো কুইণ্টল। লাভের অঙ্ক কি লাখ টাকার উপরে চলে যায় না প্রতি মাসে?'

'রায়পুর একটি ছোট্ট গ্রাম। এই গ্রামের গুরুত্ব বাঙালীদের কাছে তেমন কিছু নেই। কিন্তু মাড়োয়ারীদের কাছে আছে গুরুতর রকমের। বাঙালীদের এসব ক্ষুদ্র কুটির-শিল্পের দিকে লক্ষ্য নেই।'

একজন মাড়োয়ারীবাবুর সঙ্গে আলাপ হতে সে হেসে বললে: 'পাঁপর হল বাবু, হল্‌দে সোনালী টাকা। আপনাদের বাংলা দেশেই তা তৈরি হয়। আপনারা রাজনীতি করেন, নাচ-গান-ফুর্তি করেন, আর আমরা কাম করি।'

'কাম' করো না 'ইনকাম' করো?'

দু'-পয়সার আদার ব্যাপারী বাবু। জাহাজের খবর জানি না। আমরা লঙ্কা বেচি, আদা বেচি, ডাইল, খইল, তৈল বিক্‌রি করি—সাধারণ আদমি আছি। লাট বাহাদুর, মন্ত্রী-মহাজন নই, আমাদের কথা খবরের কাগজে ওঠে না,—কিন্তুন বাবু আমাদের মুঠির কব্জায় আছেন আপনারা। আপনারা যাকে পাঁপর বলেন আমরা তাকে 'হলদে টাকা' বলি—'সোনালী চাঁদ' বলি।'

সরাবন তহুরা

'দণ্ডীরাম মণ্ডল, বাড়ি আছ নাকি হে?'

আরো কয়েকবার হাঁক পাড়ার পর বাঁখারি-বোনা আগড়ের দোর খোলার জন্যে কে একজন বাঁশের হুড়কো খুলে খড়খড় করে শব্দ করলে। অন্ধকারে বোঝা গেল না, মেয়ে না পুরুষ। মূর্তিটি কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ চোখে জন-তিনেক লোককে সদরের ছাঁচতলায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আবার 'বাকুলে' সেঁদিয়ে গেল।

আবার নিঃশব্দ। নিস্তব্ধ চারিদিক। ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে রিঁরিঁরিঁ শব্দে। ক্রু ক্রু ক্রু শব্দে ডাকছে উইচিংড়ি। কর কর-করবরর ··শব্দ করে গলা ফুলিয়ে ডাকছে কুটুরে ব্যাঙ!

'এই দণ্ডী, শালা, ভয়ে লুকিয়ে আছে! আমরা কি ফাঁড়ির 'পুলুস' র‍্যা স্যাঙাত? তোর বউ না কে উঁকি মেরে দেখে যেয়ে কি তোর গলা জুড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ল!'

পরিচিত গলা বুঝতে পেরে দণ্ডীরাম একটা লম্ফ হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল। এলো গা। লুঙ্গিপরা। কোমরে একটা গামছা বাঁধা।

মাথার ওপরে লম্ফটা তুলে ধরে লোকগুলোকে দেখে নিয়ে শুধোলে, 'কারা গা?'

'তোর ভগ্নিপতির বাবার ছেলে, শালার ভয় দেখো, ইঁদুরের গর্তে লুকিয়েছিলি বোধহয় এতক্ষণ? মশার কামড়ে শালা দাঁড়ানো যায় নে।'

'কালু-দা—বসো। এরা দুজন কে? এদের তো চিনি না।'

তালপাতার তিনটে চাটাই বিছিয়ে দিতে লোক তিনজন বসল। উবু হয়ে বসল দণ্ডীও। গায়ে-বুকে-পিঠে তার লোম ভর্তি—প্রায় বনমানুষের মতন। হাতের বাজুতে একটা ইয়া বড় মাদুলী বাঁধা লাল ঘুনসিতে। কানের ওপরের আধাপোড়া বিড়িটা লম্ফের আলোতে ধরিয়ে নিয়ে নতুন লোক দু'টোর দিকে সন্দেহভরা চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে থাকে দণ্ডী।

কালু সেখ বলে, 'এরা মোর আত্মীয়, ইনি দাদার শালা আর ইনি মোর আপন 'চাসতো' বোনের দেওর। লও, ওঠো, তিন পাঁট মাল 'লেসো'।'

'না ভাই কালু, আমি ওসব কারবার বন্ধ করে দিইচি। জানো তো গত

মাসে কি কাণ্ডটা হল ঐ চাঁড়াল পাড়াতে। 'সমাজতন্তরঅলারা' গোটা পাড়াটা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। কলকাতার কোন টাকাঅলা মাড়োয়ারবাবু ভাটিখানা বানাবার জন্যে চাঁড়ালপাড়ার সবাইকে টাকা দিয়ে মাল তৈরি করতে বলে গেল। বাবু নাকি 'লাইসেন' বার করেছে। ভাটিখানা তৈরি হল শ্মশানটার কাছে। কাজ আরম্ভ হতেই পার্টির লোকজন এসে মাররিট দিয়ে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিলে সব। পাড়ার কত লোকের ঘর পুড়ল। থানায় যেতে পুলিসের রা নেই। না ভাই, ওসবের মধ্যে আমি নেই। অন্যখানে দেখো, যদি পাও।'

'এই অ্যাদ্দিন পরে, কাদা ভেঙে, খানা-ডোবা সাঁতরে এনু শালা, দণ্ডী, তুই ধর্মের দাদা মোব, ধর্মের বাপ—দে আজ, আত্মীয়-বন্ধুদের মুখ রাখ, কেউ জানবে না। এখানে বসেই আমরা গলায় ঢেলে যাব। মাইরি তোর মা কালীর দিব্যি! আল্লার কসম! যে শালা 'ফুটচার' করবে তার বাপ আঁটকুড়ো হবে।'

দণ্ডী মণ্ডলের দুটো পায়ে জড়িয়ে ধরে কালু সেখ। বাড়ি থেকে গিলে-আসা তাড়ির নেশা তখনো তার কাটে নি। তার সঙ্গের বাবুমতো চেহারার গলায়-রুমাল-বাঁধা ছোকরাটি দু'টাকার দু'খানা নোট বার করে হাতে গুঁজে দেয় দণ্ডীরামের, 'দাও না ভাই, একদিন এসেছি, বিশ্বাস করো আমরা 'পুলিসের চর' নই।'

দণ্ডীরাম হাতে টাকা পেয়ে একটু নরম হল যেন। ডাকলে, 'বিন্দে!'

বিন্দে এসে দাঁড়াল। বয়েস পঁচিশের ভিতর। বিধবা যুবতী বোন দণ্ডী মণ্ডলের। বললে 'দু'পাঁট 'সাদা জল' এনে দে তো বাবুদের।'

'মাইরি দণ্ডী-দা, তিনটে দাও, আমরা তিনজন।'

'আর দু'টাকা লাগবে তাহলে। অনেক কষ্টে লুকিয়ে মাল তৈরি করতে হয়। মাস্তেরে এক সপ্তা আগে একবার খানাতল্লাসী হয়ে গেল। শালা, ফাঁড়ির পুলিসরা এসে ঘরের মেঝে উঠোন কোপালে। পুকুরে জাল ফেলে দেখলে, দেখলে গোয়ালঘর, ঢেঁকিরঘর, ধানের গোলা—সব! কোথাও কিছু না পেয়ে চলে গেল। দালালটা চোখ রাঙিয়ে তাকিয়ে গেল আমি তাকে হেসে বুড়ো আঙুল নেড়ে দেখাতে। শালাকে গাছ-কাটারীর এককোপে নোব এক-দিন তালে পেলেই।'

'তিন পাঁটে ছ' টাকা—এ যে একেবারে 'বেরাণ্ডি'র দাম দাদা! দিশি

'সরাবন তহুরা'—এত দাম কেন? একটু কমাও। ভোঁতা বঁটিতে পেঁচিয়ে গলা কেটো না।'

'না, কম হবে না।'

বিন্দে 'সাদা জল'-এর বোতল এনে দিলে দাদাকে। দণ্ডী বোতলের মুখ খুলে ফেললে হাতে একটা ঠোকা মেরে। ঢকঢক শব্দে ঢেলে দিলে একটা গ্লাসে। প্রথমে কালু গ্লাস নিলে। পকেট থেকে ঝালবড়া বার করে চিবোতে লাগল। পর পর গ্লাস নিয়ে গলায় ঢালার পর তু'পাঁট মাল ফুরিয়ে গেল। আবার তুটো টাকা দিলে, বিন্দে আর এক পাঁট এনে বোতলটা ধরে দাঁড়িয়ে রইল। বাবুমতো লোকটার গলায় রুমাল বাঁধা কেন? বিন্দে স্পষ্ট দেখেছে, একটা সোনার হার গলায় রয়েছে। তাই রুমাল চাপা? ঠোঁট টিপে হাসলে সে একটু।

দণ্ডী টাকা নিয়ে উঠে চলে গেল।

বিন্দে বসল। বোতল খুলে মদ ঢেলে বাবুমতো লোকটির (যার নাম নাকি রতিকান্ত!) হাতে দিলে একটু হেসে ঠেলা দিয়ে। লোকটি বিন্দের পায়ে হাত দিয়ে গড করলে। বললে, 'বৃন্দেরানী, পীরিতের দেবী, তোমার পায়ে গড় করি।'

ওদের নেশা ধরে গেছে তখন। জল দেওয়া নয়, খাঁটি মাল। মাস তুয়েকের পুরোনো।

একটু দূরে হঠাৎ তুজন লোকের কথাবার্তা শুনতে পাওয়া গেল। কুকুর ঘাঁকা করে উঠল। চট করে লম্ফটা নিবিয়ে দিলে বিন্দে। বললে, 'চুপ!'

অন্ধকারে চারটে প্রাণী। ঝোবড়া চালাঘরের অন্ধকার।

সবাই চুপচাপ বসে। সাড়া নেই, শব্দ নেই।

রতিকান্ত অন্ধকারে বিন্দের একটা হাত ধরলে। বিন্দে কিছু প্রতিবাদ করলে না। বরং একটু ঘন হয়ে সরে গেল। ওপাশে অন্ধকার ঝোবড়ার মধ্যে চলে গেল তারা। রতিকান্ত কি করছিল অন্ধকার কে জানে!

কালু ফিসফিসিয়ে বললে, 'রতি-দা, কানাই, চল পালাই, খুন হবি কোথা? সব টাকাকড়ি মেরে নেবে। এ পাড়ায় বড় 'আকৃষা-আকৃষি'।'

বিন্দে তখন লোকটার গলার হার খুলে নিচ্ছিল। আর লোকটা তার দেহ হাতড়ে বেড়াচ্ছিল পাগলের মতন। বলছিল, 'আহা সখি, গলায় কাতুকুতু দাও কেন?'

অকস্মাৎ দণ্ডী এসে পড়ে বললে, 'পালাও ভাই তোমরা। লোকজন এসে পড়েছে। খুন-খারাবি হয়ে যাবে হয়তো এক্ষুনি।'

লোক তিনজন পালিয়ে গেল।

বিন্দে আর দণ্ডী ভিতরে এসে দোর বন্ধ করে দিলে। ঘরের মধ্যে এসে বিন্দে, বৌদি আর দাদার সামনে হেসে লুটিয়ে পড়ল। দেখালে, এই সোনার হার, আর দু'খানা পাঁচ টাকার নো

দণ্ডী বললে, 'আমি আর নকুল ওদিকে কথা বলছিলুম এদিক দিয়ে গিয়ে। কুকুরটার পেটে লাথি মারতে তবে চেল্লাতে আরম্ভ করলে।'

বউ গৌরী বললে, 'ওরা গেছে তো?'

দণ্ডী আবার দোর খুলে কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এল। খানিকটা এসে একটু দূরে তিনজনকে কি যুক্তি করতে দেখলে অন্ধকারে ফাঁকা রাস্তায় দাঁড়িয়ে। জোরে গুরুগম্ভীর গলায় হাঁক মারলে, 'কোন শালারে ওখানে? দাঁড়াও তো!'

কুকুরটাকে লেলিয়ে দিতে সে ঝাঁঝাঁ করে তেড়ে যেতেই লোক তিনটে দৌড় মারলে।

এবার নিঃসন্দেহ হল দণ্ডী।

ফিরে এসে বিন্দেকে শুধোলে, 'হার পেলি কোথা তুই?'

'কেন? ঐ ফরসা লোকটার গলায় ছিল। আড়াল করে রুমাল বাঁধা ছিল। আলো নিবিয়ে দিতেই লোকটা আমার হাত ধরলে। আর আমি একটু আস্‌কারা দিয়ে সুযোগ মতন খুলে নিলুম। তুমি ঠিক সময়ে না এসে পড়লে আমার কি হাল যে করত মাতালরা কে জানে!'

গৌরী বলে, 'ধন্যি তোর সাহস ঠাকুরঝি! আমার লজ্জা লাগে—ভয় করে!'

'তোমার মতন ভাতমারা মেয়েমানুষ থাকলে শালা উপায় হবে অষ্টরম্ভা! জেল খেটেও মরতে হবে। বিন্দে আমার বোন হয়ে যে উপকার হয়েছে ভাই হলে ওকে দিয়ে মারামারি ছাড়া আর কি হত? তবে চেনাজানা খদ্দেরদের সাথে এমন 'ব্যাভার' করলে ব্যবসার ক্ষতি হবে। হারটা সোনার তো?'

বিন্দে আলোয় হারটা দেখলে বেশ চকচক করছে। নিশ্চয়ই সোনা!

তারা আলো নিবিয়ে আবার শুয়ে পড়ল যে যার।

মাঝরাত্রে আবার ডাক শোনা গেল কার যেন।

কান পাতলে দণ্ডী।

বিন্দে উঠে দেখতে এল অন্ধকারে, উদোম গায়ের কাপড় টানতে টানতে। শুধোলে, 'কে গা?'

টর্চ মারলে হঠাৎ লোকটা আগডের ওপরে।

বিন্দে চিনতে পেরে বললে, 'দূর বেহায়া মিনসে!' গায়ে কাপড় দিয়ে দোর খুলে দিলে। ভূষণ সাহা এল বাড়ির মধ্যে। হ্যারিকেন জ্বেলে নিয়ে বেরিয়ে এল দণ্ডী। বললে, 'বসো ভূষণ-দা।'

'বসব না। এখন রাত একটা। চার জায়গা থেকে মাল নিতে হবে। দেখি ক' বোতল আছে, বার করো তাড়াতাড়ি।'

'দাঁড়াও দাঁড়াও দেখি। টর্চটা দাও।'

দণ্ডী একটা কাঠের বাক্স নিয়ে খিড়কির দোর খুলে বাইরে চলে গেল। বাঁশবনের পিছনে জলডোবা হিজল আর জল-ডুমুরের বন। পোড়ো ঢিবির ওপরে খঞ্জনবোড়া, আশ-শ্যাওড়া, ঘেঁটু আর খেল-কদমের ঝোপ। সেখান থেকে বাক্স ভরে কুড়িটা বোতল তুলে আনলে দণ্ডীরাম। এসে দেখলে তার বউ বুক এলো করে বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছে ভূষণ সাহার সামনেই। অবশ্য ভূষণ তাদের ভগ্নিপতি। বিন্দে হেসে গড়িয়ে পড়ছে কি কথা শুনে। বিন্দে বলছে, 'দিদি আমাকে বলেছে তুমি নাকি 'বুড়ো' হয়ে গেছ!'

'তুমি পরীক্ষা করে দেখেছ তো—সত্যি কি তাই?'

'দূর মিনসে! আমি কবে পরীক্ষা করনু? গলায় গামছা দোব মিনসের। দেখি কত টাকা এনেছ—'

পকেটে হাত গলালে তার হাতে একটা মোচড় দিতেই বিন্দে 'বাবারে' বলে চেঁচিয়ে উঠল। ভূষণ বললে, 'কেমন, আমি 'বুড়ো' কি জোয়ান এবার টের পেয়েছ তো বৃন্দেরানী! বউদি 'রাধারানী'র তো সব ঝরে গেল! দাদার জন্যে একটু মধু না থাকলে বেচারা যাবে কোথায়?'

গৌরী চোখ ট্যারা করে গায়ে কাপড় দিলে। দণ্ডীর কাছ থেকে মালের পেটি নিয়ে বাইরে এসে একটা হোঁচকা মতন লোকের মাথায় তুলে দিয়ে টাকা গুণে দিলে ভূষণ দণ্ডীর হাতে। বিন্দে এসে হাত পেতে দাঁড়াতে তার হাতে একটা দু'টাকার নোট দিয়ে তার গাল টিপে দিয়ে চলে গেল সে। বলে গেল, আসছে কালীপুজোর সময় যেন বেশি মাল তৈরি থাকে।

পঁচিশটা টাকা দিয়ে গেল ভূষণ। দু-টাকা বোতল। ওরা শহরের

দোকানে খদ্দেরের ভিড় দেখলেই তাল বুঝে জল মেশাবে। খুব নেশা ধরে গেলে শুধু সোডাজল খাওয়াবে! মোটা লাভ ওদের। দু'চারজন খদ্দের তাদের বাড়িতে আসে, পাড়া-গাঁ থেকে। তারা রুগ্ন গরিব খদ্দের। গলা একবার কাটলে আর 'ঘেডোয়' না। আর বাইরের অচেনা খদ্দেরদেরও ভয় বেশি। বিশ্বাস করা যায় না, কে কখন ধরিয়ে দেবে তার ঠিক নেই।

রাত দুটোর পর উনুন জ্বাললে বিন্দে। গোয়ালের মধ্যে কলসীতে 'ভেলিগুড়' পচানো ছিল 'জল' দিয়ে। এক সের গুড়ে চার সের জল। তাতে তাড়ির 'জাওয়া' দেওয়া হয়েছে। পনেরো দিন পচাবার নিয়ম। কিন্তু মালের টান থাকায় আর ধরা পড়বার ভয়ে তাড়াতাড়ি মাল পচিয়ে তুলতে 'কারবাইড' দিতেই হয়। ফেনা উঠে গেঁজিয়ে-ওঠা সেই পচানি ভাঁড়ে করে তুলে এনে কানা-কাটা একটা অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িতে ঢেলে দিলে বিন্দে। সেই হাঁড়ির ওপরে আর একটা হাঁড়ি বসালে। তার তলাটা এক ইঞ্চি পরিমাণ ফুটো। সেই ফুটোর চারপাশে ইঞ্চিখানেক করে চারটে 'ঠিকরে' কাঠ দিয়ে তার ওপরে তলালেপা মুখ 'চ্যাত্‌রা' (বড়) ঘটি বসালে। ঘটিটা রইল দ্বিতীয় হাঁড়ির মধ্যে। পর পর দুটি হাঁড়ির ওপরে এবার কড়া বসালে। কড়ায় ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিলে কানায় কানায় ভরে। তারপর কাদা দিয়ে দুটো হাঁড়ির জড়েন-মুখ লেপে এঁটে দিলে।

এবার উনুনে জাল দিতে লাগল চ্যালা কাঠ ধরিয়ে। হু হু করে আগুন জলতে লাগল। ভটভট করে ফুটতে লাগল তলার হাঁড়ির মধ্যেকার গুড়ের পচানি। বাষ্প উঠে মাঝখানের হাঁড়ির তলার ফুটো দিয়ে ঢুকতে লাগল। সেই বাষ্প জমতে লাগল ওপরের কড়ার তলায় ঠাণ্ডা পেয়ে। তারপর ঘামের মতো ঝরে ঝরে পড়তে লাগল ঘটির মধ্যে।

কড়ার জল গরম হয়ে উঠলে বদলে ঠাণ্ডাজল আবার দিতে হবে। সমানে আগুন জলা চাই। নিচের হাঁড়ির পচানি শুকিয়ে 'কাই' হয়ে এলেই—যখন আর বাষ্প আদৌ উঠবে না তখন সব নামিয়ে ফেলতে হবে। ঘটির 'বাষ্প-জল'টুকু বোতলে ঢেলে ছিপি এঁটে দাও। এই হল চোলাই মদ! স্রেফ গুড়-জল আর তাড়ির 'জাওয়া' পচানি 'বাষ্পজল'!

পচানি আরো থাকলে আবার হাঁড়ি-পাতিল বসিয়ে জাল দিতে হবে। মাল বেশি করতে হলে চার-পাঁচটা উনুন একসঙ্গে জ্বালালেও হবে। এই

চোলাই মদের ব্যবসা চলে গোপনে। ফাঁড়ির পুলিস হানা দিয়ে মাঝে মাঝে দেখা যায়, কোমরে দড়ি বেঁধে প্রায়ই তাদের ভ্যানে তুলে নিয়ে চলে যায় ২৪-পরগণা জেলার দক্ষিণ অঞ্চলের কয়েকটি থানা এলাকা থেকে।

আসছে কালীপুজোয় চোলাই মদের খুব টান পড়বে। সুস্থ মানুষ বিকার-গ্রস্ত হয়ে প্রেতনৃত্য করবে। তাদের নাচাবার গোপন 'সাদাজল' তৈরি হচ্ছে দণ্ডীরাম মণ্ডলদের ঘরে ঘরে। সাদাজল খেয়ে মানুষ 'রঙিন' হবে। দু'পয়সা পাবে দণ্ডীরা। কিন্তু ভূষণ সাহারা পাবে যে তার কয়েক গুণ। তারা পাকা-মালে কি কি 'ফেঁট' বা 'ভেল' দিতে হয় তা জানে। বিলিতি মদের সঙ্গে দিশি মদ 'পাইল' দেয়। অ্যালকোহল, সোডাজল কত কি দিয়ে তাদের কারবার। সরকারের দেওয়া তাদের 'পাকা লাইসেন্স' আছে।

দণ্ডীদের লাইসেন্স নেই। তারা চোরের চাইতেও 'বেহাদ্দ'। কিন্তু তারা খাঁটি মাল দেয়।

কালীপুজোর আগে একবার মহড়া দেবে পুলিস—সবারই তা জানা আছে। তাই সবাই সতর্ক। কিন্তু এত কাণ্ড করার পরও আবার কালু সেখ দুটো লোককে নিয়ে এল। নেশার খেয়ালে সব ভুলে গেছে বোধ হয়।

দণ্ডী একেবারে হাঁকিয়ে দিতে চায়। সন্ধ্যার মুখোমুখি তারা এসেছে। বিন্দে বললে, 'দাও দাদা, চটিয়ো না। কালু সেখের যা মুখ, গালাগালি করবে; আর ওরা ভাল টাকা দেবে।'

তিনটে বোতল বার করে দিতে রতিকান্ত নামের লোকটি হেসে বললে, 'সেদিন তো তোমার বোন আমার কেমিকেলের হারটা খুলে নিলে! আজ কি নেবে?' তারপর সে হুইসেল টানতেই ডজনখানেক পুলিস ছুটে এসে হঠাৎ দণ্ডীরামের বাড়ি ঘেরাও করলে। কালু সেখ বললে, 'প্রতিশোধ নিলুম বলে দুঃখ করিসনি ভাই দণ্ডী! আমাদের পিছনে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিলি না?'

কোমরে দড়ি বেঁধে দণ্ডীকে নিয়ে চলে গেল পুলিসরা। দণ্ডীর বউ কাঁদতে লাগল।

কিন্তু বিন্দে বললে, 'কাঁদিস কেন বউদি? দাদার একটু 'জিরেন' হল। জেলখানায় মাসছয়েক থাকলে 'শরীল'টা তবু একটু সারবে। আমি তো রইচি। আমার নাম বিন্দে, মালের ভেয়ান আমি জানি। আর রাতের মানুষ ভূষণ সাহা আছে আমাদের বাঁধা নাগর।'

সেয়ানে সেয়ানে

কয়েক বছর আগে আমাদের থানায় ফিরোজ জা এসেছিলেন বড় দারোগা হয়ে। ভদ্রলোক মুর্শিদাবাদের নবাব বংশের ছেলে। দশাসই চেহারা। থানায় এসেই বিদায়ী ও সিকে নিয়ে সর্বত্র আলাপ পরিচয় করে গেলেন। পুরনো নামকরা দালালদের থানায় আসা বন্ধ করে দিলেন। ঘুষ খাওয়া বন্ধ করতে অন্য দারোগা জমাদাররা সবাই ক্ষুব্ধ। রিকশাঅলা, গরুরগাড়িঅলা, চালপাচারকারী ইত্যাদি ছোট ছোট অপরাধীরা থানায় এসে বড়বাবুর একটু ধমক খেয়েই খালাস। ঘুষ লাগে না। এমন কি এক প্যাকেট সিগারেটও চান না। 'বড়বাবু মহৎ লোক' বলে রটে গেল। কিন্তু ভীষণ কড়া, বড় বড় অপরাধী রাঘব-বোয়ালদের তিনি ছাড়ছেন না। মিল কোম্পানীর ম্যানেজার-বাবুদেরও না।

ফিরোজ সাহেবের খ্যাতি রটে গেল চারদিকে।

দারোগা ঘুষ খায় না—এ আবার কবে কোন্ মান্ধাতার আমলে হয়েছে? কেউ কেউ অবিশ্বাসও করে বইকি। বলে, 'ছোট ছোট বাটা মিরগেল খান না, বড় বড় রুই কাতলা অবশ্যই খান।'…প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে সেসব কথা যেন বলা হল। কাজেই মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে সব কিছু কেউ বলতে পারে না—এই ঘোসাটে ভাবটাও বড় দারোগা সম্বন্ধে রইল। কিন্তু ও-সি ফিরোজ জা যখন বাইরে বেরুতেন লোকজনের কৌতূহল, প্রশংসা, ভিড়—এসব দেখে তাঁকে ভদ্রলোক, সজ্জন বলেই মনে হত।

হঠাৎ তাঁর একটি বাদশাহী কাণ্ড সারা থানার মানুষের কানে গেল। সবাই বললে, 'বাহবা! এমন নাহলে মানুষ!'

ঘটনাটি সংক্ষেপে হল এই:

থানার কাছাকাছি বাজারে সকালে বাজার করতে এসেছেন মেজ দারোগা শেখরবাবু। তিনি সত্যকার জাত-দারোগা। কলাটা মুলোটা নেন আর দাম দেন না কেউ কেউ লজ্জার মাথা খেয়ে সাহস করে দাম চাইলে বলেন, 'থানায় যাস, নিয়ে আসিস। আমি হলাম গে তোদের মেজ দারোগা।'

তাঁর চোখরাঙানি দেখে আর থানায় যায় না।

কিন্তু একটি বছর আষ্টেকের মেয়েকে একটি খুব বড় এবং একটি ছোট

পাকা পেঁপে নিয়ে বসে থাকতে দেখে মেজ দারোগা বড় পেঁপেটা হাতে তুলে নিলেন। কত দর শুধোতে মেয়েটি বলল: 'মা বলেছে, ছোটটার যা দাম হবে বড়টার তার ডবল।'

মেজ দারোগা বললেন, 'তাহলে ছোটটা বিক্রি না হলে বড়টার দাম দোব কেমন করে? ওটা বিক্রি হলে দামটা থানা থেকে নিয়ে আসিস।'

কাণ্ডটা সবাই দেখলে। হাতিরা, সাহারা, ভাণ্ডারীরা—যত দোকানদাররা চারপাশে ছিল। মেজ দারোগা চলে যেতে মেয়েটি কাঁদতে লাগল। বাড়িতে গেলে নাকি তার মা মারবে! ওইটুকু বয়েসেই সে বুঝতে পেরেছে ওই খাকি পোশাক-পরা লোকটা আর দাম দেবে না। কেমন যেন চোখমুখের চেহারা! স্বাভাবিক এবং ভদ্র নয়।

ঠিক একটু পরেই এলেন বড়বাবু ফিরোজ সাহেব। বাজারের মুখেই মেয়েটিকে কাঁদতে দেখে শুধোলেন, 'কি হয়েছে মা খুকী, কাঁদছ কেন?'

'একটা 'পুলুস' আমার পিঁপে নিযে পালিয়েছে, দাম দেয় নে।'

'পুলিস! সেকি!' দারোগা সবার দিকে তাকাতে হাতিদের অনিমেষবাবু ফোন রেখে নেমে এলেন দোকান থেকে। ও-সিকে ব্যাপারটা বললেন তিনি আনুপূর্বিক। ও সি ফিরোজ তা শুনে সিগারেট ধরালেন। গম্ভীর মেজাজে বললেন, 'নুইসেন্স শেখরবাবু! মজা দেখাচ্ছি দাঁড়াও। এই খুকী, দে ছোট পেঁপেটা। এটা আমি নিলাম, এই নে, কুড়ি টাকা এটার দাম দিলাম।' তিনি দু'খানা দশ টাকার নোট দিয়ে সেরখানেক ওজনের পেঁপেটা নিলেন। সবাই দেখলে। মেয়েটিকে বললেন, 'এসো আমার সঙ্গে—তোমার বড় পেঁপেটার দাম আনবে থানা থেকে। আসুন আপনারা অনিমেষবাবু।' সবাই থানায় গেলেন।

ও-সি-র চেম্বার।

মেজবাবুর ডাক পড়ল। তিনি এলেন লুঙ্গি পরে শার্ট গায়ে লাগিয়ে বাসা থেকে। পেঁপেটা কেটে খাচ্ছিলেন সবে। এসে বড়বাবুর টেবিলে পেঁপে এবং বাজারের লোকজনদের দেখে কিছু ঘটবে বলে তাঁর অনুমান হল। বড়বাবু শুধোলেন, 'আপনি এই মেয়েটির কাছ থেকে পেঁপে এনেছেন? দাম দিয়ে আসেননি?'

'ও বললে স্যার, ছোটটার যা দাম হবে বড়োটার তার ডবল হবে।'

'ন্যাচারালি।'

'তখন তো ওর ছোটটা বিক্রিই হয়নি।'

'কাজেই বড়টা বিক্রি হবে না। আপনি নেবেন ছোটটা। অথবা ছোটটা অন্যে নিলে তবে ডবল দামে বড়টা নেবেন। কিন্তু ওইটুকুন মেয়ে কি থানা আর দারোগার 'ক্ষ্যামতা' কত সেসব জানে! ওইটুকুন চাষীর বাড়ির মেয়ের একটা পেঁপেতেও আপনার লোভ! ও হয়তো ওটা বেচে নিয়ে গেলে তবে ওর মা এক কে-জি গম কি আটা কিনবে। বেশ তো মশাই!'

'তা আমি এখন কি দাম দোব বলুন স্যার।'

'ছোটটা বিক্রি হয়েছে খুকি? কত দাম?' ও-সি শুধোলেন।

খুকী বললে, 'হাঁ। এই যে'—দুখানা নোট দেখালে সে।

মেজবাবুর গাল হাঁ বললেন, 'কুড়ি টাকা!'

ফিরোজ জা নবাব বংশের ছেলে। তিনি বললেন, 'আজ্ঞে হাঁ, আপনি চল্লিশ টাকা দেবেন। যান এখনি নিয়ে এসে দিয়ে দিন।'

অগত্যা। উপায় নেই ফেরত দেবারও, পেঁপেটা তখন মেজ দারোগার পেটের মধ্যে পাক দিচ্ছে।

কুড়ি আর চল্লিশ মানে ষাট টাকায় দুটো পেঁপে বিক্রি হল আমাদের থানার দুই দারোগার মধ্যে।

ফিরোজ সাহেব এখন অন্য থানায় চলে গেছেন সত্য কিন্তু তাঁর সুনাম আমাদের থানায় বড় পাকা সরস পেঁপের মতই আজো বিদ্যমান। নবাব বংশের মান রেখে গেছেন তিনি।

মোল্লা এবং মল্লিক সাহেব

ইলাহিকাণ্ড!

ইলাহি বক্সের বউকে নাকি জীন ধরেছে!

সে গান করছে, নাচছে, বগল বাজাচ্ছে, ডিগবাজি খাচ্ছে আর অশ্লীল ভাবভঙ্গি করে শুনলে-কানে-আঙুল-দিয়ে-পালাতে-হবে এমন আদিরসাত্মক কথাবার্তা বলছে। ইলাহি বক্সের বাড়িতে লোক ভবু ধরে না। মেয়েরা হাসছে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে। পুরুষরা একচোখ দেখেই সরে যাচ্ছে লজ্জায়। ইলাহি বক্সের মা সাধেমন বিবি 'বড়কান গাজি', 'মাদার সাহেব', 'শা ফরিদ',

'গুন্‌জের মল্লিক', 'ওলা বিবি'—এই পাঁচটা পীরপীরিনীর থান ধুইয়ে এনে খাইয়েছে বউকে—থানে মাটির ঘোড়া বসিয়ে দিয়ে এসেছে একুশটা করে—বাতাসা মানসিক করে বিতরণ করেছে। কেউ শত্রুতা করে 'বাণ' মেরেছে মনে করে কল্পিত মন্ত্রকের নামে মাটির মালসা উপুড় করে দিয়ে আকাশে হাত তুলে 'বদ্‌দোওয়া' করে এসেছে : 'হে আল্লা আমার বউয়ের যে 'সব্বনাশ' করেছে সে যেন 'নিব্বংশ' হয়।'

কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। পাঁচজনের যুক্তিতে এবার ইলাহি বক্‌স গেল মোল্লা মোগলজানের কাছে। মোল্লা সাহেব এলেন হাতে একটা বাঁকা লতার লাঠি নিয়ে। তাঁর গলায় 'দোওয়া তাবিজে'র লম্বা মালা ঝুলছে—লাল নীল সবুজ সাদা কালো কাঁচের দানা গাঁথা। গায়ে কালো রঙের জোব্বা। মাথায় বাবরি-ছাঁট চুলের ওপর তালপাতা-চিরে-চিরে-বোনা ফুটো ফুটো জালি টুপি। মেহেদি পাতার কষে রাঙানো লাল দাড়ি, নাভিতক লম্বা। মোল্লা সাহেব এসে দাঁড়ালেন 'আলায়কুম আস্‌সালাম' বলে। সবাই উত্তর দিলে (মেয়েরা বাদে), 'ও-আলায়কুম আস্‌সালাম।'

ইলাহি বক্‌সর বউ মোল্লাকে মিলিটারী কায়দায় সালাম জানালে। মোল্লাও হেসে উত্তর দিলেন। বললেন, 'বসো।'

বউটি বসল। মোল্লা তার সামনে বসে শুধোলেন, 'আমি কে বলো তো?'

'তুমি পুথিপড়া মোল্লা, দুটো টাকা দিলে একজনের বউয়ের তালাকনামা লিখে দাও। পাঁচসিকে দিলে পাঁচ ছেলের মায়ের নিকে পড়াও। ভূত তাড়াও, জীন ছাড়াও। ওলাউঠো, অম্বলশূলের পানিপড়া দাও। আল্লার নামে তোমার সব ফক্কিবাজীর ব্যবসা।'

'চোপ!' হাঁক মারলেন মোল্লা সাহেব।

মেয়েটি উঠে পড়ে তখন বগল বাজাতে শুরু করলে। মোল্লার মাথার টুপি খুলে নিতেই তাঁর টাক বেরিয়ে পড়ল। মোল্লা রেগে গিয়ে উঠে পড়ে বউ হালিমার নড়া ধরে চেপে বসিয়ে দিয়ে টুপিটা মাথায় গলিয়ে নিয়ে বললেন, 'ধরো একে, খচ্চর 'কালাজীন' ধরেছে! 'এসম আজম' পড়তে হবে।'

বিড়বিড় করে কী সব আরবী আওড়াতে লাগলেন মোল্লা। হালিমার ঘাড় গুঁজে ধরা আছে। সে গোঁ-গোঁ করছে। মাঝে মাঝে ঝেড়ে-মেড়ে উঠতে চাচ্ছে। মোল্লা ফুঁ-ফাঁ করে মুখের হাওয়া দিচ্ছেন ঝাড়ন মন্তর ছোঁড়ার মতো করে। থুথু ছিটকে পড়ছে তাঁর মুখ থেকে।

ঘণ্টাখানেক এই রকম করার পর মেয়েটা জখম হয়ে যায়। সংজ্ঞা হারিয়ে গেলে শুইয়ে দেওয়া হয়। মুখ থেকে তার গাঁজা উঠতে থাকে। মোল্লাজী মাটিতে চিক কেটে তাকে গণ্ডী দেন। বাঁ হাতটা হালিমার 'সিনা'র (বুকের) ওপর রেখে মোল্লা আকাশের দিকে মুখ তুলে বলতে থাকেন: 'ইয়া আলী, ভেজ মাওলা, পীর জাহান্দার, আমেল-কামেল, আল্লার নামে সবাই মাথা নোয়াও কাবায়, তার নামে ভূত, মামদো, কালাজীন, পেত্নী, শাঁকচুন্নি—দানো দক্ষিণে—সব পালা—যদি না পালাস তোর নামে আল্লার কসম!'

মোল্লা মাটিতে চাপড় মারতে লাগলেন। হলুদ পুড়িয়ে নাকে চেপে ধরতে লাগলেন হালিমার। একটা তামার পয়সা পুড়িয়ে কপালে বসিয়ে দিতেই মেয়েটি 'আঃ আঃ' শব্দ করলে একবার। পরে সংজ্ঞা হারাল।

মুখে জলের ছিটে মারতে মারতে জ্ঞান ফিরলে, মেয়েটি উঠে বসল। তাকে মোল্লা শুধোলেন, 'তোর নাম কি?'

'আমার নাম কাদের বক্‌স। ঐ 'আম্‌লি' (তেঁতুল) গাছে থাকি।'

মোল্লা মাথা নাড়লেন। ঠিক ঠিক। বললেন, 'আচ্ছা, জীনের তো শুনি অনেক ক্ষ্যামতা, কই তুই এক ডাবর পানি দাঁতে করে বয়ে নিয়ে যা দেখি।'

এক ডাবর জল এনে দিতেই মেয়েটা উঠে নিচের পাটির দাঁত দিয়ে তার কানার তলাটা চাগিয়ে তুলে তিন বেড ঘুড়িয়ে এনে ফেলে দিলে। তারপর সে পড়ে মুখ ঘষড়াতে লাগল। মোল্লা তার গর্দানটা চেপে ধরে পিঠে পাছায় চাপড় মারতে লাগলেন। মেয়েটির আবার জ্ঞান হারিয়ে গেল। তখন মোল্লা বললেন, 'ঐ দেখ—ঐ দেখ, জীন পালালো, ঐ শোঁ শোঁ করে আকাশ বেয়ে উড়ে পালাচ্ছে।'…

মোল্লা এরপর ইলাহি বক্‌সর বাড়িবন্দনা করে নিশান পুঁতে, দোওয়া-তাবিজ-মাদুলী দিয়ে গেলেন। 'সরা পড়া' দিয়ে গেলেন দুয়ার জানালার মাথায় টাঙিয়ে দেবার জন্যে। পঁচিশটা টাকা নিয়ে চলে গেলেন মোল্লা সাহেব।

কিন্তু জীন ছাড়ল না। আবার দু'চারদিন বাদে বাদে বউ হালিমার অমনি উপসর্গ হতে লাগল। মোল্লা বললেন, 'হবে না কি হবে, বাসিছুঁত গায়ে দোওয়া-বাতিজ রাখলে ভূত-জীন এসে আরো জুটবে।'

কিন্তু গ্রামের প্রাইমারী স্কুলের মাস্টার ইউসুফ মিয়া বললেন, 'ভূত মানুষকে ধরে না, মানুষই আসলে ভূত হয়! ইলাহি বক্‌সর বউকে হিস্টিরিয়া

রোগে ধরেছে। ভাল ডাক্তার দেখাতে বলো—সেরে যাবে।'

কিন্তু একথা কানে গেলে মোল্লা সাহেব তাঁকে প্রকাশ্যে ইংরিজি-শেখা 'কাফের', 'বেদ্বীন' বলে গালাগালি করলেন। শুধোলেন, 'কোরআন শরীফে কি জীনের উল্লেখ নেই ?'

মাস্টার সাহেব তখন একেবারে চুপ !

কিন্তু দিনচারেক পরে হঠাৎ শোনা গেল ইলাহি বক্সর বউ হালিমা খাতুন পুকুরে পড়ে ডুবে মারা গেছে ! সে নাকি আবার পোয়াতি ছিল !

হালিমার লাস আর সদরে চালান গেল না। কাফন দাফনের হুকুম পাওয়া যেতে আবার মোল্লা সাহেবকেই ডাকতে হল। একটা মুরগী জবাই করতে গেলে মোল্লাকে চাই; সবে-বরাতের সময় মৃত আত্মীয়-স্বজনের আত্মার মুক্তির জন্য কোরআন শরীফ আর মাদুরী বগলে করে বাড়ি বাড়ি আসেন, সরবত খান, দু-চার আনা পয়সা নেন—তাঁকে চটালে তোমার বাড়ি ফাঁক দিয়ে অন্য বাড়িতে পড়তে চলে যাবেন মোল্লা সাহেব। বিয়ে পড়ানোর সময় তাঁকে চাই, চাই মৃতের 'জানাজা' পড়বার সময়। সন্ধ্যা থেকে রাত বারোটা নাগাদ সাপ খেলানো সুরে চিৎকার করে পুথি পড়ার সময় তাঁর অনেক শ্রোতা জোটে ! সেই মোল্লা যদি নামাজ না পড়ার জন্যে দুটো কথা শোনান নীরবে হজম করতে হয়। কিন্তু আজকালকার শিক্ষিত ছেলেরা তাঁদের তেমন আমল দেয় না নিতান্ত সামাজিক বা ধর্মীয় দায়ে ঠেকা না পড়লে।

মাস্টার ইউসুফ মিয়া সন্ধ্যার পর মোড়ের চা দোকানে বলছিলেন, 'এইসব কাঠমোল্লারা আমাদের মুসলমান সম্প্রদায়কে ডোবাচ্ছে। এরা না জানে ভাল করে আরবী আর না জানে বাংলা। কোরআন শরীফ পড়ে যায় যার একবিন্দুও অর্থ বোঝে না। কিছু হাদিসের কথা পাতলা পাতলা জানে মাত্র। তাছাড়া পুথির কাহিনী—যার মধ্যে গল্পকথাই বেশি, দুধের চাইতে পানির পরিমাণ অধিক—সেইগুলি এরা পড়ে আর প্রচণ্ডভাবে বিশ্বাস করে। আর ভীষণ গোঁড়া। আরে বাবা রিলিফের চার্টটা খুলে দেখ না, কাদের সংখ্যা সেখানে বেশি, মূর্খের সংখ্যাতে তারা পৃথিবীর সব সম্প্রদায়কে লজ্জা দেয়। সন্তান উৎপাদনের হারও তাদের বেশি। একই দেশে একটি উন্নতিশীল ভিন্ন সম্প্রদায় কতখানি উদার হলে এসব বরদাস্ত করতে পারে ? 'দাঙ্গা হয়, তার পিছনে ধর্মীয় উন্মাদনা যতখানি থাকে তার চাইতে বেশি থাকে রাজনীতির

গোপন গূঢ় অভিসন্ধি। এ সবের বলি হয় অশিক্ষিত দরিদ্ররা।' বাদশা খাঁর এসব অভিযোগ সত্যি। দারিদ্র্য আর অশিক্ষা এই দুটি অভিশাপকে দূর করবার প্রয়াস কই আমাদের মধ্যে? তাই আমরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি আল্লার রোষেই।'

আমি চুপচাপ বসে কথা শুনছিলাম খবরের কাগজ দেখতে দেখতে। হঠাৎ মোল্লা মোগলজান এলেন চা দোকানে। তাঁকে দেখে মাস্টার সাহেব চুপ করে গেলেন। হয়তো মনে মনে ভয়ও করেন তাঁকে। 'একঘরে' করার ভয়!

মোল্লা হঠাৎ আমাকে শুধোলেন, 'মুসলমান কখনো কমিউনিস্ট হতে পারে ·'

আমি কোনো উত্তর না দিয়ে চুপচাপ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনি চা নিয়ে বলতে লাগলেন, 'হাদিসে আছে, পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে জন্মাবে একদল কাফের, তারা ধ্বংস করবে পৃথিবীকে আর ধ্বংস হবে নিজেরা।' আমার মনে হয় কমিউনিস্টরা হল সেই কাফের। আর তারা চীনের লোক —কেননা চীন আরবের পূবদিকে আছে।

মাস্টার আর আমি মৃদু একটু হাসলাম। মোল্লা তা টের পেলেন বোধ হয়।

কিন্তু অকস্মাৎ সেখানে নাটকীয়ভাবে আবির্ভূত হলেন পাগলা মল্লিক সাহেব। নাদির মল্লিক। সে-যুগের বি-এ পাস। এককালে জমিদারী ছিল। প্রবাদ আছে চামনের মল্লিকরা নাকি ঘোড়াকে মশারি খাটিয়ে রাখতেন আর মিছরি খেতে দিতেন। যৌবনে মল্লিক সাহেব বিকৃতমস্তিষ্ক হয়ে যান। নারদ ঋষির মতন সব চুল, গোঁফ-দাড়িঅলা পাতলা ঋজু চেহারা মল্লিক সাহেবের। আমি তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বসবার জায়গা করে দিলাম। তিনি দীর্ঘ করঞ্জ চোখ মেলে একবার মোল্লাকে দেখলেন। বললেন, 'বাবা মোল্লা মোগলজান, আল্লার নামে বেসাতি করছ, কার ক'টা মুরগী খেয়েছ কিয়ামতে হিসেব দিতে পারবে তো?' বলে তিনি অঙ্গভঙ্গি সহকারে বসলেন।

মোল্লা বললেন, 'পারব বইকি!'

'দূর বেটা মিথ্যুক, তোর দাড়িতে ক'গাছা চুল আছে তুই জানিস নি, কিয়ামতে হিসেব দিবি!' সবাই হা-হা করে হেসে উঠল।

মোল্লা সাহেব অপমানবোধ করলেন। রেগে উঠে বললেন, 'তোমারও দাড়ি আছে হে মল্লিক। ক'গাছা চুল আছে গুণে রেখেছ কী?'

'ন হাজার ন' শো নিরেনব্বুইটা—গুণে দেখ'—বলে তিনি তাঁর দাড়িগুলো বাড়িয়ে ধরলেন। তারপর খানিকটা আরবী পড়ে গেলেন গড়গড় করে। বললেন, 'মোল্লাকী করিস, বল তো বেটা কোন সুরা থেকে পড়লাম—কি তার মানে? ও, জানিস না, মুর্খের মোল্লা তোরা?'

মোল্লা বললেন, 'আমরা মুর্খের মোল্লা, কম জানি কিন্তু তুমি তো বেশি জানা শয়তান, নামাজ পড়ো না, রোজা করো না। গাঁজা টানো।'

তখন পাগলা নাদির মল্লিক বগল বাজাতে লাগলেন। বললেন, ইকবালের কথা শোন দোস্ত:

'কাফেরে বেদাবদিল্ পেশে সনম্
বেহ্ যে দীঁদারে কে খুফ্‌ত অন্দর্ হরম্।'

এর অর্থ হল: 'প্রতিমার সামনে জাগ্রতচিত্ত কাফের উৎকৃষ্টতর সেই নিষ্ঠাবান মুসলমানের চাইতে যে ঘুমিয়ে আছে কাবার মধ্যে।'

মোড়ে যত লোক ছিল জুটল এবার নাদির পাগলাকে দেখতে, তাঁর কথা শুনতে।

ইন্‌তাজ মোল্লা জাল বুনতে বুনতে এসে তাঁকে সালাম করে বললে, 'হাঁ গো মল্লিক সাহেব, আমাদের বাড়ি যাওয়া হবে নাকি? দুখানা খেপ্‌লা জাল আছে ছিঁড়েখুঁড়ে, সেরে দিয়ে যেতে হবে বাবা।'

মল্লিক সাহেব রাজী হলেন। জাল সারায় তিনি দক্ষ ব্যক্তি। তাঁর দেখা পাওয়া যায় হয়তো বছরে একবার। কেউ কেউ আবার তাঁকে 'পীর' বলেও অনুমান করে। অনেক সময় তাঁর কথা দুর্বোধ্য লাগে। আবার শরিয়ত ছাড়াও অনেক কথা বলেন। যারা গোঁড়াপন্থী তাদের দেখলেই তিনি চটাতে আরম্ভ করেন। এ তাঁর একরকম মজা। লোকটা কতটা কি জানে সেটা জানাই বোধ হয় তাঁর উদ্দেশ্য। সেই ধরনের কথাবার্তা তিনি কিছু আরম্ভ করলেন।

নাদির মল্লিক মোল্লা সাহেবকে শুধোলেন, 'আচ্ছা বাবা মোল্লাজী, কও তো দেখি তোমার ধর্মের জ্ঞান বা বুদ্ধির বহর কতটা: আল্লা কি করতে পারেন আর কি করতে পারেন না।'

মোল্লা সাহেব চট করে নিঃসংশয়ে বলে দিলেন, 'আল্লা সব করতে পারেন। তিনি সর্বশক্তিমান।'

মল্লিক সাহেব বললেন, 'হ! পারেন। কিন্তু মিয়া, এমন দুটি ব্যাপার আছে, যা তিনি আদৌ করতে সক্ষম নন। বলো দেখি, বলতে পারলে আমার মুণ্ডু হেরে যাব।'

মোল্লা সাহেব গম্ভীরভাবে খানিকটা ভাবলেন। না, তিনি ভেবে পাচ্ছেন না। বললেন, 'সব পারেন তিনি।'

'বলতে পারি'—মল্লিক সাহেব বললেন, 'তবে মোল্লার বাড়ি তাহলে আমাকে খাওয়াতে হবে।'

'বেশ বেশ!' মোল্লা সাহেব রাজি।

তখন মল্লিক সাহেব বললেন, 'দুটি কাজ আল্ল করতে পারেন না। এক হল, নিজেকে তিনি ধ্বংস করতে পারেন না। দুই, আর একটা দ্বিতীয় আল্লা তিনি পয়দা করতে পারেন না।'

মাস্টার সাহেব আনন্দে হুররে বলে লাফ দিয়ে উঠে পড়লেন।

মোল্লা সাহেব চুপ। ব্যাটা পাগলা বলেছে মন্দ কথা নয়।

মল্লিক সাহেব শুধোলেন, 'যদি মুসলমান মেয়েরা এই বলে অভিযোগ আনে যে, তারা একটি পুরুষ-শাসিত সমাজে বন্দী হয়ে বৃথা এবং ব্যর্থ জীবনযাপন করছে তাহলে তাদের কি উত্তর দেবে? মুসলমান ধর্মে তাদের সামাজিক অধিকার নেই কেন? কেন তারা ময়দানে নামাজ পড়তে যাবে না, কেন তারা স্বামীর বা পুত্রের কবর পর্যন্ত দিতে যাবে না? অবশ্য বলবে, কেউ কেউ যুদ্ধক্ষেত্রে গেছেন, রাজ্য চালিয়েছেন, সেটা স্বতন্ত্র, শতকরা দশজনও নয়। গোটা মুসলমান মেয়ে জাতটা হারেমে, পর্দায় বন্দী কেন?'

মোগলজান বলেন, 'তবে কি বেপর্দা হতে বলো?'

'না, তা বলি না। এর মূলে পুরুষশাসিত সমাজ বলে এই ফল দর্শেছে। মেয়েরা বাইরে বেরুবে না মানে আমাদের পুরুষরা খারাপ। আমাদের এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর গত হয়েছেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কি কেউ মেয়ে-ছেলে ছিলেন?'

মোল্লা বললেন, 'মেয়েছেলে পয়গম্বর হয়ে ধর্মপ্রচারে বেরুলে তাঁকে বেদুইনরা বা দস্যুরা চুরি করে নিয়ে পালাত!'

'যা বলেছিস বেটা। পুরুষরা বড় ভালবাসে নারীদের। যাহোক, আল্লা নারীদের ফুলের মালা করে মুসলমান পুরুষদের গলায় পরিয়ে দিয়েছেন, তারা অন্দরে-অন্দরেই থাক। কিন্তু তাদের প্রতিনিধি দেন নি আল্লা এটা সত্য।

দিলে তাঁকে রক্ষা আল্লাই করতে পারতেন। কোনো পয়গম্বরের জীবনই সুখের ছিল না। কেউ যদি তর্ক করে বলে যে, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার জন পয়গম্বরের সব নাম আমরা যখন জানি না তখন তাঁদের মধ্যে মহিলা আসেন নি এমন কথা বলাও কঠিন। কিন্তু বাবা, এক-আধজন যদি বা আসেনও তাঁদের নামের উল্লেখ আছে কি কোরআন শরীফের মধ্যে? আর সব চাইতে গুরুতর কথা, যদি জিজ্ঞাসা করি, আল্লা কোন্ জেণ্ডার? মানে কোন্ লিঙ্গ?'

মোল্লা সাহেব উত্তর দিলেন, 'তিনি কোনো জেণ্ডার বা লিঙ্গ নন। তিনি নিরাকার। তাঁর আবার জেণ্ডার-মেণ্ডার হবে কেন?'

'তবে বাবা নিরানব্বইটা নামে বিচারবান, মহিমময়, সম্পূরক, দয়াশীল, প্রেমময় বলো কেন? কেন পুংলিঙ্গ ব্যবহার করো? ভুলেও বলো না কেন তিনি বিচারকর্ত্রী, প্রেমময়ী, দয়াশীলা? এতে প্রমাণ হয় মুসলমানদের পুরুষ-শাসিত সমাজ। আর তাই পুরুষমানুষ তার স্ত্রীকে যে কোনো মুহূর্তে তিন তালাক দিয়ে তাড়িয়ে দিতেও পারে। আবার পাঁচসিকে পয়সা দিলেই মোল্লা মোগলজানরা সেই মেয়ের একটা নিকে দিয়ে দিতে পাবে 'ইদ্দৎ' পালনের পর—গর্ভে সন্তান আছে কি না দেখে মাস তিন-চারেক পরেই অন্যের সঙ্গে। তার আগের পুরুষটি আবার বিয়ে করতে পাবে, আবার তালাক দিতে পারে, আবার বিয়ে করতে পারে, আবার তালাক দিতে পারে, আবার বিয়ে করতে পারে, আবার তালাক দিতে পারে...' ক্রমাগত মিনিট খানেক ধরে একই কথা উচ্চারণ করতে থাকেন পাগলা মল্লিক সাহেব।

সবাই হাসিতে ফেটে পডতে রাগে মোল্লা সাহেব উঠে টট্টর করে চলে গেলেন। বগল বাজাতে লাগলেন নাদির সাহেব।

সবাই থামলে মল্লিক সাহেব মোল্লা মোগলজানের উদ্দেশে বললেন, 'যা বেটা, মেয়েদের ভূত ছাড়িয়ে, জীন ছাড়িয়ে, দোওয়া তাবিজ বেচে, ওলাউঠোর পানি-পড়া দিয়ে, 'ওবা' তাড়িয়ে, আল্লার নামে মিথ্যের বেসাতি কর গিয়ে—কিয়ামত যেন সত্যিই হয় তোদের জন্যে। এই লোকদের পয়দা করে আল্লা নিজেই পড়েছেন বিপদে। এরা না বোঝে নিজেদের, আর না বোঝে আল্লাকে। আর ৯৯ নামের আল্লার জায়গায় এখন ৯৯৯ নামের শয়তান এদের মগজে আর মনে চিরস্থায়ী বাসা বেঁধেছে। এরা অন্যের ফরসা কাপড় দেখে ঈর্ষান্বিত, নিজেদের ময়লা কাপড় পরিষ্কার করবার কথা বললেই ক্ষেপে যাবে।'

রাত হয়েছে দেখে মাস্টার সাহেব চামনের মল্লিক সাহেবকে হাত ধরে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। যাবার আগে তিনি সরু কল্‌কে বার করে গাঁজা টেনে গেলেন। কটু গন্ধে চারদিকটা ভরে গেল।

মোল্লা মোগলজান এবং নাদির মল্লিক দুটি মানুষ—এঁদের মধ্যে কে ভাল, কে মন্দ সে বিচারে কাজ নেই, কিন্তু পথে ফেরার সময় কেন জানি না, দুজনেরই ভাবমূর্তি মনকে ভরাক্রান্ত করে তুলল। একজন আচার-তান্ত্রিক, বুদ্ধিহীন, আধা-শিক্ষিত আর তিনি ভার নিয়েছেন ধর্মের মাধ্যমে জনকল্যাণের। সেখান থেকে আহরণ করেন জীবিকা। তাঁর 'দেওয়া' সময়ক্ষেত্রে অর্থহীন হলেও মানুষ তাকে নিষ্প্রয়োজনীয় ভাবে না আর সেই দেওয়ার মধ্যে তুকতাক বিধিনিয়মের কল্পিত রং চড়ান মোগলজান কিন্তু তার 'নেওয়া'টা আদৌ যেমন মিথ্যা নয় তেমনি বিধানও নেই জোর করে আদায় করার—যদিও তা অপ্রচুর। ধর্মবৃক্ষের ডাল-পালায় বহু কাক-কোকিল তোতা-ময়না চিল-শকুন বাস করে, তার মধ্যে মোগলজান তো একটা ছোট্ট টুনটুনি মাত্র।

আর পাগলা নাদির মল্লিক সংসারহারা প্রগল্‌ভ ব্যক্তি। ছিদ্রান্বেষী। তার্কিক, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, শিক্ষিত মানুষ হলেও তাঁর মধ্যে আচারনিষ্ঠা, নিয়মনীতি বা সামাজিক দায়ের বালাই নেই। তিনি কতকটা উদাসীন সন্ন্যাসী ধরনের।

তাঁর কথার ওজন আছে, ধার আছে, আছে গভীরতা, ব্যাপকতা। তিনি জানেন অনেক, কিন্তু পালন করেন না কিছুই। তবু তাঁর মধ্যে সত্য-অন্বেষ্টা আজে, কিছু আলোর ঝিকিমিকি আছে। পবিত্র কোরআন, হাদিস, হজরতের জীবন তাঁর ভাল জানা আছে—কিন্তু মোগলজানের তেমন জানা নেই।

আল্লা সম্বন্ধে দুজনের বোধ দু-রকম। মোল্লা সাহেব সম্মোহিত। নাদির সাহেব মুক্তবুদ্ধি।

মোল্লা হিস্টিরিয়া রোগকে কালাজীন-ধরা বলে বিশ্বাস করেন আর চামনের মল্লিক সাহেব সব জেনেশুনেও গাঁজা খান, অশ্লীল কথা বলেন।

মোল্লা মোগলজানের বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছিলাম, সেখান দিয়েই আমার পথ। উচ্চকণ্ঠে তাঁর পুথি পড়া শুনতে পেলাম। প্রায়ই যেমন শোনা যায়:

'দুধেজলে ত্রিশ মণ করে জল পান।
আশি মণ খানা ফের খায় সোনাভান॥'

বাস্তব জীবনের দুঃখকষ্টকে ভুলবার জন্যে অশিক্ষিত আধা-শিক্ষিত লোকদের কাছে পরমপ্রিয় বোধ হয় অলৌকিক গল্পকাহিনী।

তাই 'মাজেজা' বা অলৌকিক ভূতপ্রেত জীনপরী অপদেবতার কাহিনী অথবা পূজা অশিক্ষিত জাতিসম্প্রদায়ের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বাস্তবভিত্তিক বিজ্ঞানকে তাই এই সব লোক শত্রুর যমদণ্ড মনে করে। যেমন মোল্লা সাহেব বলেন: 'তোমরা যেমন জীনপরীতে বিশ্বাস করো না, আমরা তেমনি তোমাদের চাঁদে যাওয়াকেও বিশ্বাস করি না।'

পরদিন পাগলা নাদির সাহেব চাঁদে যাবার প্রসঙ্গ উঠতে বললেন, 'মানুষকে আল্লা কতখানি ক্ষমতা দিয়েছেন, চাঁদে পৌছনোই হল তার প্রমাণ। পরে পরে অন্য সব গ্রহেও সে যাবে—আর আঠারো হাজার আলম অর্থাৎ ভুবনের খবর পেয়ে সে হবে বিস্মিত। প্রশ্ন করবে, কে এ মহাবিস্ময়ের ধারক? ভাবতে ভাবতে তারাও শালা একদিন আমার মতন পাগল হয়ে যাবে॥'

পান

'আঁক কেটে পাঁক কেটে বসালুম চারা
ফুল নেই ফল নেই পাতায় ভরা।'

গরু ছাগল মোষ কাঁচা ঘাস পাতা চিবিয়ে খায় কিন্তু মানুষও যে কাঁচা পাতা চিবিয়ে খেতে পারে না ভারতের লোক এ-কথার মূর্তিমান প্রতিবাদ। ভোজনের পর আমাদের দেশের সামাজিক নিয়ম, একখিলি পান দিতে হবে। জর্দা গুণ্ডি অথবা মিষ্টি এলাচ সহযোগে আমরা দিব্যি আরামে মচমচ করে গাছের পাতা চিবিয়ে ঠোঁট দুটো পাকা তেলাকুচোর মতো রাঙা করে তুলি। সাধু ভাষায় যাকে বলে 'বিম্বাধর'। অনেক লোক, নারীপুরুষনির্বিশেষে, বাঙালী, ওড়িয়া, বেহারী, কাশ্মীরী, আসামী—খোট্টা, চুলিয়া, বামুন, কায়েত মুসলমান, খ্রীস্টান—সর্বশ্রেণীর মধ্যেই এ দেশে পান চর্বণের রেওয়াজ আছে। কেউ কেউ এমনই পানভোজী যে উদয়াস্ত ছাড়াও গালে পান নিয়ে ঘুমোতে ঘুমোতে হাঁ করে কষ বেয়ে রক্তরঙিন 'লিস' বা লালা গড়িয়ে ফেলে রাত্তিরেও তাদের বিছানা বালিশ নোংরা করে ফেলে। গ্রামে গুণ্ডিখাকী মেয়েরা

বলে, 'ভাত বিহনে যেমন তেমন পান বিহনে মরি।' ভাত একবেলা না হয় নেই নেই, কিন্তু পান খেতে না পেলে দম ফুলে মারা যাবে! পান আসলে একটি নেশার জিনিস। এই পানের জন্যে চুন, খয়ের, সুপুরি, জর্দা, মতিহার, ধনে, কালাজিরে, গুঁদলি, পোস্ত, এলাচ, লবঙ্গ, মৌরি কত কি-ই না প্রয়োজন হয়। কতশত রকমের জর্দা বিক্রি হয় এদেশে। সুন্দরী সুর্তী, লালবাবা, কালাপাত্তি, দিলীপ, মোহিনী, লক্ষ্ণৌ, অমৃত, পিলাপাত্তি—এসব তো বাজারের সাধারণ জর্দা কিন্তু যাঁরা সৌখিন লোক তাঁদের জর্দার ভরি নাকি পাঁচ টাকা পর্যন্ত—লক্ষ্ণৌ বা দিল্লীর নবাবী চেহারার জর্দাঅলা বিশটা জর্দা মিশিয়ে বাবু'কে রুপোলী রাংতায় মুড়ে একটা বেহেশ্‌তী সওদা দিয়ে দিলে—পান—মন মেজাজ প্রসন্ন হয়ে যাবে। পানে নাকি আবার স্বর্ণভস্ম মুক্তাভস্ম ইত্যাদিও ব্যবহার করা হয়। নইলে সেকালের নবাবের চিবিয়ে-ফেলে-দেওয়া-পানের-ছিবড়ে-খেয়ে দশ-বিশজন চাকর-বাকররা জ্ঞানহারা হয়ে পড়ে থাকবেই বা কেন?

সব চাইতে বেশি পান খেতে দেখা যায়, ওড়িয়াদের আর মিলাদ মহফিলে ধর্মীয় বক্তৃতা করে বেড়ানো 'পেশাদার' মৌলভী মওলানাদের এবং গ্রামের প্রায় প্রতিটি মুসলমান বাঙালী মেয়েদের। অফিসের কেরানীবাবুদের মধ্যে যাঁদের বয়স আধ-শতাব্দীর দিকে তাঁদেরও ডিবে খুলে পান গালে পুরে আঙুলের ডগায় করে চুন নিয়ে দাঁতের পাটির ভেতরে টেনে মুছে নিয়ে মসটে মসটে চিবোতে দেখা যায়। কোনো কোনো দিন হয়তো পিক ফেলতে গিয়ে ঝরে পড়ে তাঁদের সাদা পাঞ্জাবিতে লম্বা হয়ে, আর চুন দিয়ে তা ঢাকা দেবার প্রয়াসে তাঁদের ভদ্রতা রক্ষা করার কি অদ্ভুত বাঙালীপনা যে প্রকাশ পায় তা বিদেশের কোনো সভ্য মানুষ দেখে গিয়ে যদি দু'কলম লিখে দেন তবে আর বলার কি আছে!

কলকাতায় গোলদীঘির ঈশানকোণের একটি পান-দোকানে যেসব সর্ব-ভারতীয় মহাজনদের পানের প্রশংসাপত্র আছে, তাঁদের দায়ে পড়ে যদি সেসব লিখে দিতে না হয়ে থাকে, তবে পান খাওয়া যে একটি অসভ্য কাজ একথা বললে স্বয়ং বার্ট্রেণ্ড রাসেলেরও ক্ষমা নেই! 'চাষা জানে কি মদের স্বাদ?'

পান গাছের পাতা বটে কিন্তু বরণীয় জনসাধারণের একটি পাবলিক নিত্য ব্যবহার্য জিনিস। হাজার হাজার টাকার বিকিকিনি হয় এই পান, প্রতিদিন

শিয়ালদার বাজারে। রবি আর বৃহস্পতিবার ছাড়া প্রতিদিন হাজার হাজার পানের মোট আসছে শত শত গ্রাম থেকে লরী আর ঠেলাগাড়ী বোঝাই হয়ে।

পানকে হেনস্থা করার সাধ্য নেই কারো—পান নাকি এখন একটি কৃষিজাত 'শিল্পদ্রব্য'। এই কৃষিজাত শিল্পের চাষ-আবাদ করে গ্রামের বহু মানুষের সংসার নির্বাহ হচ্ছে। দশ-কাঠা জায়গায় পান বরোজ তৈরি করতে ৬০০।৭০০ টাকা খরচ। যাদের আট-দশখানা পান বরোজ আছে তারা কম পয়সার মালিক নয়! একটি দশ কাঠা বরোজের আয় থেকে পাঁচ-সাত জন লোকের একটি সংসার চলে যায়।

পানের নাম প্রাণ। তার গোড়ায় জল পাঁক সার ঢালো সে পাতায় পাতায় প্রাণ বাঁচানোর জন্যে টাকাপয়সা ঢেলে দেবে।

২৪ পরগণার বিষ্ণুপুর, বজবজ থানার বহু গ্রামে, হাওড়ার নপ্টেবাঁটুলে প্রচুর পরিমাণে পান চাষ হয়। তাছাড়া গাজিপুরের পানও খুব বিখ্যাত। গয়া জেলায়ও পান চাষ হয় প্রচুর।

নোদাখালির পাঁচমাথার মোড়ে শনি এবং বুধবার বাদ দিয়ে যে কোনো দিন বসে থাকুন, দেখবেন চারদিকের গ্রাম, হাউড়ি, কামরা, ধঞ্চেবেড়িয়া, সোনাপুর, চকদৌলত, সাতগাছিয়া, চকবাঁশবেড়িয়া, ডোঙ্গাড়িয়া, সাহেবান বাগিচা থেকে চাষীরা সন্ধ্যার সময় পানের মোট বয়ে এনে নামাচ্ছে। প্রতিদিন ৫০।৬০ খানা পানের মোট যাবে এখান থেকে লরীতে করে শিয়ালদায়। পথে মুচিশা, বাখরাহাট, বিবিরহাট, নান্দাভাঙ্গা, কেয়াতলা, সামালী থেকে গাড়ি থেমে থেমে আরো মোট তুলে নেবে। রথের মতো সাজিয়ে নিয়ে গাড়ি চলে যাবে কলকাতায়। প্রত্যেকের মোটে চিহ্ন দেওয়া আছে। কারো সবেদা-পাতা, কারো জাম, জামরুল, ম্যালিরিয়া বন, আশ-শ্যাওড়া পাতা, মুক্তোঝুরি বা আপাং, চাঁদা চটপটির গাছ।

রবি আর বৃহস্পতিবার পানের বাজার বন্ধ শিয়ালদার। সেইজন্য তার আগের দুদিন মাল যাওয়া বন্ধ। শিয়ালদার মাল সারা কলকাতায় ছড়িয়ে পড়ে তো বটেই, ছড়িয়ে পড়ে সারা ভারতের দিকে দিকে। বোম্বাই, বাঙ্গালোর, আজমীর, এলাহাবাদ, শিলং সর্বত্র।

হাউড়ি গ্রামের সম্ভ্রান্ত চাষী নন্দ মান্না, মাথায় আধ হাত পরিমাণ সব চুল, আগে মুখে দাড়িচুলও ছিল, এখন আর তা নেই, হাতে একটা ছড়ি, খাটো

ধুতি আর খাকি কাপড়ের ফতুয়া পরনে, কাঁধে একটা মোটা সুতোর চাদর, পায়ে চটি, মাঝে মাঝে বিড়ি খান, বয়স প্রায় ৬০ বছর, পানের কষে দাঁতগুলো কালো—তাঁকে পান সম্বন্ধে শুধোতে বললেন, পান আছে বহু রকমের। যেমন :

১। দিশি

(ক) ঢল দিশি

(খ) কালকে ডগ

২। মগাই (গয়া)

৩। কড়ুই (নণ্টেবাঁটুল)

৪। ছাঁচি (নণ্টেবাঁটুল, গন্ধ)

৫। মিঠে

৬। মজাল (গুগোল তুলসীর মতো গন্ধ)

৭। গেছো (বড় বড় আম-কাঁঠালগাছে উঠে হয়)

৮। গাজিপুরী

(ক) ভাবনা বাঙাল

(খ) হাত্‌কে বাঙাল

(গ) গুলে বাঙাল

(ঘ) ঢল বাঙাল

৯। বাগেরহাটি (খুলনা, ঝাল)

১০। ভেড়ামারি

১১। হরগৌরী (একচির সবুজ একচির সাদা)

১২। ঘন গেঁটে (সবচেয়ে বড় পান)।

নন্দবাবু লেখাপড়া জানেন, হিন্দুধর্মের আদিঅন্তের খবর রাখেন, মহাভারত, রামায়ণ, ভাগবত-গীতা, চণ্ডী, বহু রকমের পুরাণ শুধু পড়েছেন নয়, রীতিমতো জলের মতো সব কাহিনী কণ্ঠস্থ। প্রতিদিন খবরের কাগজ পড়েন, কংগ্রেসী করেন চিরকাল, এ লাইনে রং বদলান না তিনি তাঁর সেজো, ন-সেজো, ছোট ভাই, ভাইপো—এঁরা সবাই কট্টর বাম কমিউনিস্ট। তাঁর ছেলে কমল মান্না ছবি আঁকতে পারে, নাটক লেখে আর লোকজন পেলেই যে কোনো উৎসবে যাত্রা অভিনয় করে। নন্দবাবুর ধানজমি আছে, খোরাকী হয়েও সামান্য কিছু বিক্রি হয়। পানের বরোজ আছে। আলু কলা পটল মাছ

গুড় পাট উলু নারকোল সবই প্রায় চাষে হয়। নিজে খাটতে খাটতে গতর তাঁর প্রায় পড়ে এসেছে। কোমরে গেঁটে বাত। সাইটিকা আছে নাকি আবার। নিজের জানা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা চালান। অনেক নভেল নাটক পড়েছেন। কালিদাস, কাশীদাস, চণ্ডীদাস থেকে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত পথটাকে তিনি মোটামুটি চেনেন তারপর থেকে একালের বহু মহাজনের অরণ্যে প্রবেশ করেও যেন কাউকে তেমন চিনতে পারেন নি আপন করে। তাঁদের পথে নাকি বড় সরু সরু চোরাগলি।

পিতৃস্থানীয় দরদী এই বৃদ্ধ অপূর্ব গল্প বলতে পারেন। বহু বিচিত্র বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা। ধর্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, গার্হস্থ্যনীতি, যৌনবিদ্যা নানান ব্যাপারে তাঁর বেশ জানা আছে। তিনি বলছিলেন, 'পান-চাষে লাভ প্রচুর সত্যি কিন্তু অপর্যাপ্ত খাটুনি। কার্তিক মাসে বরোজ ফাঁদতে হয়। 'সাজতে' হয়ও বলে। দশকাঠা একটা বরোজ থেকে বাপ-মেয়ে-ছেলে মিলে জল বয়ে পাঁক দিয়ে পরিশ্রম করে নণ্টেবাঁটুলের এক বুড়ো সংসার চালিয়ে অবস্থা গুছিয়ে নিয়েছে।'

শুধোলাম, 'মেয়েদের তো পান বরোজে ঢুকতে মানা!'

নন্দবাবু বললেন, 'কে বলেছে, যত সব কুসংস্কার। কেন, মেয়েদের যদি অত হীন ভাবো, তাহলে তাদের গর্ভে জন্ম নেওয়াও তো বন্ধ করতে পারো! এই তো ইন্দিরা গান্ধী এখন প্রধানমন্ত্রী, তা বলে কি পুরুষরা সব লজ্জায় গলায় দড়ি দেবে? মেয়েদের ঐ যে তিন-চারদিন অসুখ থাকে ফি-মাসে ওই কদিন পান বরোজে ঢুকবে না। তারপর পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন হয়ে ঢুকলে কি দোষ? লোকে বলে মেয়েছেলে পান বরোজ স্পর্শ করলেই বরোজের সমস্ত পান জ্বলে যাবে, ওসব বাজে কথা। অতি ভক্তি বা অতি সাবধানতার আতিশয্য। তার মানে, যাতে সংসার চলে, টাকাপয়সা আসে তার কাছ থেকে অচ্ছুৎ বা 'তেরো-স্পর্শ দোষ ইত্যাদি দূরে রাখতে চায়। মহাজনরা বললেন, অমুক মাসে মূলা বা বার্তাকু নিষিদ্ধ। তার মানে গ্রহের ক্রিয়া পৃথিবীতে এমন হয় এই সব খাদ্যে, প্রতিক্রিয়া করে। বামপন্থী ভাইরা বলে, 'ঐসব গেঁজেল মহাজনদের কথা ফেলে দাও'। তা মহাজনরা তো মধুর সঙ্গে ঘি খেতে বারণ করেছেন, খাও তবে তোমরা, মজাটা টের পাবে! মহাজনদের কথা মানবে না মানে কি? বাপ-ঠাকুরদাদা যাঁরা সেই সুরেন বাঁড়ুয্যে, সি. আর. দাশ, রবিবাবু, বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ সব বাদ দিয়ে বিদেশী নেতাদের কথা শুনলেই এ দেশের মাটিতে ফসল

ফলে যাবে তো ? তাঁরা তাঁদের দেশের সেই যুগের সমস্যা সম্বন্ধে বলেছেন, যুগ জীবন পাল্টাচ্ছে, তার মূল্যায়নও পাল্টাচ্ছে। ভারতের মাটিতে অনেক জাতের অনেক ভাবের কলমের গাছ পোঁতা হয়েছে—লাল হলদে কালো– সব একদিন সবুজ হয়ে যায়। এ তার মাটির গুণ।'

'আপনি পানচাষ সম্বন্ধে বলছিলেন।'

'হাঁ। 'তিন চাষে ধান বিনা চাষে পান, ষোল চাষে তুলা, তার অর্ধেক মূলা'। বিনা চাষে পান মানে অবশ্য একেবারে আচোট মাটি হলে হবে না। এক চাষ দিয়ে জমি 'চৌসো' করে ঘাস আগাছা তুলে পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। শতখানেক বাঁশ কেটে 'উবি', 'জটলাই' পুঁতে 'তার' খাটাতে হবে। আগে 'তার' ছিল না, ঝড় হলেই বরোজ শুয়ে পড়ত। এখন 'তার' হয়েছে। ২' কুইনটল 'তার' লাগবে দশ কাঠা জায়গায়। 'তার' শুধু ছাউনি চালের জন্যে দরকার। টান করে আড়ে-লম্বায় বেঁধে দাও হাত দুয়েক ছাড়াছাড়ি করে। কাছাকাছি শক্ত গাছ থাকলে টানা বাঁধার সুবিধে। নইলে 'উবি' বা বাঁশের মোটা 'গোজে' পুঁতে 'তার' টেনে বেঁধে রাখতে হবে। 'তার' খাটানো হলে উপরে কয়েক কাহন 'পাকৃড়ি বা প্যাকাটি' (পাটকাঠি) বিছিয়ে দাও পাতলা পাতলা করে। তার উপরে আবার পাতলা পাতলা কাশ বিছিয়ে দিতে হবে। শীতে একটু ঘন চাল ভাল। চারদিকে বেড়া দিয়ে নারকোলপাতা চেলা করে 'বাতা' ধরে ভেতরটা আড়াল করে দিতে হবে। তারপর 'জোড়গাছি', 'ফাঁকগাছি' উবি পুঁতে দাও সরল রেখায় ঈষৎ উঁচু ভাঁটি টেনে নেবার পর। এরপর বসাতে হবে পানের বীজ। বীজ হল একটা গাঁট সমেত একটা আস্ত পান। কেউ কেউ তিন গাঁট নিয়েও আবার বসায়। গয়া, বাগেরহাট—এসব জায়গায় নাকি আবার গোটা লতানে পানগাছটাকে ভাঁটিতে বিছিয়ে এক ইঞ্চি মাটির নিচে চাপা দেয়। শুধু পানগুলো বাইরে থাকে। উপরে পাতলা করে ভিজে খড় বিছিয়ে দেওয়া হয়। মাটিতে এ সময় রস থাকে। জল লাগে না। সপ্তাহ দেড়েকের মধ্যে অঙ্কুর গজিয়ে ওঠে। গাছ একটু বাড়লেই লতিয়ে ওঠার জন্যে বাছাই প্যাকাটি পুঁতে দিতে হবে। ভাঁটিতে খইল, ঘুঁটেগুঁড়ো বা পচা পুকুরের কালো পাঁক দিতে হবে।'

'বৈজ্ঞানিক সার দিলে কি রকম ক্রিয়া হয় পরীক্ষা করে দেখেছেন ?'

'দেখেছি, কোনোটাই ভাল কাজ দেয় না, বরং ক্ষতি করে। এক বাবু

সেদিন পঞ্চায়েত অফিসে এসে চাষবাস সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা করছিলেন। তিনি নাকি এগরিকালচারের অফিসার। পানগাছে সার দেওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন করতে তিনি বললেন, 'গর্ত খুরিয়া পানগাছের গোরায় সার দিবেন'! তাঁকে শুধোলাম, 'মহাশয় আপনি কি কখনো পানগাছ চোখে দেখিয়াছেন? গোড়া খুলিয়া সার দিবার জায়গা কোথায়? বইয়ের ছবিতে বোধহয় পানগাছ দেখিয়াছেন, কোনোদিন বরোজে ঢোকেন নাই। যে ভাঁটিতে গাছ থাকে তাহার নিচে অজস্র গাছের কাণ্ড থাকে। গর্ত খুড়িলেই ক্যাঁচ ক্যাঁচ করিয়া কাটিয়া যাইবার সম্ভবনা'। লাইনের পাশেই পথ, যে পথে দাঁড়িয়ে গাছের 'পাট' করতে হয়। যাহোক, মশায়, সার দিতে হলে গাছের গোড়ায় যেমন গুঁড়ো খইল ছড়িয়ে দিয়ে তার ঝাঁজ মরে গেলে ঝুরে মাটি তার উপরে দিয়ে দিতে হয় তেমনি দিতে হবে। তবে কি সার দেবেন, মিশ্র, না হাড় গুঁড়ো—যাই দিন ফল ভাল হবে না। উল্টে বাঁশ যাবে। বাবু কিছুতেই স্বীকার করলেন না যে তিনি পানচাষ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। এগ্রিকালচারে তাঁর ডিগ্রী আছে কল্যাণী য়ুনিভারসিটির। কিন্তু হাল-লাঙল কোনোদিন করেন নি, মানে, হাতে-কলমে তাঁর বিদ্যের অভাব। ডাক্তার বলন্সে, বেদানা আপেল খাও, বোগীর সে সামর্থ্য না থাকলে! আমরা গরিব চাষী, অতো সারের পয়সা কোথায়? আমাদের গোবরই ভাল।'

দুখানা পানের 'মোট' এল। নন্দবাবুর একটা ছোটমতো পানের 'খতি' মাথায় নিয়ে এল তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান ন্যালা ক্যাবলা গুরুচরণ। নন্দবাবু ব্যস্ত। চা খেয়ে পানের হিসেবটা লিখে নিলেন। তারপর বলতে লাগলেন, 'কাঠা দশেক জায়গায় বরোজ করতে গেলে ৬০০।৭০০ টাকা খরচ হয়। ধরো, 'তার' দুশো টাকা, একশো ভাল বাঁশ আড়াই শো টাকা, প্যাকাটি ছ-টাকা থেকে পঁচিশ টাকা কাহন, এখন দশ টাকা দর, দশ কাহন প্যাকাটি একশো টাকা, তারপর বীজ পঁচিশ টাকা, কেশে পঞ্চাশ টাকা, দড়ি পাঁচ টাকা, মজুরী একশো টাকা—কত হল? সাতশো পাঁচ টাকা? তাহলেই বোঝো ঠেলা? অবশ্য সব কিনে যারা ববোজ করে তাদের দুর্দশার শেষ নেই। একবার বরোজ সাজলেই যে পান পিঠ দেবে এমন ভাগ্য সবায়ের হয় না। তাই ঘরের বাঁশ প্যাকাটি কেশে ইত্যাদি থাকলে ভাল হয়। সুরেশ ভোঁড়ের দশটা পান বরোজ, ৩০।৪০টা জন-মজুর খাটছে নিত্যদিন। মুসলমান অনাথা মেয়েরা কলসী কাঁখে নিয়ে রোজ রোজ শত শত মণ জল আর পাঁক বইছে

তার বরোজে। পাঁচসিকে মাত্র রোজ তাদের! বরোজের চালে তার প্রচুর পটল হয়। রান্নাপুজোয় ৬০ কেজি পটল বেচলে দু' টাকা দরে—একশো কুড়ি টাকা উপরি পাওনা। একটা বরোজ পিঠ দিলে বিশ বছর যায়। আমাদের এদিকে সব দিশি পানের চাষ। এখন আবার 'ঘন গেঁটে' চাষ করছে অনেকে। ঘন গেঁটের একটা গাছে সাত-আট গণ্ডা পান থাকে। দশ-বারো গণ্ডা পর্যন্ত রাখা যায় শীতকালের জন্যে। শীতেই তো পানের বেশি দর। এক গোছ এক টাকা। আট গোছ টাকায় বিক্রি হয় আষাঢ়-শ্রাবণে। এখন কার্তিক মাসে দেড় গোছ টাকায় যাচ্ছে। একটা ছ-পাই পানের মোট নিয়ে গিয়ে দেড় গোছ টাকায় বিক্রি করলে হবে একশো চুয়াল্লিশ টাকা। দু-গোছ করে বিকোলে একশো আট টাকা। লরীর ভাড়া মোট পিছু এক টাকা ষাট পয়সা। এখান থেকে তিরিশ মাইল পথ শিয়ালদা। পান ৩২টায় গোছ। ২৪ গণ্ডায় শ। ১২ শয়ে পাই। ৬ পাই বা ৮ পাইয়ে মোট বাঁধা হয়। ৫০ গোছ বা ১০,০০০ হাজারে যারা মোট বাঁধে তারা মোটকে 'সিড়ি' বলে। বাগেরহাটের মোট সাজানো হয় লাটুর মতো করে। আমাদের এদিকের মোট চৌকোনা। সব পানেই চারটে করে শিরা হয়, একটা মূল শিরা। ডাঁটার গোল পিঠটা নিচের দিকে। সব রকম গাছেরই তাই। এতে বোঁটার বা ডাঁটার ধারণ-ক্ষমতা বাড়ে।'

গুরুচরণ নাকিস্বরে বললে, 'বাঁবাঁ চাঁ খাঁবো!'

নন্দবাবু খেঁকিয়ে উঠলেন, 'চাঁ খাঁবে! সাধে কি তোর নাম গুরুচরণ রেখেছি! যা একটা পানতুয়া খেয়ে নিয়ে ঘরে যা। গরুকে খড় ভুঁসি দিস, নাহলে কাল এসে স্থটিয়ে হাড় গুঁড়ো করে দোব। বাঁদরটা এই দু-ছড়া কলা আর এক থালা মুড়ি খেয়ে এল!'

তারপর আবার নন্দবাবু বলতে লাগলেন, 'যারা বরোজের কাজ জানে তাদের রোজ সাড়ে তিন টাকা। তারা 'দোলন' দেয়, গাছ নামায়, 'জেবো' কাটে, 'কড়ম' কাটে, 'জুন'—মানে আধ-হাতটাক করে উলু কেটে শুকিয়ে রাখা হয়, সেটা ভিজিয়ে নিয়ে কোমরের কাছে রেখে লখিন্দর বেহুলার পালা গান গাইতে গাইতে স্নদৃশ্য হিমশীতল পান-বরোজের মধ্যে গোড়ার পান ভেঙে নিয়ে পচা প্যাকাটি পাল্‌টে দিয়ে বেঁধে দেয়। আগুন জেলে বরোজের বাইরে কাঁচা পাটের প্যাকাটি থেকে আঁশ পুড়িয়ে সাফ করে রাখতে হয়। 'গবে' বা গর্তে নালা দিয়ে সেচের জল এনে, তাতে পাঁক গুলে নিয়ে কলসীতে

করে ঢেলে ঢেলে দিয়ে যেতে হবে পানের লাইনে। প্রতি পনেরো দিন ছাড়া একবার করে গোবর সার বা খইল দিতে হয়। 'জেবো'-কাটা ডালপালা ফেলে দিতে হয়। 'জেবো' থেকে বীজ হতে পারে কিন্তু 'কড়ম' থেকে আদৌ হবে না। মোট হবার পর যা বাছপান বের হয় তা পাড়ার মেয়েরা ঝোড়া ভর্তি করে নিয়ে যায়। তারা খায়। শীতকালে ছাউনি ঘর থাকলে শীতটা কম লাগে—নইলে কড়া শীতে পান ঝরে যায়, গাছের ডগা ফেটে যায়, ভেঙে পড়ে। বর্ষায় চাল পাতলা হয়ে যায়। শীত কাটলে ফাল্গুনে আবার হাওয়া বাতাস খেলবার জন্যে ছাউনি হাল্‌কা করা ভাল। প্যাঁকাটির বদলে ধঞ্চে বা শরখড়ি ব্যবহার করা যায়।'

পানের রোগ সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে নন্দবাবু বললেন, 'ধসা', 'ভাবা', 'ছল্‌মা', 'শেল দাগ' বা 'মশা দাগ', 'পায়রা-চোখো' রোগ হয় পানের। 'হাওয়ালি' পোকা ধরে। এই পোকা সাদা এবং কালো দু'জাতেরই আছে। কালোতে ক্ষতি করে, পান কুঁকড়ে যায়, কালি হয়। ভিতর পিঠে পোকা ধরে কিন্তু কালো হয় উপর পিঠ। পানের রোগ ধরলে আমরা সারা-বরোজে ধুনোর গন্ধ দিই। গ্যামাক্সিন দিই। হয়গৌরীও মনে হয় এরকম রোগাক্রান্ত পান। জোঁক থাকে পান বরোজে।'

'একটা বরোজ আছে বাঁড়ুয্যেদের। বিশ-ত্রিশ বছর চলছে। মাটি দিয়ে দিয়ে একবুক উঁচু হয়ে গেছে। একটু নাবাল জমিতে তাই বরোজ ফাঁদা ভাল। অবশ্য জলবসা যেন না হয়।'

'সপ্তাহে একবার পান ভাঙা যায় ?'

'না। পনেরো দিনে ভাঙলে ভাল। যে যেমন রাখতে পারবে শীতের বেশি দরের সময় তেমন মাল বা টাকা পাবে। একটু নরম পান ভাঙলে রাত্রে 'জাগ' দিয়ে জল ছাড়িয়ে রাখলে পরদিন পান শক্ত ডাঁটো হয়ে যাবে। 'পান করা' হল কয়েকজন বসে তিন চার সাইজের পান বাছাই করতে করতে 'গোছ' সাজিয়ে যাওয়া ; তাই নিয়ে সারাদিন পর হয় 'মোট'। শুকনো কলাপাতা বা খড় দিয়ে মোট বাঁধা হয়।'

'পান চুরি হয় না ?'

'রাত্রে পান চুরি করলে পট্‌পট শব্দ হবে। এলোমেলো পান ভাঙা দেখলেই বুঝতে পারবে পান চুরি হচ্ছে। এমনি বিশ্বাসদের চুরি হত রোজ। তাদের যুক্তি দিলুম যাঁতিকলের মতন কাম্‌ড়ি তৈরি করে এনে বরোজের দোরগড়ায়

বসিয়ে রাখতে। তারা কামারশালা থেকে লোহার মারাত্মক কাম্‌ড়ি তৈরি করে এনে বসিয়ে রেখেছিল। আর ননী ভুঁয়ে পান চুরি করতে যেয়ে দিলে তাতেই পা। চার-পাঁচটা মারাত্মক ধারালো ফলা বিঁধে গেল তার পায়ে। তখন চিৎকার। তারপর হাসপাতালে গিয়ে তার হাঁটু থেকে ঠ্যাংটা বাদ দিয়ে আসতে হল।'

পানের লরী চলে যাবার পর লাস্ট বাসে নন্দবাবু চাদর মুড়ি দিয়ে শিয়ালদায় চলে গেলেন পান বেচতে, গালে একখিলি পান পুরে চিবোতে চিবোতে ঠোঁট দুটো রাঙা করে। বাসে উঠে বললেন, 'এসো না যাই, 'কমললতা' দেখে আসব'খন!'

বললাম, 'না দাদা, গহ্বরের মতো কোথায় আবার সংসারধর্ম হারাব।'

বদলিওয়ালা

হাড় কনকনে শীতের রাত। কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে পৃথিবী। মাথাভাঙা পাণ্ডুর চাঁদটা ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে গাছপালার ভেতর দিয়ে।

এক মিনিট ধরে কেঁপে কেঁপে তিনটের ভোঁ হচ্ছে চটকলে।

সট করে ঘুম ভেঙে গেল রহমানের। গায়ের ওপর থেকে তেল-ময়লা-জমা পুরু ছেঁড়া কাঁথাটা সরিয়ে উঠে বসল সে। দু-হাতের উল্টোপিঠে ঘুম জড়ানো পিচুটিভরা চোখ দুটো রগড়াতে রগড়াতে দাঁত-কিড়মিড় করে বললে, 'শালা!'

রহমানের মা কান-খড়কে বুড়ী জরিনা তখন বাইরের দাওয়ায় শুয়ে শুয়েই ডাকছে, রহমান—ও রহমান! পয়লা ভোঁ হয়ে গেল যে রে বাবু! 'কহোন' কলে যাবি তুই? কি মারানে 'হিদ' বাবা তোদের।'

'খচখচ করিহ্‌নি বাবু তুই!' ঘরের ভেতর থেকে দাঁত-ঝাড়া মেরে ওঠে রহমান।

গ্রাহ্যই করে না বুড়ী। বলে, 'হাঁ-র‍্যা মুখ-লুকুনে, কাজে যাবি কহোন?'

'আমার যহোন ইচ্ছা যাবো হোন। তুই অত ভ্যাবাস্‌-নি-কো!' হাঁটুতে হাত বেঁধে মাথা গুঁজে বসে রইল রহমান খানিকক্ষণ।

কোলের বাচ্চাটাকে রাত্রে কখন ওপাশে সরিয়ে দিয়ে কাছে ঘেঁষে এসে

শুয়েছিল কাজল। মা-বেটার চেঁচামেচিতে তারও ঘুম ভেঙে যায়। কাঁথাটা টেনে নিয়ে পড়ে থাকে চুপ করে, চোখ বুজে। অভ্যাস মতো ছেলেটা সরে এসে কাজলের বুকের ভেতরে মাথা গুঁজে চুষছিল তার শুকনো একটা স্তন। মাঝে মাঝে কচি কচি চারটে দাঁতে কুট করে কামড়ে দেয়, দুধ পায় না বলে।

কলের লোক চলতে শুরু করেছে রহমানের ঘরের পিছনের পথ ভেঙে। আর বসে থাকা চলে না। উঠে পড়ে পরনের ছেঁড়া কাপড়টা ছেড়ে মিলে-কাজ-করা ছেঁড়া-ময়লা-চামড়া হাফপ্যাণ্টখানা পরলে রহমান। গায়ে গলালে গত বছরের পুজোয় বখশিশ-পাওয়া নীল হেসিয়ান চটের শার্টখানা। কান দুটোর ওপর দিয়ে মাথায় সেঁটে জড়ালে গামছাটা। দোরের আগডটা খুলে খুকখুক করে কাশতে কাশতে নেমে গেল অন্ধকারের প্রাণী অন্ধকারে।

বাইরের অন্ধকারভরা ঝোপঝাড়ের পথে হাড়-কনকনে শীত। খালি হাত দুখানা বুকে বেঁধে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে চলল রহমান।

খানা-খন্দ-ভরা অন্ধকার-জমা মাইল দুই পথ। শীতে সিটিয়ে জড়ো হয়ে আসে রহমানের হাড়-পাঁজুরে চেহারাটা। বাবলা-বাড়ির ঝোপটার তলায় হঠাৎ কিসে যেন ঠোক্কর লাগে। মুখ গুঁজে পড়ে যায়—ছিটকে—খানিকটা দূরে। শীতে যদি পা দুখানা অসাড় হয়ে না যেত—লাগতো যা জমপেশ। উঠে দাঁড়িয়ে আবার হাঁটবার মুখে, পয়লা কদম ফেলেই, দাঁত কিড়মিড় করে বলে, 'শালা!'

পিছনের মানুষটা এগিয়ে এল। মুখে তার বিড়ির আগুন। দপদপ করছে। রহমান প্যাণ্টের পকেটে হাত গলিয়ে গত সন্ধ্যার আধপোড়া বিড়িটা বার করে বললে, 'দেখি দাদা আগুনটা।'—বিড়িতে দু-টান মেরে খিকখিক করে খ্যাক-শিয়ালের মতো খানিকটা কাশলে রহমান। লোকটাকে শুধোলে, 'লিজ কাজ?'

'হ্যষ্! বদলি! খল্-পা ছেড়ে গেল রোজ-রোজ হাজিরি দিতে এসে। আচ্ছা ভাই, আমরা এই 'আম্না' (আর না) হবে দশ বচ্ছর বদলি কচ্ছি। এ্যার মধ্যে কত পারমেণ্টোওলার 'পান্সিয়ান' হল কত লোক 'সারপিস' পেলে, তবু আমাদের আর লিজ কাজটাও হলুনি? আচ্ছা, তাও যাক, কিন্তন 'হাপ্তা'য় দু'দিনও যেতিন…'

দাঁত-ঝাড়া মেরে ওঠে রহমান, 'তবে অরে কি! কে হে তুমি? তারা হল

বাবুদের বাবাখুড়ো। বিদেশ থেকে এয়েচে। থাকে কোথা—খায় কি ?'

'তবে আমরা কি ঘরের খেয়ে বিলের মোষ তাড়ব ?'

'বাঙ্গালী আদমী। তাছাড়া আর করবে কী! তোমরা তো 'কমিনিস' —খালি 'ধম্মঘট' আর 'ঘেরাও' লাগাও।

লোকটা বেশ। তারও বুকভরা আগুন। রহমানের ঝাঁঝরা বুক থেকে ঠিকরে পড়ল দু'টুকরো। পূবাকাশ তখন ঘোলাটে আঁধারে পাঁংশুটে সাদা। লোকটা নাম বললে—কানাই।

কানাই বলে যায়, 'হাতে নেই একটা কানাকড়ি। রোজগারের নামে ঢু-ঢু। আবার ভাই, আজ রাত্তিরে আমার বউটা বিইয়েছে একটা! 'ধিৎকার' করে মারলে শালা!'

ধারমরা পানশে হাসি হাসে রহমান। ও-কথা আর কেন বলে কানাই। তারো যে এবারেরটাকে নিয়ে হল পাঁচটা তারপর বুড়ো মা—আর তারা দু-মেয়েমর্দ।

রহমান বলে যায়, 'বাবু বলে, মুরগী আছে নাকি হে রহমান। খাইয়ো না একটা। তা খাওয়ানু। বলে, উপায় নেই ভাই। ওপরের 'অডার' চুটকি-ওয়ালাদের পয়লা কাজ দিয়ে যদি থাকে তবে। আচ্ছা, কাল এস না- চেষ্টা করা যাবে। সেই থেকেন এই পাঁচ 'হাপ্তা' হল। দুদিন খালি হয়েছে উ-হপ্তায়। দেখি-না, আজ শালা কি বলে। চাষের যে জন খাটব তারও উপায় নেই।…ভোরে হাজিরি দিয়ে ঘরে ফিরতে ডেভটা বাজে। রাত-কাজটা পাই কিনা দেখে যাই কিনা। জানে 'ধিৎকার' ধরে গেল ভাই কানাই। শালার মিটিংই খালি হচ্ছে—যারা তবু পাচ্ছে কিছু—কাজ আছে—তাদেরই 'হাপ্তাকড়ি' বাড়াবার চেষ্টা হচ্ছে। মোরা যে ভুঁয়ে মুখ 'লোগড়ে' মরতিচি সিদিকে কি কারু লক্ষ্য আছে? মোরা যেন মানুষ লয়—কুকুর—বেরাল—শুয়োর ··' গলার স্বর মোটা হয়ে যায় রহমানের। ফোঁৎ করে কেঁদেই ফেলে বেচারী! শিং-উঁচু গণ্ড বেয়ে ঝরঝর করে ঝরে পড়ে কোটরে-ঢোকা চোখের জল। তলা-ফাটা চামড়া-ওঠা কড়া-পড়া হাতে চোখের জল মুছে ফেলে ব্যথার পাথরটা ঘিঁটে নেয়।

পাঁচটার বাঁশি হয়ে গেল আধা পথেই। ছুটে ছুটে চলল দুজনে। কানাই তাঁতে। মোটায় কিংবা হেসিয়ানে—যাতে হয় হোক। মোটায় একটু খাটুনি বেশি। মাকু, দক্তি, হাতল, বীম, ঝাঁপ, মেড়া এই সব নিয়ে তার কারবার।

রহমানের স্পিনিংয়ে। তাদের মতো কতশত বদলিওয়ালা চলেছে! প্রায় মুখ-চেনা। কেউ করে বীমে, দেয়ানে, বোপিনে, কেউ-বা রোপিংয়ে, হাতীকলে ঘড়িকলে, সেলাইয়ে, পেশাইয়ে, পাঁজ-চাপায়, নলি-খোলায়, বাইরের কয়লা বওয়ায়, পাটের গাড়ি ঠেলায়—হাজারো কাজে। হুহু করে বাঁধভাঙা স্রোতের মতো ছুটেছে আধন্যাংটো মানুষের দঙ্গল। বামুন, কায়েত, মাহিষ্য, মুচি, তিয়োর, ডোম, চাঁড়াল, মুসলমান। কত অজানা জাত-গোত্রহীন মানুষ। কলের লোক। ভাল কথায়—শ্রমিক মজদুর!

যে যার ডিপার্টমেণ্টে সারি বেঁধে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছে নিজকাজওয়ালা লোকগুলো। হাজিরিবাবু নাম-নম্বর ধরে ডাক দেয়। হাজিরি হয়ে যায়। যে কজন আসেনি অর্থাৎ আসতে পারেনি—ব্যারামে পড়ে ছুটি করেছে—তাদের বদলে বাবু যাকে ইচ্ছা তাকে কাজ দেয় বদলিওয়ালাদের মধ্যে থেকে।

তারপর বাকিগুলো মুখ চুন করে বাবুকে একটু ভাল করে বলে-কয়ে দেখবার জন্যে ভিজে বিড়ালের মতো ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়ায়। দাঁত খিঁচিয়ে বার করে দেয় ঝড়াচিটেগুলোকে।

মিল চালু হয়ে যায় ছ-টার ভোঁ হয়ে যেতেই।

ঝন্‌ঝন—শন্‌শন—বনবন্—ফটাফট—হাজারো রকমের শব্দ। ম্লানমুখে বেরিয়ে এল রহমান। পিছন থেকে এসে কাঁধে হাত দিলে কানাই। বললে, ‘চলো সেই গরম-পুকুরটার ধারে গে বসি।’ বসে বসে দশটা বাজালে। খিদেয় পেটটা চোঁ-চোঁ করছে। মুড়ি আর রুটির বোচকা বগলে করে এল নাইটসিস্টের লোক। বদলিওয়ালার দলে আবার দাঁড়াল গিয়ে রহমান। পাঁচজন লোকের দরকার। দেড়শোজনেরও বেশি দাঁড়িয়ে আছে লাইন দিয়ে। চারজন হিন্দুস্থানী আর একজন ওড়িয়াকে নিলে বাবু। করুণ দৃষ্টি মেলে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল সবাই। পায়ে জড়িয়ে ধরলে রহমান। অভাবে স্বভাব খারাপ হয়। তা হোক, মাগছেলে আছাড় খাচ্ছে, লজ্জা করে কি লাভ? সবাই তো বলতে চায়: ‘বাবু আমাকে কাজটা দ্যান। ছেলেমেয়ে মারা যায় খিদেয়।’

‘আরে কি মুশকিল! পায়ে ধরলে কি কাজ পাওয়া যায় নাকি?’

‘আপনি ‘যেতিন’ দয়া করো’—বলে রহমান।

‘কাল এস রহমান, চেষ্টা করব।’

সবাই দেখেছে বাবু রহমানকে কথা দিয়েছে। তাই তারাও হাতে পায়ে

ধরবার জন্যে খানিকটা ঘুরতে থাকে পায়ে পায়ে।

লোকগুলো যেন হন্যে কুকুর—এক টুকরো বাসি রুটির লোভে যেমন ঘুরে বেড়ায়! এই তো সেদিন ধর্মঘট গেল। ম্যানেজার সাহেব ওদের বুঝিয়ে কুমড়ো ঘণ্ট আর খানচারেক রুটি খাওয়াবার লোভ দেখিয়ে তিনশো জনকে আটকে রাখলে ক্যান্টিনে ধর্মঘটের দিনে কাজ করলে চাকরি পেয়ে যাবে বলে। কিন্তুন হপ্তার টাকা থেকে ক্যান্টিনে খাওয়ার দাম কাটা গেল! পার্টির আপিসে গিয়ে গলা ফাটিয়ে অভিযোগ করলে। বললে, 'আমরা খাবার লোভে থাকিনি। ছিলুম শুধু চাকরি পাবার আশায়। জানের মায়া ছেড়ে। কিন্তুন ম্যানেজার সায়েব তার বাত ঠিক রাখেনি। যার বাত নড়ে তার বাপ নড়ে।'···

সাত হাজার শ্রমিকের মধ্যে মাত্র তিনশোজনকে দিয়ে মিল চালিয়ে কোনো ফায়দা হয়নি। ভেবে দেখেছে ম্যানেজার। বলেছে, 'তোমরা মীরজাফর!'

কিন্তু রহমান যায়নি ওদের দলে। সে জানত, মীরজাফরের পোষ্যপুত্র এই ভাঁওতাবাজ কোম্পানীর দালাল বাবু-সাহেবগুলো, ওদের বিশ্বাস নেই।

এগারটার ভোঁ হল। চালু হয়ে গেল নাইটসিপ্ট। ভিড়ভিড় করে খেতে বেরুচ্ছে ফেঁসোমাথা হাজার হাজার মানুষ। কঙ্কাল কাফেলা। তারি মধ্যে রহমান। খুঁজে নিয়েছে তাকে কানাই। পাশাপাশি চলেছে দুজনে। মুখপোড়া হনুমানের মতো মুখ। খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ। নাভিশ্বাস বইছে হাঁ করা গালের ফাঁক দিয়ে। ট্যাঁকে একটা আধপোড়া বিড়িও নেই যে দু'টান মারবে। ঘুচিয়ে দেবে বুকের ভেতরের জমে-ওঠা যত গ্লানি, অভিমান, দুঃখ, হতাশা, শ্রান্তি আর ক্রোধ। ফিরতি পথে হেথা হোথাকার চা-দোকানের-গায়ে-মারা রঙিন কালির পোস্টারগুলোয় চোখ পড়ে রোজ। বানান করে করে পড়ে কানাই :

'যুক্তফণ্ট যুক্ত নয়, গোদীর লোভে যুক্ত হয়।'

'ভোটের দ্বারা শাসক পালটায়, শোষক পালটায় না।'

'ভারতে ৫০ কোটি লোকের ৩৬ কোটি মূর্খ—বিশ বছরে কংগ্রেসের এই বিশাল কীর্তি!'

'লক্ষ লক্ষ বেকারকে খুন-জখম-লুটপাটের ছাড়পত্র দিতে হবে। 'বিপ্লবে'র তারাই আসল দাবিদার।'

'শিবের চেলা ১৪ দল, ১৪ দলের ভাল কে বল্ ?'

বেড়ে লেখে বটে লোকগুলো।

কানাই বলে, 'দুনিয়ার হালচাল পালটাচ্ছে ভাই রহমান।'

'বয়ে গেল! মোদের 'কুনো' উবগার হবে না কস্মিনকালেও। মোরা গরিব। খোদাও মোদের বাচ্চাদের 'কেসমতে'—রুজি-রোজগারে বেজ্জার দাদা। খোদাও বেজার। দশ বচ্ছর বাঁচো তো 'তহোন' এসে 'মুয়ে' দু-ঘা জুতো মেরে বোলো যেতিন কুনো উবগার-উন্নতি হয় গরিবের। গরিব ই-একটা জাত! ই-জাতের হাতে যেতিন রাজুত্ব আসে—ই-শালাও বড়লোক হয়ে যাবে। গরিবদের ভোটটা লিয়ে কুনো রকমে একবার গদিতে বসতে পারলে হয়—গরিবকে ত্যাখন 'কেলা' ছ্যাখাবে! যারা গদিতে বসে তারা সবাই বড়লোক—নামে মোদের বন্ধু! দু-বচ্ছর 'মুন্ত্রী' থাকলে টাকায় পাহাড় জমাবে আর মোদের বংশধররা পিঁপড়ের সারির মতন খাবি খাবে বেকার হয়ে। মাঝে মাঝে দাঙ্গা বাধিয়ে দিলে যদি এরা কিছু কমে তো কমবে; ভারতের 'হেঁদু-মোছলমান' লড়ালড়ি শিখবে; শিবের গাজন শালা গরিবরাই ধ্বংস হবে। গরিব হল শালা ভগমানের চোখের জল! গরিব ই-একটা জাত—শালা কুকুরের ল্যাজ—যতই ঘি দিয়ে টানো সিধে করা যাবে না।'…

ক্ষোভে দুঃখে নিজের গায়েই যেন ছুরি-ছোরা মারে রহমান!

কানাইয়ের মতন রাজনীতিকও বুঝতে পারে না রহমানের চালটা। শুধোয়, 'বলি, তুমি কুন্ দলের হে।'

'কুনো শালার দলে লয়! আমি একটা গাধা, গরু—বুনো শুয়োর! তুই যা শালা! খচাস্‌নি এ্যাহোন আমার সঙ্গে। মাথা খারাপ!'…

ঘাবড়ে যায় কানাই। অকারণে হঠাৎ রেগে উঠতে খারাপ একটা কথা বলে সে মনে মনে।

কানাইকে এখনো যেতে হবে। পথ শেষ হয়েছে রহমানের। সালাম জানালে কানাইকে।

বাড়িতে এসে হুমড়ি-খাওয়া ছাউনিগলা দাওয়ার চালখানাকে বেঁকে দুমড়ে পড়ে চাগিয়ে-রাখা খুঁটিটাতে হেলান দিয়ে হাঁটুতে হাত বেঁধে মাথা গুঁজে বসে রইল খানিকটা।

কাজলের কোলে ছেলেটা হ্যাঁ-হ্যাঁ করে কাঁদছে। বিরক্তিতে ফেটে পড়ে রহমান: 'দেনা শালাটাকে এক কাছাড়। সাবাড় করে ফ্যাল!'

সজল করুণ চোখ তুলে তাকায় শুধু কাজল-বউ। ঢলঢলে মিষ্টি মুখখানা তার শুকনো তুলসীপাতা। কোনো প্রতিবাদ করে না কাজল। কিন্তু সেইটাই তো আরো বিরক্তিকর রহমানের কাছে। আগুনভরা গোল গোল চোখে খানিকটা তাকিয়ে থাকে কাজলের মুখের দিকে। মরা হাসি চিকচিক করে শুকনো কালো বাঁকা দুটো ঠোঁটে। কাজল! গেরামের মধ্যে যে ছিল একদিন সেরা সুন্দরী! পাঁচ ছেলের মা হয়েও—দুঃখের সংসারে দু-বেলা দু'মুঠো খেতে না পেয়েও যার রূপের জৌলুস এখনো ধাঁধাঁ লাগায় রহমানের চোখে। একদৃষ্টে কতক্ষণ তাকিয়ে থাকে। কাজল বোঝে বইকি রহমানের এই দৃষ্টির অর্থ। তাই অন্যমনস্কভাবে বলে, 'গা ধোবে তো! বসে রইলে কেন?'

'খাবার আছে কিছু?'

'না।'

না—ছোট্ট একটা শব্দ! আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ। হাতের কাছে কিছু একটা পেয়ে গেলে ছুঁড়ে মেরে দিত কাজলকে। কেন—মিথ্যে কথা একটা বানিয়ে বলতে পারে না সে? কি দরকার তার ওই মানুষ পয়দা হওয়ার গাছটাকে? আশা-আকাঙ্ক্ষায় গড়ে-রাখা আগামী বছরটাকে আরো ভীষণতর করে উপস্থিত করে ওই মেয়েমানুষটা!

মাথাটা ঝিমঝিম করে রহমানের। পেটের বত্রিশ হাত নাড়ীতে ছত্রিশ হাজার পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে। ছ-সাতটা প্রাণী। ঘরে একমুঠোও দানাপানি নেই।

খাবার যখন নেই—'গোসল' (স্নান) করে কি লাভ?

রেশন কার্ডখানা হাতে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল রহমান। রিলিফের টিকিট দিচ্ছে নাকি অঞ্চলের 'পেরধান'বাবু। কাজল ছেলে বগলে করে গিয়েছিল একবার। দেয়নি। বলেছে, 'তোমার সোয়ামী তো মিলে কাজ করে।' এত করে বললে, 'বদলি কাজ—মাসের মধ্যে দুটো দিনও হয়নে—তবু দিলে নে।'

যাচ্ছে—বলে দেখবে একবার রহমান।

প্রধানবাবু বসে আছে। চারপাশে আধমরা ছেঁড়া ন্যাকড়াপরা নরনারীর ভিড়। রহমান এগিয়ে যায় বাবুর কাছে।

'কি রহমান যে, কি তোমার?'

'আজ্ঞে, বাবু…'

'না বাপু, মাফ করো। এ কি আমার বাবার ঘরের মাল যে, যাকে ইচ্ছে বললেই দিয়ে দেব ? পাঁচশো থেকে দু-হাজার ইউনিট করেছি—আরো কত চাও তোমরা ?'

'সে তো ঠিক কথা। হুজুর হল আমাদের মা-বাপ।'

শত কণ্ঠের গুঞ্জন ওঠে বাবুর চারপাশে।

'তাহলে একটাও হবেনে হাঁ-বাবু ?' হাতজোড় করে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে শুধোয় রহমান। থরথর করে কাঁপতে থাকে তার শুকনো ঠোঁট দুটো। বাবু লিখতে লিখতে মাথা না তুলেই বলে, 'আচ্ছা, সামনের কোটায় দ্যাখা যাবে। এখন যাও, বিরক্ত করো না। ভাল এক ঝঞ্ঝাটে পড়া গেছে বাবা !'

দাঁড়িয়ে থেকে থেকে বসল রহমান। বসে থেকে থেকে আবার দাঁড়াল। বেলা তখন গড়িয়ে পড়েছে পশ্চিম আকাশে।

'হাঁ বাবু, যেতিন একখানাও…'

'আরে, কি মুশকিল। চৌকিদার, এই বেচু সরদার ! শুয়োর কাঁহে-কা - এই লোকটাকে বার করে দে এখান থেকে। পাগলা বুঝি—কথা বোঝে না। বেটারা রিলিফের মাল খাবার বেলা হাত-জোড়—আর ভোট দেবার বেলা হাতুড়ি—যত সব !' তীব্র বিরক্তিতে কলমটা বন্ধ করে পকেটে গুঁজলে প্রধানবাবু। নরম নারীসুলভ মুখে কতকগুলো ভাঁজ পড়ে গেল তার।

'এই হাঁটো হাঁটো সব। বাবুকে হাওয়া লাগতে দাও।' বেচু সরদারের গায়ে তেজ আছে। ধাক্কা মেরে লোকগুলোকে হটিয়ে দিলে।

ঘোলা চোখ দুটোর দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায় রহমানের। আগুন জ্বলে ওঠে একবার তার বুকের ভেতরে দপ করে।

চৌকিদারের ধাক্কা খেয়ে মাথা নিচু করে বাইরে বেরিয়ে এল সে। মুখে বললে, 'শালা !'

পথে আসতে আসতে হঠাৎ একটু আশাতে মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার। কাজলের হাতে এখনো চারগাছা করে 'দায়মলকাটা' 'বাতানা' (চুড়ি) আছে রুপোর। কাঁচের রেশমী চুড়ি একটু আঘাতেই ভেঙে যায় বলে হাঁস-মুরগীর ডিম বেচে বছর তিনেক আগে বাতানা ক-গাছা গড়িয়েছিল কাজল। ডিম খেতে দেয়নি বলে তখন কত ঝগড়া করেছে—গালাগালি দিয়েছে কাজলকে। মারতেও কসুর করেনি।

আটগাছা বাতানা দু-টাকায় এক সপ্তার কড়ারে বন্ধক রেখে এক কেজি চাল একপো খেসারি ডাল আর দু-আনার বারোটা পয়সা ফিরিয়ে আনলে রহমান সাহাদের দোকান থেকে।

রান্না করতে বসল কাজল। খালি হাতে থাকতে নেই বলে বুড়ী জরিনা বাদি কাপড়ের পাড় থেকে রঙিন সুতো তুলে নিয়ে বেঁধে দিয়েছে বউমার দুখানা হাতে।

বড় মেয়ে বাসিরন তার কচি ভাইকে নিয়ে কান্না থামানোয় ব্যস্ত। ডাগর মেয়ে। দেহ ভরে গেছে যৌবনে।

ছোট তিনটি ভিড় জমিয়েছে মায়ের কাছে। গরম 'আসাম' (ফেন) খাবে তারা চায়ের মতন সুরুৎ সুরুৎ করে।

মুখ-আঁধারী সন্ধ্যার আকাশে ফুটে উঠেছে কয়েকটি নক্ষত্র। নিমগাছটাতে জোনাকীরা আলোর মালা গাঁথছে। হাতে পয়সা রয়েছে ক'টা—মনটা চনবন করতে লাগল রহমানের। ডাক দিলে মেয়েকে, 'ও-মা বাসি, চার পয়সার বিড়ি লেয় না মা।'

কথাটা কানে গেল কাজলের। রাগে গুম হয়ে রইল। কোনো প্রতিবাদ করলে না।

ডাগর মেয়ে। সাঁঝরাতে বাইরে যাবার দরকার নেই। হিন্দী-সিনেমা-ত্যাখ্যা পাড়ার 'লোটো' ছোঁড়াগুলোর চালচলন দেখলে ঝাঁটা মারতে ইচ্ছে যায়। বাসিরনও 'নাই' বার করে কাপড় পরতে ধরেছে!

এক কেজি চালের ভাত ভাগ করে দিলে কাজল সবাইকে। নিজে কত ক'টা রাখলে নিজের জন্যে তা সেই জানে কিন্তু পেট ভরল রহমানের। খাটুন্তে মানুষ। সে তো একটু বেশি খাবেই।

ছোট বড় চারটে ছেলেমেয়েকে নিয়ে শুয়ে পড়ল রহমানের মা। তাদের নিয়েই বুড়ীর আশা-ভরসার পৃথিবী।

অনেকটা রাত হয়েছে। কাজলের চোখে তখনো ঘুম নেই। আস্তে আস্তে স্বামীর গায়ে হাত দিয়ে একটু নাড়া দিলে।

'শুনছ ?'

'কি।' সাড়া দেয় রহমান। জেগেই ছিল সে।

কি বলবে হঠাৎ ভেবে পেলে না কাজল। অথচ কত কথাই না ভেবে গেল এতক্ষণ। লোকটা কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। কথা বলে না।

গুম হয়ে থাকে। কত কি যেন ভাবে শুধু। অভাবে দুঃখে গলে যাচ্ছে। একদিন কি চেহারা ছিল আর আজ কি হয়েছে।

'কাপড়ের জন্যে যে বাইরে বেরোনো দায় হল।'

'কাল আনব তোর কাপড়।'

'ঠাট্টা করছ?'

'না। তোর। মায়ের। বাসির। আমার।'

'কাবুলীর দেনায় এমনি তো একগলা। আকবর কাবুলী সেদিন 'বাকুলে' কেউ নেই, এসে একেবারে ঘরে ঢুকে পড়ে আমাকে বেইজ্জৎ করতে গেল— বঁটি নিয়ে তাড়া করতে তবে পালায়। কাপড় আনবে, টাকা পাবে কোথা!'

'বলব। পরে।'

শুব্ধতাকে আরো গভীর খাদে বইয়ে চলে একটা কি যেন পোকা। ক্যাঁচোর ক্যাঁচোর শব্দে বাসা তৈরি করছে আড়কাঠার বাঁশে। হাড়ের মজ্জা কুরেকুরে খাচ্ছে যেন। গভীর অন্ধকার। ক্রমে ঘুম নেমে এল দু-জোড়া চোখে।

হঠাৎ মাঝরাত্রে খিদেয় ককিয়ে ককিয়ে কাঁদতে লাগল কোলের বাচ্চাটা। স্তনের বোঁটা দাঁত দিয়ে কেটে ফেললেও দুধ পড়ে না এক ফোঁটা। রাগে ঘা-কতক কীল-চড় দেয় কাজল তার বাচ্চাকে। ছেলেটা আরো জোরে চেল্লাতে থাকে। রেগে যায় রহমান। উঠে চুলের মুঠি ধরে বেশ করে ঘা-কতক লাগায় কাজলকে। মেয়েমানুষের একটু সহসবুরি নেই!

গাছপালার ভেতর দিয়ে একটাই পোড়ামাটির মতন চাঁদটা ডুবে যাচ্ছে পশ্চিম আকাশে। শীতের চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে পৃথিবী। তিনটের ভোঁ হচ্ছে কেঁপে কেঁপে। উঠে বসল রহমান। কানখড়কে বুড়ী জরিনার ঠিক ঘুম ভেঙে গেছে। ডাকছে সে ছেলের নাম ধরে।

বুকে হাত বেঁধে পথে নামল রহমান।

হাজিরি হল। কাজ হল না রহমানের। বাইরে এসে বসে রইল। ভাবতে লাগল। রাতকাজটা হয় কি না দেখে যাবে। উঠে পড়ল। আনমনে চলতে চলতে পাট-তোলার ক্রেন-পাটাতনের জেটিতে এসে দাঁড়ালে রহমান। জেটিঘাটে ভিড়ানো বোটের খোল থেকে কাঠের সরু সিঁড়ি বেয়ে মাথায় কয়লার ঝুড়ি নিয়ে উঠছে নামছে একদল আঁধার-কালো মানুষ। আর ছোট

ছোট কয়েকটি মানুষের বাচ্চা। তাদের মধ্যে থেকে নিজের পেটের ছেলেকেও চিনে বার করা মুশকিল!

ঘড়ঘড় করে ক্রেন ঘুরছে। ঝড়ঝড় করে কয়লা ভর্তি গাড়ি চলেছে রেলের ওপর দিয়ে। মাস কয়েক আগে গাড়িগুলো ঠেলত মানুষে। তামাচটা পিচ-গলা রোদ্দুরে পায়ে চট জড়িয়ে। এখন তাদের ছাঁটাই করে আমদানি হয়েছে ইনজিন। একাই একশো মানুষের কাজ করে।

ঘোলাজলে পাক মেরে বয়ে চলেছে হুগলী নদী মন্থরে। কলকাতাগামী জাহাজের ঢেউয়ে দুলছে জেলেদের নৌকোগুলো। সাড়ে দশটার ভোঁ হল।

হাজিরি দিতে এল রহমান। কাজ হল। বাইশ নম্বরে। ঝড়ের বেগে ঘুরছে স্পিনিংয়ের ডাণ্ডিগুলো। বনবন করে বোঝাই হচ্ছে ফুঁকোনলী। রি-রি করে একটা গভীর শব্দ। রহমান ছুটে চলেছে লাইনের পাশের ঝোড়া থেকে নলী আনতে। নলীর ওপরে নলী সাজিয়ে নিয়ে ছুটে যায় অন্য লাইনে। পায়ের চাপে 'স্প্যাণ্ডেল'খানা দাবিয়ে রেখে বাঁ হাতের তালুতে চেপে ধরে টেকোটা। পাক মেরে খুলে ফেলে একখানা ডাণ্ডি। সেই ডাণ্ডিব ঘা মেরে অন্য ডাণ্ডিগুলোর প্যাঁচ আধখোলা করে নেয়। তারপর অতি দ্রুতবেগে এক-একটা বনবন করে ঘুরিয়ে খুলে খুলে রেখে দেয় নলীর কোলে কোলে। দড়িভর্তি নলীগুলো টেনে বার করে টপাটপ ছুঁড়ে দেয় স্পিনিং লাইনের মাথার ওপরে। সেখান থেকে চলন্ত ফিতের ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ে গিয়ে বাক্সে। পরিয়ে দেয় খালি নলীগুলো। তারপর পাক দিয়ে দিয়ে ডাণ্ডি পরানো। মাথার ওপরের বোপিনের নলী থেকে আধ-পাকানো দড়ির খি-গুলো টেনে এনে ডাণ্ডির একটা হাতলে পাকিয়ে দেওয়া। তারপর মেশিন চালু করে দাও। বনবন করে ঘুরতে থাকবে পাক-খেতে-খেতে বোঝাই-হতে-থাকা নলীগুলো। পর পর দশখানা নলী। আঠারোটা লাইন। আগে ছিল আটখানা নলী। তেরোখানা লাইন। প্রত্যেক লাইনে এক মিনিট করে সময়। নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই। হাড়ভাঙা খাটুনি। আট ঘণ্টার পারিশ্রমিক মাত্র তিন টাকা তেরো আনা। সপ্তায় আঠারো টাকা থেকে কুড়ি টাকা মাত্র। সে যাদের রোজ কাজ—পারমেণ্টওয়ালা—বদলিওয়ালাদের মাত্র দুদিন কাজ হয়—ছ' টাকার বেশি হলে সরদার বাবুদের 'চেকারা' দিতে হয়।

বনবন করে ঘুরে ঘুরে পাক-খাওয়া দড়িগুলো বোঝাই হতে লাগল নলীতে। রহমানরা ছুটে গেছে অন্য লাইনে। দেখলে মনে হয় একদল মানুষ লড়াই করছে যন্ত্র-দানবের সঙ্গে। বাঁচবার কথা, মরবার কথাও ভুলে যেতে হয়। পিছন থেকে তাড়া লাগায় সরদার। ঘুরে ঘুরে দেখছে একটার পর একটা লাইন। যেটার 'খি' ছিঁড়ে যাচ্ছে বন্ধ করে দিচ্ছে। বাবুরা তালায় এসে চারদিকে চেয়ে চেয়ে ভারী মেজাজে জুতো মসমসিয়ে চলে যাচ্ছেন। পদমর্যাদার রঙিন চাহনি তাঁদের লাল চোখে।

দেড়টার ভোঁ হল। দিন-টাইমের লোক এসে হাজির হচ্ছে একে একে। দুটোর সময় ঝপ করে আলো নিবে গেল। লোক বদল হল। গায়ের ফেঁসো ঝাড়তে ঝাড়তে খৈনী-গালে পোরা মানুষের দঙ্গল বেরুতে শুরু হল বাঁধভাঙা স্রোতের মতো। বাইরে কত বড় সীমাহারা দুস্তর আকাশ। লাল চোখ দুটো জ্বালা করে ওঠে সূর্যের ঝলকানি লেগে। মিনিট পনেরো কানে শুনতে পাওয়া যায় না কিছু। তালা ধরে থাকে। ঝমঝম করে শুধু চটকলের হাজার রকমের শব্দ।

কানাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল রহমানের।

'কি ভাই, আজ কাজ হয়েছে?' শুধোয় কানাই।

কলার ছড়ার মতন হলদে দাঁত বার করে ফ্যা-ফ্যা করে হাসে রহমান। হাঁ, কাজ হয়েছে আজ তার।

'আমার ভাই, পাস বইটই সব কেড়ে নিয়েছে বড়সায়েব। আর ই-মিলে ঢুকতে মানা। জবাব। বদলি কাজ--তার আবার জবাব!'—ধারালো হাসিতে একটু পৌরুষের তেজ আছে কানাইয়ের।

'কি ব্যাপার রে ভাই?'

'বাবুকে বলেছিনু, যাদের কাজ দাও তারা তোমার বাবা হয় না বোনাই হয় যে তাদের ফি-হাপ্তায় কাজ দাও? শালা রেগে যেয়ে ঘাড়ধাক্কা মেরে মেরে নিয়ে যাচ্ছিল বড়সায়েবের কাছে। পথে—সেই লেবর আপিসের পাশে দিইচি শালার নাকে এক ঘুঁষি। তারপর দরোয়ান এসে ধরে নিয়ে গেল। বড়সায়েব পাছায় দু'ঘা লাথি মেরে খিস্তিখাস্তা দিয়ে পাসবই কেড়ে নিয়ে বললে, জবাব! তবেই শালা, বয়ে গেল! ইউনিয়ানে যেয়ে বলতে তারা গা করলে না—আমি চাঁদা দিতে পারিনি। ঠিক আছে, চাষে জন খেটে খাব—বাজ পড়ুক শালার চটকলে!' খিঁক খিঁক করে হাসতে হাসতে

পায়ের টায়ার-কাটা স্যাণ্ডেল জোড়া টানতে টানতে কানাই চলে গেল ইটখোলার রাস্তাটা ধরে বাড়ির দিকে।

সম্মোহিতের মতো খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল রহমান তার দিকে। কানাই অদৃশ্য হলে ছেঁড়া গামছাটা পরে চান করলে গরম পুকুরে।

কাজ হয়েছে শুনে রহমানের মা বুড়ী জরিনা মাথায় করে বয়ে নিয়ে এসেছে গরম ভাতের ডিশ। ডিম বেচে আধ-কিলো চাল কিনে রান্না করেছে কাজল। 'চাটটি' দিয়েছে আর 'চাটটি' রেখেছে বাচ্চাদের জন্যে। কাজল আর রহমানের মা—বুড়ো মানুষটা, থাকবে অনাহারে। ভাড়াটে নোংরা বস্তির একধারে পথের দিকে পিছন ফিরে বসে ন্যাকড়া খুলে ভাতের ডিশ বার করে রহমান।

বাচ্চা 'পিলে' মুরগীটা নাকি শিয়ালে নিয়ে পালাচ্ছিল। বাসিরন ছুটে গিয়ে ছাড়িয়ে এনে জবাই করে এনেছিল। তারি একটু মাংস। কিন্তু কেমন যেন বিস্বাদ লাগে মুখে। অভুক্ত মা বসে রইল পাশে। কি ভেবে চোখের পাতা দুটো ভারী হয়ে এল রহমানের। পড়ে রইল অর্ধেকটা ভাত। মাকে বললে, 'উ-কটা খেয়ে লে মা তুই। মুই আর খাবুনিকো। ভুখ্ নেই।'

চোখের জল মুছে ভারী গলায় বলে জরিনা, 'না রে না—খেয়ে লে! মোর মাথা খাস—খেয়ে লে বাবা। রাত দশটা 'লাগাত' ঐ খেয়ে তোকে যুঝতে হবে। কই, তবু খেলে! ওরে, ও রহমান…'

বুড়ীর ছেলে-ভোলানো দরদ-ভরা আবদার আর আদেশকে উপেক্ষা করে চলে যায় রহমান।

ভাত কটি বেঁধে নিয়ে ধীরে ধীরে পথের বুকে পা বাড়ায় জরিনা। মাথায় ধবধবে চুল। গো-বকের পালকের মতো সাদা। কোটরে ঢোকা চোখ। লোল চামড়া। সোজা হয়ে দাঁড়াতে গেলে পা দুটো থরথর করে কাঁপে। পরনে একটা কি যেন! তার বউ-মা—ঘরের লক্ষ্মী কাজল—ছেলের মা—পরের মেয়ে—বেটার ঘরে ভাত নেই—তবুও মারধর খেয়ে জ্বলেপুড়ে আছে যে তাই বরাত। তার জন্যে ঐ ভাত-ক'টি না নিয়ে যেয়ে কি পারে জরিনা! কোলের ছেলেটা খাবে কি? দিনান্তেও যদি এক মুঠো ভাত না পায় কাজল দুধ আসবে কোথা থেকে তার 'থনে'—বাচ্চাটার জন্যে?

নিঝুম শীতের রাত। দশটার ভোঁ হয়ে গেল। জরিনা বউমাকে শুনিয়ে বললে, 'এই গো মা, দশটার ভোঁ হল। এতক্ষণে মোর বাচ্চার ছুটি হল।'

হাঁ-না কোনো সাড়াশব্দই করলে না কাজল। পুঞ্জীভূত অভিমান জমে আছে তার বুকের মধ্যে গত রাত থেকে। বুড়ী একাই এটা সেটা বকে যায়। ছেলেমেয়েরা 'সেপুন্নে' শাক-সিদ্ধ খেয়ে তার পাশে পড়ে ঘুমোচ্ছে।

ঘণ্টাখানেক পরে রাত-টাইমের লোক যায় তাদের ঘরের পিছন দিয়ে। ছেলের আসার অপেক্ষায় জেগে বসে থাকে জরিনা। লোকচলাও প্রায় শেষ হয় একসময়।

ও-পাড়ার রহমত হেঁকে বলে যায়, 'ও চাচী, রহমান সেই উঁচু-ঢিবির কাছে রাস্তায় পড়ে আছে। জ্বর হয়েছে বুঝিন! আলো লিয়ে যাও এক্ষুণি —শিগ্‌গির…'

শীতে থরথর করে কাঁপছে রহমত। দাঁড়াবার সময় নেই তার। ভাল করে ছুটো কথা জিজ্ঞেস করবার সময়ও পেলে না জরিনা।

আলো কোথায় পায়? একটা হ্যারিকেনও যে নেই তাদের! অন্ধকার কোকাফ। মেঘে ঢেকে গেছে আকাশ। জরিনাও বুড়ো মানুষ। দিনের বেলাতেই পথ হাতড়ে বেড়ায়।

অনেক দিনের ঝগড়াকে উপেক্ষা করে জরিনা পাশের বাড়ি থেকে একটা হ্যারিকেন আনলে হাতে পায়ে ধরে চেয়ে—ঘণ্টাখানেকের জন্যে। কথা দিয়ে এসেছে দু-আনার তেল কিনে দেওয়ার।

বাসিরনকে ডেকে তুলে তার কাছে দিলে কাজল কোলের বাচ্ছাটাকে। হ্যারিকেনটা হাতে নিয়ে বুড়ী শাশুড়ীর একটা হাত ধরে নামল পথে। স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কায় বুকখানা তার দুরদুর করে। কি জানি কি হল লোকটার!…

হ্যারিকেনের আলোয় দুটো মানুষের ছায়া আসমান সমান হয়ে দুলতে দুলতে এগিয়ে চলেছে কাঁটাগাছে দু-পাশ ভরা ঝোপঝাড়ের পথে।

দু-চারজন কলের লোক চলেছে তখনো। তারা শুধোয়, 'কারা যায় গো? কোথা যাবে এত রাতে? ওঃ! হাঁ হাঁ, পড়ে আছে বটে লোকটা, আমরা মনে করি পাগল কিংবা মাতাল! কত লোক এখন পড়ে রয়েছে রাস্তাঘাটে। কে অতশত লক্ষ্য করে!'

নাড়ু পাকিয়ে পড়ে থরথর করে কাঁপছে রহমান। মুখ ঘষড়াচ্ছে মাটিতে। জ্বলজ্বলে চোখ মেলে দাঁড়িয়ে আছে গোটাচারেক শিয়াল। কাছেই শ্মশানচর। একটু দেরি হলে জ্যান্ত ছিঁড়ে খেয়ে ফেলত বুঝি রহমানকে।

'রহমান! ও রহমান!' ডাক দেয় জরিনা কান্নাভাঙা গলায়। দুজনে ঝুঁকে পড়ে রহমানের ওপরে।

'মা!' মায়ের গলার স্বর শুনে অস্পষ্টভাবে চাপা আর্তনাদ করে উঠে রহমান।

টেনে তুললে তাকে কাজল। বললে, 'আমার গলা জড়িয়ে ধরো, কাঁধে ভর দাও!' স্বামীর দুঃখের সমবেদনায় দু-চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে কাজলের গণ্ড বেয়ে টস্‌টস্ করে। কিন্তু হাঁটতে পারছে না রহমান। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না একেবারে। পাঁজরে নাকি ভীষণ দরদ। গোটা দুই ঘুঁষি মেরেছে আকবর কাবুলী। পাঁজরাকাঠি গুঁড়ো হয়ে গেছে বুঝি! মাথায় গায়ে কাপড় জড়িয়ে আকবর যে ছোট গেটের ধারে বসে থাকবে সে কল্পনাও করেনি রহমান। এতখানি পথ এসেছিল সে রহমতের কাঁধে ভর দিয়ে। সারাদিন কারখানার হাড়ভাঙা খাটুনির পর বিরক্ত হয়ে ফেলে রেখে চলে গেছে সে। বলে গেছে, 'এখানে বস্, আমি তোর বাড়িতে খবর দিয়ে যাচ্ছি।'

জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে রহমানের।

জরিনার গায়ে কি সে-বল্ আছে আর যে তার বাছাকে কোলে তুলে নিয়ে যাবে! তাই অনন্যোপায় হয়ে কাজল কোলে তুলে নিলে তার স্বামীকে। আলো ধরে পথ হাতড়ে এগিয়ে চলল জরিনা। কাজল ভাবছে—এতখানি পথ যাবে কি করে সে!

কিন্তু যেতে হবে তাকে—যেমন করেই হোক। হাল্লাক হয়ে যায় নামাবে, আবার কোলে তুলে নেবে। এ যে তার বিরক্ত হয়ে ফেলে রেখে যাবার জিনিস নয়।

হাড়-কনকনে শীতের রাতে দরদরিয়ে ঘাম ঝরে কাজলের সারা দেহ থেকে। ঝরুক।

পথে যদি ভোর হয়—হোক।

দিনের আলো ফুটে উঠলে তখন আর ধার করা আলোটার প্রয়োজন হবে না।

কাজল চলল—কোলে তার আধমরা স্বামী।

মা চলেছে এগিয়ে—আলো ধরে।

বাবা বড় কাছারী

সাপ্তাহিক লক্ষ্মীপুজোর শেষে চাল-কলা-সন্দেশ-বাতাসার ছাঁদা বেঁধে নিয়ে যাবার সময় বাড়ির বউ হরিমতী গড় করতে গেলে বাবাঠাকুরও বলে গেলেন : 'আশীর্বাদ করি মা, তোমার কোলজোড়া সোনামানিক আসুক—শ্রীপতির বংশরক্ষে হোক—নিঃসন্তান হলে—আটকুড়ো হলে 'রৌরব' নরকে পুড়তে হবে।'

শ্রীপতি মাইতির মা বললে, 'রৌরব কি আর পাতালে আছে ? ওটা মনে। তুঁষের আগুনের মতন জ্বলছে নিত্যিদিন। পাহাড়-পানা গতর আমার বউয়ের—পাঁচটা বছর কেটে গেল—এখনো বাচ্চাকাচ্চা হবার নাম নেই। হাজার জড়িবটি তুকতাক করছি, সব গয়ায় যাচ্ছে। তা নয় বাবাঠাকুর, কোনো গোপন পাপে শনির নজর পড়েছে বউয়ের ওপর।'

বাবাঠাকুর শনিগ্রহের শান্তির জন্য পূজো দিতে বা কোনো পাথর ধারণ করতে উপদেশ দিয়ে চলে গেলেন।

শ্রীপতির সংসারে অভাব নেই। চাল-ধান, ডাল-কলাই-নারকোল-পাট-বাঁশ-আনাজ, দুধ-ডিম-গুড়—সবই নিজের চাষ-আবাদ থেকে হয়। শ্রীপতি খাটতে পারে, সারাদিন সে লোকজন নিয়ে মাঠে মাঠে ক্ষেতখামারে থাকে, চাষবাস করে। সন্ধ্যায় ফিরে যখন হাতে পায়ে সরষের তেল ঘষে পাথরবাটি ভরা গরম ঘন দুধে হামাই ধানের বড় বড় মোটা মোটা ফুলকো মুড়ি অথবা বাসকামিনীর সুগন্ধি চিঁড়ে ঢেলে নিয়ে খেতে বসে তার স্ত্রী হরিমতী লালপাড় তাঁতের শাড়ি পরে মাথায় আড়-ঘোমটা টেনে গম্ভীর মেজাজে ঘরের দোরের বাজু ধরে দাঁড়িয়ে থাকে তুলসীতলায় সন্ধ্যা দিয়ে শাঁখ বাজিয়ে গড় করে এসে। তার আসবার আগেই ছেলেকে খাবার দিয়ে দেয় বুড়ী। আর তার পাশেই মাটিতে হাত পেতে বসে আদিখ্যেতা জোড়ে।

'বাবাঠাকুর বলছিল, বাচ্চাকাচ্চা নাহলে নাকি রৌরব নরকে পুড়তে হবে। বলি কি বাবা, তুই নাহয় আর একটা বিয়ে কর।'

মায়ের মন রেখে শ্রীপতি বলে, 'দেখো তবে আর একটা মেয়ে।'

'বউয়ের এমন গতর, এমন সুন্দর দেখতে—তা একেবারে পানগাছ—ফল নেই ফুল নেই পাতায় ভরা।'

শাশুড়ীর কথাবার্তা সময় সময় এত নিচুতে নামে যে হরিমতীর সহ্যের সীমা অতিক্রম করতে চায়। ইচ্ছে করে মাগীকে ঝাঁটার বাড়ি কষিয়ে খরিশের বিষ ঝরিয়ে দেয়। ছেলে তার এদিকে নিমুরোদে কিনা সে পরীক্ষা ডাক্তার দিয়ে করে দেখেছে কি? তাই হরিমতীর মনে অন্য একটা প্রবৃত্তি মাঝে মাঝে খেলা করে। তার মাসতুতো দেওর কমল রায় যখন আসে আর রঙ্গ-তামাসা করে তখন তার কথার সোনালী রুপোলী চারা চারা মাছগুলো মনের অতল জলে খেলা করে। হরিমতী সন্তানের জননী নাহলে এ সংসারে তার ভাগ বসাবার জন্যে আর একজন সতীনের আবির্ভাব হতে পারে—একথা অনেক দিন থেকেই সে শুনে আসছে। কিন্তু হরিমতী জানিয়েছে শ্রীপতিকে, 'আমার কোনো অসুখবিসুখ নেই, হয়তা তোমারই। যদি আবার বিয়ে করো আর তারও বাচ্চাকাচ্চা না হয় তখন তোমারই অপমান হবে। তার চাইতে বাবা বড় কাছারীর কাছে মানত করো। দরখাস্ত লিখে লাল ঘুনসিতে গেঁথে বাবার থানে যে অশথগাছ আছে তাতে টাঙিয়ে দিয়ে এসো। বাবা বড় কাছারীর দৃষ্টি পড়লে নাকি বাঁজা মেয়েরও ছেলে হয়।'

তাই করবে শ্রীপতি। অনেকবার কথা দিয়েছে। কিন্তু সে প্রতিদিন ভোর না হতেই সংসারের কাজে বেরিয়ে যায় আর যাবার সময় হয়ে ওঠে না। আবার চেপে ধরলে বলে, 'বেশ তো আছি, ছেলে হলে তোমার এই যৌবনের বারোটা বেজে যাবে। ফুল ফুটে আছে, বেশ তো—ফলের জন্যে অতো তাড়া লাগালে যে গাছ শুকিয়ে যাবে।'

হরিমতী বলে, 'তুমি কি ছেলে চাও না?'

কোনো উত্তর দেয় না শ্রীপতি।

'তোমার মা তো এ সংসারে আমার আর মুখ দেখানো দায় করে তুললে। বাড়িতে যে আসবে তাকেই ধরে ধরে বলবে, ঐ গতর আছে মাগীর, ফল নেই, ফুল নেই, পাতায় ভরা!—একদিন দেখো, আমি গলায় দড়ি দেবো কিংবা পুকুরে ডুবে মরব। শুনছ—ঐ ছাখো—'

শ্রীপতির তখন নাক ডাকতে শুরু করে।

অথচ কমলের কি গভীর আর তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাকে পাবার। বিকালে যখন কেউ বাড়ি থাকে না, কমল এসে চুপি চুপি ঘরে ঢোকে। ওর পায়ের তলায় বিড়ালের মতো নরম মাংসপেশী আছে নাকি কে জানে! কোনো শব্দ নেই—সাড়া নেই। এসে পিছন থেকে চোখ টিপে ধরে।

'ছাড়ো। ঠাকুরপো! কলেজে যাওনি যে আজ?'

'আজ ছুটি। জানো বউদি, দুর্দান্ত খবর, মাসী মামাদের বাড়ি গেছে। গুণধর মামার মেয়েকে দেখতে। তার সঙ্গে নাকি দাদার আবার বিয়ে দেবে। পথে দেখা হল, আমাকে বললে।'

কাঁথা সেলাই করছিল হরিমতী। নানা রঙের সুতো দিয়ে সে একটা ফুল তুলছিল। কোনো উত্তর দিচ্ছে না দেখে তার হাতের সেলাই গোলমাল করে দিলে কমল। হাতটা চেপে ধরলে। বললে, 'দেখি তোমার হাতে বাচ্চা-কাচ্চার চিহ্ন আছে কিনা!'

কমল কোমল নধর পরিপুষ্ট হাতখানা নিয়ে অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করলে। বললে, 'আশ্চর্য, অনেক ছেলেমেয়ে তোমার হাতে! দাদাই তাহলে অক্ষম। মিথ্যে অপবাদে তুমি পাগল হয়ে যাচ্ছ। চল আমার সঙ্গে একদিন কলকাতায় —কোনো ক্লিনিকে দেখিয়ে আসি।'

হাতে চুমু খেলে তার কমল।

কাঁথাটা টেনে নিয়ে আবার সেলাই করতে বসলে কমল উঠে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে রেডিও চালায়। কিছুক্ষণ পরে দেখে হরিমতীর চোখের জল গড়িয়ে গড়িয়ে গড়ছে গাল বেয়ে মেঝেতে। কমল স্থির দৃষ্টিতে দেখলে সে দৃশ্য কিছুক্ষণ। নেমে এল। বসল হরিমতীর সামনে। তার আঁচল নিয়ে মুখ চোখ মুছিয়ে দিয়ে গভীর সহানুভূতির স্বরে ডাকলে, 'মতি!'…তারপর সে তাকে চুম্বন করলে অকস্মাৎ। হরিমতী হঠাৎ যেন জেগে উঠল। দেওরকে দ্রুত হাতে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে উঠে পড়ে চলে এল ঘাটের দিকে। কিছুক্ষণ পরে এসে দেখলে কমল পালিয়ে গেছে। সে মৃদু একটু হাসলে। হয়তো তার দাদাকে বলে দেবার ভয় পেয়েছে বেচারা! মেয়েরা এসব কথা বলে না। বললে তাদেরই মান যায়। দুর্নামটা চিরকাল তাদের গায়েই লেগে থাকে। আর সংসারে আগুন জ্বলে। নারী যে সর্বংসহা—তাকে অনেক কিছু হজম করতে হয়।

কিন্তু শ্রীপতি মায়ের চাপে আবার বিয়ে করবার জন্যে পীড়াপীড়িতে বিরক্ত হয়ে একদিন হরিমতীকে জানিয়েই মানত দিতে গেল বাবা বড় কাছারীর থানে।

২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর থানায় এই বাবা বড় কাছারীর থান। বাখরাহাট থেকে মাখালিয়া গ্রামের মধ্যে দিয়ে উত্তরে মাইল-দুয়েক পথ। চারদিকে

বাদা, ধানের মাঠ। মাঝখানে একটা দ্বীপমতো জায়গা। কয়েকটা খুপরি খুপরি দোকানঘর। একটা পুকুর। বহু বছরের একটা অশথগাছে বাবার অধিষ্ঠান। গোড়ায় সিঁদুর লেপা। একজন ব্রাহ্মণ বসে আছেন। শনি-মঙ্গলবারে মেলা বসে। হাজার হাজার ভক্ত আর দর্শনার্থীর ভিড় হয়। ঢোল, কাঁসি, শানাই, চচ্চড়ির বাজনায় দিগ-দিগন্ত মুখরিত হয়ে ওঠে। যাদের মানত করার পর ছেলে হয়েছে তারা এনেছে ঢোল, কাঁসি, শানাই, চচ্চড়ির বাজনা। হরিনামের দল। সঙ্গে এনেছে আবার বোগ্‌দা পাঁঠা—বলিদান করে মুণ্ডটা বাবার থানের সেবকদের দান করে দিয়ে ধড়টা নিয়ে যাবে। হাজার হাজার লোক এসেছে। এসেছে বর্ধমান, তমলুক, ব্যাণ্ডেল, লিলুয়া, ডায়মণ্ডহারবার, ফলতা, বজবজ, উলুবেড়িয়া, ঠাকুরপুকুর, বেহালা, গড়িয়াহাট—হাজার জায়গা থেকে। কারো মামলার জয় চাই, কারো ছেলের অন্নপ্রাশন, কারো অম্বলশূলের ব্যথা, কারো পিলে-জ্বর, হ্যাবা, রক্ত-আমাশা, 'ফুলোরিসি' (প্লুরিসি), কেউ আবার চায় চাকরি! পরীক্ষায় পাস! কেউ মন্ত্রীত্ব চেয়ে কিংবা কংগ্রেসের সুদিনের আকাঙ্ক্ষা জানিয়ে অথবা বিপ্লবের নামে কল্কি-অবতার বামপন্থীদের বামাচারলীলা থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করে বাবার কাছে আবেদন ঝুলিয়ে দিয়েছে কিনা হাজার হাজার দরখাস্তের ভিড়ে তার হদিস করা বোধহয় বাবার পক্ষেই কষ্টসাধ্য। তবে বাবা বড় কাছারীর ছেলে হওয়ার মানসিক অব্যর্থ।

কেউ বলতে পারে না বাবা বড় কাছারীর বয়স কত। আশী বছরের তিন মাথা ট্যারা-কাটা বুড়ো তারাপদ হালদার বলে, 'বাবার নাম তো আমার ঠাকুর-দাদারাও ন্যাংটাবেলা থেকে শুনে আসছে গো! বাবার কি বয়েস আছে!' কে কবে ঐ অশথগাছ 'পিদিষ্টি' (প্রতিষ্ঠা) করেছিল কেউ বলতে পারে না। নানা লোকের নানা মত। আগের সেই ঠাকুরতলা সিকি মাইল উত্তরে উঠে গেছে। কাঁঠালরা এর প্রতিষ্ঠাতা। তবে শোনা যায় মোগল আমলে বাদশা আকবরের সময় নাকি কন্যাকুমারীর তীরে ঐ অশথ-মূলে এক ব্রাহ্মণ নিঃসন্তান হয়ে সংসার ত্যাগ করে এসে 'হত্যা' দিয়ে থাকেন একাদিক্রমে একশত দিন। তারপর তিনি ওখানে দেহ রাখেন। সেই থেকে পূজা বা মানত চলে। কন্যাকুমারী শীর্ণা নদী, বহুকাল আগেই অবলুপ্ত হয়ে গেছে। 'মা-খা-লিয়া'র জাগ্রত কালী সেই নদীকে খা-লিয়া। এই নদীর অববাহিকায় থাকত মাঝি-মাল্লারা। মাঝি উপাধি আছে তাই এখনো এ অঞ্চলে অনেকের। মাদারের

কেল্লা আছে কাছেই। নীলকর সাহেবরা কুঠি বেঁধেছিল বাহিরচড়া, কামরা অঞ্চলে ইংরেজ আমলে। সব গেল কিন্তু বাবা বড় কাছারী আজো জাগ্রত। শত শত মানুষ আসে, মানত করে, কেউ ব্যর্থ হয়েছে এমন শোনা যায় না।'

এ মেলায় পুরুষ অপেক্ষা নারীদেরই ভিড় বেশি। শনি-মঙ্গলবারে বাবা বড় কাছারীর পুজারীদের ভিড়ে লোক ধরে না বাসে। বাখরাহাট হাইস্কুলের পাশের ময়রা দোকানটা থেকে তারা বাতাসা, বরফি, সন্দেশ, মুড়কি কিনে নিয়ে যায়। কারো হাতে কড়িডাব। নানান মানতের জিনিস। মাছ, মদ, দুধ, গাঁজা, তাড়ি, আফিম, মুলো, কাঁচকলা যা ইচ্ছে—সবই বাবার থানে অশথমূলের এক কোমর গহ্বরে ঢেলে দাও! তারপর পুজো দেওয়া হলে গড়াগুটি দাও, হরিনামের দলে মিলে হাত তুলে নাচো, গর্তের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে পচা দুর্গন্ধময় জলের তলা থেকে অশথমূলের শিকড় অথবা যা পাও তুলে নিয়ে এসে যার জন্যে মানত তাকে খাইয়ে দাও। বাবার থান ধুইয়ে, সেই গর্তের পচা জল 'চরণামৃত'-রূপে নিয়ে এসো একটা ছোবা ভাঁড় কিনে নিয়ে। বাড়ির সবাইকে খাইয়ে দাও—সর্বরোগের শান্তি হবে—মানত-মনস্কাম পূর্ণ হবে।

শ্রীপতি একটা দরখাস্ত লিখে টাঙিয়ে দিলে। 'তার স্ত্রী হরিমতী দাসীর গর্ভে একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেন যেন বাবা বড় কাছারী। মানত দেবে নাম-সংকীর্তন আর জোড়া পাঁঠা!' বাবা বড় কাছারীর কাছে জাত-সম্প্রদায়ের, বামুন-শূদ্রের বাছবিচার নেই। সবাই পুজো দিতে পারে।

মানত দিয়ে আসার পর শ্রীপতি দেখলে, হরিমতী বেজায় খুশী! মাও সে কথা শুনলে। সে চুপ হয়ে গেল, আর বিয়ের কথা তুললে না। ছেলে তাহলে বিয়ে করতে চায় না, মিথ্যে তার মন-ভোলানো কথা বলত। তবে সে মান্নাদের মেয়ে দেখে অদ্দূর এগুতে গেল কেন? তলেতলে তাকে অপদস্থ করা!

তবু ভাল, যদি একটা নাতি হয়!

সন্ধ্যার পর রোজই সাজগোজ করে হরিমতী। সিঁথিতে ভক্তিভরে সিঁদুর দেয়। ফোঁটা দেয় কপালে। খোঁপায় স্বর্ণচাঁপা, রজনীগন্ধা, অথবা বেলফুল গোঁজে। স্বামীকে আদর-ভক্তি করে। কিন্তু এই তপস্যা ব্যর্থ হল তার। একটা বছর কাটল কিন্তু সন্তানসন্ততি হল না।

কমল বললে, 'হয় তোমার 'স্ত্রীরোগ' আছে—নয়তো দাদার কোনো ব্যাধি আছে। তোমাদের মেডিকেল-চিকিৎসা করাও।'

সংসারের তিনটি প্রাণীই নিরাশ হয়ে গেল। বাবা বড় কাছারীও মুখ তুলে চাইলেন না। নিশ্চয়ই মানতের মধ্যে কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটেছে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কে অক্ষম তাই নিয়ে পরস্পরে রেষারেষি। পুরুষ কখনো হারে না, তার পক্ষে যদি আবার মা মাসী অথবা বোন কিংবা পিসিমারা থাকে। যত দোষ নারীর।

আবার বিয়ের কথা চলতে লাগল।

আবার সেই সোনালী রুপোলী মাছগুলো মনের জলের তলায় খেলা জুড়ল হরিমতীর। আবার সেই বিকেল। সেই কমলের সন্তর্পণ আসা-যাওয়া। লাঞ্ছনা আর অপমৃত্যুর চাইতেও সে ভাল। শাশুড়ী উঠতে বসতে তাকে অপমান করবে কেন? গতকাল তার পিঠে ঘটি মারলে, থালাবাসন মাজা হয়নি, 'এঁটো-সঁগ্ড়ি' নাকি লেগে রয়েছে। আজ সকালে শ্রীপতির সামনেই সে উঠোন ঝাঁট দিচ্ছিল, হাঁসের গলা ধরে পুকুরে ফেলে দিয়ে আসবার সময় নাকি শাশুড়ীর পায়ে ঝাঁটা লেগে গেল। হাত থেকে ঝাঁটাটা কেড়ে নিয়ে দিলে এক ঘা কষিয়ে। বললে, 'যা মাগী, বেরিয়ে যা বাড়ি থেকে, আমাকে ঝাঁটা মারিস, এত বড় আস্পাদ্দা!'

হরিমতী দেখলে এ সংসারে আর তার শান্তি নেই। মায়ের কাছে গিয়ে একসপ্তা কাটিয়ে আসাও সম্ভব নয়। মা অনাথা ভিখারী বলতে গেলে। দুটি-তিনটি পোষ্য তার। পাঁপর বেলে দিন চলে।

অগত্যা অচেনা কাক-জোৎস্নার এক অন্ধকার পথে পা বাড়াবে সে ঠিক করলে।

কমলকে সে আদর করতে শুরু করলে। বিকেলে সে আসবার কথা ছিল। শ্রীপতি গেছে শিয়ালদায় পানের 'মোট' নিয়ে। সেখান থেকে যাবে নাকি দমদমে বোনের বাড়ি। পরদিন আসবে। কমলকে বাড়িতে থাকার কথা বলে গেছে। বউয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ বলে শাশুড়ী পাড়ার মেয়েদের কাছেই মনের কথা উজাড় করতে চলে যায়। তা ছাড়া কমলকে বউয়ের ঘরে দেখলেও মাসী কিছু বলে না, বা আড়িও পাতে না। কার যেন জন্মের ব্যাপার নিয়ে কথা উঠতে মেয়েদের সামনে মাসীকে একদিন বলতে শুনেছে, 'কার জন্ম কেমন করে হয়েছে সব কথা জানলে মানুষ তো পাগল হয়ে যাবে!'

শুয়েছিল হরিমতী। কমল এসে ঘরে ঢুকল।

বউদি এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে। অঘোরে ঘুমোচ্ছে। পাশে বসল কমল। সর্বাঙ্গ তার থরথর করে কেন যেন কাঁপছে।

চোখ মেললে হরিমতী। আগুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'ক-ম-ল !'

হরিমতী শুধু চোখ বন্ধ করে বাবা বড় কাছারীকে ধ্যান করতে লাগল।

সন্ধ্যার পর মাসীর সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করলে কমল। মাসী সন্তুষ্ট হল। খাওয়া-দাওয়ার পর মাসী বললে, 'হাঁ বাবা কমল, 'অঘ্ঘান' মাস এখন, হিম পড়ে গেল, বাইরে শুবি ? ঠাণ্ডা লেগে যাবে বাবা, ঘরে শো! তাছাড়া তোর দাদা নেই, ঘরে টাকা-পয়সা, সোনা-দানা রয়েছে, সিঁট কাটলে ধূলিকুঁড়ি সব যাবে। তোর বউদিকে বল আজ মেঝেয় শুতে।'

কমল বললে, 'আমার ঠাণ্ডা আদৌ সহ্য হয় না মাসীমা। ঠিক আছে আমি দাদার বিছানাতেই শুই। বউদিদিমণি, তুমি আজ লক্ষ্মীটি দয়া করে মেঝেতে শোও। নাও, লেপকাঁথা তুলে নিয়ে বিছানা পাতো।'

হরিমতী মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল বিছানা পাততে পাততে। কমল রেডিওটা বার করে নিয়ে গিয়ে ততক্ষণ বাইরে বসে কেবলই সেণ্টার চেঞ্জ করতে লাগল। এখন কিছুই তার শুনতে ভাল লাগছে না।

কিছুক্ষণ পরে হরিমতী ডাকলে, 'ঠাকুরপো এসো, শুয়ে পড়ো, আমার মাথা কনকন করছে, দোর দেব।'

তারপর সত্যই বোধহয় বাবা বড় কাছারীর 'ভর' হল সেই রাতে হরিমতীর উপরে !

কেননা পাশের বাড়ির এক জায়ের কাছে হরিমতী এর পরদিন থেকে বলতে লাগল, 'রোজ রাত্তিরে আমি স্পষ্ট দেখতে পাই কে যেন একজন পুরুষ, ফুলের মালায় দেহ ভরা, দেবতুল্য দেখতে, আমি ঘুমোলে সে যেন আমার ওপরে 'ভর' করে। আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। সে যখন চলে যায় ফুলের গন্ধে চারিদিক ম-ম করে !'

এরপর মাস দুই-তিন না যেতেই হরিমতী বমি করতে শুরু করল। যতবার সে বমি করতে থাকে, 'জয় বাবা বড় কাছারী' বলে শাশুড়ীকে তার অতিভক্তির বার্তা শোনায়।

শ্রীপতিও আশান্বিত হল।

হরিমতীর পুত্রসন্তানই হল।

শ্রীপতি তো তাই চেয়েছিল বাবার কাছে।

এবার উৎসব আনন্দের মাতন। ছেলের বয়স ছ'মাস কেটে যেতেই হরিনামের দল, পাঁচটা ঢোল, শানাই, কাঁসি, চচ্চড়ি বাজিয়ে জোড়া পাঁঠা আর জন-পঞ্চাশ মেয়েপুরুষ জুটিয়ে নিয়ে শ্রীপতি গেল বাবা বড় কাছারীর পুজো দিতে।

হরিমতীর মনে সেদিন কী আনন্দ। আনন্দ তার শাশুড়ীর মনেও। হরিমতীর বুকের ওপর কচি বাচ্চা। বাচ্চাকে যাতে রোদ না লাগে তার জন্যে রঙিন ছাতার আড়াল দিয়ে চলেছে শ্রীপতির মা। শ্রীপতি আজ মদ টেনে রঙিন হয়েছে। ঢুলীদারদের বলছে সে, 'বাজা শালারা, বাজা। কুড়িটা টাকা নিবি কি মোক্তা?'

আদিকালের অশথ, সব ডালপালা এককালে শুকিয়ে গিয়েছিল বাবা বড় কাছারীর। একটিমাত্র সরু শাখায় ছিল কয়েকটি সবুজ পাতার চিহ্ন। কিন্তু গোড়ার গর্তের মধ্যে দুধ মদ ইত্যাদি সারবস্তু পড়াতে আবার শাখাপল্লব গজিয়েছে। এ নিতান্ত বাবার দয়া বলতে হবে। আবার কেউ কেউ বলেন, আদি গাছ ওটি নয়, তিনবার গাছ লাগানো হয়েছে। তবু এ গাছটির বয়েস নাকি শতাব্দী পার হতে চলেছে। চারিদিকে চল্লিশ-পঞ্চাশটা ঢোল বাজছে। নাম-সংকীর্তন হচ্ছে

একটা বাগদীর মেয়ে এসেছে ক্ষুদ্র মানত পাঁচটা কই মাছ আর বাতাসা নিয়ে। তার কালো মতো এতটুকু একটা বাচ্চা কোলে। মেয়েটার বয়স চোদ্দ বছর হবে তো? এসেছে অনেক মুসলমান মেয়েরাও—কপালে বাবার 'চরণামৃত' লেপা! ভাঁড়ে করে থান ধুইয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বাবার কাছে জাতগোত্র নেই, মন-গুণে ধন পাবে।

শ্রীপতি পাঁচশো টাকা ব্যয় করে দিলে ছেলের জন্যে। পুজো দিয়ে ফিরতে সবাইকে পাঁঠার মাংস লুচি মিষ্টি দই খাওয়ালে। একুশ জন ব্রাহ্মণ ভোজন করালে।

ছেলের নাম রাখলে—যুধিষ্ঠির!

কুমোরবাড়িঃ কলসী-হাঁড়ি

বিরলাপুর চটকলের ভোর তিনটের ভোঁ হতেই ঘুম ভেঙে যায় পালপাড়ার মানুষদের। তেল-ময়লা-জমা মোটা আর ভারী কাঁথার ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ে গায়ে মাত্র ধুতির খুঁট বা শাড়ির আঁচল জড়িয়ে এসে বসতে হয় 'কাজঘরে'। দরজা, বৈঠকখানা, চালাঘর, দাওয়া, উঠোন, বার-খামার—সর্বত্র হাঁড়ি, কলসী, তিজেল গড়ার কাঁচা কাজের মালে 'লেতুড়'।

মোরগ-ডাকা সেই ভোরে শীতে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বাঁ হাতে চাকে-তৈরি-করে-রাখা ভাঁড়ের 'মুখপাত' আর পাথরের 'বোলে' ধরে ডান হাতে কাঠের 'পিটুনি' দিয়ে গতকালের গড়ে-রাখা 'চাপড়া'—পাতি ভাঁড়ের তলা—জুড়বার জন্যে পটাপট পটাপট শব্দ ওঠে সারা পালপাড়া জুড়ে।

আর ধানভানা ঢেঁকির শব্দ ওঠে—দুমদুম্-দুমদুম্!

নারকোলপাতা পুড়িয়ে আগুন তৈরি করে এক-পো সময় ধরে হুঁকোয় ভুড়ুক ভুড়ুক করে তামুক টেনেও গা গরম হয়নি, তাই জাড় কাটাবার জন্যে গলা ছেড়ে কীর্তন জুড়েছে হেম পাল :

'আর এক লাজ তোহে কি কহব মাই।
জল দেই ধোই যদি তবহুঁ না যাই॥
নাহি উঠল হাম কালিন্দী-তীর।
অঙ্গহি লাগল পাতল চীর॥
তহিঁ বেকত ভেল সকল শরীর।
তহিঁ উপনীত সমুখে যদুবীর॥'

হেম পাল রোজই ভোরবেলা আর সন্ধ্যায় কীর্তন গায়। ভাইপো গোবিন্দ এসে করতাল বাজিয়ে ঠেকা দেয়। খোল বাজায় সনাতন খুড়ো। তামুক টেনে নিয়ে তারা গান জোড়ে আবার গান শেষ করে তামুক খায় এক ছিলিম। তারপর ওরা চলে যায় যে যার কাজঘরে। হেম পালের কীর্তনের গলাটা ভাল। ভাল লাগে সকলের। সনাতন খুড়োর গোটা 'গীতগোবিন্দ' মুখস্থ। শুনে শুনে হেমেরও কিছু কিছু আয়ত্ত হয়েছে। সে কাজ করতে করতে গুন-গুন করে :

'ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী,
পীনপয়োধরপরিসরমর্দনচঞ্চলকরযুগশালী।'

হেম পাল এসব মহাজনের বাণীর গূঢ় অর্থ হয়তো তেমন বোঝে না কিন্তু অপূর্ব ভক্তিরসে তার মন ভিজে যায়। অপরিচিত শব্দের মোহ, দেবদেবীর হৃদয়-মনের দেওয়া-নেওয়ার স্বর্গীয় মাধুরী তাকে মুগ্ধ করে।

বৈঠকখানার পেছনে ঠিক চাকের পাশেই চড়া-জমি-চটিয়ে-তুলে-এনে জমিয়ে-রাখা এঁটেল মাটি 'আতালি'-র জল নিয়ে মাখিয়ে 'বোলে' দিয়ে ঠুকে ঠুকে 'চাপড়া' গড়তে গড়তে মেয়েরা হেম পালের সেই গান শোনে আর ভক্তিরসে মন তাদেরও সিক্ত হয়ে যায়।

সকাল হলে সকলে একবার ওঠে। হাত-পায়ে-ঝিনঝিনি-ধরে-যাওয়া-অবশ-হওয়া-শরীর নাড়েচাড়ে। মুখ হাত ধুয়ে মুড়ি কিংবা রুটি দিয়ে এক ঘটি করে গরম চা খেয়ে নেয়। আবার এসে কাজে বসে। পঞ্চাশ হাত লম্বা পাঁচিলের গায়ে যে চালাঘর সেখানে সাজানো একশোটা করে কলসী অথবা হাঁড়ি। পর পর পাঁচ থাক। কোমরে আঁচল জড়িয়ে বছর সাতাশের সুন্দরী বউ, কপালে বড় একটা ফোঁটা, 'চন্দ্রকোণা' রঙ বালতিতে করে নিয়ে পাঁচ রোদে শুকোনো কলসী-হাঁড়ি-তিজেলের গায়ে ন্যাতা বুলিয়ে বুলিয়ে মাখিয়ে দিচ্ছে। ঘাটালের 'চন্দ্রকোণা' মাটির রঙ দেওয়া হয়ে গেলে তার ওপর কলসী হাঁড়ির কানায় গলায় দিতে হয় 'উপরি-বনক' রঙ। কাঁচা গোলা রঙের রূপটা কালো। কিন্তু 'পনে' পোড়ালে হবে টকটকে লাল। এ রঙের দর বড্ড বেশি। আধ কিলো টাকায়। কুমোরটুলির জি. সি. পালের নাতনী হল হেমচন্দ্র পালের বউমা—পাকা হাত—কাজ করতে করতে আড়চোখে এক-একবার দেখে পাল মশায় আর খুশী হয়।

শুধোয়, 'হাঁ বউমা, প্রবোধ কি এখনো ওঠেনি ? সারারাত জেগে মহাবীর ভীম সেজে যাত্রা করে এসে বেটা আমার এখনো বিছানায় চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে ! দু-এক গেলাস টেনে এসেছে কিনা দেখ, ওসব না গিললে তো আবার লম্ফঝম্প করা যায় না—তাতে আবার ভীমের পাট !'

বউমা মৃদু মৃদু হাসে। বলে, 'এই তুলে দিতে বাগানের দিকে গেল। চোখ দুটো কুঁচের মতো হয়ে আছে। মদ ও কোনোদিন খায় না বাবা !'

'সৎসঙ্গে পড়লে সবাই খায়। কথায় বলে, 'ছেলেকে দেবে না যাত্রাদলে, গরুকে দেবে না আখশালে।'—তা কচি বাছুরটা ভ্যাবাচ্ছে, দুধটা দুইবে কখন ? আজ ধান উঠবে তো, খামারটা নিকিয়ে দিতে বলো বুড়ীকে।'

ভারী পাওয়ারের মোটা কাঁচের চশমাপরা হেমচন্দ্রের বুড়ী মা 'আতালি'

থেকে জল নিয়ে হাঁড়ির মুখপাত আর চাপড়া-জোড়া জোড়েন মুখে বুলিয়ে দিয়ে পিটুনী চালিয়ে চলেছে। ছেলে প্রবোধ পাল মস্ত ডাকাতের মতো চেহারা—মাথায় চুলের স্তবক—তিনটে গাই গরু, দুটো বাছুর আর হেলে জোড়াকে গলায় 'গলাম' লাগিয়ে পঞ্চানন্দতলার বিশাল তেঁতুল গাছটার নিচে রোদে বেঁধে দেয়। হেঁড়ে গলায় হঠাৎ তাকে বলতে শোনা যায়: 'জনেরা কেউ কাজে আসবে না বাবা। তাদের নাকি চার টাকা করে জনের দাম দিতে হবে। দু-টাকা রোজ দেওয়া হচ্ছিল, আমি আড়াই টাকা দোব বলিচি। ওরা নাকি পার্টি থেকে হুকুম পেয়েছে, 'চার টাকা রোজ না দিলে কেউ কাজ করবে না।' শ্লোগান দিয়ে গত সন্ধ্যায় নাকি পার্টির লোকরাও হেঁকে গেছে। তিনটাকা দোব। আর মুড়ি বিড়ি। না পারিস দরকার নেই, আমরা নিজেরাই ধান কাটব, 'গল্‌টাব', মাথায় করে বয়ে এনে খামারে গাদা দোব। ঝাড়ব, মাড়ব—সব করব। কেন, আমরা কাজ জানি না নাকি? শালা, আমি কাজ করলে তিনটে জনে পারে না আমার সনে। ওরা বললে, তা হতে দুবুনিকো দাদা! তোমার জমি হলেও তুমি কাজ করতে পারবে না আমাদের কাজ না করিয়ে। তাহলে কাস্তে দিয়ে ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দোব! বলিচি, মাইরি নাকি! নেবে দেখ না জমিতে! ভাদ্দর মাসে জল হতে রোয়া হল, বিঘেয় ছ-সাত মণ ধানের জায়গায় এ বছর তিন-চার মণ হবে মাত্তর—ওদের আবদার চার টাকা করে জনের দাম দাও! এটা তো ঘাটতি এলাকা, হুঁশ আছে? ছোট ছোট চাষী সবাই, ক্ষেতমজুর বরং সংখ্যায় কম, তারাই এর পাঁচদিন, ওর সাতদিন কাজ করে চাষ তুলে দেয়। ধানটা উঠে গেলে কে চার টাকা রোজ দেবে? তাদের কতখানি অভাব আমরা চাষীরা ছাড়া কি বাইরের বাবুরা জানে? এখন পাঁচসিকে নতুন চালের কে-জি। এখন রোজ বাড়াবার কথা তুলছে, আর যখন বর্ষাকালে চাল দু-টাকার উপরে ছিল বাছাধনরা কোথায় ছিলে? তার মানে খাবেও না, খেতে দেবেও না। চলে আসছি, কানাই মোড়ল ডেকে বললে, তিন টাকা দিও, পার্টিকে বলব চার টাকা দিচ্ছে!'

হেমচন্দ্র যেন এসব কথার ফন্দি তেমন বুঝতে পারে না। মাঠে কি তাহলে ধান পড়ে থাকবে নাকি? খুনখারাবি—রক্তপাত হবে?

প্রবোধ বলে, 'ক্ষেতমজুররা কিছু বলছে না, পার্টি বলাচ্ছে, তাদের উপকারী সেজে ভোট নেবে একদিন। এর নাম আন্দোলন, সংগঠন। তিনটাকা

নেবার কথা দিয়ে পাঁচজন কাজে গেছে। দেখো, কি হয়, মাঠ থেকে তাদের তেড়ে দেয় কিনা।'

হেমচন্দ্র বলে, 'ওদের ভাতভিত যাবে। দুদিন কাজ বন্ধ গেলে খাবে কি? গরিব ভিখিরির দশা ওদের। ওদের নিয়ে আবার রাজনীতি শুরু হল! বেচারাদের যে পুঁটিমাছের প্রাণ, আড়াই ঘণ্টা টেকে না। আমরা চাষীরা যদি পাঁচদিন কাজ বন্ধ দিই ওদের পার্টি কি খোরাকী দিয়ে সাহায্য করবে?'

বউমা বলে, 'কেন, ওরা তোমাদেরই জমির ধান তুলে নিয়ে যাবে।'

হেমচন্দ্র বলে, 'আমাদের তিরিশ বিঘে সম্পত্তি, বছরের খোরাকী হয় মাত্তোর—তা আমরা কি ওদের হাতে লুঠ-খুন-জখম হয়ে মরব?'

প্রবোধ বলে, 'যার পাঁচকাঠা জায়গা আছে সেই নাকি জোতদার।'

হঠাৎ নরহরি গোস্বামী করতালে ধ্বনি তুলে ভিক্ষা মাগতে এল। দোর গোড়ায় বসে সে সুউচ্চ এবং দীর্ঘলয়ে ললিতকণ্ঠে হরিনাম শুরু করলে :

হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে।
হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে॥

ক্রমে ক্রমে দ্রুতলয়ে তার স্বর এগোতে লাগল।

কলেজে-পড়া ভাগনেটা বালতি আর সরষের তেলের শিশি আনলে প্রবোধ দুধ দুইতে বসে চোঁক-চাঁক শব্দে। বউ এসে কচি কোমলে বাছুরটাকে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে।

শীতের রোদে বসে ছেলেমেয়েরা সূর্য-বন্দনা শুরু করেছে পঞ্চানন্দতলায় :

সূয্যিমামা ওঠ না
ঘোড়া নিয়ে ছোটো না
সূয্যিমামার রাজরোগ
রক্ত তোলে ভগভগ!
জাড়ের বাসা হাড়ে
যেন বাঁশ ফাড়ে।
বুড়ীর নাই কাঁথা
খা শুয়োরের মাথা।
আপনি মরি জাড়ে
কলাগাছের আড়ে

কলা পড়ে টিপটাপ
বুড়ী খায় লুপলাপ।

প্রবোধ জোরালো গলায় বাবাকে শুনিয়ে বলে, 'বারোশো একাশী' ধান উঠবে আজ, পাঁচটা জন লেগেছে, নটার সময় যেন মুড়ি যায়।'

হরিনাম শেষ হলে নরহরি হেমচন্দ্রের কাছে এসে একটা বিড়ি খায়। দুধ দোওয়া হয়ে গেলে বাছুর ছেড়ে দিয়ে প্রবোধের বউ একসরা চাল এনে ঢেলে দেয় বাবাজীর ঝোলায়। প্রবোধ ঠাট্টা করে বলে, 'বাবাজী আজ সাত-সকালেই বাগিয়েছ মন্দ কী! তাজা গতর এমন, চলো দিকিনি মাঠে কাজ করবে। হরিনাম করে ভিক্ষে করলে চলবে না।'

নরহরি-রসিক-চূড়ামণি। সে বলে, 'আমরা হলাম কেষ্টর জীব বাবা! আমাদের লেজ নেই, বীরত্ব নেই, আমরা গোপীকা—প্রেমের মন্ত্র জানি—কাস্তে দিলে যে, যারা গতর খাটায়, দেহের ক্ষুধার সৈনিক, তাদের সেনাপতিগিরী করে তোমাদের মতন মহাজন কেষ্টঠাকুরদের গলা কেটে ফেলব! রাধেশ্যাম!' বাবাজী গান গেয়ে উঠল :

'নিঠুর গরজি, তুই মানস-মুকুল ভাজবি আগুনে!
তুই ফুল ফুটাবি বাস ছুটাবি সবুর বিহনে?'

বাবাজী চলে গেল। রামায়ণ মহাভারত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ-অধ্যয়নকারী একটি আশ্রমের ভরণপোষণ করায় বাবাজী ওই ভিক্ষালব্ধ দক্ষিণায়।

খামারে গোবরজল ঢেলে ঝাঁটা টেনে টেনে নিকোতে শুরু করেছে প্রবোধের মা!

প্রবোধ মুড়ি খেয়ে জমিতে যাবার আগে বউকে বলে গেল, 'নলেনগুড়, নারকোল আর মুড়ি রেখো, আজ ব্লক-ডেভালপমেণ্টের পঞ্চায়েত-অফিসার সমাজদারবাবু, এগরিকালচার অফিসার আর সুধাকর সেন মশায়রা আসবেন। ১২৮১-র কর্প-কাটিং নেবার কথা আছে।'

হেম পালের অবস্থাটা একটু ভাল ছাপান্ন ঘর পালপাড়ার বাসিন্দাদের মধ্যে। তিরিশ বিঘে ধানজমি। পাঁচ-সাতটা মাছভরা পুকুর। বাঁশ, নারকোল, কলা, সুপুরি, উলু, পাট, কলাই, আনাজ এসব তার চাষেই হয় রেশন কার্ডে মাথায় পাগড়ি 'উন্না' শ্রেণীভুক্ত তারা, পাঁচজন মেম্বর কিন্তু পাত পড়ে এগারোটা। নিজের হাতে ইট কেটে একতলা পাকাবাড়ি তৈরি

করেছে। একমাত্র ছেলে প্রবোধ, কাজের লোক, ক্লাস টেন পর্যন্ত লেখাপড়া করেছে। লাইব্রেরী, ক্লাব, স্কুলের সেক্রেটারী। অমানুষিক খাটুনি খেটে হেম পাল হাঁড়ি-কলসী গড়ত, জমি চষত আর টেনেটুনে সংসার চালিয়ে বছরের শেষে যা জমাতে পারত তাই দিয়ে জমি কিনত। প্রবোধ জোয়ান হয়ে বুদ্ধিফিকির করে জমির আয়-উন্নতি যেমন বাড়াল, তাদের মৃৎশিল্পের ব্যবসাকেও করে তুলল উন্নততর। শুধু আজ আর বাখরাহাট, আমতলা, বাটা, বিরলাপুর, ডায়মণ্ডহারবার নয়, কলকাতার বেহালা, চেতলা, কালীঘাট, কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে সে লরী বোঝাই করে মাল সাপ্লাই দেয়। কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের আড়তদারের কাছে খোঁজ নিয়ে দেখুন, সব চেয়ে ভাল আর টেকসই, পয়লা নম্বরের কলসী, হাঁড়ি, পাতিভাঁড়, দেবীঘট, ধুনুচী, কল্কে, কুঁজো কে চালান দেয়? সে উত্তর দেবে, প্রবোধচন্দ্র পাল, পিতা হেমচন্দ্র পাল, সাকিম ডোঙ্গাড়িয়া, পোঃ ডোঙ্গাড়িয়া, জিলা ২৪ পরগণা।

এই ডোঙ্গাড়িয়া গ্রামে জীবন অধিকারী, দুলাল অধিকারীদের বাড়িতে যান, কুকুরে কামড়ানো ওষুধ পাওয়া যাবে। নির্ঘাত ভালো হয়ে যাবে। সোনা পোকার পরিমাণ মতো অংশ নিয়ে পাকা কলার মধ্যে ওষুধ বাটা পুরে দিয়ে খাইয়ে দেবে। মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ। খেলেই রোগী মারা যাবে। আর পাগলা কুকুর কামড়ানোর বিষ থাকলে ওষুধ খাবার পরই রোগী টের পাবে, তার শরীর ভীষণ গরম হয়ে যাবে, কেবলই প্রস্রাব পাবে, কটকট করবে, কিন্তু বেশি প্রস্রাব হবে না। সব বিষ বেরিয়ে যাবে। ডাবের জল খেয়ে শরীর ঠাণ্ডা করলেই সব সেরে যাবে। মাত্র সওয়া পাঁচআনা পয়সা লাগে।

ইডেন গার্ডেনের পশ্চিমে বাবুঘাটে ৭৫ নং বাসে উঠে বসে ৬৯ পয়সা ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে লম্বা একটা ঘুম দিন এক ঘণ্টা পঁচিশ মিনিট, তারপর ডোঙ্গাড়িয়া গ্রামের মোড়ে কণ্ডাকটর আপনাকে নামিয়ে দেবে। সামনে দেখবেন চা-দোকান, কলুর ঘানিতে চোখে ঠুলি আর পেটে ভাঁড়-বাঁধা গরু ঘুরে চলেছে, নাপতে কানাই চেয়ারে বসিয়ে চুল কাটছে কারো কচকচ শব্দে কাঁচি চালিয়ে; জলদি-করকে-সেরে-দেনে-হোগাওয়ালা গোড়ালীহীন তলা ঝরঝরে স্যাণ্ডেলে হাফসোল মারছে মুচি যমুনাপ্রসাদ; ক্লাবঘর, লাইব্রেরী, ডাক্তারখানা, পথের উত্তরপারে জুনিয়ার-হাই গার্লস স্কুল, পোস্ট অফিস, শানের ঘাট, মুদিখানা। কাঠের পুল পেরিয়ে স্কুলের পাশ দিয়ে ইট আর

খোলামকুচির পথ ধরে চলে আসুন পালপাড়ার মধ্যে। চারদিকে বাঁশবন, নারকোল, কলা, গেঁয়ো করমচা, আম, জাম, তেঁতুল, শ্যাওড়া, ডুমুর, সাঁইবাবলার জড়াজড়ি জঙ্গল। পুঁইমাচা, লাউমাচা। কুমোরপাড়ার বারবাড়িতে কাঁচা হাঁড়ি-কলসীর সারি, পটাপট শব্দ, দেড়মণ ওজনের চার-পাকি বাঁখারীর ওপরে কাদার বেড় দেওয়া চাক ঘুরছে বনবন করে, 'পন'-ঘরে পোড়ানো হাঁড়ি-কলসী! 'সুনসরা'য় করে ধরে নিয়ে কাঁচামাল তুলে সারি সারি রোদে দিচ্ছে মেয়েরা। বউগুলো অধিকাংশই ফরসা, সুন্দরী।

এ পাড়ার সব মানুষেরই উপাধি পাল। বাংলাদেশে মৃৎশিল্পী মাত্রেই হিন্দু। পালবংশ জগৎসৃষ্টির পর মানুষ যখন সমাজ গড়ে তোলে তখন থেকেই সনাতন এবং ত্রিকালজয়ী। এদের কাজ কেউ নিতে পারেনি। সৃষ্টির আদি কাজ মৃত্তিকাশিল্প। লক্ষ লক্ষ বছর আগের ধ্বংসস্তূপ খুঁড়ে প্রত্নতাত্ত্বিকরা ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মিশর, ফ্রান্স, রাশিয়া, সর্বত্র পোড়ামাটির পুতুল, পাত্র, হাঁড়ি-কলসী পেয়েছেন। হাঁড়ি-কলসী মানুষের প্রায় প্রথম সৃষ্টি। সেই সৃষ্টি আজও জাত-ব্যবসারূপে পালেদের মধ্যে অকৃত্রিমভাবেই বিরাজমান রয়েছে। সভ্য জগতে শহর-নগর গড়ে উঠতে যখন সেখানের পায়ের তলা থেকে নরম মাটি সরে গেল, এল সিমেণ্ট আর কংক্রীট-কাঠিন্য, মাটির পাত্রের ব্যবহার কমে গিয়ে সেসব জায়গায় এল এলুমিনিয়াম, জার্মান সিলভারের পাত্র, লোহা, পিতলের দ্রব্যাদি কিন্তু তাতে কি মৃৎপাত্রের রেওয়াজ কিছুমাত্র কমেছে?

হেম পাল বলে, 'না কমেনি। আমাদের কাজের টানে আদৌ ভাঁটা পড়েনি। জাতব্যবসা ছেড়ে যারা কেরানী, অফিসার, প্রফেসার হয়ে যাচ্ছে তাদের চাপটা এসে পড়ছে আমরা যারা টিকে রয়েছি তাদের ঘাড়ে। দিন দিন কাজের টান বাড়ছে বরং। শহরে ফুলের টব, কলসী, কুঁজোর টান বেশি। গ্রামে হাঁড়ি, মালসা, সরা, ভাঁড়, কলসী, চাটু, তিজেল, ম্যাচলা, খুলী (গুড় জাল দেওয়া), জালা, মেটে, গামলী, ধুনুচী, দেবীঘট, ছোবাভাঁড়, পাতিভাঁড়, রসের ভাঁড়, চাল উচোনো খুলী,—এসব চিরকাল নিত্যদিন কাজে লাগে। এত পাতিভাঁড় গড়ছি, এসব যাবে শহরে। পুজোর ঘটরূপে ব্যবহার হয়, মেছুনীরা, কাঁচা আনাজ ব্যাপারীরা, ফুল ব্যাপারীরা জল তোলার ভাঁড় হিসাবে এসব ব্যবহার করে। একটা ভাঁড়ের দাম ১২ পয়সা। পাইকারী

দশ পয়সা। ভাতের হাঁড়ি একটা আট আনা, যাতে আড়াই কেজি চাল ফুটবে। মোটা চাল তিন কেজি, সরু চাল আড়াই কেজি। তিজেল মানে 'বেননে' হাঁড়ি বা তরকারীর হাঁড়ি ১৯ পয়সা। একটা জালা ছ-টাকা। ম্যাচলা একটা যাতে একবস্তা মানে দেড়মণ ধান ধরে, তিন টাকা। গাঁজার কল্‌কে ১২ পয়সা। এ বাবা অমানুষিক খাটুনি। চল্লিশ বছর একনাগাড়ে ভোর তিনটে থেকে রাত দশটা অব্দি কাজ কচ্ছি। কুমোরের কাজ মেয়েদের হাতেই বেশি বলে আগে পরের মেয়ে ঘরে আনতে অনেক টাকা পণ লাগত। এখন আর সেসব নেই। পালপাড়ার ছাপ্পান্নঘর লোকের মধ্যে অনেকেই যাকে বলে 'শিল্পকাজ' তা জানে না। পিত্তিহীন লোকের কাজ এসব। হাতবশ হতে বহুদিন লাগে। কাছেই কল-কারখানা হতে অনেকেই এখন জাত-ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে শ্রমিক হয়ে যাচ্ছে। তারা এখন দুর্দিনে পড়ে জাত-ব্যবসা, জমি-জিরেত সব খুইয়ে, কাবুলীর কাছে দেনা করে ফতুর হয়ে গিয়ে চা-দোকানে আড্ডা দেয় আর রাজনীতি করে। এ পাড়ায় মোটে ২০টা ভোট কংগ্রেসের! আমাদের বাড়ি আর সারদা পালের বাড়ি। সারদা পাল ইউনিয়ন বোর্ডের 'পেসডণ্ড' বাবু ছিল। তাতেই সব খুইয়েছে সমাজবাদী হয়ে কাজ করতে গিয়ে, উল্টে বদনাম। তবে সে-ই এই গ্রামে হাই ইসকুল, মেয়েদের ইস্কুল, পোস্ট অফিস, লাইব্রেরী এই সব করেছে। আমাদের প্রবোধবাবু এখন গাঁয়ের মোড়ল-মহাশয় ব্যক্তি। একটু চড়া মেজাজের লোক। ৫০-৬০ জন লোক এল গত বছরের আগের বছর আমাদের ঘর থেকে ধান বার করতে। প্রবোধ বললে, 'গেট আউট! আমার বাড়িতে তোমাদের প্রতিনিধি আসুক—সব লোক এলে থালা-ঘটি-বাটি, জিনিসপত্র চারদিকে ছড়ানো আছে, চুরি গেলে তোমরা সব দায়ে পড়বে। লোকগুলো যেন বর্গীর দল! বাড়িলুঠ করতে এসেছে!' আসলে রাজনীতি নিয়ে 'আকৃষা-আকৃষি'। প্রবোধের মূর্তি দেখে সবাই বাইরে দাঁড়াল। প্রবোধ তখন দু-ধামা মুড়ি, এক কলসী ভাল বালিগুড় আর পঁচিশ তিরিশটা নারকোল দিয়ে গেল তাদের। খুশী হয়ে তারা সবাই খেলে। ধান না পেয়ে চলে গেল।—'পাবে কোথা? আমার তিরিশ বিঘে সম্পত্তি কিন্তু পাও পড়ে এগারোটা! এঁটেল মাটি তুলে তুলে জমিও আমার অনেক ডহর হয়ে গেছে।'

গঙ্গার মাটিতে হাঁড়ির তলা তৈরি হয়। রায়পুর, বেড়াল, রায়গঞ্জ,

স্যাকরাইল থেকে নৌকোয় করে গঙ্গার মাটি আনতে হয়। উত্তরমগরা, পাণ্ডুয়ার বালি আনতে হয়। ধুলোবালিতেও পেতেনের কাঁচা কাজ হয়।

প্রবোধ একটা ধানের বোঝা মাথায় নিয়ে এসে খামারে ফেলে দিয়ে বললে, 'জনেদের ওই পার্টির লোকেরা কাজ করতে দেয়নি। তেড়ে দিয়েছে। তারা তিনটাকা রোজে কাজ করতে চায় কিন্তু ছোকরারা বলছে চারটাকা রোজ না দিলে কেউ চাষীর ক্ষেতে নামতে পারবে না। ছোকরাগুলোর এখনো ভাল করে গোঁফ গজায়নি। ঠিক আছে, আমারই লাভ, বিনা পয়সায় দু-ঘণ্টা করে পাঁচজন ধান 'গোল্‌টে' দিয়ে গেল। দেড় রোজের কাজ হয়ে গেল এমনি এমনি। এই ছেলেরা সব, চল ধান বইবি। থাক, পাঁচদিন ওদের কাজ বন্ধ থাক।'

হেম পাল বলে, 'তা কি হয়! ওরা গরিব মানুষ, খাবে কি?'

'মুড়ি নিয়ে যেতে বলছি, তাও নিতে দেয় কি দেখো!'

হেম পাল উঠে এসে এক আঁটি ধান হাতে তুলে নিয়ে দেখে বললে, 'এই তোর ১২৮১ ধান 'চায়েন' হয়ে ফলেছে! এক আঁটিতে দুশো গ্রামের বেশি ধান হবে না। তুই বললি ৫০০ গ্রাম হবে! 'মরিচ-শাল' ধানের মতোই দেখতে—ক্ষুদে ক্ষুদে। কিন্তু এর গাঁথুনি যে পাতলা।'

প্রবোধ বলে, 'তাইনান, তাইচুঙ, আর আই-এইট, বারোশো একাশী—এসব ধান প্রফুল্ল সেন জাপান থেকে এনেছিলেন (?) বলেই এখন এরা ডুগডুগি বাজাচ্ছে।'

হঠাৎ জনেরা ফিরে এসে বললে, 'আমরা কাজ করব। পার্টির লোকদের রাজি করিয়েছি।'

তারা মুড়ি নিয়ে ক্ষেতে চলে গেল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে যেন হেম পাল।

বিকালে সারা পালপাড়া ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার। 'পনে' আগুন দিয়েছে।

চৌচালা ছাউনি, ছ-টা মাঝখানে, দুটো ধারে, মাটির থাম আর দেওয়াল, নিচে 'পনে'র গহ্বর। আকার ত্রিভুজের মতো। পেছন দিকটা দু-কোণ এবং উঁচু। মুখের কোণের দিকে ইট আর মাটির তিন থাক পৈঠা। মাঝে মাঝে ফাঁক। তার মাঝ দিয়ে আগুনের হল্‌কা আনে 'পনে'র মধ্যে। 'পনে'র নিচে পুরনো কলসী উপুড় করে সাজিয়ে দিয়ে তার ওপরে দিতে হয় কাঁচা কাঁটাপালা, তার ওপর শুকনো নারকোল পাতা। এবার দিতে হবে

রোদে শুকোনো কাঁচা হাঁড়ি-কলসী ইত্যাদি। তার ওপরে আবার কাঁচা ডালাপালা, নারকোলপাতা আবার হাঁড়ি-কলসী আবার ডালপাতা কলসী দাও। এমনি করে পাঁচ থাক দিয়ে তার ওপর আঁটির বাঁধন খুলে খড় বিছিয়ে দিয়ে আবার কাদার লেপন দিতে হবে। এবার দক্ষিণমুখো 'পনে'র মুখের নিচে লোহার শিকের ওপরে কাঁচা কয়লা তুলে ধরিয়ে দাও। কয়লা পোড়াব লেলিহান শিখা ভেতরে ঢুকতে থাকলে কাঁচা ডালপালা পুড়তে থাকবে পড়পড় চচ্চড় শব্দ করে আর 'পনে'র পেছনের গহ্বর দিয়ে বল্‌বল করে ধোঁয়া বেরুবে। সেই ধোঁয়ায় সারা পালপাড়া অন্ধকার হয়ে যাবে। সারারাত ধরে এই 'পন' জ্বলবে। সকালে 'পন' পোড়ানো শেষ হবে। 'পন' পোড়াতে লাগে :

৮ মণ কাঁচা কয়লা	দাম	২৪·০০
৪০ খানা নারকোল পাতা	"	৪·০০
কাঁচা ডালপালা	"	১·০০
খড়	"	৮·০০
মজুরী	"	২০·০০
		৫৭·০০

একবার 'পন' পোড়ানো হলে তা থেকে যে মাল খালাস হয় তার মোট মূল্য একশো টাকা। সপ্তায় দুবার 'পন' পোড়ে। শীতকালে মাটির কাজ ভাল হয়। বর্ষায় বড় কষ্ট। বৃষ্টি-বাদলায় সব মাল তুলতে না পারলে অনেক নষ্ট হয়।

মুসলমান ছেলেমেয়েরা ভাঁড় ভর্তি করে কাঁকড়া ধরে এনে তার বিনিময়ে হাঁড়ি-পাতিল নিয়ে যায়। মুসলমান বুড়ীদের হাতে পাড়ার মাল বিক্রি হয়ে যে দু-চার আনা আসে সব পয়সা নেয় প্রবোধের মা। তাদের সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা আর কি রকম ঝগড়া হয় শাউড়ি-বউয়ে, সেই সব কাহিনী নিয়ে গল্প-গুজব-করে।

হেম পাল বলে, 'তখনকার সমাজ-কর্তারা আমাদের সমাজের রক্ষণা-বেক্ষণের কথা ভাবত। এই যে অরন্ধন' পূজা, এ আমাদের কথা ভেবেই। সারা বছর যদি মানুষ হাঁড়ি-পাতিল না ফেলে তাহলে আমাদের চলে কেমন করে—সে কথা ভেবে নিয়ম করে দিয়েছিল ভাদ্রমাসের সংক্রান্তির দিনে সব পুরনো

হাঁড়ি ফেলে দিয়ে কুমোরবাড়ি থেকে নতুন হাঁড়ি-মালসা-সরা কিনে আনতে হবে। এখনকার সমাজকর্তারা কি সে কথা ভাবে? তারা কিসে সব কিছু নষ্ট করতে পারে সেদিকে বুদ্ধিবাগীশ। সকাল-সন্ধ্যা রেডিও খুলে বসি, অনেক কথা শুনি কিন্তু পৃথিবীর সব চাইতে আদি মৃৎশিল্পী এই কুমোরজাতের কথা কেউ কই কোনোদিন কিছু বলে কি?'

প্রবোধ বলে, 'বৈজ্ঞানিক সভ্যতা বাড়লে আমাদের মাটির হাঁড়ি স্বর্গে চলে যাবে। তখন আর হয়তো খেতেই হবে না মানুষকে, রান্না তো দূরের কথা।'

হেম পাল বলে, 'তাহলে আমরা কি তখন শুধু ঠাকুর গড়ব?'

প্রবোধ বললে, 'ঠাকুর গড়তেও হবে না। আজকাল লোকে ঐ কৃত্রিম ঠাকুর-দেবতা মানে না। সভ্যজগৎ লোহা-লক্কড় চায়, মাটিকে চায় না। মাটি তাদের পায়ের তলা থেকে আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে।'

সন্ধ্যায় প্রবোধের স্ত্রী শাঁখে ফুঁ দিয়ে তুলসীতলায় আলো দেখিয়ে গড় করে এসে ঘাটের জলে কলার ভেলায় কয়েকটা ছোট ছোট মাটির প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে উঠে আসবার সময় প্রবোধ কয়েকজন বাবুকে নিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকল গিয়ে।

সনাতন খুড়ো আর ভাইপো গোবিন্দ এসে তামুক টেনে নিয়ে খোল করতাল বাজাতে বসলে হেম পাল গলা ছেড়ে কীর্তন গাইতে শুরু করলে:

'বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে॥
এতেক সহিল অবলা বলে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে॥'

কীর্তন শুনতে শুনতে হেম পালের বুড়ো মায়ের ভারী পাওয়ারের কাঁচের চশমা চোখের জলে ভিজে যায়।

বাবুরা বিদায় নিলে বউমাও এসে গলবস্ত্র হয়ে বসে ভক্তিপ্লুতমনে কীর্তন শোনে। হাতের কাজ কিন্তু তাদের বন্ধ হয় না। 'বোলে'র ওপরে পিটুনি চলে হাতের পটাপট পটাপট শব্দে। আর চাক ঘুরতে থাকে বনবন করে প্রবোধের হাতে। সে যেন এখন স্রষ্টার ভূমিকায় সেজেছে, বহুবিচিত্র মৃৎপাত্র তৈরির ঘামঝরা পাথরকোঁদা চেহারার এক অক্লান্ত ঈশ্বর!

মা মনসা ঃ বাবা শা-ফরিদ

মেয়েরা 'বার' করে চলেছে! 'বার' মানে ব্রত। লাল নীল সবুজ শাড়িপরা 'এয়োস্তি' মেয়েরা। কপালে দগদগে সিঁদুর। প্লাসটিকের বালতি-ব্যাগের মধ্যে একখানা শাড়ি, মুড়ি চালভাজা খেসারী কলাই ভাজার পুঁটুলি। সঙ্গে চাষাভূষো স্বামী—পা ফাটা, রুখু চুল, গায়ে ময়লা শার্ট-চাদর, পরনে আটহাতি ধুতি—আর পেটভাবা ছেলে বা মেয়ে। হীরেপুরে মা মনসা আব বাবা শা-ফরিদের থানে মানত দিতে যাচ্ছে। হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া থানায় এই হীরাপুর গ্রাম। হুগলী নদীর চরে—আড়বাঁধির একেবারে ওপবেই। পুবপারের ২৪ পরগণা থেকেই যাত্রীরা আসছে বেশি। উলুবেড়ে, কালসাপা, আছিপুব, বিরলাপুর, রায়পুর, গদাখালি, নলদাঁড়ি, কাঁটাখালি, বুড়ুল, বাগাণ্ডা—কতশত জায়গা থেকে ফেরি নৌকো বোঝাই হয়ে ঢোল-কাঁসি-শানাই বাজিয়ে আসছে যাত্রীরা। কারো ছেলের পেটের ব্যামো ভাল হয়ে গেছে—তাই বাবা-মায়ের থানে চলেছে মানসিক-করা হাঁস বা পাঠা নিয়ে বলি দিতে। কেউ চলেছে পেটজোড়া লিভার-পিলেতে 'গাম্বিস'-হয়ে-ওঠা হাত-পা-নলা হাড়গিলে ছেলেকে নিয়ে মানসিক করে, ওষুধ ধারণ করে আসতে। শতকরা আশীজন মেয়ে! তাদের সঙ্গে চলেছে আরো বাড়তি দু-চারজন করে—হয়তো বা শাশুড়ী, নয় শশুর কিংবা কুমারী বোন, বিধবা পিসি-মাসি। সকলেই স্নান করে পবিত্র হয়ে ভিজে চুল পিঠে এলিয়ে হাতে মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে এসে উঠছে নৌকোয়।

অধিকাংশ ফেরি নৌকোর মাঝি মুসলমান। কারো লম্বা দাড়ি, কারো বা চেঁচে কামানো। ইসমাইল মাঝি তরুণ ছোকরা। যে নন্দ মাঝি ঘাট জমা নিয়েছে তার নিজস্ব নৌকোর দাঁড়ি সে। কাজেই মাছি গফুর মিয়া তাব আপন চাচা হলে কি হবে, তা বলে কি ঘাটের ফেরিকে টপকে ভাড়া নিয়ে চলে যাবে?

ইসমাইল বলে, 'দেখো চাচা, ভাল হবে না, চারটে লোক নিয়ে তুমি চলে যাবে—আচ্ছা যাও, দু-আনা করে ঘাটজমা দিয়ে যাও। আর লোকগুলো চারআনা তোমাকে দেয় দিক।'

নন্দ মাঝি পাড় থেকে হেঁকে বলে, 'হাঁ, ঘাটজমা দিয়ে যাও।'

গফুর মিয়া গর্জে ওঠে, 'চারটে লোক 'নৈকো'য় তুলেছি তো অমনি ঘাট-জমা ? চললুম এদের নিয়ে, দেখি কি করিস মোর !'

সত্যিই গফুর মিয়া তার পানশি নিয়ে হালে ঝিঁকি মারতে মারতে চলে গেল মাঝদরিয়ার দিকে ছোট ছোট আট-দশ বছরের দুটি ছেলেকে দাঁড় বাইয়ে নিয়ে। যুগোশ্লাভিয়ার একটি জাহাজ চলে গেল কলকাতার দিকে প্রপেলারের ভীষণ গর্জন তুলে। তার পিছনে পিছনে জলের উচ্ছ্বাসের মধ্যে ছিটকে-ওঠা-মাছ খাবার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে উড়ে চলেছে একদল পানপায়রা আর গাঙচিল। বিরাট বিরাট ঢেউ উঠলে গফুর মিয়ার নৌকোটা মোচার খোলের মতন নাচতে থাকে। দূর থেকে মনে হয় এই বুঝি তলিয়ে গেল। আবার টুক্ করে ভেসে উঠছে ঢেউয়ের মাথায়। আবার নেমে গেল ! আরো দুঃসাহসিক কাণ্ড, কচি কচি মাত্র দুটি ছেলে ছোট্ট একটি পানশি নিয়ে জাহাজের একেবারে সামনে দিয়ে চকিতে পার হয়ে এসে ঢেউয়ের ওপর নাচতে লাগল। তাদের একজন জাহাজের উদ্দেশে চিৎকার করছে, 'হেই বাবা সাহেবরা, শুনছ, হেই শালারা, কিছু দিয়ে যাও…'

জাহাজ থেকে তিন-চারটে খালি টিন বা ক্যানাস্তারা পড়ে গেল। ছেলে দুটো অসীম বিক্রমে ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ছুটল যেন নৌকো নিয়ে, টিন তোলবার জন্যে। ধরল তারা সব কটি। তীরে এনে বেচবে টিনগুলো একটা দেড় টাকায়।

ফেরি নৌকোয় বসেছিলুম ইসমাইলের। আটটার সময় উঠে বসেছি। নৌকো ছাড়বার নাম নেই। আরো জনচারেক লোক মানসিক শুধ্‌তে যাচ্ছে, ঝোলার মধ্যে তাদের একটা হাঁস। নৌকোর পাডনের সঙ্গে বেঁধে ঝুলিয়ে রেখেছে। মাঝে মাঝে ফ্যাসফ্যাস করে ডাকছে। হাঁসা। পুরুষ হাঁস। আর একজন লোক এল, বুড়ো মতন। কখন নৌকো ছাড়বে তার-ই অস্থিরতা। নন্দ মাঝির বাড়ির মেয়েরাও নাকি যাবে এই নৌকোয়। বুড়ো লোকটি রাজ-নীতি, সমাজনীতির গল্প বলে যাচ্ছিল। আর একদল মেয়ে-পুরুষ এল। বড় নৌকো। ইসমাইল বললে, 'আশীজন লোক তোলা যাবে, ভয় কি !'

জলে নেমে খানিকটা এসে নৌকোয় উঠতে হবে। মেয়েরা হাঁটুর ওপরে কাপড় তুলে তুলে এগিয়ে আসছে। একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক, দিব্যি আদ্দির পাঞ্জাবি গায়ে, গলায় মাফলার, কাঁধে পাটকরা শাল, মিহি ধুতি কিন্তু খালি পা। তার সঙ্গের বছর সাতেকের ছেলেটার কাঁধে ঝোলানো একটা ছোট্ট

রেডিও সেট। ভদ্রলোকের শালীটি আধুনিকা। স্ত্রী ছাপোষা—তার চোখে লজ্জা! ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে হাত ধরে নৌকোয় তুলে নিলেন। এবার যুবতী শালীকে তুলে নিতে গেলে সে আপত্তি করলে। নিজেই উঠতে গেল। যথেষ্ট উঁচুতে একটা পা তুলতে হল তাকে। নির্লজ্জ চোখ যাদের সে দৃশ্য তারা দেখলে।

তবু এহ বাহ্য! মা মনসার থানে পবিত্র মনে চলেছে সকলে। এখন সর্ব পাপ সর্ব কুদৃশ্য উপভোগ এবং দর্শন—নিন্দনীয়।

মাঝির দাঁত-বড়-বড় ঠোঁট-ঝোলা বউটি চার-পাঁচটি ডিব্‌রি ভাব্‌রা ছেলে-মেয়ে নিয়ে এসে উঠল। সঙ্গে একটা পাঁঠা এনেছে। মিষ্টির হাঁড়িগুলো নৌকোর গলুয়ের দিকে ভাল করে বসিয়ে রাখলে। একটি ফুলো মেয়ে আর একটি পাঁঠাকে তোলা হল। দুর্গন্ধে অস্থির।

ভদ্রলোক আমার পাশে বসে আলাপ জমাতে চাইলেন। ছেলেটি রেডিও চালাচ্ছে। শালীটি আর বউটি আমার দিকে কেন জানি না বার বার তাকাচ্ছিল। কি যেন বলাবলি করছিল তারা। ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি কি হীরাপুর যাবেন? মানসিক নাকি?'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

'কিসের মানসিক?'

'আমার এক অনূঢ়া শালী আছে, তার খরিশ কেউটের মতন রাগ, দিনে কিংবা লোকের সামনে তো দূরের কথা, রাত্রে এবং একাকী তার গায়ে হাত দেবার উপর নেই। তাই মা মনসার কাছে মানত করতে চলেছি, শ্যালিকার খরিশ কেউটের বিষ অথবা ক্রোধ যেন তিনি হরণ করেন!'

ভদ্রলোকের শালী এবার খিলখিল করে হাসতে লাগল। বউটিও অপাঙ্গে একবার তীর হেনে মিটিমিটি হাসতে লাগল ঘোমটার আড়ে। ভদ্রলোক উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লেন। সিগারেট দিলেন। হঠাৎ বললেন, 'আমি কিন্তু আপনাকে চিনি।'

বললাম, 'মরেছে!'

তিনি বললেন, 'কি কুসংস্কার দেখুন না ভাই, এই ছেলেটার পেটের ব্যাধি। বায়োকেমিক, কোবরেজি, হোমিওপ্যাথি অ্যালোপাথি করে করে সব প্যাথির ওপরে সিমপ্যাথি হারিয়ে এখন শ্রীমতীর আবদারে চলেছি মা মনসার থানে। আমি আবার খানিকটা কমিউনিস্ট! জানেন তো আমরা মাঠে জনতার

সামনে বক্তৃতা দিই, আমরা দেবতা ভগবান মানি না, কিন্তু ঘরে স্ত্রী লক্ষ্মীপূজা, মনসাপূজা করে—তাতে বাধা দিতে পারি না। এখানে আমরা 'হিন্দু কমিউনিস্ট'! তাই আমাদের কমিউনিজমের রূপ একান্ত ভারতীয়—নানান জোড়াতালি তাতে। করজোড়ে নমস্কার করি। মহান নেতাদের প্রতিকৃতিতে মালা দিই, দিয়ে করযোড়ে নমস্কার চলে। এসব সৌজন্যের মধ্যেও যে প্রতীক-পূজার গন্ধ আছে তাও বেমালুম ভুলে যাই।'

নৌকোকে উজান ঠেলে মাইল খানেক দক্ষিণে নিয়ে চলল ইসমাইল। তারপর ছেড়ে দিলে। মাঝখানে এসে, পড়ল জাহাজের ঢেউয়ের সামনে। ভীষণ নাচতে লাগল নৌকোটা। ভদ্রলোকের স্ত্রী শালী ভয় পেয়ে তাঁর কাছে ঘেঁষে এসে বসে তাঁকে প্রায় জড়িয়ে ধরলে। ছেলেটা তাঁর কোলে মুখ লুকোল।

নন্দ মাঝির ছোট ছোট ছেলেগুলোর কী উল্লাস! তারা নৌকোর বাড় ধরে ঝুলে ঝুলে ঢেউ দেখছে।

আমি নির্বিকার। ভদ্রলোকটির নাম নাকি শ্রীপতি চক্রবর্তী। তাঁর শালীর নাম রাধা। বউটির নাম কৃষ্ণা। তার হাতের আংটিতে নামটি লেখা রয়েছে দেখলাম। রাধার চাইতে বড় বোন অনেক ফরসা এবং দেখতে ভাল। বউটির চোখ দুটো যেন দুটি প্রদীপ। উজ্জ্বল, হাস্যময়। নৌকো অসম্ভব দোল খাচ্ছে। রাধার চেহারা একটু গোলগাল। তার পা দুটো হঠাৎ একবার আমার গায়ে ঠেকে যেতেই সে পায়ে হাত দিয়ে গড় করলে।

ভদ্রলোক বললেন, 'ও কলেজে পড়ছে।'

রাধা বললে, 'আমাদের লোক-সাহিত্যের ক্লাসে প্রফেসার সুধীন বন্দ্যোপাধ্যায় আপনার খুব প্রশংসা করছিলেন, আমি ঠাকুরপুকুর বিবেকানন্দ কলেজে পড়ি।'

'সুধীনবাবুকে আমার নমস্কার জানিও।'

তারপর রাধা আমার কাছে সরে এল। প্রগল্‌ভার মতো নানান কিছু বকতে লাগল। বললে, 'জামাইবাবু আদৌ কমিউনিস্ট নন, সুবিধাবাদী। আজকাল কমিউনিস্টরা মাঝেমাঝে রাজত্ব করছেন, তাঁরা জাতে উঠেছেন দেখে অনেক ভদ্রলোকও এখন নিজেকে কমিউনিস্ট পরিচয় দিয়ে 'প্রগতিশীল' বলে চালাতে চান। অমন ভদ্রলোকদের মুখে ছাই! বলুন তো কোনো কমিউনিস্ট ধান-চালের কারবার করেন?'

বললাম, 'দেশের কল্যাণে আত্মপর রেহাই নেই, দাও আলিপুরে গিয়ে ওঁর নামে একটা কেস ঠুকে। ভদ্রলোক জব্দ হয়ে যাক।'

শ্রীরাধা গাল ফুলিয়ে ক্ষুণ্ণ মনে বললে, 'তা দিতে পারি, কিন্তু সাক্ষী হবে কে? দিদি? হরিবোল হরি! ওঁর সঙ্গে যে হরিহর আত্মা!'

শ্রীপতিবাবু হাসতে লাগলেন।

হীরাপুর গ্রামটা চোখের সামনে ভাসছে। বনানীর গাছগুলোর মধ্যে যেগুলো ঘন কালো রঙের সেগুলো তেঁতুল কিংবা খিরিশ হবে মনে হল। ২৪ পরগনার তীরে অর্থনীতির আখড়া বেশি। বেশি কারখানা, ঘাট, জেটি, বাজার, গঞ্জ, ইটখোলা, পাটকল, তেলকল। বেশি নারকোলগাছ, খেজুর-গাছ, তালগাছ।

বয়ার কাছে এল নৌকোটা। বয়ার মধ্যে বেশ বড়ো মতো একটা ঘর যেন। তার মধ্যে কয়েক জোড়া পায়রা বাসা বেঁধেছে। জেলেদের ছেলেরা মাঝে মাঝে ওখানে নৌকো ধরে তাদের বাচ্ছা নিয়ে আসে। হঠাৎ ফ্যাঁস করে শব্দ তুলে নিঃশ্বাস ছেড়ে কালো শ্যাওলা রঙের একটা শুশুক ডিগবাজি খেলে নৌকোর কাছেই। আবার উঠল কিছুক্ষণ পরেই। তার পাখনা আছে। মুখটা ইউ অক্ষরের নিচের দিকের মতো গোলাকার। ইসমাইল বললে, 'ঠিক শুয়োরের মতন দেখতে। ভীষণ তেল হয় ওর। আশী টাকা কেজি। বাতের উপশম হয়।'

হীরেপুরের চড়ায় নৌকো বাঁধল। এদিকে একেবারে চড়া। অনেক দূরে নামতে হবে। চারদিক থেকে নৌকো এসে জড়ো হচ্ছে। সবাই ঝপাঝপ নেমে যাচ্ছে।

রাধা বললে, 'এখানে তো অনেক জল, এখানে নামতে পারব না আমরা।' কিন্তু ইসমাইল নামতেই দেখলে মাত্র একহাঁটু জল সেখানে। কয়েকটি মেয়ে ফেটিজাল পেতে মাছ ধরছে। যাত্রীরা নামতে লাগল। পা-ফুলো অসুস্থ মেয়েটিকে তার স্বামী নামিয়ে কোলে করে তুলে নিয়ে গেল চরের ওপরে। পাঁঠা দুটোকে নামালে ইসমাইল। জলে ফেলে দিলে। চান করাতে হবে তো! তারা চেল্লাতে থাকল। একটি রেগে গিয়ে আকাশে ঠ্যাং তুলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ইসমাইলের পাছায় দিলে এক গুঁতো মেরে। সে দিলে এক লাথি। বললে, 'মরবার আগে শালা ইতরেছ বোধহয়!'

আমি নামলাম। কেবল আমার হাতেই জুতো। বউটি নামল

শ্রীপতিবাবুর হাত ধরে। রাধা আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বললে, 'ধরুন তো একটু, প্লিজ!'

রাধা আমার হাত ধরে ধরে কাপড় তুলে তুলে জল ভেঙে ভেঙে এসে চরের ওপরে উঠল।

ছেলেটি রেডিও চালিয়ে দিতেই গান শুরু হল—'নাগিনওয়ালা আগেয়া...'

আড়বাঁধির চরের ওপর, হীরাপুরের মেলায় আসা গেল। চরের ঢালুতে আমন ধান পেকেছে। খালের মধ্যে জোয়ারের স্রোত চলেছে রুপোলী ফিতের আকারে কুলকুল করে বয়ে। খালধারে বনঝামা আর হরকোচের বন। চারদিকে শুধু পাঁঠার গায়েব গন্ধ। সানের ঘাটে সকলে পা ধুয়ে নিলে। হাঁসগুলোকে চুবিয়ে নিলে। মেলায় দোকানপাট বসেছে। মাত্র রবিবার, একদিনের মেলা সপ্তাহে। তেলেভাজা, মুড়ির দোকান, কয়েকটি প্লাসটিকের খেলনাব দোকান। সবেদা, পাকা কলা, নেবু, আম ইত্যাদি ফল বিক্রি হচ্ছে। আমাদের গ্রামের সেই বহুরূপীসাজা বেচা ঘোষ এসেছে আইসক্রীম বেচতে। সে চিৎকার করছে, 'অজয়-ইন্দিরা আইসক্রীম, একান্ত গোপন ঘবে তৈরী, খেলেই মুক্তি! হাঁফকাশি, গুলাউঠো সাফ, যে না খাবে তার শ্বশুর হব, যে খাবে তার হব শালা!'

সারি সারি বারকোসে সাজানো বাতাসা বরফি বিক্রি করছে জন পঞ্চাশেক মিঠাইঅলা। পীতাম্বর বাগের বাড়ির সদরের দরজায়ও উঠে বসেছে তারা। মেলার মাঝখানে একখানা আটচালা। তার মধ্যে পূজো-দেওয়া মেয়েরা এসে হাত-পা মেলে বসে একগামছা মুড়ি আর তেলেভাজা পেতে নিয়ে সবাই মিলে গাল চালিয়ে যাচ্ছে আর লাল সালুব ফতুয়া গায়ে গলায় বত্রিশটা মেডেল ঝুলিয়ে, চিকদানা গলায় দিয়ে, হাতে চামর ঢুলিয়ে ঢুলিয়ে মা মনসার কথকতা গাইছেন শ্রীসাধনচন্দ্র মাইতি। অবিকল যাত্রাদলের বিবেকের গলা তাঁর। লখিন্দর বেহুলার পালা গাইছেন তিনি। সবাই শুনছে ভক্তিভরে। মেলার দক্ষিণ দিকে দুটি পাকাবাড়ি বাগেদের। শুরুতেই একটি তেলেভাজা আর চায়ের বাঁধা দোকান মুসলমানদের। তারপরেই বাবা শাহ্‌ ফবিদউদ্দিন পীরেব মাজাব। চার হাত বাই তিন হাত চূড়োহীন খিলেন করা পাকা মাজার। ভেতরে বাবার থান। কাজী গিয়াসউদ্দিন সেবক। সিনি গ্রহণ করে কার কি অসুখ জিজ্ঞেস করছেন। তারপর থানের খানিক ধুলো নিয়ে দুটো বাতাসা তাতে গুঁড়ো করে কাগজে মুড়ে দু-হাতে সেটা কপালে ঠেকিয়ে

কি সব মনে মনে বিড়বিড় করে বলে দিয়ে দিচ্ছেন। বলছেন, 'সাতদিন সকালে একটু করে খাওয়াবেন। পেট দেখি, পেটে পিলে হয়েছে, ঠিক আছে, বাবার থানের ধুলো মাখিয়ে দিচ্ছি, ভাল হয়ে যাবে। ভাল হলে মানত শুধে যেও। সিন্নির জন্যে আট পয়সা, পেটের জন্যে পাঁচ পয়সা দাও।'

কাজী সাহেবের দ্বারস্থ হলাম। সব ইতিহাস জানতে চাইতে বললেন, 'প্রায় একশো বছর বাবার এই মাজার চলছে। অসংখ্য যাত্রী হয়। আমার ঠাকুরদাদা মেহের আলী কাজী এর প্রতিষ্ঠাতা। বাবা শেরিয়াতুল্লাহ্ কাজীও এই মাজারের সেবক ছিলেন। আগে আমাদের ১৪০০ বিঘে সম্পত্তি ছিল লাখেরাজ। হুগলীর খানাকুলে ছিল আমাদের আদিবাস। নবাব সিরাজোদ্দৌলার প্রিয়পাত্র ছিলেন আমাদের আদিপুরুষ রফিজুদ্দিন কাজী। তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে যতদূর পেরেছিলেন জায়গা দখল করে নিয়ে ভোগ করেন। সেসব এখন কিছুই নেই। ভগ্নবাড়ি পড়ে আছে আমাদের।'

'এ মাজার হয় কেমন করে ?'

'পীতাম্বর বাগ নামে একটি লোক—এইটাই তার বাড়ি, খুব অসুখে ভোগে। একদিন নদীর চরে গরু বাঁধতে এসে গালে হাত দিয়ে বসে বসে ভাবছে হঠাৎ দেখে তার পেছনে একজন ফকির। গলায় তাঁর নানা রঙের পাথরের মালা। ফকির হেসে শুধোলেন, 'তুমি এখানে বিষণ্ন মনে বসে কেন ?'

'বাগ মশায় বললে, আমার কঠিন ব্যাধি ফকির বাবা।'

'ফকির সাহেব তাঁর সামনে থেকে একটা গাছ উপড়ে নিয়ে তার শিকড় গলায় বাঁধতে বলে চলে গেলেন। বাগ মশায় এসে ঠিক এই মাজার যেখানে, এইখানে বসে ওষুধটা গলায় বাঁধে। আর তাঁর অসুখ ভাল হয়ে যায়। তারপর সেই ঘটনা আমার দাদাও শোনেন। এবং ফকির সাহেবও কয়েকদিন দাদার অতিথি হয়েছিলেন। হঠাৎ তিনি একদিন উধাও হয়ে যান। তারপর বাগ মশায় তাঁকে স্বপ্ন দেখেন। তিনি নাকি পীর বাবা শা-ফরিদ। তিনি তাকে একটি মাজার করে দিতে বলেন। কিন্তু বাগ মশায় তা করছে না দেখে পীরবাবা আমার দাদাকে স্বপ্নাদেশ করেন। দাদা তখন এখানে একটি মাজার করেন। তারপর শত শত লোক এই মাজারে আসতে শুরু করে এবং তাদের রোগশোক ভাল হয়ে যায়। তখন বাগ মশায় করলে কি, তার বাড়ির মনসা

ঠাকুরকে বাইরে এনে বামুন ডেকে প্রতিষ্ঠা করে সেখানে ওষুধ বাঁধতে শুরু করে দিলে। তাদের কুল-পুরোহিত পূজায় বসতে লাগলেন। যাত্রীরা অনেকেই হিন্দু। তাই ওদেরই মানত, সিন্নি, দক্ষিণা ইত্যাদি পড়ে বেশি।'

শুধোলাম, 'শাহ্ ফরিদ পীরের ইতিহাস জানেন?'

গিয়াসউদ্দিন কাজী বললেন, 'তিনি জাগ্রত পীর। যৌবনে ছিলেন দুরন্ত ডাকাত। হেন অপরাধ নেই যা নাকি তিনি করেন নি। বাদশাহ পর্যন্ত তাঁকে ডরাতেন। বড় বড় একশো অপরাধের পর তাঁর ভেতরে বিবেক জাগ্রত হয়। তিনি অনুশোচনায় পাগল হয়ে ওঠেন। বহু পীর দরবেশের কাছে যান, কেউ তাঁর মুক্তির পথ বলে দিতে পারেন নি। তাঁর ইতিহাস কিছুক্ষণ শোনার পরই সকলে ধৈর্য হারিয়ে তাঁকে পাপিষ্ঠ দুরাচার বলে তাড়িয়ে দেন। তখন তিনি এক গোরস্থানের নিবিড় জঙ্গলে এসে, তলায় নিজের তরবারিটি রেখে দিয়ে গাছে উঠে দুটি পায়ে শিকল বেঁধে মাথাটা নিচের দিকে করে ঝুলতে থাকেন। এই কৃচ্ছ্রসাধনাতেই হবে তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত। অনাহারে আল্লাকে ডাকতে ডাকতে তাঁর পাপের মুক্তির জন্যে দীর্ঘ একচল্লিশ দিন কাঁদার পর হঠাৎ একদিন তিনি দেখলেন সেই নিভৃত গোরস্থানে কাকে যেন বহু বনেদী আমীর-ওমরাহ্ গোছের লোকেরা কবর দিয়ে গেলেন। কবরটি হয়ে যাবার পর তার মাঝখানে একটা বর্তুল আকার চিহ্ন করে দেওয়াতে বোঝা গেল—সেটি কোনো মেয়েমানুষের কবর। সবাই 'জিয়ারত' করে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে একটি যুবক এসে—শা-ফরিদকে মহা আশ্চর্য করে কবরটা খুঁড়তে আরম্ভ করলে। তারপর যুবকটি কবরের লাসটা ওপরে তুলে এনে কাফন খুলে ফেলে সেই মৃত যুবতী নারীটির ওপর যৌনাচার শুরু করলে! শা-ফরিদের রক্তে তখন আগুন ধরে গেল। এত বড় অন্যায় কি মানুষ করতে পারে? এ কি হতাশ প্রেমিক ছিল মেয়েটির? মরার পর আজ প্রতিশোধ নিতে এসেছে? ঠিক আছে, একশো পাপ তিনি করেছেন, আর একটি করবেন ভেবে নিয়ে শিকল ধরে ডালে উঠে পায়ের বাঁধন মুক্ত করে শা-ফরিদ নেমে এলেন। তরবারিটি নিয়ে তিনি পাপিষ্ঠ যুবকটির দেহকে দ্বিখণ্ডিত করে দিলেন! এরপর তাঁর মুক্তি হল! বিষে বিষক্ষয় হল। সেই থেকে তিনি পীর। মানুষের পাপের, ব্যাধির, শোকের, দুঃখের যে যুবকদেহ পাপাচারে লিপ্ত হয় তাকে তিনি নাশ করেন।'

রাধা হঠাৎ আমার হাত ধরে টান দিয়ে বললে, 'এদিকে আসুন, দেখবেন।'

মা মনসার মন্দির। ওপরে একত্রে গাঁথা তিন-মুখী তিনটে ত্রিশূল। নিচে লেখা ওঁ শ্রীশ্রী৺মা মনসা। স্থাপিত সন ১৩৫৯ সাল। মন্দিরের গা থেকে খোলার চাল খানিকটা। তারপর টিন ছাওয়া। তার ওপরে লাউগাছ। ভেতরে বাসন্তী রঙের মনসা দেবী দণ্ডায়মানা। হাতে সাপ। গলায় শোলার অসংখ্য চাঁদমালায় তিনি প্রায় চাপা পড়েছেন। ব্রাহ্মণ নামাবলী গায়ে দিয়ে বসে ভক্তদের মিষ্টান্ন, ফল, প্রসাদী নিয়ে নাম ঠিকানা লিখে দিচ্ছেন হাঁড়ির গায়ে। তারপর একটি বছর-চোদ্দ বয়সের ফ্রক-পরা মেয়ের হাতে হাড়িটি দিলে সে ঠাকুরঘরে রেখে দিচ্ছে। ব্রাহ্মণের দুটি মেয়ে নাকি কলেজে পড়ে। উলুবেড়েয় তাঁর স্থায়ী বাস। নাম শ্রীকাশীনাথ ত্রিবেদী। তাঁর পিতৃদেব ৺ক্ষুদিরাম ত্রিবেদীও মায়ের সেবা করে গেছেন। পীতাম্বর বাগের বংশধর গৌর-যুগল-কানাই বাগ—এঁরাই এখন এই মন্দিরের লভ্যাংশের মালিক। তাঁরা ব্রাহ্মণ, কথক, কর্মকার, ঢুলী, সেবক সবাইকে একটা করে নির্ধারিত অংশ দেন।

মন্দিরের একদিকে দুটি লোক বসে বসে দক্ষিণা নিচ্ছেন। পেটে দরকার হলে ছেঁকা দিচ্ছেন। একটি লম্ফ জ্বলছে। যারা মন্দিরের পেছনের পুকুর থেকে স্নান করে চাল আর খেসারী কলাই ভাজা চিবুতে চিবুতে এসে দাঁড়াচ্ছে তাদের একটু ন্যাকড়া ছেঁড়াতে ওষুধ পাকিয়ে নিয়ে সুতো দিয়ে বেঁধে দিচ্ছেন গলায়। বলে দিচ্ছেন, 'একদিন পরে রোগীকে পুঁটিমাছের অম্বল রান্না করে খাওয়াবে। একমাস পিঁয়াজ, মাংস, কাঁকড়া, ডিম খাবে না। ভাল হয়ে গেলে মানত দিয়ে যাবে।'

রাধা যে দৃশ্য দেখতে ডেকে এনেছিল সেটি বড় মর্মন্তুদ! তার দিদি এবং আরো কয়েকটি বউ ঘাট থেকে ডুব দিয়ে উঠে সাষ্টাঙ্গে মাটিতে শুয়ে পড়ে পড়ে মন্দিরের চারদিকে গণ্ডি দিতে শুরু করেছে। অনেক মেয়ের গায়ে ব্লাউজ নেই, পরনে সায়া নেই। ভিজে কাপড়চোপড় সরে যাচ্ছে, উঠে আবার টেনেটুনে নিচ্ছে। মন্দিরের দিকে চোখ মুখ ফিরিয়ে মায়ের উদ্দেশে নাকমলা, কানমলা খেয়ে আবার মাটিতে লম্বা হয়ে শুয়ে দুহাতে প্রণিপাত করছে। মাটি স্যাঁৎসেতে কাদা হয়ে গেছে। পাথরকুঁচি খোলাভাঙা চার-দিকে ছড়িয়ে। যাদের গণ্ডি দেওয়া হয়ে গেছে তারা পুকুরে স্নান করে

উঠলে তাদের সোয়ামীরা শাড়ির একপ্রান্ত ধরে আছে আর একপ্রান্ত পরে নিচ্ছে মেয়েরা।

কৃষ্ণাদিদির কষ্টে রাধার চোখে জল এসে গেল! তার বোনপো-টা মরলেও বোধহয় এত কষ্ট পেত না সে। দিদি থরথর করে কাঁপছে। দাদাবাবু এ দৃশ্য দেখতে না পেরে সরে গেছেন। দিদির সাত বেড় মানসিক! তিন-চারদিন আর জ্বরে হুঁশ থাকবে না! এমন করে কি কেউ মানসিক করে? ছেলের জন্যে মা সব করতে পারে। অথচ বড় হয়ে এই মায়েদের কি মর্যাদাই না দিই আমরা!

রাধার দিদির দশা দেখছিলাম, তার লজ্জা হচ্ছে দেখে সরে এলাম।

সাড়ে বারোটার পর পুজো আরম্ভ হল। যার যার মিষ্টির হাঁড়ি আর প্রসাদী ফেরত পেলে। কৃষ্ণাবউ স্নান করে এলে শ্রীপতিবাবুরা আটচালায় বসে মুড়ি খেতে খেতে সাধন মাইতির কথকতা শুনছেন। রাধা আমাকে তাদের খাদ্যে ভাগ বসাবার জন্যে ডাকলে। আমি মাফ চাইলুম। কারণ বউটি অর্থাৎ তার দিদিটি বড় লাজুক। যদিও ঘোমটার আড়ে তার মুখচোখে তখন এক দিব্য প্রশান্তির হাসি!

সাধন মাইতি ঢোল-কাঁসির বাজনা আর লোকজনের কলকোলাহলের মধ্যেই চিৎকার করে গাইছেন :

'লোহার বাসর বেঁধে এক থাকে লখিন্দর।
মা মনসা পাঠায় সেথা নাগিনী বিষধর।
কালনাগিনী দংশাইল লখিন্দরের পায়ে।
বেহুলা সতী যাঁতি মারে সেই নাগিনীর গায়ে।
মৃত স্বামী ভেলায় নিয়ে ভাসে বেহুলা সতী।
তার স্বামীরে বাঁচায় পুনঃ মনসা দয়াবতী॥

এরপর হাঁসবলি, পাঁঠাবলি শুরু হল।

শম্ভু কর্মকার কাতান তুলে হাঁসের ধড়ের কোল থেকে এক কোপ মেরে কেটে নিচ্ছে। মুণ্ডুগুলো সবই তার। তিন আনা করে বিক্রি করবে সে। পাঁঠা বলি দিচ্ছে 'জয় মা মনসা' বলে তার ভাই সতীশ কর্মকার। মুণ্ডুটা তার পাওনা। কাজেই যতখানি এগিয়ে নিতে পারবে তারই লাভ। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছিটকে পড়ে পড়ে জায়গাটা লাল হয়ে গেছে। অন্য জীবন্ত বলির পাঁঠা-গুলো ভয়ে ব্যা-ব্যা করে ডাকছে।

গিয়াসউদ্দিন কাজীর কাছে চলে এলাম। তিনি রোজা করা সত্ত্বেও মতিহার তামাকের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি-করা মিশি দিচ্ছেন ঠোঁটের কোলে! গ্রামের অনেক মুসলমান মেয়েরা অবশ্য তাই করে। এতে রোজা না হবারই কথা। কাজী সাহেবকে নিতান্ত সহানুভূতির জন্যই বললাম, 'দিন তো দেখি আমার ছেলেটার জন্যে কিছু সিনি, তার টনসিল হয়েছে, ভাল হয় কিনা দেখব।' কাজী সাহেব থানের খানিক মা নিয়ে বাতাসা গুঁড়ো করে দিলেন। কুড়িটা পয়সা দিলাম। তিনি কতকগুলি বাতাসা আর শক্ত বরফি দিলেন শালপাতায় মুড়ে। যারা মনসার পুজো দিচ্ছে তারা শা-ফরিদেরও মানত দিয়ে যাচ্ছে। মুসলমান মেয়েরাও তাই। মা মনসার মন্দিরের চারপাশে মুসলমান মেয়েরা গণ্ডি দেয় কিনা শুধোতে কাজী সাহেব বললেন, 'না। তবে শা-ফরিদের এই মাজারের চারপাশে গণ্ডি দেয়।'

'আপনাদের হাঁস বা পাঁঠা দিলে কি করেন?'

'আমরা বলি দিই না, ছেড়ে দিই ওই মাঠে। পরে ধরে নিয়ে যাই। যারা বৈষ্ণব তারা বলি না দিয়ে মনসার পুকুরে হাঁস ছেড়ে দিয়ে যায়।'

শত শত যাত্রী। প্রাগৈতিহাসিক আচার অনুষ্ঠান। খাদ্যের বিধিনিয়ম পালনে কিছু ফল হলেও মানসিক তেজ তাদের ইষ্টসিদ্ধির হয়তো কিছুটা সহায় হয়, নতুবা এত লোক আসবে কেন? আর বাঙালী মুসলমানদের যে অংশের হিন্দু থেকে উৎপত্তি, প্রাথমিক জীবনের আত্মীয়তা আজো ভুলতে পারেনি বলেই শুধু এখানে কেন অনেক হিন্দু দেবদেবীর থানের পূজা-আচ্চাতেও তাদের শরিক হতে দেখা যায়। দেশ যখন সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জর তখন মা মনসা আর বাবা শা-ফরিদের এই সহ-অবস্থান বেশ একটি তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার। এ এক চমকপ্রদ তীর্থ—যেখানে কোনো সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের বালাই নেই।

কাজী সাহেব বললেন, 'যে এই মনসা শা-ফরিদকে অবজ্ঞা করবে তাকে কালশাপে খাবে অথবা বাবার তরবারি পড়বে তার গর্দানে!'

শ্রীপতিবাবুদের আসতে দেরি হবে, তাই নমস্কার জানিয়ে চলে আসছিলাম, রাধা সামনে এসে বললে, 'চলে যাচ্ছেন!'—বলেই সে আমাকে গড় করলে।

আশীর্বাদ করে বললাম, 'বালিকা, তোমার দেবদ্বিজে অচলা ভক্তি হোক।'

সে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বললে, 'কলা।'

নৌকোয় এসে উঠলাম। যাত্রীরা ফেরত চলেছে ওপারে। অপরাহ্নের নদী রহস্যময় রূপ ধারণ করেছে। ভাঁটার টানে গলা রুপো কিংবা পারার মতো যেন টগ্‌বগ করে ফুটছে তখন। ঝিলমিল ঝিলমিল করছে। ঠিক যেন রাধার দিদি কৃষ্ণার ছেলের অসুখ ভাল হবার পর কঠিন আয়াসসাধ্য ব্রত-সমাধা-সিদ্ধির এক চরম প্রশান্তি! মায়ের মুখের পবিত্র স্বর্গীয় হাসি! বড় রহস্যময়!

কাবুলিওয়ালা

বাপের 'ছাদ্দ', মেয়ের বিয়ে, চাচার সাথে মামলা, মেয়েমানুষের ডেলিভারি-কেস, গরিবের ঘোড়ারোগ শখ-হলে-ভোটে-দাঁড়ানো—এসব ব্যাপারে টাকা চাই। টাকা নেবার লোকের যেমন অভাব নেই, দেবার লোকের তেমনি অভাব আছে এমন ধারণা ঠিক নয়। প্রথমটি শর্তসাপেক্ষ না হলেই ভাল, দ্বিতীয়টি অবশ্যই শর্তসাপেক্ষ। সেজন্য টাকার যাবার পথটি বড় পিছল, আসার পথ বড় দুর্গম এবং বন্ধুর।

সেই দুর্গম ও বন্ধুর পথের গিরিসংকট খাইবার উপত্যকা পার হয়ে এদেশে এসেছে আমাদের দুর্দিনের বন্ধু কাবুলিওয়ালারা, সঙ্গে কিছু হিং আর 'কোহনুর' পাহাড়পোড়া সুর্মা নিয়ে। শহরে, শহরতলীতে, শিল্প-অঞ্চলে যারা আগে থেকে এসে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসে আছে তাদের কাছে নিতে হয় প্রাথমিক আশ্রয়, আর্থিক সাহায্য, ব্যবসায়িক বুদ্ধিফিকির, ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষা উর্দু হিন্দী বাংলা শিক্ষা—আর সেই সঙ্গে সুর্মা-হিং বিক্রি করে যৎকিঞ্চিত রোজগারদারী। কোথায় কাবুল, কান্দাহার, হেরাক, মাইমানা, মুসাকালা, ঘিলুজাই, তাইরাম, গজনী আর কোথায় দিল্লী, বোম্বাই, বাঙ্গালোর, পাটনা, কলকাতা, শিলং—সর্বত্র চলন্ত 'আফগান ব্যাঙ্ক' মাথায় চল্লিশ গজ কাপড়ের পাগড়ি জড়িয়ে লম্বা আলখাল্লার ওপর ফুচকে ওয়েস্ট কোট এঁটে, দশ গজ কাপড়ের শালোয়ারী পাজামা পরে, পায়ে ঠাকুরদাদার আমলের হাজার তাপ্পিমারা পেরেক ঝুনঝুন-করা পাঁচ সেরি চপ্পল লাগিয়ে ডাণ্ডা হাতে নিয়ে কারখানার গেটের পাশে বসে থাকা—লোক চেনা, তাদের পাকড়াও করা, ঝগড়া-বচসা করে ভয় দেখিয়ে সুদ আদায় করা—বিচিত্র এক জীবন! পঁচিশ বছরের জোয়ান যুবক—সাদীর পর

বউ রইল মুলুকে পড়ে আর চোখের জল মুছতে মুছতে কারো সঙ্গে চলে এল টাকার দেশ, সোনার মুলুক ভারতবর্ষে। কষ্টসহিষ্ণু পাহাড়ী জাত। এসেছে ব্যবসা করতে। সঙ্গে আছে পাশপোর্ট—নাম-ধাম লেখা। মহামান্য রাজার অনুমতি স্বাক্ষরিত শীলমোহর মারা। তারা কী ব্যবসা করতে আসে?

টাকা খাটাতে। সুদ খাটাতে। টাকার বাচ্চা বার করতে। ধর্ম কাবুলীদের ইসলাম। ইসলামের বিধানে সুদ খাওয়া মহাপাপ। সে পাপের শাস্তি 'জাহান্নাম' নামক নরকভোগ। এসব জানা সত্ত্বেও মুসলমান হয়েও কাবুলীরা সুদ খায়। ইসলামে বারণ থাকলেও মুসলমানরাই সুদের ব্যবসার শিকার হল এই বড় দুঃখের। সুদ খাওয়া যে মুসলমানের জন্য কতটা খারাপ মিলাদ মহিফলে পেশাদার এক মৌলভীকে বয়ান করতে শুনেছিলাম এই রকম ক্ষুদ্র একটি কাহিনী :

'একটি মেয়ে তার একমাত্র ছেলের ব্যারামে হঠাৎ আল্লার কাছে মানসিক করে বসে যে সে 'গু' খাবে যদি তার 'ছাওয়ালে'র অসুখ ভাল হয়ে যায়! আল্লা তাকে পরীক্ষা করবার জন্যে তার ছেলের অসুখ ভাল করে দিলেন। কিন্তু বেটি আর কিছুতেই ঐ মানসিকের দ্রব্যটি খেতে চায় না! কিছুদিন গত হলে সে স্বপ্ন দেখে, তার ছেলের আবার ব্যাধি হবে যদি প্রতিজ্ঞা পালন না করে। তখন মেয়েটি নাচার হয়ে একজন বিখ্যাত পীরসাহেবের কাছে বিধান চাইলে তিনি বলেন, 'যে-কোনো সুদখোরের বাড়িতে মেয়েটিকে একবেলা আহার করতে বলুন, তাহলেই তার মানসিকের অভীষ্ট দ্রব্যটি ভক্ষণ করা হবে।' কাজেই বুঝে দেখুন, সুদখোররা গরিবের চোখের পানি ফেলা, বাস্তুভিটে হারানো টাকার বিনিময়ে যে খাদ্য ঘরে এনে খায় তা কি চীজ!'

ইসলামে প্রথম এবং ক্ষমাহীন পাপ 'শেরক'। আল্লার অংশীদার দাঁড় করানো। দ্বিতীয়, 'জেনা'—অবৈধ নারীসংগম। তৃতীয়, সুদ। তারপর নর-হত্যা, মিথ্যাকথন, বেইমানী ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু সুদ যে হারাম একথা বিরলাপুরের বিখ্যাত পুঁজিদার কাবুলিওয়ালা গোলাম হোসেনকে বললে সে বলে, 'হামারা তো ব্যাওসা কার। আদমী কো উব্‌কারে রুপেয়া দেতা হায়! নজরানা লেতা হায়!'

'কেত্‌না লেতা হায়?'

'রুপেয়া মে চার আনা। এক মাহিনা মে চার আনা। দো আনা হামারা দালাল লেগা, দো আনা হামভি লেগা। খুদ আপ লোক লেগা তো দো আনা

লাগে গা। দালাল আদমী পাকড়কে লায়ে গা তো চার আনা দলিলমে লিখা-পড়হা হোগা। সমঝে ?'

নৈহাটি, জগদ্দল, ইছাপুর, কাদাপাড়া, বেলঘরিয়া, বরানগর, দাশনগর, শুঁড়া দমদম, বাউড়িয়া, মেটিয়াব্রুজ, বজবজ, বিরলাপুর—কোথায় কাবুলিওয়ালার অভাব ? যেখানে চটকল, সুতোর কল, কারখানা—অল্প পারিশ্রমিকের শ্রমিক-মজুরের গাদাগাদি—সেখানেই বাজারের পাশে, গেটের ধারে সারি বেঁধে শকুনের মতো বসে আছে কাবুলীরা। আগে ইংরেজ আমলে এরা চাষীবাসী শ্রমিকদের বাড়িতে এসে রীতিমতো মারধোর করত। খাতক না থাকলে তার বউকে বলত : 'এ্যায় বিবি 'ভাতাল' আয়া, ভাত লাদ, খানা পাকা ! উ-শালা ভাগা হ্যায়। আজ রাতমে তুমার গরে হামি থাকবে। তুমারে লিয়ে আসনাই করবে। হাম্‌কো মাফিক তাজা লেড়কা হোবে।'

এখন আর অদ্দূর যায় না। দিনকাল পালটেছে। কাবুলিওয়ালাকে মার দেবে। তাই তারা নতুন কৌশল আরম্ভ করেছে। কিছু কিছু দালাল পুষে রেখেছে। সেসব লোক এদেশীয়। বাঙালী মুসলমান। তারা এসে সুদ আদায় করে নিয়ে যায়। তার দু-আনা, কাবুলীর দু-আনা। কাজেই কাবুলীকে মারতে গেলে তার পোষা দালালরা তোমাকে 'দোরস্ত' করে ছেড়ে দেবে। থানায় গিয়ে কাবুলী দারোগাকে কিছু 'ইনাম' বা নজরানা দিয়ে সাক্ষী-সমেত কেস ঠুকে দিয়ে আসবে।

খাতকদের কাছে কাবুলিওয়ালাদের প্রথম ভাষা হল : 'আছল মৎ দেও, 'ছুদ' মিটা দো।'

যে টাকা নিয়েছে তার ভাইয়ের সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায় তবে জনাব গোলাম হোসেনই বলবে, 'তুমি আচ্ছা আদমী আছ, লেকিন তুমহার ভাই, ওশালা হারামী-কা বাচ্চা আছে।'

আর মজা দেখবার জিনিস হল, ওদের দেশ থেকে অথবা দূর থেকে কেউ পরিচিত আত্মীয় এলে দুজনে মিনিট পনেরো ধরে, হাতে হাত দিয়ে অত্যন্ত দ্রুত এবং অনুচ্চস্বরে দোওয়া-দরুদ পাঠের মতন পোস্ত মিস্ত বাঁ ফুবিল মাঁনুহা নি তুং বিঁ জাঁ ইত্যাদি কি যে সব ফারসী না পস্তু বলে তা খাস কাবুলী অথবা আল্লার ফেরেশ্‌তা ছাড়া কার বাপে বোঝে !

কিন্তু চিত্রটি বড় হৃদ্য এবং উপভোগ্য।

গোলাম হোসেন খাস কাবুল শহরের আদমী। ফারসী ভাষায় দোসরী

কিতাব পর্যন্ত তার দস্তুর মতন পড়াশুনো আছে। সুর্মা-টানা দীঘল চোখ। বাঁশির মতো নাক। লাঠির মতো পাতলা তড়পি চেহারা। দাড়ি গোঁফ কামানো। মাথায় বাবরি চুলের ওপর জরিদার পাগড়ি। হাতে একটা রুল-বাড়ি। মাঝে মাঝে শিশির ঘোষের চা আর মিষ্টির দোকানে তাকে সরব অভ্যর্থনার মধ্যে এসে বসতে দেখতাম। সাহিত্য রাজনীতির সংলাপ বন্ধ করে শিশির ঘোষ গোলাম হোসেনের দিকে মন দিতেন। 'আফগান চা' দিতে বলতেন। দাম ত্রিশ পয়সা। চায়ের ওপর একটা স্বর্ণাভ সর পড়ত আর ফ্যানের হাওয়ায় তা মৃদু মৃদু কুঞ্চিত হয়ে কাঁপত। দ্রব্যটি লোভনীয় কিন্তু দু-চারদিন খাবার পর ধরা গেল—অম্বল ঢেকুর মারতে। নারকোল দুধের 'এই আফগান টি' সম্পূর্ণ শিশির ঘোষের আবিষ্কার। একেবারে ট্রেডমার্ক !

শিশিরবাবু বলেন, 'বেটা আফগানী বুদ্দুরা খুব খুশী। তাদের নামের চা যে!' শিশিরবাবু তাদের সঙ্গে টাকা দেওয়া-নেওয়ার ব্যবসাও করতেন। খাতক মক্কেল ধরতেন। দু-আনা দালালী নিতেন। সেই থেকে তাঁর নিজেরও সুদের মূল ব্যবসা চলছে। এক লাখ টাকার ইনসিওরেন্স-মেম্বার করে দেবার পর তিনি মাসিক একটা লভ্যাংশ পান। কিছুদিন যুদ্ধে ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের সুপাঠক এবং সমালোচক। রাজনীতিতে একটা মার্কা থাকলেও সুযোগমতো অন্য মার্কা হতে তাঁর আপত্তি নেই। তাঁর সংলাপ খুবই উপভোগ্য এবং বুদ্ধিতীক্ষ্ণ।

গোলাম হোসেন আমার সম্বন্ধেও হাঁড়ির খবর রাখে জেনে বিস্মিত হলাম। শুধোলাম, 'তুমি লেখাপড়া জানো ?'

সে বললে, 'হাঁ জানি। তুমি কত লেখাপড়া জানো তাও জানি। তুমি 'কিতাব' লেখ। শায়েরী করো। তুমার শ্বশুরের নাম আহমদ আলী মণ্ডল। বেগমের নাম আসিয়া খাতুন। বাড়ির ঠিকানা : গ্রাম—সাতগাছিয়া, পোঃ—বাওয়ালী, থানা—বজবজ, জিলা—২৪ পরগণা।'

শিশিরবাবু হাসতে লাগলেন। এসব তাঁরই কারসাজি।

বললাম, 'এ বেটা পাঠান বোকা নয়।'

গোলাম হোসেন বললে, 'বোকা তুমরাই আছ। হামারা এই ভারতবর্ষ চারশো বরস শাসন করেছি। হামারা তুমাদের জানি।'

এই পাঠান! আলাউদ্দিন খিলজীর বংশধর! কে আর তা অত মিলিয়ে মনে রেখেছে যে ওরা একদিন আমাদের রাজা ছিল!

গোলাম হোসেন তার হাতের ঘড়িটা বার করে দেখলে। ঘড়িটি দামী। বললে সাড়ে সাতশো টাকা দাম।

শুধোলাম, 'তোমরা গরুর গোশ্‌ত খাও?'

সে বললে, 'ও-চীজ, চামার আদমী খাতা হ্যায়!'

শিশিরবাবু আবার হাসতে লাগলেন। তিনি বললেন, 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্যাটায়ার মনে আছে? তাঁকে কে যেন শুধোয়, 'মুসলমানদের সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?' তিনি বলেন, 'মুসলমানরা আর সবাই ভাল, কিন্তু যারা গরু খায় তারা নরাধম!'

কাবুলিওয়ালা গোলাম হোসেন বঙ্কিমবাবুর চাইতেও নির্দয়! কারণ বঙ্কিমবাবু রসিকতা করেছেন আর কাবুলিওয়ালা তার সিদ্ধান্তের কথা বলেছে।

কাবুলী গোলাম হোসেন খাসীর মাংস, চাপাটি, দুধ, কলা, ডালিম, আপেল, খেজুর, ডিম, পোলাও, কোর্মা খায়। তার রোজগার অনেক। প্রায় তিন লাখ টাকা তার নাকি ভারতের পঁচিশটা শহরে খাটছে। সে কাবুলিওয়ালাদের কর্জ দেয়। বাংলামুলুকের কয়েকটি শিল্প-অঞ্চলেই মাসিক সুদ সে যা পায় তার পরিমাণ প্রায় চার হাজার টাকা।

শিশিরবাবু বলেন, 'গোলাম হোসেন ভারতে আসে সতেরো বছর বয়সে। ওর বাবার চারটে বিয়ে। শেষ পক্ষের ছেলে ও। প্রথম পক্ষের ছেলে, ওর প্রায় বাবার বয়সী, সে ভারতে এসে কয়েক হাজার টাকা সুদের ব্যবসায় ঢেলে রেখে দেশে গিয়ে হঠাৎ মারা যায়। মারা যাবার কারণ সে এখান থেকে এক দুরারোগ্য যৌনব্যাধি নিয়ে যায়। কাবুলে তার অতি আশ্চর্য রকমের এক প্রতিকারের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। পাপের শাস্তির জন্য তাকে কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে রাখার বিধান দেয় সমাজের মৌলভীরা। তাকে খাওয়াতে যেত আর প্রদীপ জ্বেলে সারা রাত তার বউ সামনে বসে থাকত। স্ত্রীকে পাবার কি চরম আকুলি-বিকুলি! তারপর লোকটা সাতদিন পরে মারা গেল। সে মারা গেলে গোলাম হোসেন এসে তার ব্যবসার হাল ধরে। এখন সে বহু লাখ টাকার মালিক। আমার সঙ্গে দারুণ ভাব, গোলাম হোসেনকে পরীক্ষা করার জন্যে জপাই, কোনো রাতের মোহিনীর কাছে নিয়ে যাবার জন্যে। সে শুনলেই তৌবা তৌবা করে। তার দাদার ট্রাজিডির কথা তার স্মরণ হয়ে যায়। বছর পাঁচেক ছাড়া দেশে যায় একবার করে। হিং খেয়ে খেয়ে সংযম করে। দেশে কাবুল সিটির ওপরে গোলাম হোসেন দেড় লাখ

টাকা খরচ করে আধুনিক প্যাটার্নের ইমারত করেছে। বাদশাহ্ জহির খাঁকে গৃহপ্রবেশের দিনে নিমন্ত্রণ করে এনেছিল। ওর বড় ছেলে এখন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে।'

শেষ সংবাদটির জন্য আমি গোলাম হোসেনের সব অপরাধ বোধহয় ক্ষমা করেছি।

তাকে নৃশংস বলেই জানতাম। ব্যাপারটি শিশিরবাবুও সম্ভবত জানেন কাবুলীর মারফতে। সেই সূত্রেই গোলাম হোসেন আমার ঘরের খবর জানে। বেগমের নাম পর্যন্ত! বেগমের আব্বাজান তাঁর মধ্যম পুত্রের মাথায় নারকোল পড়ে যাওয়াতে এবং তাঁর সহধর্মিণীর জীবনসংশয়ী 'হেমোরেজ' ব্যাধিতে অনন্যোপায় হয়ে ঐ গোলাম হোসেনের কাছে ঋণ গ্রহণ করেন। পাঁচ শত টাকা—টাকায় চার আনা করে মাসিক সুদ। তাহলে পাঁচশো টাকায় একশো পঁচিশ টাকা সুদ হয় প্রথম মাসেই। দিতে পারলেন না। চক্রহারে তা বৃদ্ধি পেতে লাগল। চক্রহার হল, দিতে না পারলে মাসিক সুদটা মূলধনের সঙ্গে যুক্ত হবে। তার মানে এক মাসেই ছ শো পঁচিশ। দু-মাসে সাতশো একাশি টাকা চার আনা। মাঝে মাঝে তিনি দু-চারশো টাকা দেন তালপাতা, নারকোল, ধান বা ছোটখাটো দু-এক টুকরো জমি বিক্রি করে, বন্ধক দিয়ে। কাবুলী পীড়ন করলে অন্য কাবুলীর কাছ থেকে দেনা করে হয়তো কিছু দিয়ে দিলেন। কত থাকল, দেনার দায়ে মাথা গরম অবস্থায় হিসেব করে কে আর তার কূল পায়? হিসেব করতে গেলে দিন রাত বয়ে যায়। সংসার খরচা আছে, তাঁর শ্যালক একজনের কলেজের মাইনে দিতে হয়। জামাইয়ের কাছে প্রতিশ্রুত জিনিসপত্র আর দেওয়া হয়ে ওঠে না। সব জমি পুকুর বন্ধক হয়ে যায়। ঘরের খোরাকী ছাড়াও দু-দশ মণ ধান যে বিক্রি হত, সে সব তো গেলই, উপরন্তু খোরাকীতে টান পড়ল। মিলের কাজ বন্ধ হল, পথে কাবুলীরা ধরবে। অপমান করবে। দাড়ি ধরে নাড়া দেবে। অগত্যা কারখানার কাজের 'সারভিস' ফাণ্ড তুলে নিয়ে কাবুলীকে দান করতে হল। অন্য কারখানায় বদলিওয়ালা সাজতে হল। ছেলে তিনটে নতুন 'ওয়াডলুমে' কাজ শিখে কাজ পেতে কিছু সুরাহা হল। তিন চার হাত ফিরি করে বন্ধক দেওয়া জমিগুলি বিক্রি করে সহসা কাবুলীর সঙ্গে মারামারি করার পর থানা কেস ইত্যাদি হয়ে শেষ পর্যন্ত চার হাজার পাঁচশো টাকাতে রফা হল।

গোলাম হোসেন এ হেন শ্বশুরের জামাইকে চিনবে না আবার! সে দেখা হলেই সাইকেল থেকে নামে। সালাম জানায়। চা খাওয়ায়। তার ছেলের পড়াশুনোর খবর নিই। ছেলের কথা বললেই সে অন্যমনস্ক হয়ে যায়। হাতে হাত চেপে খানিকটা চুপ করে থাকে। তারপর হঠাৎ গর্জে ওঠে: 'ছেলের কথা তুমি বোলো না ভাইসাহাব। দুসরা বাত বোলো। উ হারামজাদা আছে। আংরেজি শিখে বদ-বখত হোয়ে গেছে। মেম সাদি কোরেছে। চিঠঠি দিয়েছে বাদশাহ জহির শাহ্ তাকে ভারতে 'অ্যামবাসাডর' কোরে পাঠাচ্ছেন! হামি ভারত ছেড়ে চলে যাবো।'

গোলাম হোসেনের চোখে জল টলটল করে। ক্ষোভে দুঃখে ফুলতে থাকে। সে বলে, 'হারামের পয়সাতে মানুষ, হারামী তো হোবেই সাহাব। এ আল্লার বিচার।'

'তবে এই সুদের ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে দেশে চলে যাও না। এত টাকা কি হবে তোমার? আর ছেলে বিলেত-পাস করে মেম বিয়ে করেছে তো কি! মেমরা কি মানুষ না?'

'হাঁ সাহাব মানুষ তো আছে, লেকিন···ও দোনো ভি সুরা খাতা হ্যায়—মদ খাতা হ্যায়।'

'তুমি সুদ খাও আবার নামাজ পড়ো!'

'হামি পাপ করি আউর উসুল দিই।'

'তোমার ছেলে 'সরাবন তহুরা' পান করে কেন জানো, ওটি বেহেশ্‌তে গেলে প্রচুর পরিমাণে পাবে আর তার সদ্ব্যবহার করতে না পারলে খোদা ব্যাজার হবেন, তাই বোধহয় দুনিয়াতে সুরাপান করে অভ্যাসটা রপ্ত করে নিচ্ছে।'

কাবুলী হেসে উঠল। হা—হা—হা···

হঠাৎ সে আমাকে বিস্মিত করে বললে, 'না সাহাব, আমার ছেলে নাই, উসব ঝুটা বাত! শিশিরবাবুকে হামি মিছা কথা বানিয়ে বলেছিলাম। হামি দেশে নাই, কে হামার ছেলে তৈয়ারি করবে?'

বললাম, 'তেমন লোকের বড় অভাব বুঝি তোমাদের দেশে?'

গোলাম হোসেন চোখ ট্যারা করলে আমার দিকে।

সে উঠে চলে যাচ্ছিল। তার আলখাল্লা চেপে ধরলাম।

'সত্যি, তোমার ছেলে নেই?'

তখন গোলাম হোসেন তার সাতখানা জামার ভেতর থেকে বিলেতের একটা চিঠি বার করে দেখালে। ভেতরে ফারসী লেখা। ঠিকানা নাম ইংরেজিতে। ওর ছেলের নাম দীলওয়ার হোসেন! এই সেই ভুর্ভেদ্য দুর্বোধ্য ফারসী ভাষা, যে ভাষায় কাব্য লিখে গেছেন ফেরদৌসী, শেখ সাদী, হাফিজ, ওমর খৈয়াম!

বললাম, 'দেখো ব্যাটা কাবুলী, এই ছেলের সঙ্গে তুমি বিরোধ করো না। তোমার সঙ্গে তার বনবে কেন? তোমাকে বাপ বলে যে এখনো সে পরিচয় দিচ্ছে সেইটাই তো তোমার পরম ভাগ্য। কোনো ইংরেজকে বাপ বলে যদি সে-দেশেই থেকে যেত কি হত? সুযোগ-সুবিধের জন্যে আধুনিক যুগে পিতৃপরিচয় পর্যন্ত গোপন করে, বদল করে মানুষ। আধুনিক কালকে মেনে নাও। তোমাদের দেশও অ্যাডভান্স হচ্ছে। একটা মেম এনে তোমাদের জাত করে ফেলছে সে তো তার ক্রেডিট।'

'মেম সাহাব কি মুসলমান হোবে?'

'মেয়েরা কি মুসলমান হয় কোনোদিন? তোমার বাপ মুসলমান, দাদা মুসলমান, তুমি মুসলমান, তোমার ছেলে মুসলমান, কিন্তু তোমার বউ মুসলমান নয়।'

'কাহে?'

'তার কি 'মুসলমানী' মানে'হাজামত' অর্থাৎ 'খৎনা' বা লিঙ্গচ্ছেদ হয়েছিল?'

কাবুলী হা হা হা করে আকাশ ফাটিয়ে হাসতে লাগল। এরপর সে চিঠিখানাতে চুমো খেয়ে মাথায় ঠেকিয়ে পকেটের মধ্যে তা পুরে নিয়ে চলে গেল।

কয়েকদিন পর ব্লক ডেভালপমেণ্ট অফিসে গিয়েছিলাম আমার ব্যক্তিগত একটি কাজের তাগিদে। বন্ধুবরেষু বি-ডি-ও রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তরুণ, অমায়িক এবং অত্যন্ত কর্মঠ ব্যক্তি। তার সঙ্গে চাষবাস, শিল্প, সংস্কৃতি নিয়ে আলাপে মশগুল ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম কয়েকজন কাবুলী এসেছে তাদের হিসেবপত্র দেখাতে। পাসবই আর লম্বা সরু হিসেবের খাতা হাতে। খাতায় সিরিয়্যাল নম্বর নেই। সবই ওদের ভাষায় লেখা। দেড় হাজার দু-হাজার টাকা মাত্র খাটাচ্ছে বলে সকলেই হিসেব দেখাচ্ছে। বি-ডি-ও বললেন, 'এসবের আমি কি বুঝব, ইংরেজি বা বাংলাতে লিখিয়ে আনো।' খাতাগুলোর পাতা খুলে নিয়ে নম্বর ফেলে আনতে পারবে সহজেই। ওদের ডবল খাতা থাকে। গোপনটাতে থাকে ২৫% সুদ দেবার লেখাপড়া। গোটা হাতের

ছাপ মারা। দ্বিতীয়টাতে থাকে মাত্র ৪%—যে হারে সেভিং ব্যাঙ্ক সুদ দেয়। ফিকস্‌ড্‌ ডিপোজিটের মতো হয়তো ৮% কারো কারো বা। মোদ্দা কথা ওরা ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেয় প্রায় সকলেই।

গোলাম হোসেনকে একদিন বলেছিলাম, 'আচ্ছা আমরা যদি দল বেঁধে তোমাদের এদেশ থেকে তাড়িয়ে দিই?'

সে বললে,' হামাদের আপলোক ভাগানেসে হামলোক ভি যাঁহা যাঁহা হামারা মুলুকমে হিন্দুস্থানকো কাপড়া-কাকারখানা হ্যায়—উসকো হঠা দেগা ভাগা দেগা।'

এই জোঁকেদের কোনো ল্যাজ নেই যে আছাড় মারা যাবে, নুনেও জব্দ হবে না—এরা আমাদের রক্ত আর নোনা ঘাম শুষেই জীবিকা আহরণ করে। তাছাড়া এই চলন্ত 'আফগান ব্যাঙ্ক'কে ধ্বংস করলে বাপের ছাদ্দের সময় আমাদের ছেলেরাই বা আমাদের ছাদ্দ করবে কেমন করে? তারপর আফগানের সঙ্গে আছে আমাদের ভারত সরকারের অকৃত্রিম মৈত্রী!

মাংস এবং কসাই

কাঁচা তাজা রক্ত!

এক কেজি নয়, দু-কেজি নয়, তিন কেজি নয়, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ—একশো কেজি দুশো কেজি—রক্ত! কাঁচা! তাজা! গড়িয়ে চলেছে থকথক করে একটা নালা বেয়ে!

স্বপ্ন দেখছিলাম। রকেটে চড়ে যেন পিছনের অতীতের সোনালী অন্ধকার-যুগে চলে গিয়েছিলাম। বেদ-এর বজ্রবাঁশরীতে মন্ত্রপাঠ হচ্ছে। বৈদিক রাজা রন্তিদেব, তাঁর গোশালার সন্নিকটে আমি দাঁড়িয়ে আছি। আর বধ্যভূমি থেকে রক্ত গড়িয়ে চলেছে। রক্তের নদী* বয়ে চলেছে। হাজার দুই করে গরু কাটা হচ্ছে রোজ। রাজ-অতিথিরা কচি বাছুরের মাংস খেয়ে পরিতৃপ্ত হবে!...মধুপর্ক দান করতে হবে তাদের।

* মহানদী চর্মরাশেরুৎক্লেদাৎ সংসৃজে যতঃ।
ততশ্চর্মন্বতীত্যেবং বিখ্যাতা সা মহানদী।
(মহাভারত—শান্তিপর্ব—১৯-২০)

'রামায়ণ মহাভারত যাঁরা লিখেছিলেন তাঁরাও কি গোমাংসভোজী ছিলেন? গোমেধ যজ্ঞ তখনো কি ছিল?' তারপর ঋষি মনুর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি দক্ষিণ ভারতে বিন্ধ্যাচলের সন্নিকটে একটি চিকিৎসক সম্মিলনীতে বক্তৃতা করছিলেন, 'গোমাংস হিন্দুদের জন্য নিষিদ্ধ। মহাপাপ। গোহত্যা ব্রাহ্মণ হত্যার সমতুল্য। কারণ ভারতীয় আবহাওয়ায় এই মাংস নিষিদ্ধ এইজন্য যে, এদেশের মানুষদের এ থেকে নানা রোগ জন্মায়। আয়ুর্বেদীয়গণ বলেছেন, এ থেকে কুষ্ঠ, যক্ষ্মা, চর্মরোগ, কৃমি, অম্লশূল, পিত্তবমন ইত্যাদি দুরারোগ্য ব্যাধি হচ্ছে। এবং গো-সম্পদও ধ্বংস হচ্ছে। কৃষিকাজের জন্য বলদের প্রয়োজন। এখন থেকে আমার বিধান, কোনো হিন্দু গোমাংস ভক্ষণ করলে মহাপাতক হবে। গরুর দুধ বৈধ। সে কারণে দুগ্ধদাত্রী গোধনকে মাতৃরূপে সেবা করবে।'

কাটা কাটা স্বপ্ন। এসব কি সত্যি? আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আবার স্বপ্ন দেখছি। বাটার কারখানার মধ্যে হাজার হাজার কর্মী চামড়ার জুতো তৈরি করছে। সিলেনডার ঘুরছে, সিঙ্গার মেশিন চলছে ঘরঘর শব্দে—লক্ষ লক্ষ জুতো তৈরি হয়ে বের হয়ে যাচ্ছে! এক ব্রাহ্মণ বন্ধু বললেন, 'মনুর কথা বাদ দিন তো মশায়! তাঁকে যদি হঠাৎ হাওড়ার পুলের ওপর তোলা যেত তিনি ভয়ে একটা বিধান দিয়ে যেতেন, বাছা হিন্দুর ছেলেরা, তোমরা যেন কস্মিনকালেও এই শূন্য ঝুলন-পর্বতটার ওপরে কেউ উঠো না কখনো!'

বন্ধুর হাসির লহরা ধরে হঠাৎ আমি বালিগঞ্জ আর শিয়ালদার রেল লাইনের ওপারে গিয়ে মুচিদের আড্ডায় পড়লাম। দুর্গন্ধে চোদ্দ-পুরুষের পেট থেকে অন্ন উঠে আসতে চায়। স্বপ্ন ছুটে গেল।

বড় বড় গরুর চামড়ার মধ্যে নুনজল ভরে সেলাই করে ঝুলনো রয়েছে হাজার হাজার। ট্যানিং হচ্ছে। ট্যানিং হবার পরে আসছে ফিয়ার্স লেনের কাছাকাছি সব চামড়ার জাব্‌নাদারদের গোডাউনে! মালিকরা সবাই মুসলমান। এখানে দুর্গন্ধের রাজ্য!

পঞ্চমবেদ মহাভারত* বর্ণিত রাজা রন্তিদেবের গোহত্যার রক্ত আজো গড়িয়ে চলেছে ট্যাংরায়, মেটিয়াব্রুজে, বাঁকুড়ায়, আখড়ায়, চন্দননগরে!

* রাজ্ঞো মহানসে পূর্বরন্তদেবস্য বৈদ্বিজ।
অহন্যহনি বধ্যেতে দ্বে সহস্রেগবাং তথা।

স্বপ্ন নয় তাহলে ?

কিন্তু মুনিঋষি মনুর কথা কি লঙ্ঘন হতে পারে ? যারা তাঁর কথা মানে না তারা যদি মুসলমান, খৃস্টান হয় তবে আর কি বলার আছে ? মনু তো মুসলমান খৃস্টান কী চীজ তা দেখে যাবার সৌভাগ্য লাভ করেন নি ? পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন তো ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখাচ্ছেন, হিন্দুরা বৈদিক যুগে প্রচুর গোমাংস ভক্ষণ করত।

'অহিংসা পরমধর্ম' বলে যে বৌদ্ধ অহিংস্রকরা তারাও যে মাছ-মাংস খায় না এমন নয়। তারা আইনের ফাঁক রাখে, বলে, মাছটা মেরে দাও। আর কসাইখানায় 'ডেড বডি সেলিং' তো হয়ই। হিন্দু থেকে বৌদ্ধ এবং বৌদ্ধ থেকে যারা মুসলমান হল, তারা টিকি ছেড়ে ন্যাড়া, ন্যাড়া ছেড়ে দাড়িতে এল কিন্তু হিন্দুরা এই ভাসমান পরগাছাদের ম্লেচ্ছ বলতে শুরু করলে। এরা গোমাংস খায়। তপশীলী অনেক হিন্দুও এদের সঙ্গে মুসলমান হয়ে মিশে গেল। মোগল-মুসলমানরা এসে পাঠান-মুসলমানদের ঠেঙাতে তাড়াতে লাগল। এদের শিক্ষার ব্যবস্থা কিছু হল না। ফলে এরা না হল মুসলমান না হল হিন্দু। 'নেড়ে' বিশেষণে কুখ্যাত হল বর্ণহিন্দুদের কাছে। দুঃস্থ দরিদ্র অশিক্ষিত অসহায় সেই সব মুসলমানরাই আমাদের অনেকের পিতৃপুরুষ। আমাদের শুনতে খারাপ লাগলেও এটা সত্য যে চীন দেশের হিন্দুরা আজো গরু খায় আর নিকোবর দ্বীপের মুসলমানরা খায় শূকর।

হিন্দুরা যা খেয়ে দেখে-শুনে খারাপ (?) জেনেই ত্যাগ করল তা আবার অন্য সম্প্রদায় খেতে গেল কেন ?

মুসলমানরা সব দেশেই গরু খায় একথা ঠিক নয়। মধ্যপ্রাচ্যের আরব, সিরিয়া, মিশর, ইরান, আফগানিস্তানে গরু নেই এবং তারা তা খায়ও না। ভারতের আবহাওয়ায় এ মাংস নিষিদ্ধ বলা সত্ত্বেও মুসলমান খৃষ্টানরা তা খেলো কি শুধু সম্প্রদায়গত ভিন্নতা রক্ষার জন্যে ?

পৃথিবীর আদি ধর্ম পৌত্তলিকতা। হিন্দু থেকে আমরা এসেছি এ কথা স্বীকার করতে লজ্জায় মাথা কাটা যাবার কি আছে ? ইহুদি থেকে খৃস্টান এবং

সমাংসং দদতো হ্যন্নং রন্তিদেবস্য নিত্যশঃ।
অতুলা কীর্তিরভবন্নৃপস্য দ্বিজসত্তম।
(বনপর্ব—২০৮।৮-১০।)

মুসলমান হয়েছে। হিন্দু থেকে বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, মুসলমান ইত্যাদি হয়েছে ভারতে। ভারতীয় মুসলমানদের বিশেষ করে বাঙালী মুসলমানদের পোশাক আচার চেহারা ভাষায় এখনো আধাআধি হিন্দুত্ব বর্তমান। তাই প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খাঁ বলেছিলেন, 'বাঙালী মুসলমানরা খাঁটি মুসলমান নয়।' কথাটা সত্য। পূর্ব পাকিস্তানের বিখ্যাত চিন্তাশীল সাহিত্যিক সৈয়দ মোতাহের হোসেন চৌধুরীকে আমি একবার চিঠি লিখে জানতে চাই তিনি 'চৌধুরী' হলে 'সৈয়দ' হন কেমন করে? তিনি লেখেন, 'কথাটি ভাববার। এবার থেকে আমি 'সৈয়দ' ত্যাগ করলাম। আমি 'বাঙালী' তাই 'চৌধুরী' হওয়াই স্বাভাবিক।'

আমরা যে হিন্দু ছিলাম তার চিহ্ন বর্তমান, কিছু কিছু সৈয়দ-বাড়ির বধূরা এখনো সিঁথিতে সিঁদুর দেন। অশিক্ষিত মুসলিম মেয়েরা মানত দিতে যায় হিন্দু দেবদেবীর পীঠস্থানে। কিন্তু গোমাংস ভক্ষণের কথা তুললে প্রায় মুসলমান যুবকই হিন্দুদের কাছে মিথ্যে কথা বলে।

যাহোক, এসব স্বপ্ন দেখছিলাম বুড়ো হেলে-গরুর মাংস খাবার পর পেটটা গরম হয়েছিল বলে। আমি গোমাংস ভক্ষণকারীদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে চাইছি না। কতকগুলি ব্যাপারে আমি প্রত্যক্ষদর্শী। দেশের কল্যাণে সেগুলো বলা দরকার।

যেসব মুসলমান বন্ধুরা মনে করেন মুসলমানদের ভারতে যথেষ্ট অধিকার দেওয়া হচ্ছে না আমি একটি ব্যাপারে তার প্রতিবাদ করি। আমাদের গ্রামগুলিতে আসুন, দেখবেন, 'ঘো-ই-স' শব্দ করে মাথায় গরুর মাংসের বাজরা নিয়ে চলেছে পাড়ায় পাড়ায় কসাইরা। যে গ্রামে শতকরা পঁচাত্তর জন হিন্দু সেখানেও। দশটা বাড়ি নিয়ে একটা মুসলমান পাড়া, সেখানে মোড়ের মাথায় গোমাংসের বাজরা নামিয়ে কসাইরা মাংস বিক্রি করছে দেড় টাকা সাত সিকে কেজি দরে। এ মাল আসছে উলুবেড়িয়ার হাট থেকে, খাপড়ের হড়মা-সার গরু, মরবার আগে জবাই করা। নিতান্ত শকুনের সঙ্গে আড়ি করে খাওয়া। পাড়ার লালমনের মা, সফুরার চাচী, জিয়াদআলী, গোলাম রসুল—সবাই কিনছে চুবড়ি ভরে। কালো কালো হাড়ে হয়তো পচানী গন্ধ উঠেছে। (পচা মাংস খাওয়া যায় না কিন্তু পচা মাছ খাওয়া যায়)। এই মাংসে মাইক্রোস্কোপ বসিয়ে দেখলে দেখা যাবে পোকা হয়ে গেছে। মাছিরা যেছেতা (জীবন্ত ডিম) ছেড়েছে। তবু এই সস্তাদরের মাংস গরিব চাষী-শ্রমিক মুসলমান পরিবার কে না কিনতে চায় যদি খাবার বিধান থাকে! তারা রসুন পিঁয়াজ আদা লঙ্কা

ঠেসে দিয়ে কড়ুয়া করে রান্না করে কপালে ঘাম ঝরিয়ে সেই হড়মা-সার মাংস চিবুতে চিবুতে শেষ পর্যন্ত অক্ষম হয়ে গিলে নেয়। ছোট ছোট ছেলেরাও কোঁৎ কোঁৎ করে গিলে নিতে থাকে। কেউ কেউ পরিহাস করে বলে, 'দেওয়ালে পা দিয়ে ছিঁড়তে হয়।' হিন্দুরা ঠাট্টা করে বলে, 'বাবলার গাঁট!' অর্থ শক্ত মাল।

কিন্তু গ্রামের হিন্দুদের এতে আপত্তি নেই। নাকে কাপড় দিয়ে চলে যায়। এমন কি কোন হৃদ্য বন্ধু হলে বলে, 'নেবে নাকি হে দু-কেজি?' তারা হাসে। আগে হলে কাটাকাটি বেধে যেত। বছর পঁচিশ আগে মুসলমানদের হিন্দুরা কেউ ছুঁতো না। অস্পৃশ্য ভাবত। এখন মোড়ে মোড়ে মুসলমানদের চা-দোকান। তাতে অবাধে হিন্দুরা চা খাচ্ছে। সবাই এক গেলাসের ইযাব।

কমিউনিস্ট হিন্দু বন্ধুরা গোমাংস খাচ্ছেন। কলকাতা শহরে সংস্কারহীন অসংখ্য শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী হিন্দু তরুণরা শিককাবাবের পরম ভক্ত। একজন যশস্বী তরুণ হিন্দু সাহিত্যিক আমাকে বলেছিলেন, 'গোমাংসের বিরুদ্ধে কিছু লিখবেন না মশাই, আমরা রোজ খাচ্ছি। ডাল-ভাতের চাইতে মাংসভাত বরং সহজপাচ্য।'

আমি আতঙ্কিত হয়েছিলাম তাঁর কথায়। কেননা এঁরা নতুন খাইয়ে। ভালমন্দ চেনেন না। শহরের অধিকাংশ পচা মাল। বরফে ঢোকানো থাকে। সেই সব ছাঁটমাল যায় হোটেলে।

সাবধান না করে এই সব প্রতিভাধরকে কি বিপদে ফেলব! আধুনিকরাও খাচ্ছেন। ফলে ভাল টাটকা গোমাংসের দাম হয়েছে তিন টাকা কেজি। ডাক্তারবাবুও বিধান দিচ্ছেন, 'খাও না, অনেক প্রোটিন আছে।'

এক বিশিষ্ট হিন্দু বৈজ্ঞানিকের একটি চিঠি আছে আমার কাছে। তিনি লিখেছেন, 'হিন্দুরা গরু খেলে মার্কিনদের মতো হতে পারত।'

কিন্তু আমার একটি ব্যাপারে আপত্তি আছে। গরুর মাংস—যেসব সস্তা মাংস গ্রামাঞ্চলে বিক্রি করতে আসে সেগুলি 'হারাম' অর্থাৎ অপবিত্র হওয়া উচিত। কেননা এগুলি রুগ্ন, রোগজর্জর, পঙ্গু, হড়মা-সার, বুড়ো গরুর মাংস। এ মাংসে হাড়মাজাতীয় এক রকম হড়হড়ে শক্ত জিনিস থাকে যা কুকুরের পক্ষেও হজম করা কঠিন। তারপর গরুগুলি জবাই করা হয় হয়তো আজ সন্ধ্যায়, আর দু-তিন দিন ধরে রোদে রোদে বাজরা মাথায় নিয়ে ঘুরে

ঘুরে সস্তাদরে বিক্রি করা হয়। যারা দরিদ্র দুঃস্থ সম্প্রদায়, তারা অনেকেই অনাহারে অর্ধাহারে ভুট্টা, যব, বেসম, গম খেয়ে লিভারের বারোটা বাজিয়ে রেখেছে আগেই, তারপর এই মাংস এবং তাড়ি খেয়ে হজম করতে পারে না। পেটে পচতে থাকে। পেটে বড বড লম্বা কৃমি জন্মায়। হাত পা গলা সরু হয়ে আসে, পেট ডাবা হয়ে যায়। মুখের চেহারা মলিন হয়। চোখ কোটরে ঢুকে যায়। আগে যন্ত্রণা হলে মুসলমানরা পেটে দাগ দিত। রাংচিতার পাতা বেটে পেটের দু-দিকে চোপ দিলে ফোস্কা পডে যেত। লিভার পিলে ভাল হত। হত কি না খোদা জানেন। এখন কিন্তু ডাক্তার বন্ধুরা বলেন, 'মুসলমান রোগী, ঐ রকম শরীর দেখলেই, আমরা কৃমির ওষধ খাইয়ে দিই, আর দু'দিন পরেই রিপোর্ট পাই, পনেরো-কুড়িটা বড় বড 'কিড়মি' বেরিয়েছে।'

কৃমিরোগ গ্রামে ছেয়ে গেছে। একটি ছেলে বা একটি লোকের হলে তা গ্রামের সব ছেলেমেয়ের মধ্যে সংক্রামিত হবে। পূজারী ব্রাহ্মণদের বাড়ির ছেলেমেয়েদের পেটে কৃমি হবার সম্ভাবনা আছে। কেননা পূজায় প্রাপ্ত বাতাসা, বরফি, সন্দেশ, কলা ইত্যাদি মিষ্টিজাতীয় জিনিস তারা প্রতিদিন খায়। ফলে অম্বল রোগ ধরে। পেট খারাপ হলেই পেটে ময়লা পচবে এবং কৃমি হবে। সেজন্য সপ্তাহে একবাব করে চিরতাজল, ভাঁটপা া বা ঘেঁটুপাতার রস, বনঝামা, আদা-বিরমি ইত্যাদি খাওয়া দরকার। খেল-কদম বা খয়ের গাছের বীজ বা দানা ভেজে চালভাজার সঙ্গে ছেলেদেব খাওয়ালে কৃমি বের হয়ে যায়।

লিভার খারাপ হলে মেজাজ কড়া হবে, পিত্ত পড়বে। বেশি পিত্ত পড়লে মানুষ পাগল হয়ে যায়। মুসলমানদের রাগ বিখ্যাত। এর মূলে কিন্তু তাদেব অধিকাংশের লিভার খারাপ এবং পিত্তচড়া। লিভার হল আগুনের চুল্লী। তাব তেজ কমলে চোখ দাঁত চুল সব হারাতে হবে অল্পদিনেই। অকালেই মানুষ বুড়ো হয়ে যাবে। 'তরুণ বয়সে টাক পডা বড় করুণ ব্যাপার।' কিন্তু টাকের ওষুধ নাকি গোবর। মুসলমানদের জন্য তাও আবার অপবিত্র!

গোমাংস খেতে হলে তিন ঘণ্টা জ্বালানো দরকার। তিন ঘণ্টার কম সিদ্ধ করলে তা সিদ্ধ হবে না। কাজীরা বলেন, 'অসিদ্ধ মাংস হারাম।' তার কারণ আর কিছু নয়, হজম হবে না বলেই ঐ ফরমান। খৃস্টান সাহেবরা বীফ খায়, পর্ক খায় কিন্তু তারা বিয়ার খায়।

হাসপাতালে আসুন, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, চর্মরোগ, কৃমি, চক্ষুরোগ, পেটের পীড়া এসব রোগীদের সংখ্যা দেখুন। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে এখানেও মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা! কিন্তু সবাই কি আর আসে? যারা পর্দার মধ্যে রয়েছে? যারা 'উজড়ি' বা 'বট' খায়? 'উজড়ি' কি জিনিস এ কথা বলে দিলে অনেক গোঁড়াপন্থী মুসলমান, যারা স্বসম্প্রদায়েরও মঙ্গল চায় না, তারা ব্যাজার হবে! হিন্দুরা আদৌ এ ব্যাপারটা জানে না। 'উজড়ি' হল গরুর নাড়ীভুঁড়ি! ময়লা পরিষ্কার করে এই দুর্গন্ধযুক্ত নাড়ীভুঁড়ি খায় নিম্নশ্রেণীর মুসলমান মেয়েরা। খায় দুর্গন্ধ শুটকি মাছ। তারা নানা রোগে পর্দার অন্তরালে ভুগছে। কজন আর হাসপাতালে আসে? হয়তো তাদের সঙ্গতিরও অভাব। আর অশিক্ষার অন্ধকারে ঘুরপাক খাচ্ছে।

কিন্তু গরুর মাংস খাওয়া বন্ধ করলে মেটিয়াব্রুজের দর্জিদের চলবে কেমন করে? কলকাতার বস্তিবাসী চামার, মুচি, মেথর, নিম্নশ্রেণীর মুসলমানরা খাবে কি? এ যে তাদের দৈনন্দিন খাদ্য। এ তো শখের খাবার নয়। কলকাতায় কত সাধারণ মুসলিম হোটেল চলছে? শত শত। গ্রাম থেকে হাজার হাজার হিন্দু ছেলেরা কলেজে পড়বার জন্যে গিয়ে থাকে। কিন্তু তারা খাবে কি? হিন্দু হোটেলে দু-বেলায় পাঁচ টাকা না খেলে উদরপূর্তি সম্ভব নয় কিন্তু মুসলমান ছেলেদের মুসলিম হোটেলে সে জায়গায় লাগবে বেলাকে ৭৫ পয়সা করে দু'বেলায় দেড় টাকা। আট আনার ভাত, চার আনার মাংস। অথচ তারা প্রোটিন পাচ্ছে। হিন্দু ছেলেদের হয় মেসে থাকতে হবে নয়তো পেয়িং-গেস্ট হতে হবে।

কিন্তু সাধারণ মুসলিম হোটেলগুলো এত নোংরা যে এই নোংরামির জন্য হোটেল মালিকদের দোজখে যাওয়া উচিত। সরকারও কিছু বলতে গেলে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ আসা বিচিত্র নয়। এই সব হোটেলে আসে মাংসের ছাঁট মাল। যা খারাপ। যা বিক্রি হল না। পচাও। সস্তা দামের ঝাল মশলা। পচা পিঁয়াজ আলু। সরষের তেলের বদলে খইল। তরকারি ঝাল মশলায় তীব্র স্বাদযুক্ত। সপ্তাহখানেক খেলেই আমাশা ধরবে, পেটের ব্যামো অনিবার্য। তাই কথায় বলে, 'হোটেলে কোনো ভদ্রলোক বিপদে না পড়লে কখনো খায় না।'

একটা অন্ধকার জগৎ আছে, তা পতিতালয়। একটা অন্ধকার সমাজ আছে, তা দুরারোগ্য রোগে ভরা নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের। উচ্চশ্রেণীর বিত্তবান

মুসলমানরা অবশ্য নিয়মিত গোমাংস ভক্ষণ করেন না। ভারতের পশ্চিমঘাট পর্বতাঞ্চলে মলয়ালমবাসীরা ভীষণ গো-খাদক। উত্তর ভারতের মুসলমানরাও। তারা নীল গাইও খায়। এ এক রকমের হরিণ। বাংলার মুসলমান—যারা নিম্নশ্রেণীভুক্ত এবং মাঝারি সম্প্রদায়ও, তারা গরু খায়।

এবার একটি চিত্রে আসা যাক!

একটি কুষ্ঠরোগী পথের ধারে বসে ভিক্ষা চাইছে আলীপুর গোপালনগরের মোড়ে। হাত-পায়ের আঙুল খসে গেছে। রস ঝরছে। ন্যাকড়া জড়ানো। তাকে শুধোলাম : 'তোমার নাম কি?'

বললে, 'সেখ আলম।'

'এই কুষ্ঠরোগ তোমার হল কি করে?'

'বাবু, আমি ছিলুম কসাই। আমার বাপও ছিল কসাই। তার নাম মনরদ্দি। সে কীলখানায় গরু জবাই করত। গরু পিছু পেত চারআনা করে। রোজ ভোরে ছোরায় শান দিয়ে নিয়ে চলে যেত কীলখানায়। আঠারোটা-কুড়িটা গরু রোজ সে জবাই করত। একটা দড়িতে পায়ে পায়ে গরুগুলো বাঁধা থাকত। দু' দিকে সিমেণ্ট করা চাতাল। উঁচু থেকে নিচুর দিকে মুখ করে গরুগুলো শোয়ানো দুদিকে। মাঝখানে নালা। বাবা মনরদ্দির সঙ্গে আমিও যেতুম। সে এক-একটার গলায় 'বিসমিল্লাহে আল্লাহু আকবারু' বলে ছোরা চালাত। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে গা-হাত-মুখ-বুক ভরে যেত। একটা লোক কাছা সেঁটে দুহাতে বাগিয়ে ধরে থাকত গরুর গলার নলীটা। তার ধরার অসুবিধা হলে বাবা মুখ খারাপ করে গাল দিত। ধরা ঠিক না হলে রক্ত গায়ে লাগবেই। পাশের জীবন্ত গরুগুলো তাদের হত্যার দৃশ্য দেখে গাঁকগাঁক করে চিৎকার করত। রক্ত—কাঁচা তাজা রক্ত—গড গড হড় হড করে গড়িয়ে গিয়ে পড়ত নালা বেয়ে একটা চৌবাচ্চায়। তা কি জানো বাবু, বাবার হাতে ঐ কাঁচা গরম রক্ত পড়ে থাকত আর সে ধুতো না। সেই নিয়ে কীলখানায় বসে বসে পাওনা মুণ্ডু ছাড়াত, মুড়ি খেত। তারপর যখন হাত ধুতো, দেখতাম, রক্ত-পড়া জায়গাটা যেন কি রকম হেজে গেছে। সাদা সাদা দাগ। বাবা ভ্রূক্ষেপ করত না। তারপর তার ডান হাতে একটা ঘা হল। সেই ঘায়ে একটা গরুর বিষাক্ত রক্ত পড়ে একদিন সমস্ত শরীরে 'আমবাত' দেখা দিল। আর সেই গরুর মাথাটাই বাবা এনেছিল। তার মাংস খেয়ে আমাদেরও সবায়ের

'আমবাত' হল। দাগড়া দাগড়া হয়ে বিছুটি বা সোঁয়াপোকা লাগার মতন সর্বশরীর ফুলে গেল। ভীষণ কিটোতে লাগল। কদিন পরে আমাদের ভাল হল। বাবার কিন্তু হাতের সেই ঘায়ের মধ্যে দিয়ে ভেতরে বিষ ঢুকল। শেষ পর্যন্ত তার হাত খসে গেল। ডান হাত নুলো হয়ে গেল। কীলখানার মালিকের পীড়াপীড়ি আর রোজগারের ধাক্কায় বাবা সেই নুলো হাতেই ছোরা বেঁধে গরু জবাই করত। কিন্তু তার নুলো হাতের মাথায় ঘায়ের সোঁস ছিল। বাবা আবার বিছানায় পড়ল। আর উঠল না। বাবা মারা গেছে অনেক দিন হল। তার কবর থেকে একদিন হঠাৎ মাঝরাতে আগুন জ্বলে উঠতে দেখেছিলুম। তার কি কঠিন শাস্তি হচ্ছে হাঁ বাবু?'

বললাম, 'আগুনটা অন্য কারণে ওঠে। শাস্তির কথা মনগড়া। বিজ্ঞান বলে, খানাডোবার ধারে পচা পাতার নিচে, কবরের হাড়ে, ভিজে পাট বা খড়ের গাদার মধ্যে এক রকম গ্যাস জন্মায়, কোনোক্রমে সেই গ্যাস বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শ পেলে দপ করে জ্বলে ওঠে। বাতাস জোরে বইলে এই আগুন বা জ্বলন্ত গ্যাস ছুটতে থাকে। একে আলেয়া বলে। আর অন্ধকার মাঠে জ্বালামুখী খ্যাঁকশিয়াল যদি হঠাৎ হাঁ করে তার গালের মধ্যে ফসফরাসের আলো দেখা যায়। বহু দিনের পুরোনো কোনো তেঁতুলগাছের গোড়া পড়ে থাকলে তাতে ছাই বর্ণের ফসফরাসও অন্ধকারে জ্বলে। ভেট্‌কিমাছ, চিংড়িমাছ, গরু, শিয়াল, কুকুর, বিড়ালের চোখে রাত্রে টর্চের আলো ফেললে জ্বলতে দেখা যায়। ঐ ফসফরাস আছে। মাটিতে যে কেঁচো আছে তাকে রাত্রে কাটলেই দেখতে পাবে। অথবা জোনাকীর আলো। কবরের হাড়েও ঐ গ্যাস জন্মায়—সেইটাই ফাঁক পেয়ে হঠাৎ জ্বলে উঠেছিল।—তা গরুর মাংস খেয়ে যদি 'আমবাত' হয় তবে খেতে নেই। ওটা অ্যালার্জি। শরীর চায় না। বল, এবার তোমার কথা।'

আলম বলতে লাগল, 'বাবা মারা যেতে সংসারের ভার পড়ল আমার ওপরে। আমি কসাইখানায় কাজ নিলাম। সেখান থেকে আবার কীলখানায়। দেশ স্বাধীন হবার পর একটা নিয়ম হল বেস্পতিবার শুক্কুরবার গরু কাটা বন্ধ। আর ভাল গরু কাটতে হবে। কেননা রোগা গরুর চামড়া ভাল নয়। মাংস তো বটেই। তাই কীলখানায় যেসব গরু আসত একটা সাহেব এসে পরীক্ষা করে দেখত। যে গরু কাটা চলবে তার পাছায় শীলমোহর মেরে দিত। কিন্তু এর মধ্যেও ঘুষ চলতে লাগল। সাহেব রোগা

পটকা আধমরা সব গরুকেই চালিয়ে দিয়ে যেত পকেটে টাকা গুঁজে দিলে। আর আমিও ছোরা চালাতাম। একদিন দেখি একটা গরুর গায়ে অনেক বিজবিজে কেঁট আর চাকা চাকা ঘা ভর্তি। সেটা জবাই করব না জানাতে কীলখানার মালিক যা-তা বলে গালাগালি করতে লাগল। শেষে দিলাম জবাচ করে। কথায় বলে 'পরের জন্যে যে পাতকোয়া খোঁড়ে সেই পড়ে মরে।' সেই গরুটার 'উজড়ি' বোধহয় আমার মা এনেছিল কীলখানা থেকে। সেই খেয়ে আমাদের সবায়ের ফের ঐ 'আমবাত' হল। আমার দুটো চোখের পাশ ফুলে উঠল। গোটা মুখ ফুলে চোখ ঢাকা পড়ে গেল। মায়েরও তাই। আঙুলের গলুইগুলো এত কিটোতে লাগল যে চুল্‌কে ছিঁড়ে না ফেললেও নিস্তার নেই। শেষে ব্যথা, গাঁটে গাঁটে বিষ-ব্যথা। বিজিবিজি ফুসকুড়ি দেখা দিল। তারই ওপরে কীলখানার গরম রক্ত পড়তে লাগল। তারপর একদিন আর সোজা ফুলো আঙুল মুঠো করে ছোরা ধরতে পারলুম না। চাকরি গেল, ভিক্ষে করতে বেরুলাম। ধীরে ধীরে হাতের পায়ের আঙুলের গাঁট খসে পড়ে গেল। একটা করে আঙুলেব গাঁট খুলে পড়ে যায়, সেটা ফেলে দিই, আবার জোড়া দিয়ে দেখি, আবার ফেলে দিই! কী মায়া বাবু, নিজের হাতের আঙুল।'

'তুমি হাওড়া কুষ্ঠরোগীর হাসপাতালে যাও না কেন?'

'এখন আর গিয়ে কি করব? আমার মরণ কবে হবে তারই মুখ চেয়ে আছি।'

আলম আর কিছু বললে না। তার দুটো চোখ থেকে তখন জল গড়াচ্ছে। তাকে কিছু পয়সা দিয়ে চলে এলাম। ভাবতে লাগলাম, এ সবের প্রতিকার হবে কিসে? ভয়ে গরুর মাংস খাওয়া ছেড়ে দিলাম। কিন্তু ছেড়ে দিলে কি হবে, রোগ তো চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ধাপার ময়লা খাওয়া দেখে ট্যাংরা কই মাগুর মাছ খাওয়া কতদিন বন্ধ রাখা যায়? আর একটা মোরগ যে কিনবেন, তাকে তো আধ কেজি ভাত জল খাইয়ে দেড় কেজি করে এনে বিক্রি করবে!

বজবজ দিয়ে ফিরছিলাম। বাটার কাছে চন্দননগরে এসে হঠাৎ নাকে কাপড় দিতে হল। যেমন মেটিয়াব্রুজের কীলখানা থেকে পচা রক্তের গাড়ি যাবার সময় অনেকক্ষণ ধরে দম না ফেলে অজ্ঞান হয়ে থাকতে হয়! হিন্দুরা গালাগালি করে। কোনো কোনো হিন্দুদের ঐ পরিবেশে হয়তো থাকতেও

হয়। কেমন করে তারা থাকবে? কেন দিনের পর দিন তারা এই অসহনীয় উৎকট গন্ধ সইবে? আর মুসলমানরা যারা সহ্য করে আছে তা কোন্ পবিত্র দায়ে তা বুঝতে পারি না। শুধু কি পেটের দায়ে? ধর্মের দোহাই দিয়ে যা মন্দ তাকে চালাতে যাওয়া বাতুলতা।

যতই ধার্মিক যোগী পুরুষ হই না কেন আমরা পায়খানা করে তার পাশে বসেই নাক খুলে রেখে আহার-বিহার, চণ্ডীপাঠ, কোরআনপাঠ চালিয়ে যেতে পারি না। মানবতা কেন, জনস্বাস্থ্যের দিক থেকেও এ ক্ষতিকর। এবং এসব পরিস্থিতি থেকে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ জন্ম নেয়।

ইসলামের বিধান:

'সে মুসলমান নয়, সে মুসলমান নয়, সে মুসলমান নয়, যার আঘাত থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।'

"বিশ্ব জগৎ আল্লাহর পরিবার, সেই আল্লাহ্‌র কাছে ভাল যে তাঁর পরিবারের প্রতি ভাল।'

জয়নগরের মোয়া

শিউলি গোষ্ঠ মোড়ল—হাড়পাকা খঞ্জুরে মানুষ। ঝুনো নারকোলের মতন—নাড়া দিলে ভিতরের জলটা মানে প্রাণবস্তুটুকু নড়েচড়ে, বাইরেটা একেবারে শুকনো-হাড্ডিসার। গোষ্ঠ মোড়ল বাগদি, বড় বড় চিংড়িমাছের মতন এক-জোড়া ঝোলা গোঁফ, মাথায় দশ বছরেও একবার চিরুনি না টানা উলুঝোপের মতন চুল—সারা দেহে বনমানুষের মতন লোম—মাংসহীন হাড়ে-চামড়ায় চেহারা—উঁচুতে ফুট পাঁচেকের বেশি নয়। কিন্তু হলে কি হবে তার চাইতে 'করিৎকর্মা' লোক ভূ-ভারতে পাওয়া মুশকিল। বেলা দশটা থেকে তিনটে পর্যন্ত চল্লিশটা খেজুরগাছ কেটে দিয়ে বাড়িতে ফিরে যদি দেখে বউ তার কাস্তে আর ঝোড়া নিয়ে ধানজমির ভেড়ির কোল আঁচড়ে অথবা জলা-জাঙ্গাল থেকে 'জলভাটি' (শামুক), 'দুগাবাড়ি' (গেঁড়ি), 'দু-পাটি মাছ' (ঝিনুক) কুড়োতে চলে গেছে তো গোষ্ঠ তার কুঁড়ের মধ্যে ঢুকে শিশি থেকে এট্টু ছাঁচি-তেল (সরষের তেল) কড়াপড়া খেজুর-রসের আঠা-মাখা হাতের তালুতে ঢেলে নিয়ে নাকের গর্তে, কানের গর্তে, নাভির গর্তে দিয়ে নিয়ে পেটে পিঠে চাপড়ে

এঁদো ডোবা থেকে ডুবে এসে আজড়ানো ময়লা তিনহাতি জোলার বাড়ির মোটা ধুতিটা পরে নিয়ে ভিজে গামছাটা দুহাতে শূন্যে মেলে ধরে শুকোতে শুকোতে অনাহারেই চলে আসবে রহিম মোল্লাদের বাড়িতে। ভোর যখন তিনটে—অঘ্রাণের শেষ অথবা পৌষ মাস—আকাশ থেকে হিম গলে গলে নামছে—হাড় কনকনে ঠাণ্ডা—তবু যখন সেখ পাড়ার মোরগ 'বাঙ' দেয়, সরদার পাড়ার চিঁড়ে-কোটা ঢেঁকির পাড় পড়ে দুম্‌দুম্—দুম্‌দুম্ শব্দে – 'আজান-সূর্যে'র তারাটা হেলে পড়ে 'পচ্চিম আগাশে'র কোলে, অন্ধকার 'কওশায় (কুয়াশায়) জাড়ে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে শিউলি গোষ্ঠ মোড়ল মাত্র একখানা গামছা গায়ে জড়িয়ে খালি পায়ে ভিজে মাটিতে শিশিরে পা ফেলে ফেলে মহাজন রহিম মোল্লার মাঠে রোজকার মতো চলে আসবে বাঁকবাড়িটা হাতে নিয়ে খেজুরগাছে উঠে উঠে রসের ভাঁড়-কলসী খুলে আনবার জন্যে। কুমীরের গায়ের মতন এবড়ো-খেবড়ো খেজুরগাছের কোয়ায় পা দুমড়ে বেঁকে যাবে—অসাড় হয়ে যাবে হাত-পা। দু-কুড়ি গাছের রস খুলে বাঁকে করে বয়ে এনে বেলা সাতটার মধ্যে 'বান' জেলে গুড় জ্বাল দিতে বসে যাবে। পালা, জঙ্গল, খেজুর-পাতা তিনপাখা বানের গহ্বরে ঠেলে দিলে দাউদাউ করে জ্বলতে থাকবে। রস বল্‌কা মেরে মেরে ফুটতে থাকবে। ততক্ষণ ভাঁড়ের সব 'কানাচি'-দড়ি খুলে ফেলে ভাঁড়গুলো ধুয়ে উপুড় করে দেবে সে। রস উথলে উঠলে ঝাঁটিপাতা দিয়ে চাপতে হবে। তাতারস খাবার জন্যে পাড়ার ছেলেরা ভিড় করবে। মোল্লাবুড়ী মুড়ি এনে দিলে তাতারস তুলে নেবে 'উখ্‌ড়ি'-মালায় করে। সেই দিয়েই যা মুড়ি খাওয়া সকালে। গুড হয়ে গেলে কলসীতে ভরে মোল্লাদের ভাঁড়ার ঘরে তুলে দিয়ে আসবে। পাটালী বা মোয়ার অডার থাকলে তাও করে দিতে হয়। জলন্ত বানের ওপর রসের ভাঁডগুলো পুড়িয়ে 'কানাচি' পরিয়ে বাঁকে করে বয়ে নিয়ে মাঠে চলে যেতে হয় তাকে। যে যে গাছগুলো কাটা হবে তার গোড়ায় গোড়ায় একটা একটা ভাঁড বসিয়ে দিতে বলে কোনো ছেলে-মেয়েকে। গাছে উঠে সারা গাছ কাঁপিয়ে হ্যাঁচহ্যাচ শব্দে কাতান চালিয়ে খেজুরগাছ কাটবে গোষ্ঠ শিউলি। রহিম মোল্লার স্কুলে পড়া মেয়ে সফুরা খাতুন—বয়স তার বছর চোদ্দ-পনেরো—সে যায় মাঠে গোষ্ঠ মোড়লের সঙ্গে। নির্জন হাওয়া-ভাঙা মাঠ। মুলো ক্ষেত, সরষে ক্ষেত, শাকালু-ডাঙা, আখবাড়ি। সফুরা বলে, 'কাকা, 'চাঁপালা' (খেজুরগাছের মোচ) থাকলে দিও! আমি শাকালু তুলে খাই।'

গোষ্ঠ মোড়ল বলে, 'দেখিস মা, পাতলা গাছকাটারী যেন শক্ত এঁটেল মাটিতে কোপ মেরে ভাঙিসনি। তার চাইতে আখ কেটে খা।'

গোষ্ঠ মোড়ল বিকেলে ঘর থেকে ফিরে এসে মাথা গুঁজে বসে আছে দেখে মোল্লাবুড়ী শুধোয়, 'কিরে গোষ্ঠ, তোর বউ বুঝি ভাত দেয়নি আজ! চাল কিনে দিয়েছিলি? তোর বউ হেঁতালী দাসী, অভাগীর দেটি বড় বজ্জাত! নিজের আষাঢ়ে গতরটি ঠিক রেখেছে। আয় 'বাকুলে'র ভেতরে, দুটি ভাত খা! কেউ দেখলে আবার তোর জাত যাবে।'

গোষ্ঠ ভাত খেয়ে নিয়ে শীতের বেলাতেই যতটুকু সময় পায় মাঠ-ক্ষেত-খামার থেকে কাঁটা-পালা বা খেজুরপাতার বোঝা বয়ে এনে রাখে বানশালে! নইলে সকালে জ্বালানী কাঠের টানা পড়লে মুশকিল হবে। পাতা৫ বোঝা বেঁধে রেখে গেছে সে গাছ-মুড়ো দেবার কিছুদিন পরেই। বাবলা, গুয়ে বাবলা, কয়েমচা, খেল-কদম, আশ-শ্যাওড়া, নাটা-কাঁটা, সোনা-কাঁটা, বিল-ঝনঝনি, বন-তুলসী, বঁইচি, সোঁয়াকুল—এই সব কাঁটা-ঝোপও সে কেটেছে অবসর মতন। জঙ্গল কাটতে গিয়ে চন্দ্রবোড়া, শিয়রচাঁদা, গোখরো সাপ মেরেছে কত গণ্ডা। রহিম মোল্লা সম্ভ্রান্ত চাষী হলেও পায়ে হরিণের চামড়ার জুতো পরে হাতে সুন্দর শিকড়ের রাঙা ছড়ি নিয়ে মাঠে আসে কখনো কখনো। গোষ্ঠ মোড়লকে সে বেশ পছন্দ করে। গোষ্ঠ বলে: 'মোল্লাদা, শালা একখানা ইয়া-বড় চন্দুরে বোড়াকে কেটেছি দেখ। বারেক হাতে ছোবল দেয়নি। 'ভবনীলে' সাঙ্গ করে দিত থা'লে। উলু সুদ্দু মুঠো করে ধরে মেরেছি কাস্তের টান। শালার মুণ্ডুটা দু-টুকরো!'

মোল্লা সাপটা দেখে। বলে, 'পেটে ডিম রয়েছে—গজগজ করছে। ভরা পোয়াতি—তাই নড়তে পারেনি হে! তা হাঁরে গোষ্ঠ, মেয়েটাকে তুই আস্কারা দিয়ে দিয়ে আখবাড়ি আর শাকালু ক্ষেতটা কি করেছিস বল তো? এখন মাল চুরি গেলে বোঝা যাবে কেমন করে? শোন্, তোর রোজ বাড়িয়ে দিনু আজ থেকে, তোর নাগাড় কাজ। সমবছর। দু-টাকা চার আনা করে পাবি। তোকে নাকি অম্বিক ঘোষাল আড়াই টাকা রোজ দিয়ে শিউলি রাখতে চায়?'

'অম্বিকটা বলেছ্যালো বটে। বলে মোছলমানের কাজ করিস, তাদের বাড়ি নাকি খাস—জাতজন্ম দিবি? আমি বলেছি আমরা বাগ্‌দি—সব চাইতে

নিচু জাত—তার চেয়ে আরো নিচুতে যাব কোথা ? তোমরা বাবাঠাকুর হিন্দু হয়েও তো আমাদের একসাথে এক 'পঙ্‌ক্তি'তে খেতে দাও না। ওরা অতখানি ঘেন্না করে না। থালা বাসন মেজে ধুয়ে দিয়ে যেতে বলে না। মানুষ হলেও আমাদের কুকুরের অধম মনে করে !'

রহিম মোল্লা হাসলে, 'জয়নগরের মোয়া, সব চাইতে ভাল রহিম মোল্লার, খাটি গাওয়া ঘি থাকে, নলেন গুড় আর কনকচূড়ার খই থাকে, চিনির পানা জমানো খইচুর সে নয়—খেয়ে কলকাতার বাবুরা 'তোফা তোফা' করে কিন্তু তারা কি জানে বাগ্‌দি গোষ্ঠ মোড়ল সেই মোয়ার আসল কারিগর !'

গোষ্ঠ মোড়লের পাওনা টাকাগুলো হিসেব করে মিটিয়ে দিয়ে রহিম মোল্লা গম্ভীরস্বরে বলে, 'যেতে পারো তুমি, আমি তোমাকে বেঁধে রাখি না। তবে গোষ্ঠ, তুমি চলে গেলে, তোমার মতন কাজের লোক আমি আর পাব না।'

গোষ্ঠ বলে, 'পাগল হয়েছ মোল্লাদা, আমি তোমাকে ছেড়ে যাব ! তুমি আমার কতদিনের মনিব মহাজন। বউটা সেবার কলসী কলসী 'অক্ত' (রক্ত) ভেঙে মারা যাচ্ছ্যালো, তুমি 'ট্যাস্কি' ভাড়া দিয়ে 'কল্লেজে' (হাসপাতালে) নিগ্যালে—মনে নেই ! যে যাই বলুক শালা—আমি ঠিক আছি। কাল দুপুরে গাছে উঠছি, দেখি অম্বিকে ঠাকুর যাচ্ছে। বললে, কিরে গোষ্ঠ হনুমান, খুব যে গাছে উঠছিস ?···জানো মোল্লাদা, লোকটা বামুন ঐ নামে, চাঁড়ালেরও বাড়া। শুধু মামলা-মোকদ্দমা, মদ আর মেয়েমানুষের নেশায় বয়ে গেল ! সমাজের ওপর তলার মানুষ, ওরা যদি অমন ধারা হয়, আমরা কি হব ?'

রহিম মোল্লা এবং তার মেয়েকে ছাড়া গোষ্ঠ মোড়ল কখনো তার পেটের কথা কাউকে বলে না। এমনিতে সে নির্বাক। শুধু কাজ করে যায়। রহিমের বড় ছেলেটা পাজীর হদ্দ। সে বানের আগুনের মধ্যে একদিন বেল ফেলে দিলে না ফাটিয়ে। গোষ্ঠ তা দেখেনি। হঠাৎ গড়াম করে সেই বেল ফেটে বেরিয়ে গিয়ে পড়ল বিশহাত দূরে। একটা গুড়ের মাটির খুলী গেল ফেঁসে। পোড়া বেলের শাঁস আর গরম গুড় ছিটকে এসে ছেলেটার গায়ে পড়ল আর তারও গা-হাত পুড়ল। ছুটে গিয়ে জঙ্গল থেকে একটা লতাগাছ এনে তার পাতা হাতে মলচে রসটা লাগিয়ে দিতে জ্বালা থেমে গেল। আর আশ্চর্য, গোষ্ঠ সেই রস হাতে মেখে গরম টগবগ করে ফোটা গুড়ের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বললে, 'দেখ ছোঁড়া, কী যাদু ! আমার হাত পুড়বে না।

এ্যার নাম 'দিব্যগুণ' (দ্রব্যগুণ) ।'

গোষ্ঠ নাকি সাপ কামড়ালে, হাতচালা জানে। সে বলে, 'শ্বেত কুঁচ, শ্বেত জবা, শ্বেত আকন্দ, শ্বেত করবী, আর শ্বেত অপরাজিতার শিকড়ে হাত চলে। সাপ কামড়ালে আড়াইটা মরিচ দিয়ে এই সব যে কোনো একটি গাছের শিকড় বেটে খাওয়ালে বিষ চলে যায়। মনিরাজ, ঈষরমূল, হরকোচ—এসব গাছও সাপের ওষুধ।'

গোষ্ঠ 'ধুকুড়ে' মন্তরও জানে। চুরি করতে গিয়ে তুমি ধরা পড়লে। হরদম মার খাচ্ছ! সেই মন্তর বিড়বিড় করো আর তোমাকে লাগবে না! ছেলেরা তার কথা শুনে হাঁ করে থাকে। শুধু সফুরা বলে, 'কাকার সব গুলপট্টি। আচ্ছা, তুমি মন্তরপড়ো আর আমি এই কাটারী দিয়ে তোমার পিঠে মারি!'

'মারো।'

সফুরা সত্যিই কাটারীর চওড়া পিঠে পটাস্ করে এক-ঘা কষালে। গোষ্ঠ দিব্যি হাসতে লাগল। সে দশটা কাঠ-পিঁপড়ে হাতে ছেড়ে দেয় আর তারা কামড়াতে থাকলেও সে উ-আ কিছু করে না। সে হাসতে হাসতে খানিকটা হাত চিরে দেয়—এ যেন খেলা—তার সহ্যশক্তি সাংঘাতিক। সে আপন মনেই কাজ করে যায়, তাকে কেউ ফরমায়েস করে না।

রহিম মোল্লা বলে, 'নিচের তলার মানুষরা, ওপরের চাপে কয়লার খনির হীরের টুকরোর মতন হয়ে যায়। ওদের মনুষ্যত্ব আমাদের চাইতেও অনেক বেশি। ওদের ছায়া মাড়ালে স্নান করতে হয় যারা বিধান দিয়েছিল তারাই আসলে মানুষ ছিল না।'

'আকাশপ্রদীপ'-জ্বালা কার্তিকের শেষে যখন টিঙেপাখি সবুজ ধানক্ষেতের বুকে সোনালী রঙের ছোঁওয়া লাগে আর আকাশ থেকে গলে গলে হিম নামে খেজুর-রস আহরণকারী গোষ্ঠ মোড়ল তার 'কোপ-কাটারী, 'গাছ-কাটারী' কামারশালা থেকে পাজিয়ে এনে 'বেলেন' বালিতে ঘষে ঘষে 'নালি' তুলে ধার দিয়ে রাখে। গাছ-কাটারীর শানে-ধরা নালি তুলে এমন ধার তুলবে সে যে হাতের কিম্বা পায়ের লোম ফরফর করে কেটে যাবে ব্লেডের মতন। তারপর বাঁশঝাড় থেকে মোটা কঞ্চি কেটে এনে—যে কঞ্চি 'কাকমরা' 'ভেলকো' ছাড়া অন্য কোনো রকম বাঁশে হয় না—গাঁট বাদ দিয়ে দু'চেলা করে তার একমাথা কোপ-কাটারী দিয়ে ডাহুক পাখির ঠোঁটের মতন সরু এবং তীক্ষ্ণ 'নলী' তৈরি

করে রাখতে হয় যত গণ্ডা গাছ কাটা হবে তার চাইতে অন্তত কিছু বেশি। আকাশে যদি মেঘভার না থাকে তালপাতার 'খুঙি'র মধ্যে গাছ-কাটারী, কোপ-কাটারী, বালির চোঙা কোমরে বেঁধে নিয়ে লম্বা দুহাত কাঠের 'বেলেন' আর খড়-দড়ির তৈরি পা রাখবার 'পা-ছোটা' ও কাছি নিয়ে দেবদেবীর নাম শরণ করে 'মুড়ো' দেবার জন্যে খেজুরগাছে উঠতে হয়। বেলেন, বালির চোঙা নিচে রাখা রইল। দরকার মতো অস্ত্রে ধার দিতে হবে তাতে। গাছে উঠে পা-ছোটা বেঁধে, কোমরের কাছি গাছের সঙ্গে বেঁধে, এবার কোপ-কাটারী বার করে নিচের সারা বছরের বন জঙ্গল-হওয়া পুরনো শুকনো অথবা কাঁচা পাতাগুলোকে গোড়া 'হাবড়ে' ঠেসে কেটে কেটে ফেলে দিতে হবে। বাঁ হাতে পাতা ধরো, ডান হাতে গোড়ায় কোপ মারো। দেখো যেন কাঁটা না ফোটে! ধারালো চার-পাঁচ ইঞ্চি কাঁটার ছড়ার মাথা যদি এলোপাথাড়ী হাতে লাগে তবে কনকনিয়ে 'জান' বার করে দেবে। যদি ভেডি বা জাঙালের নিচু গাছ হয়, সাবধান, গোখরো অথবা কেতে-বোড়োও থাকতে পারে! জমাট পাতার কোলে যেইমাত্র সাপের গা দেখতে পাবে—দেখবে নড়েচড়ে সরে যাচ্ছে, মারো এক কোপ! তবে যদি কেউটে হয় আর কোপটা নাভির নিচে পড়ে, তাহলে বিপদ। সেই জন্যেই তো গাছে উঠবার আগে ইষ্টদেবতার নাম শরণ করা! নিজের হাতের অস্ত্রও কম শত্রু নয়!

মনে পড়ে গোষ্ঠর, একবার ডাব কাটতে উঠে কাছির একপ্রান্ত কাঁদিতে বাঁধবার আগে তাড়ির নেশার ঝোঁকে গাছের 'বেগ্‌লো'র গোড়ায় দড়িটা না জড়িয়ে নিজের পায়েই ফের দিয়ে বসে আছে, আর কাস্তে দিয়ে যেই না ডাবের কাঁদি কেটে দিয়েছে অমনি সড়াৎ করে তাকে নিয়েই ডাবের কাঁদিটা পড়ে গেল মাটিতে। বারেক গাছটা মাত্র হাত চোদ্দ উঁচু ছিল। রহিম মোল্লা চেঁচামেচি করে লোক জড়ো করে ফেললে। নিজের দামী শালখানা তাড়াতাড়ি ডোবা থেকে ভিজিয়ে এনে গোষ্ঠর মাথায় চাপড়াতে লাগল। কতক্ষণ অজ্ঞান হয়েছিল তা ভগবান জানে। এক 'হপ্তা' তাকে 'বিছেনা'য় পড়ে থাকতে হয়েছিল।

খেজুরগাছের পাতা ঝরানো হয়ে গেলে চাঁদি চেঁছে পাটচাঁছ দিয়ে নলী পুঁতে দিয়ে আসতে হয়। তারপর প্রথম যেদিন চাঁছলে ঘাট গড়িয়ে নলী বেয়ে রস পড়ে ফোঁটা ফোঁটা করে, সেদিন ভাঁড় বাঁধতে হয়। বুড়ীগাছে রস

কম হয়, রসের রঙ হয় সোনালী, সেই রস হল বেশি স্বাদের আর বেশি মিষ্টি। কাঁচা রস খাবার সাধ হলে চাষীরা সন্ধ্যার পর অথবা সকালে সেই রসই খায়। চারাগাছের অথবা খুব তেজি গাছের রস বেশি হয়। জলীয় অংশ তাতে বেশি থাকে। প্রথম দিনের যে রস হয় তাকে 'নলেন' রস বলে। পরদিনের রসের নাম 'দো-কাটের রস' বা 'ঝারা'। তৃতীয় দিন আর কাটা হবে না। অন্য গাছ কাটতে হবে। ষাটটা গাছ হলে পালাক্রমে কুড়িটা করে কাটা চলবে। চারদিন পরে আবার প্রথম পালার গাছ শুকোলে কাটা যাবে। যে গাছটা এ বছর এদিকে কাটা হল আগামী বছরে ওদিকে কাটতে হবে। চারাগাছ বেশি গভীর করে চাঁছলে গেদে গিয়ে ছোট ছোট কালো পোকা লাগতে পাবে।

জয়নগর, মজিলপুব, বড়ু, ফুটিগোদা সর্বত্র শীতকালে পোদ, সরদার, তেলি, ডোম, ক্যাওরা, হাড়ি, মুচি, বাগদি, মুসলমান শিউলিরা বাড়ি-বাড়ি খেজুরগাছ কাটতে শুরু করে। গোটা ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর জুড়ে শীতকালটায় খেজুররস সংগ্রহ করে গুড় জাল দেওয়ার কাজ চলে। বালি গুড়, সার গুড়, মাৎ গুড, চিটে গুড, ঝোলা গুড—কত রকমের গুড় হবে। কলসী ভরে, ঘর ভরে রেখে দেবে চাষীরা। সারা বছর ধরে এই গুড় খাওয়া হবে, বেচা হবে। শিউলি রেখে যদি গাছ কাটাতে না পারো আধা-আধি গুড়-ভাগে গাছ কাটতে দাও অন্য লোককে। অথবা যদি তোমার আড়াইশো খেজুরগাছ থাকে, গাছ পিছু দু'টাকা করে নিয়ে এক মরশুমের জন্য জমা দাও। রস বা গুড় পাবে না। গাছের মাথা যেন উল্টে দেয় না শিউলির পো ফাল্গুন মাস পর্যন্ত চেঁছে চেঁছে সেটুকুও দেখো। গরম পড়লেই কাঁচারস ভেঙে যাবে। তার মানে ঘোলা হয়ে যাবে। তার থেকে হবে তাড়ি।

গোষ্ঠ মোড়লও লুকিয়ে লুকিয়ে তাড়ি খায় রোজ। সফুরা জানে নবাব-গাজির মাঠে বাঁশবনের মধ্যে একটা গাছ আছে সেটায় 'জাওয়া'র গাদ দিয়ে তাড়ি কাটে গোষ্ঠ শিউলি।

কদিন রস চুরি যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে গোষ্ঠর। সে ভোরবেলা গাছ খুলতে এসে গালাগালি করে পাড়ার মুসলমানদের শুনিয়ে শুনিয়ে। উদ্‌বিড়াল, ভাম, শিয়াল, বাদুড়, ইঁদুর রস খেলে বোঝা যাবে। রস নোংরা করবে তারা। ভাঁড়ের মুখে আমপাতা দিলে ছোট গাছ হলে শিয়ালের উৎপাত থেকে

বাঁচা যাবে। নলেন রস চুরি করে খায় এক-আধ দিন দুঃখ নেই কিন্তু রোজ যারা চুরি করে তারা নিশ্চয়ই তাড়িখোর। কাঁচা রস ঝেড়ে নিয়ে গিয়ে জাওয়া দিয়ে গোয়ালের এক কোণে লুকিয়ে রেখে দেবে—একদিন পরে জমাদার তাড়ি! খেলে আমিই-বা কে আর নবাবই-বা কে এমনিধারা 'আবস্থা'! মজার 'ফুর্তি'। মহাজন চাষী তখন হুকুম দেয়, চৌকি দেবার দরকার নেই, গেঁয়োগাছের আঠা দিয়ে দাও—যে বেটা খাবে তার নাড়ী-ভুঁড়ি পচে পচে গলে গলে বেরিয়ে যাক। না হয় 'ফলিডল' দিয়ে দাও—সব সাবাড় হয়ে যাক।

'টিক'-পাতায় যেভাবে 'কানাচি'র সঙ্গে গেরো দেয় গোষ্ঠ মোড়ল তা কেউ রস চুরি করলে ঠিকই ধরতে পাবে। তারপর পিছনের 'ঝাঁটি' পাতা চিরে ভাঁড়ের গলায় সেঁটে বাঁধা থাকে—ভাঁড়টা বোঝাই হয়ে ছিঁড়ে যাতে পড়ে না যায়—তার ফাঁসটা খুলে অন্যভাবে গুঁজলে তো ধরা পড়বেই। তাছাড়া ভাঁড় থেকে রস ঢাললে তার গায়েও দাগ থাকবে।

আশ্চর্য একদিন সফুরা চুপি চুপি নবাব গাজির বাঁশবাগানে এসে দেখলে গোষ্ঠ মোড়ল আর তার বউ দুজনে বসে বসে তাড়ি খাচ্ছে! সফুরা সেখানে গেলে তারা লজ্জা পেলে না বা লুকোবার প্রয়াস পেলে না কিছুই। গোষ্ঠ মোড়লের বউ কালো দুরন্ত-যৌবনা, সাঁওতালী .মেয়েদের মতন। চির জোয়ানী বাঁজা মেয়ে। তাগড়াই চেহারা। শামুকের মুটি আর সমুদ্দুরে কাঁকড়ার ঝাল-তরকারি দিয়ে ওরা দুজনে পেটের জ্বালা জুড়োচ্ছিল। ওর বউ হেঁতালী দাসী বললে, 'তুই মেয়ে জুয়ান ষোল-বচ্ছুরী ছুঁড়ি হয়ে বন-জঙ্গলে এমন করে ঘুরে বেড়াস ক্যান-লা?'

গোষ্ঠ তাকে একটা লাথি মেরে চুপ করতে বললে। সফুরা কোনো কথা উত্তর না দিয়ে কোমর দোলাতে দোলাতে, গান গাইতে গাইতে শাকালু ক্ষেতের দিকে চলে গেল। অনেকটা দূরে মাঠে ছেলেরা ঘুড়ির প্যাঁচ খেলছে। হেঁতালী দাসী চলে গেলে মাঠের গাছে ওঠে গোষ্ঠ। ভাঙা গলায় চিৎকার করে গান গাইতে গাইতে খেজুর গাছে মাথা চাঁছতে থাকে :

"ওরে আকাশ মাঠের মাটি
পাথর হইল রোদ্দুরে,
বাদল ম্যাঘে দে দে পানি দে।..."

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ সফুরার 'কাকা-কাকা' করে চিৎকার শুনে গোষ্ঠ

এক হাঁক দিয়ে হন্‌হন করে নেমে আসে। কি হল? সাপ? নাকি কোনো দুষ্টু ছেলে একলা পেয়ে ধরেছে মেয়েটাকে জঙ্গল-মাঠের মধ্যে? ছুটে গেল গোষ্ঠ মোড়ল। গিয়ে দেখলে সফুরা একটা শোওয়া মতো কুলগাছের মাথায়। নামতে পারছে না, চিৎকার করে করে কাঁপছে।

'কাকা গো মরে গেলুম, ভীমরুল কামড়াচ্ছে আমার গায়ে।'

'দেখ মেয়ের কাণ্ড! গাছে উঠতে গেলি কোন্ লজ্জায়? আমি কি করে নাবাবো এখন তোকে?'

হাত পাঁচ-ছয় উঁচু। কুল গাছের উপরের ডাল ধরে আছে দুহাতে। নতুন রাঙা শাড়িটা কাঁটায় বেধে শূন্যে উঠে গেছে। নিচে থেকে উপরে তাকাতেও লজ্জা করে। ভীমরুল না কামড়ালে মেয়েটার নাচ দেখত খানিকক্ষণ গোষ্ঠবিহারী। দেরি আর না করে উঠে গিয়ে সে মেয়েটার হাত ধরে ধরে নামিয়ে আনলে কিছুটা নিচে। তারপর নেমে পড়ে তাকে পাঁজা করে নামিয়ে আনলে। মেয়েটা ব্লাউজ কাপড়চোপড় সব টেনে ছিঁড়ে খুলে ফেলল হিঁ হিঁ করে কাঁদতে কাঁদতে। গোষ্ঠ তার গায়ের ভীমরুল ছাড়িয়ে দিয়ে বললে, 'ছুটে যা মা, সেই যে লাল বেড়াগাছ, শিঙিমাছ কাঁটা মারলে যার রস দেয়—সেই পাতার রস দিগে যা—কটাস্‌-কটাস্‌-করা যন্ত্রণা এক্ষুণি ভাল হয়ে যাবে'খন।'

সফুরা কাপড়চোপড় বুকে চেপে নিয়ে দৌড় মারলে হিঁ হিঁ করে কাঁদতে কাঁদতে। এই অবস্থায় রহিম মোল্লা যদি দেখতে পায় তাকে আর কিছু যদি জিজ্ঞেস না করেই ছুটে আসে তবেই বিপদ!

গোষ্ঠ দেখলে কুল গাছের মাথায় একটা ভীমরুলের চাক রয়েছে বটে, ছোট মতন, নারকোলের মালার আকারে। মেয়েটা আর শাকালু, কুল বা আখ খেতে আসবে না বাগানে!

গোষ্ঠ গাছ কাটা শেষ করে মোল্লাদের বানশালে ফিরে শুনলে মেয়েটার জ্বর হয়েছে। ডাক্তার এসে নাকি ইঞ্জেকশন দিয়ে গেছে। যে গাছের পাতার রস দিতে বলেছিল, তা নাকি দেওয়া হয়নি, খুঁজে পাওয়া যায়নি বলে। রোদের মতন ফরসা মেয়ে। যেখানে যেখানে ভীমরুল কামড়েছে ফুলে লাল হয়ে আছে, এখনো কেবলই কটাস্‌ কটাস্‌ করে চিড়িং মেরে মেরে যন্ত্রণা হচ্ছে। গোষ্ঠ লাল সেই বেড়াগাছ—কলকাতায় বাগানে যে গাছ অনেকে কেয়ারি করে—ন্যাশনাল লাইব্রেরীর বাগানে রয়েছে—যাকে অনেকে

বেলেভোনাগাছ বলে—এনে রস নিংড়ে দিতে উপশম হয়ে গেল।

রহিম মোল্লা বললে, 'তুই ওস্তাদ আছিস গোষ্ঠ! তোকে আগে ডাকাই উচিত ছিল!'

পরদিন বান জ্বাল দিচ্ছিল গোষ্ঠ। তার বউ এসে মোল্লা বুড়ীর কাছ থেকে দু'কেজি চাল নিয়ে আঁচলে বেঁধে বুক-পিঠ প্রায় উদোম করে বসে কলাপাতা চেটে-চেটে তাতারস খাচ্ছিল। রহিম মোল্লা এসে বললে, 'জয়নগর ইস্টিশনের বুচকিবাবু, গোপালবাবুর দোকানে দশ কেজি করে কুড়ি কেজি মাল দিতে হবে আজ সন্ধ্যেয়। বিকেলে গাছ কাটার পর মাল তৈরি করিস।'

তিনটে খুলিতে বলক্ মেরে মেরে গুড় ফুটছিল। 'চাল্‌তা ফুট' মরে 'সরষে ফুট' ধরলে গুড় নামিয়ে রাখবে। নরম পাকে না রাখলে পাটালী বা মোয়া করা যাবে না। কড়াপাক হলে চিটে হয়ে যাবে। তেঁতো লাগবে। 'উখ্‌ড়ি' মালায় করে শূন্যে গুড় তুলে আবার খুলির মধ্যে ফেলে দেয় গরগর করে সশব্দে। এ খুলি থেকে ও খুলিতে চালান করে।

মোল্লা বলে, 'তোর বউ তো গুড় খাচ্ছে খুব—কতটা দিলি?'

'তা শালী গরম গুড় সেরখানেক খেতে পারে।'

'দে তবে আর খানিক।'

হৈঁতালী দাসী ঘোমটার আড়ে জিব কাটে।

মোল্লা চলে গেলে বলে, 'দাও মিনসে আর খানিকটা।'

'হ্যাঁ, ভাগ শালী কাঁহে-কা। গরম গুড় খেয়ে তারপর ষ্যাখন…'

'তোমার পায়ে ধরি গো, দাও এট্টুন! মাইরি, তোমাকে আজ 'আত্তিরে' বাঘের খেলা দেখাবখন!'

অগত্যা দিতেই হয় গোষ্ঠকে। গুড়টুকু খেয়ে নিয়ে পাছা দোলাতে দোলাতে চলে যায় হৈঁতালী দাসী।

গুড় নামিয়ে ভেয়ানবাড়ি দিয়ে নেড়েচেড়ে ঘষে ঘষে সাদা করে কলসীতে ঢেলে বাড়িতে এনে রেখে গাছ কাটতে চলে যায় গোষ্ঠ।

সন্ধ্যার দিকে মোয়া তৈরি করতে বসে গোষ্ঠবিহারী। তাকে সাহায্য করে রহিম মোল্লা। তার ছেলেমেয়ে দুজন। একজন আত্মীয় কুটুম্ব এসেছে মোল্লার। সে দেখছে সব।

মোল্লা বলে, 'জয়নগরের মোয়া পয়লা তৈরি করে জয়নগরের তেলিপাড়ার লোক এখন সেখানে ভদ্দর লোকদের বাস, পাকাবাড়ি, ইস্টিশন, খটির বাজার,

শিবনাথ শাস্ত্রী মশায়ের বাড়ি, লাইব্রেরী, মিউনিসিপ্যাল এলাকা, ইষ্টিশনের বুচ্‌কিবাবু, গোপালবাবু বড় ব্যাপারী, যাকে বলে মহাজন। শত শত মণ গুড় কিনে এরা হালুইকর রেখে মোয়া পাটালী করে বাজারে ছাড়ে। ঝাঁকা ঝাঁকা হাঁড়ি হাঁড়ি মাল চলে যায় শিয়ালদায়। জয়নগর থানা এলাকার সারা অঞ্চল জুড়ে এই খেজুর রস তৈরি হয়—তৈরি হয় পাটালী, গুড়, মোয়া, খইচুর। খটির বাজারের মহাজনরা বলে বছরে ষাট থেকে আশী হাজার টাকার গুড়ের তৈরি জিনিস নাকি সারা বাংলা দেশে যায় এখান থেকে। আমি নিজে তো গত বছর দেড় হাজার টাকার গুড় বেচেছি। আগের সেই টাটকা মাল আর নেই। এখন সব ভেল। আমাদের কাছ থেকে গুড় কিনে নিয়ে যেয়ে 'ডায়মনহারবড়া', আমতলা, ক্যানিং, বারুইপুর কত জায়গায় তো মোয়া তৈরি হচ্ছে। কালীঘাটেও হয়। ওসব আসলি মাল নয়। আসলি মাল করতে অনেক ঠেলা। পয়লা দিনের জিরেন কাটের রস চাই। বুড়ী গাছের রস। বানে কাঠপাতার জ্বালানিতে নয়, কয়লার জ্বালে চারকোণা চার ডাণ্ডাঅলা খুলিতে তালডাঁটা দিয়ে সদাই নাড়তে হবে। পাক চিনতে না পারলে মোয়া তৈরি করা যাবে না। সামান্য একটুর জন্যে এস্‌পার ওস্‌পার হয়ে যাবে। গুড় ঘষে ঘষে সাদা হলে কিছু মালমশলা মিশাতে হয়। খাঁটি ঘি, কর্পূর, কাবাবচিনি এইসব। ফলতা থানার রায়চকের লোকেরা তালের গুড়ের একরকম পাটালী করে সাদা সন্দেশের মতন—চকচকে কাঁচ যেন—টুস্‌কি মারলে খনখন করে বাজে—ভিতরে নরম মজাদার! দেখ না, সফুরা মা আমার, মোয়ার নাড়ু পাকাতে ওস্তাদ! এ মোয়ার কি সুস্বাদ। খেয়ে দেখ 'নেস্‌পোত' একখান! এ যে আসলি কনকচূড়ার খই, গাওয়া ঘি আর নলেন গুড় থেকে তৈরি। এ মাল তুমি পাবে কোথা? গোপালবাবুদের নাকি অর্ডার আছে নিউ আলিপুরের ডক্টর-অমলেন্দু বসু মশায়ের বাড়িতে।'

'এখন অনেকে মরিচশাল ধানের খই ডালডা আর চিনির পানা মাখিয়ে ভেলি গুড় 'পাইল' দিয়ে 'জয়নগরের মোয়া' তৈরি করছে! তখন ছিল বাওয়ালীর শখের বাজারের গজা—কাকে নিয়ে যাবার সময় যতটুকু সে ধরত ততটুকুই তার পায়ে খসে যেত, কলকাতায় যেমন ভীমনাগের সন্দেশের নাম আছে কিন্তু বাজারে একবার নকলী মাল উঠলে আস্‌লীরা আর পাত্তা পায় না।'

'পাঁচ সিকে যদি মরিচশাল ধানের খই হয় তবে কনকচূড়ার খই হবে তখন আড়াই টাকা কেজি। আড়াইশো টাকা কুইন্টল। কনকচূড়ার খই দিয়ে গাওয়া ঘি, কিসমিস, কর্পূর, নলেনগুড়ের তৈরি মোয়া গালে ফেলে আলতো করে একটু চাপ দিলেই গলে যাবে। আট আনা খরচা পড়বে একটা নাড়ুতে। বাজারে চার আনার যে নাড়ু, তাতে ভেলিগুড় আর ডালডা আর চিনি ছাড়া কিছু থাকে না। মেখে মুঠো করে মুটিয়ে দেয়। আসলী জয়নগরের মোয়া খেতে হলে টাকা চাই।'

দশ হাঁড়ি মাল তৈরি হলে রাত দশটার পর গোষ্ঠ উঠলে তাকে পাঁচ গণ্ডা মোয়া বখশিস দিলে রহিম মোল্লা। কলাপাতায় করে গামছায় বেঁধে নিয়ে অন্ধকারে শীতে কাঁপতে কাঁপতে চলে গেল গোষ্ঠবিহারী মণ্ডল। মোয়া পেয়ে তার বউ হেঁতালী দাসী আজ খুব খুশী হবে। তাকে নাকি বাঘের খেলা দেখাবে আজ 'আত্তিরে'!

শামদ্দি জেলে এবং সমুদ্র

বঙ্গোপসাগর—নীল জল আর নীল আকাশ—সীমাহীন মহাবিস্ময়ে একাকার।

সমুদ্রের কিনার!

ভয়ঙ্কর পরিবেশ। পেটের দায়ে বাঁচার লড়াইয়ে মানুষ হাড়ের মজ্জা গলিয়ে মেদমাংসের স্বেদ ঝরিয়ে রত্নগর্ভ সাগরের বুকে জাল পেতে যেসব রুপোলী সোনালী মাছ ধরে এনে তীরের বালি-রাশির উপরে ঢেলে রেখেছে সূর্যতাপে শুকনো করার জন্যে, সেখানে সামুদ্রিক অথবা নিশাচর অরণ্যচারী প্রাণীরাও আসে পেটের দায়ে—প্রাণের লড়াইয়ে। ভয়ঙ্করতার এ পরিবেশ অনেকটা মানুষেরই তৈরি এখানে। তাই পা ফেলতে হলে চার-চোখ মেলে তাকাতে হয়। নইলে পদে পদে বিপদ। মরণ ওৎ পেতে আছে।

সমুদ্র ঢেউয়ের পাহাড় ছুঁড়ছে শত শত, প্রতি মুহূর্ত, লোফালুফি করছে, ভেঙে ছিটিয়ে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। ফেনা ওগরাচ্ছে গর্জমান ভয়ঙ্কর সমুদ্র। মহা-ভীমকান্তি। তবু সামান্য মেদমাংসের পিণ্ড ক্ষুদ্র মানুষ সেই ভয়ঙ্করকে দুঃসাহসে জয় করে নৌকো নঙ্গর করেছে তীরে। বাতাসে প্রচণ্ড ঝড়ের বেগ,

মেঘের চিকুর, বজ্রপাত, অন্ধকার সাগরজলে বাড়বানলের বিস্ময়কর আগুন-খেলা—তবু কম্বল-কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমোতে হয়—হাড় কাঁপতে থাকে কনকনে ঠাণ্ডায়—বুকের ভেতরে গুরগুর করে—প্রাণপক্ষীটা কাঁপতে থাকে কবুতরের মতন। কয়লা ধরিয়ে আঁচ জ্বালিয়ে কাঁচা জনারী পোড়াবার মতন করে হাত পা সেঁকতে হয়। ধেনো, চোলাই ঢালতে হয় গলায়। অকাল বর্ষণ থেমে গেলেও মাঝি শামদ্দি বিড়বিড় করে :

'মাথা খারাপ শালা 'আগাশ'টার! কি দরকার ছ্যালো এখন এই পোষমাসে পানি হবার? মাছগুলো সব পচবে। আর ঐ পচা গন্ধে রাজ্যের জীবজন্তু, কাকপাখি জুটবে।'

ফ্ল্যাশ লাইট ফেলে তীরভূমিটা দেখে নেয় শামদ্দি। বড় বড় ক'টা কচ্ছপ উঠেছে আড়ায়। শিয়াল, খ্যাকশিয়াল, ভোঁদড়, ভাম, উদবিড়াল, গোহাড়গেল, সমুদ্রে-কাঁকড়া, সাগরবিছা জুটেছে ওখানে। কুমীর এগিয়ে চলেছে পায়ে পায়ে হেঁটে হামাগুড়ি দিয়ে। সবাই এখন আত্মীয়। আহার টেনে নিয়ে চলেছে যে যার ডেরায়। বাঁশের চেরা ফটকায় বারকয়েক শব্দ করতে কিছু জীবজন্তু ছুটে পালাতে চেষ্টা করলে। কয়েকটা কুমীর শুয়ে পড়ে মাছ চিবোচ্ছে—নড়বার নাম নেই। শামদ্দি বলে, 'খা শালারা, কত আর খাবি, আল্লার মাল, তোরাও আল্লার জীব, 'প্যাট' ভরে খা।'

শামদ্দির জোয়ান বেটা গহর আলি বলে, 'যাব, শালারগুলোকে লাঠি দিয়ে খুঁটিয়ে 'ঠেঙা' করে দিয়ে এসবো বাজী?'

শামদ্দি বলে, 'যা-না, সিদ্‌নে ওবে কেজি দুয়েক একটা সমুদ্দুরে কাঁকড়া দাড়া বাগিয়ে তাড়া করতে 'বাজী গো' 'বাজী গো'—বলে চিল্লাতে চিল্লাতে পরাণ লিয়ে 'পেলিয়ে' এলি কেন? শুনছুঁচের পানা সাগরবিছের হুলে পা-তুলে দিয়ে তার কামড় খেয়ে তিনদিন পড়ে রইলি জ্বর হয়ে—তুই জানিস কি—তোর মতন বোকার মুণ্ডু কচ্ছপেও মুচড়ে খাবে—খালি গতরে বল থাকলেই তো হবে না—মাথায় বুদ্ধি থাকাও দরকার।'

গহর কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে এবার। কুয়াশায় চারদিক ঢেকে আসছে। বিরাট আকাশ-জোড়া নক্ষত্ররাশি ঝিলমিল করতে থাকে মেঘ কেটে গেলে। কোন্ উন্মন মায়াবিনী তার নীলাম্বরীর শিথিল আঁচল টেনে ধূসর ধূলির ছায়াপথ এঁকে চলে গেছে কে জানে, কোন্ অনন্তের অভিসারে, আকাশ পাড়ি দিয়ে। পাশের নৌকোয় লোকগুলোও জেগে গেছে। আলোতে জোর

দিয়েছে—কথা বলছে। গহর বলে, 'মানুষকে সব শালাই ভয় করে। সাগরবিছে, কাঁকড়া আর সাপকে শুধু আমি ডরাই। বাঘ, কুমীর, কচ্ছপকে আমি ডরাই না। বাঘ যদি ধরে, শালাকে ঠ্যাং মুচড়ে, ল্যাজ ধরে আছড়ে মেরে ফেলব। মেরে শালার মাথা ফাটিয়ে ঘি দিলেই যেথা যেথা কামড়াবে-আঁচড়াবে ভাল হয়ে যাবে।'

পাঁচু ঘোড়ুই গলা ঘড়ঘড় করে শুয়ে শুয়েই। সে বলে, 'কেঁদো বাঘ, মেছো বাঘ হলে না হয় মদ্দামী দেখাতে পারিস, সোঁদরবনের বড় বাঘ হলে? যে তোর গলার নলী ছিঁড়ে দেবে—এক থাবা মেরে নাড়ীভুঁড়ি বার করে দেবে—এক ঝটকায় পিঠে তুলে নিয়ে চলে যাবে?'

গহর আর কিছু বলে না। নৌকোর খোলভরা সেলেমাছ, আড়ট্যাংরা, সিলং, বোয়াল, ঢ্যাং, লোটা ঘাগর, শিমুল, ইলিশ, পমফ্রেট, ভেক্‌টি, ভাঙা ভারুই, চাঁদা, চিলা—বহু রকমের মাছের আঁশটে গন্ধে গা বমি বমি করে। ওয়াক্ করে হড়হড় শব্দে অনেকখানি পিত্তি তুলে ফেলে গহর।

সবাই শুয়ে পড়ে আবার। পাঁচু বলে, 'আমার ঠাকুরদা বলত, 'জানিস পাঁচু, সাগরে যেতে গেলে সাগরদ্বীপ থেকে তিনভাঁটা নিচে যেতে হয়! তীরে মাছ ঢেলে রাখলে রাত্তিরে সেই মাছ খাবার জন্যে বাঘ-কুমীর তো আসেই, তাছাড়া অশরীরী অপদেবতা শাঁকচুন্নী ভূতপ্রেতরাও আসে! শাঁকচুন্নী হল মেয়েমানুষ! এসে নাকি নৌকোর কাছে দাঁড়িয়ে খনাখনা গলায় বলবে, এঁই গঁহর, মাঁছ দেঁ! মাঁছ নাঁ দিলে ঘাঁড় মটকে দোঁব!'

পাঁচুর কাছে সরে গেলে পাছে সে মনে করে ভীতু—তাই গহর কাঠ হয়ে পড়ে থাকে। শীতের ঠেলায় কাঁপতে কাঁপতে নন্দ মাঝি ভাঙা-কীর্তন জুড়েছে চিৎকার করে।

শামদ্দি বলে, 'ভূতপেত্নীর কথা মিছে। আমার কক্ষনো চোখে পড়েনি। তবে মানুষ অনেক কিছু বানিয়ে বলে। জানআলি বলে একটা লোক ছ্যালো মোর 'নৈকো'য়—সে ভেদবমি হয়ে মরে গেল সাগরের নোনাপানির হাওয়া সইতে না পেরে। তার সর্দি, রক্ত-আমেশা হামেশা লেগেই থাকত। সে অমনি আজান-গল্প বানাত। বলত, 'জানো চাচা, সাগরের পানিতে একবার আমি পীর বদরগাজিকে রুপোর 'আসা-বাড়ি' হাতে লিয়ে সোনার খড়ম পায়ে দিয়ে হেঁটে যেতে দেখেছি! পীরের গল্পটা না হয় সত্যি কিন্তন আর একবার বললে, রুপোর মতন চকচকে, বোয়াল মাছের মতন গা—একটা অপরূপ সুন্দরী

মেয়েমানুষ একেবারে উলঙ্গ—পানির ওপরে উঠে নাচতে লাগল পিদিমের শিখার মতন—তারপর টুব করে ডুবে গেল !'

পাঁচু ঘোড়ুই হিকিয়ে হিকিয়ে হাসতে লাগল। তারপর বললে, 'তা দাদা, এই সাগরে এসে সব কষ্ট সওয়া যায়, ঐ 'মেয়েমানুষ' না পাওয়া বা তার মুখও দেখতে না পাওয়ার কষ্টটা সওয়া যায় নে।'

আলিমদ্দিও জেগে ছিল। সে বললে, 'মোর বউটা তো শালা আগুনের হলকা ছাড়তেছে টানা 'নিশ্বেসের'! খালি দোরের বাজুর মাথায় মাটির 'কাঁতে' (দেওয়ালে) ঝুমকো ফুলের তারার মতন চুনের ফোঁটা দিচ্ছে সারি দিয়ে রোজ সকালে একটা করে। আর রোজ গুনে গুনে দেখতেছে গণ্ডা গণ্ডা করে! শালীর চেহারাটা যা না পাঁচুকাকা—শালা চাম্পিয়ান! ভুলতে পারিনি। খালি স্বপন দেখি আর শরীর খারাপ করে।'

হারান চিৎকার করে নৌকোর কাঠে চাপড় মারে—'শালা !'

শিয়াল ডাকছে দূরে—তীরভূমির পিছনের শরঝাড়, হোগলা, হেঁতাল, গেঁয়ো, হরকোচ-বনের মধ্যে। ফণীমনসার ঝোপটা ছবির মতন দেখা যায় অন্ধকার আকাশপটে।

বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বালুরাশি ধূ-ধূ করছে!

ভোর হয়ে গেল।

সবাই তখনো ঘুমোচ্ছে। দিনকে মানুষ ভয় করে না। কিন্তু শামদ্দির চোখে ঘুম নেই। বল্লম হাতে নিয়ে সে নেমে পড়েছে কুয়াশা-ঢাকা আলো-আঁধারির মধ্যে।

সূর্য উঠল অরণ্যের ওপারের আকাশ সাদা করে।

পাখিরা উড়ে চলেছে।

শামদ্দি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। আর এক পা ফেললেই সাগর-বিছের তীক্ষ্ণ গুনস্‌ুঁচের মতো লেজের হুলে পা ফেলত সে। হুলটা খাড়া করে বাগিয়ে বসে আছে জল থেকে উঠে এসে ডাঙায় কোনো শিকারের সন্ধানে। ছ-ইঞ্চি লম্বা ধারালো ঐ সুঁচটা পায়ের তলায় গেঁথে গেলে যন্ত্রণায় জীবন বার হয়ে যাবে। তাছাড়া হাফ-ডায়াল কাছিমের পিঠের মতো শক্ত আবরণীর নিচে থেকে করাতে দাড়া বার করে সঙ্গে সঙ্গে কামড়ে ধরবে বিছেটা! বল্লম দিয়ে উল্টে দিলে বিছেটা হুল নেড়ে মাটিতে বিঁধিয়ে দিয়ে উল্টে পড়বার চেষ্টা করতে লাগল। বল্লম পিঠে মারলেও বেঁধে না। অথচ তার নিচে

নরম প্রকৃতির বিছের মতো একটি প্রাণী বাস করছে! জলের মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে থেকে শিকার ধরে গেঁথে খায় লাঙ্গুল দিয়ে। প্রকৃতির কি বিচিত্র জীব সৃষ্টির খেয়াল!

বড় একটা পাথরের পাশ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ ফট্‌ করে একটা লাল সমূদ্রে কাঁকড়া বেরিয়ে পড়ে ওদিক থেকে এদিকে আড়াল হল। লোকটা শুধু হাতে থাকলেই তাড়া করত। পাঁচু ঘোড়ুই হলে হাতে গামছা জড়িয়ে নির্ভয়ে ধরে ফেলত। একবার তার হাতে একটা কাঁকড়া এমন চিপ্টে ধরল যে গামছা কেটে হাড়ে বসে গেল তার ছোট সাঁড়াশির মতো দাড়া। পাথরে ঠুকে কাঁকড়াটাকে মেরে ফেলেছে তবু দাড়া এমন মরণ-কামড়ে এঁটে গেছে যে ছাড়ানোই কঠিন।

খেলা জুড়ল শামদ্দি। কাঁকড়াটার সামনে বল্লমটা এগিয়ে দিতেই সে দাড়া দিয়ে কড়কড় করে কামড়াতে লাগল। তারপর শক্ত জিনিস দেখে ছেড়ে দিয়ে ছুটতে লাগল। শামদ্দি জোরে এক-ঘা সোঁটা মেরে তার দাড়া দুটো ভেঙে দিলে। সেখান থেকে খানিকটা এগিয়ে এসে দেখলে মাছগুলো ভিজে গেছে। দুর্গন্ধে শ্বাস টানা দায়। একটি বিরাট কচ্ছপ তখনো পড়ে রয়েছে, পেট ভরে আহার করে নিয়েও। কুৎসিত মুখটা বার করে আছে। বল্লম দিয়ে খোঁচা দিলে সে হাত-পা মুখ-চোখ লুকোল। ফোঁ ফোঁ করে গর্জন করতে লাগল। শামদ্দি পিছন থেকে গিয়ে তার পিঠে উঠে দাঁড়াতে সে গড় গড় করে টেনে নিয়ে যেতে লাগল জলের দিকে। লাফ দিয়ে নেমে পড়ে এক খোঁচা মারতেই ছুটতে ছুটতে কচ্ছপটা বেলাভূমি পার হয়ে গিয়ে ঝপাং করে জলে পড়ে গেল।

বাঁশের উবি পুঁতে বিরাট ঘের দিয়ে তার মধ্যে মরা গরু ছাগল শিয়াল কুকুর ফেলে দিলে কচ্ছপরা জোয়ারের সময় আসে—আর খাদ্যের লোভে ভাটা পড়ে গেলেও সরে না, আটকা পড়ে যায়—তখন কচ্ছপ-শিকারীরা এসে তাদের ধরে নিয়ে যায়। তিয়োররা মাংস বিক্রি করে নগরে গঞ্জের হাটে-বাজারে, তাদের কাছ থেকে পাইকারী দরে কিনে নিয়ে গিয়ে। চণ্ডাল, ধাঙড়, মুচিরা এ কাজ করে। তাদের কীর্তিকলাপ দেখেছে শামদ্দি। সাগর-বিছেও ধরে নিয়ে যায় কেউ কেউ—বিক্রি করে শহরে—বাতের তেল হয় নাকি ঐ বিছে থেকে।

শামদ্দি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুকটি মাছ দেখছিল। বালি-জড়ানো ছড়ানো

মাছগুলো পা দিয়ে বল্লমের লাঠি দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছিল। জীবজন্তুতে মাছ খেয়েছে, আবার তারই উপরে পায়খানা করেছে। এক এক নৌকোর মাছ এক এক দিকে ঢালা আছে। অন্য নৌকোর লোকজন এল।

পরেশ হাজরা কাছে এসে বললে, 'ইস! তোমার যে বিস্তর মাছ হে স্যাঙাৎ। ভেকটি, ইলিশ, বড় চেলাও শুকোতে দিয়েছ যে দেখছি! আমি শুধু 'থর'-জালে ধরা রুপোপাটি, তেল-চাপ্‌টি, চিংড়ি, ফ্যাসা, বাচি, ট্যাংরা, পাবদা, ফলুই, তারুই, চাঁদা, বোম্‌লা—এই সব শুকুটি করতে দিইচি।'

সাগরের বাতাসে শামদ্দির লম্বা পাতলা দাড়ির গোছা উড়ে যাবার জন্যে আছাড়-কাছাড় খায়। দু-একটা কথা বলাবলি করে প্রাতঃকৃত্য সেরে এসে নৌকোয় উঠে আঁচের ধা:র বসে হাত-পা সেঁকে গরম করে, চা রুটি খায়। এক ঘটি করে নুন দেওয়া লাল চা চাই সকলের। বেলা নটার সময় আসে স্টীম লঞ্চ। তারা মাছ মেপে নেয়। শামদ্দি মাঝির সাতটা সেলে মাছ পড়েছে—দশ কেজি থেকে ষোল কেজি এক-একটা মাছের ওজন। মোট ছিয়ানব্বই কেজি। ছিয়ানব্বই টাকা। আর লোটা-ঘাগর চল্লিশ কেজি। কুড়ি টাকা। খোকা-ইলিশ দশ কেজি, কুড়ি টাকা। মোট দাম একশো ছত্রিশ টাকা। জালের দু বখরা, নৌকোর দু বখরা, মাঝির এক বখরা, দাঁড়ি চারজনের চার বখরা। তাহলে মোট ন-বখরা। পনেরো টাকা এগার পয়সা করে বখরা পিছু। সারাদিন সমুদ্রের সঙ্গে লড়াই করে পনেরো টাকা মাত্র পাওয়া গেল আজ। তবে শামদ্দির একার জাল-নৌকো-মাঝি আর ছেলে গহর দাঁড়ির বখরা নিয়ে ছ-বখরা। নব্বই টাকার মতন। অন্যান্য দিন একশো দেড়শো টাকা পর্যন্তও হয়। তবু সে আক্ষেপ করে: 'শালারা 'লঞ্চো' করে লিয়ে যেয়ে ফ্রেজারগঞ্জ, কাকদ্বীপ 'ডায়মনহাবড়া'য় তুলবে, হিমঘরে রাখবে, এক টাকায় কেনা মাল ২-টাকায় ছাড়বে। তাদের কাছ থেকে পাইকের দেশ-গাঁয়ের হাটে বরফ দিয়ে লিয়ে যেয়ে সাড়ে তিন টাকা চার টাকা কেজি বিক্রি করবে। আমরা সাগর ছেঁচে মুক্তো কুড়োচ্ছি, বাইরের লোক মজা মারতেছে।'

সবার নৌকো থেকে মাল নিয়ে লঞ্চ চলে গেলে রান্না-খাওয়া করে নেয় মাল্লা-মাঝিরা। কারো কিছুর অভাব পড়লে লঞ্চের খালাসী, কুলী-কামিনদের বলে দিতে হয়।

'হিমঘরের মালিক কে?' শুধোলে শামদ্দি উত্তর দেয়: 'লোকে বলে সরকার। আসলে কিন্তু কোনো মাড়োয়ার বাবু। সরকার কি এসব চালাতে পারে? চোর আর ঘুষখোরের হাতে সরকার আমাদের নাস্তানাবুদ। যেটা ভাল চলে সেটা বেসরকারী ব্যবসা-বাণিজ্য। আমাদের শির-দাঁড়া ঠিক নেই, খালি বলে থালা-ঘটি কল-কারখানা জমি-জিরেত সব সরকারে দিয়ে দাও। দেশের ভাল হলে নিশ্চয় দিতে হবে। কিন্তন চালাবে কারা? এদেশের সৎ ভদ্দরলোক মানুষরা? সরকারী সব ব্যবস্থা তারা কেমন চালাচ্ছে? আরে বাবা, আগে খাঁটি মানুষ হও, তারপর রাজ্যের মতন কঠিন ব্যাপারের ভার লিও। কাঁচা মাটির পাত্তরে মদ ঢেলে লাভ নেই। শামদ্দি মাঝি মূর্খ হতে পারে কিন্তু অকম্মাদের সে ঠিক চিনতে পারে! শালা, আমার যদি একখানা 'লঞ্চো' থাকত, মাছ ধরে পাহাড় করে ফেলতুম। এই যে একশোজন জেলে সাগরের সঙ্গে লড়াই কচ্ছি, গায়ের জামা নেই, কাপড় নেই, অন্ন নেই, হিমঘর নেই বলে মাল রাখতে পারিনি—এসব কে দেখে? মাইনে করা সরকারী লোক কি ওই তুফান ভরা সাগরে, এই কাঠের 'নৌকো' নিয়ে লড়াই করে সারা দেশের মানুষের মুখে রোজকার মাছ ধরে এনে যোগান দেবে? তারা তীরের চারপাশে ঘুরে বেড়িয়ে এসে 'রিপোর্ট' দেবে: সাগরে এ বছর মাছ নেই।—বারেক তারা তাই করে, নইলে আমাদের মতন গরীবদের ভাতভিত যেত!'

শামদ্দি কোনো দলের লোক নয়। রাজনীতি সে বোঝে না। সে কাজ চায়। ছেলেটা তার ষাঁড়ের মতন—মাথায় কিছু নেই—হাজার কথা বুঝায় কিন্তু কিছুই তেমন বোঝে বলে শামদ্দির মনে হয় না। মুখখিস্তি গালাগাল করলেও সে নীরবে ঘাড় চুলকোয়। ছাঁচিতেল চাপড়ায় পাথর-কোঁদা আবলুস-কালো চেহারায়।

'দরিয়ার পাচ পীর বদর বদর!'

সকলে হৈ মেরে পীরের নাম নিয়ে সমুদ্রে নেমে যায় নৌকো নিয়ে। জোর তুফান চলেছে। নদীতে তিন ভাঁটার টানে যতদূর যাওয়া যায় তত দূরে এসে সকলে মোটা মোটা দড়ির সেলেমাছ-ধরা জাল নামিয়ে দেয় পঞ্চাশ 'বেঙ' (দুই বাহু দুদিকে প্রসারিত করলে যতখানি হয় তাকে এক 'বেঙ' বলে) নিচে। উল্টো দিকে মুখে বাঁশ লাগিয়ে দিয়ে চোঙা মতো বিশাল-চূড় 'থর' জাল নামিয়ে দেয়। এলোপাথাড়ি কাজ করলে শামদ্দি তার ছেলে গহরকে

গালাগালি করে। তার মা-মাসি উদ্ধার করে। নৌকোর ঢেউয়ের তালে তাল রেখে ঢেউ কাটিয়ে ধাক্কা বাঁচাতে শিখতে হয়। হাল কষে শামদ্দি। প্রলয়ঙ্কর বারিধির রণোন্মাদ উচ্ছ্বাস। চিৎকার করলেও শোনা যায় না—ইশারায় কথা বলতে হয়।

মোটা তার বাঁধা জালের মুখপাতে চচ্চড় কড়কড় করে শব্দ ওঠে। নৌকোকে টেনে নিয়ে চলে সমুদ্রের মাঝের দিকে। আবার কোলের দিকে ঠেলে আনে। দূরে যতদূর দেখা যায় সমুদ্র আর আকাশ এক হয়ে গেছে। মোচার খোলার মতো বিন্দু বিন্দু নৌকোগুলো ভাসছে। পানপায়রা আর গাঙচিল উড়ছে পাক খেয়ে খেয়ে।

হারান শুধোয়, 'আচ্ছা শামদ্দি-দা, এই সাগরের কূল-কিনারা কেউ করতে পেরেছে?'

শামদ্দি বলে, 'দরিয়ার পীর আর আল্লা ছাড়া এ্যার কেউ হদ্দহদিস বলতে পারবে নে।'

পাঁচু ঘোড়ুই একটু লেখাপড়া জানে। সে বলে, 'কূল-কিনারা আছে, পৃথিবীর বাইরে তো চলে যায়নি। এই বাংলার মাটি শেষ—তারপর জল আর জল—বঙ্গোপসাগর তারপর ভারত মহাসাগর—তারপর দক্ষিণ মহাসাগর—তারপর কুমেরু অঞ্চল—ভূগোলে এই সব কথা বলে। কুমেরুতে এখন লোক যায়। সাগরের তলায় কি কি আছে বিজ্ঞান জানে।'

শামদ্দি বলে, 'তোর মাথা! আচ্ছা, কই বলুক তো দেখি, সমুদ্দরের কুন-খানটা থেকেন জোয়ার-ভাটা ওঠে? বলুক তো দেখি, মায়ের পেটে কি ছেলে আছে? বলুক তো দেখি, কার কবে কোথায় কখন মরণ হবে? ওসব খোদা-অলি কাজ! দরিয়ার পীর বাবা বদরগাজি নাকি আমার ঠাকুরদাদাকে খোয়াব দেখিয়ে বলেছ্যালো এই সাগরের ওপারে হাজার লক্ষ যোজন দূরে কোকাফ রাজত্ব আছে। সেখানে শুধু অন্ধকার। জীন পরীরা থাকে।'

পাঁচু হাসে। বলে, 'পীর দেবতার নামে মিথ্যে কীর্তি-কাহিনী মানুষেই তৈরি করেছে। আজগুবী গল্প বোকা মানুষরা ভালবাসে—যেমন শিশুরা ভালবাসে। মূর্খ মানুষরা অনেকখানি সরল শিশু-প্রকৃতির। কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা কখনো প্রমাণ না করে আজগুবী গল্প বলবে না।'

শামদ্দি বলে, 'খোদা ছাড়া সম্পূর্ণ জ্ঞান কারো নেই, এই দুনিয়ার কাছে সবাই আমরা শিশু। এই সাগর, আকাশ, বন, মাটি, সবই আমাদের

কাছে আজগুবী গল্প—মজাদার মহাভারত—কেউ পড়ে সায় করতে পারে না।'

আকাশের মাথা পার হয়ে যায় সূর্য।

জাল টেনে তুলবার সময় গহর, পাঁচু, হারান, আলিমদ্দি যেন লড়াই করতে থাকে। এলো গা থেকে তাদের ঘাম গড়িয়ে পড়ে। গহর হাঁফাতে থাকলে শামদ্দি বলে, 'এই রকম করে টান—এই রকম করে!'

সহসা ভীষণ বেগে টান ধরল জালে। মোটা কাছি তবু ছাড়ে না শামদ্দি। হাতে কাছি বসে গেল নৌকোর কাঠের সঙ্গে সেঁটে গিয়ে। তারপর হঠাৎ ঝাঁকানি খেলে নৌকোটা। হাত কেটে ছড়ে চামড়া 'উদ্‌ড়ে' গিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল। হাতটা গালে পুরে রক্ত চুষতে লাগল শামদ্দি। তার দাড়ি বেয়ে রক্ত ঝরে পড়তে লাগল। তবু তার কী আনন্দ! বললে, 'পাঁচু, মাছ পড়েছে! শালা, বড় বড় সেলেমাছ, জাল ভরে গেছে, কী রকম করে চোঁচা টান মারতেছে খালি দেখ! যাক শালা, ভাসিয়ে নিয়ে যাক এখন। কেরদানি মরুক। হাল্লাক হোক বাছাধনরা। সিদিনের মতন হাঙর, কুমীর, শুশুক পড়ে জাল না ছেঁড়ে আবার। একঘটি পানি আন গহর। পিয়াসে ছাতি ফেটে গেল মোর।'

কিন্তু জালায় নাকি জল নেই! তা কেমন করে হবে? শামদ্দি বলে, 'পানি তো কাল সন্ধ্যেয় দেখিচি কলসী-দুই ছ্যালো। তাহলে জালা ফুটো হয়েছে ঘটির ঘা লেগে? তুই তো পানি তুলে ছেলি গহর। শালার পো-র মন কি কাজের দিকে আছে, ঘরের দিকে ছুটেছে। জোয়ান বউ ঘরে থাকে যার তাকে সাগরে যে আনে সে শালা, তার বাপ শালা! এখন কি 'পেচ্ছাব' করে খাব?'

বেলা তিনটের সময় সকলে জাল তুলে ফেললে। সত্যিই শামদ্দির আন্দাজ ঠিক। বড় বড় সেলে, আড়, লোটা-ঘাগর মাছ পড়েছে তাদের জালে। একটা খোড়ো-ভেকটি পড়েছে মণখানেক হবে। সেলেমাছ পড়েছে উনিশটা। পাঙাশ পড়েছে কয়েকটা বাগাতোক গোছের। জাল তোলার পরেই ওরা দাঁড় বেয়ে জোয়ারের টান ধরে তীরের দিকে চলে আসতে লাগল পঁচিশখানা নৌকো নিয়ে—সকলেই। জ্যান্ত মাছগুলো জাল সমেত নৌকোর খোলের মধ্যে ধড়াস ধড়াস শব্দ করে। নৌকো কাঁপিয়ে আছাড় খাচ্ছে। শামদ্দি গলায় মদ ঢালতে লাগল। তার ছেলে গহরও।

পরেশ মাঝির নেশা ধরেছে। সে নাচছে। কাপড় খুলে পড়ে যাচ্ছে। তাকে ধরে আছে দুজনে—পাছে সাগরের জলে পড়ে যায় ঝপাং করে। ভীষণ বেগে নৌকোগুলোকে টেনে আনছে জোয়ারের স্রোত, মোহনার দিকে। পাল তুলে দিয়েছে সকলে।

সন্ধ্যা পর্যন্ত তীরে এসে ভিড়ল নৌকোগুলো। জাল থেকে মাছ ছাড়িয়ে কুঁচো মাছগুলো চরের উপরের বালিতে ঢেলে দিয়ে এল সকলে। নৌকোয় এসে গা-হাত ধুয়ে-মুছে প্রথমে চা-রুটি খেলে সবাই। পাশের নৌকো থেকে জল ধার নিলে শামদ্দি দু-কলসী।

রাত্রে মাছ ভাত আর তেঁতুল-গোলা-জল খেয়ে সকলে কাঁথা-কম্বল মুড়ি দিলে। অঘোর নিদ্রায় তাদের চৈতন্য হারিয়ে গেল।

টিমটিম করে আলো জ্বলছে প্রতিটি নৌকোয়। ছামাড়-দরমা-হোগ্‌লা-ঘেরা টোঙের মধ্যে সবাই ঘুমোচ্ছে। ঢেউ আছাড় খাচ্ছে ভাষাহীন বিষম আক্রোশে।

শামদ্দির সহসা ঘুম ভেঙে গেল। তার মাথার কম্বলের উপরে কিসে যেন কড়কড় করে নখ ফুটিয়ে আঁচড়াচ্ছে না? বাঘ না কুমীর?

হঠাৎ সে পায়ের দিকের সমস্ত কাঁথা-কম্বল উল্টে এনে চেপে ধরতে গেল জিনিসটাকে। চেপে ধরেও:ছ সে। পাঁচু গাঁকগাঁক করে উঠল।

শামদ্দি বলে উঠল, ‘ধেৎ তেরি শালা! তোর হাত? মুই মনে করি কুমীর, না হয় বাঘ?’

পাঁচু উঠে বসল। সে নাকি স্বপ্ন দেখছিল। তার বউ নাকি তার গলা জড়িয়ে ধরে বলছিল, ‘তুমি সাগরে ছিলে, আমি গঙ্গাসাগরের মেলায় গেছিনু —সেখেন থিঙে কদ্দূর গা—দেখা করলে না কেন?’

‘তা বউ মনে করে আমাকে তুই জড়িয়ে ধরবি! বেটা গহরটার পাশে তো শোবার উপায় নেই! সে শুধু ‘লতিমন লতিমন’ বলে আমাকে পাঁঝা করে ধরে! চল্ সব কাল বাড়ি চলে যাই। খোরাকীও পেরায় ফুরিয়ে গেছে। আর আমার ষাট বছরের বুড়ো হাড় কাঁপতেছে।’

পাঁচু পাগলের মতন হঠাৎ শামদ্দিকে জড়িয়ে ধরলে। আবেগে গদগদ হয়ে শুধোলে, ‘সত্যি শামদ্দি-দা যাবে? কালই বাড়ি ফিরবে?’

‘পাগল না মাথা খারাপ! মেয়েমানুষের জন্যে ঘরে ফিরে যাবি? এখন সবে মাছ পড়তে শুরু করেছে। যিদিন তিনটে মাছ পড়বে সিদিন চলে যাব।’

পাঁচু আবার শুয়ে পড়ল। চুস্‌ করে। মরার মতন।

ঘণ্টাখানেক পরে আবার ঘুম ভেঙে গেল শামদ্দির। দেখলে পাঁচু কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। সে কি!

'কি হয়েছে তোর পাঁচু?' আদর ভরা গলায় শুধোলে শামদ্দি।

পাঁচু কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'ছেলেমেয়েদের জন্যে বড্ড মন কেমন করছে, শামদ্দি-দা।'

শামদ্দি আর কিছু বললে না। আজ দীর্ঘ একুশ দিন। এই নির্মম নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর পরিবেশ। অসহ্য কষ্ট। মানুষ তো দুর্বল হবেই। শামদ্দিরও চোখে জল এল। একটা দৃশ্য তার মনে পড়ল। আসবার দিনে বাইরে এসে গহরের জন্যে অপেক্ষা করছিল। হঠাৎ জানালা দিয়ে চোখে পড়ল গহর আর তার বউ দুজন দুজনকে জড়াজড়ি করে কাঁদছে।

সহসা শামদ্দি বললে, 'চুপ কর পাঁচু, কালই চলে যাব। ঢের হয়েছে, লোভ করে লাভ নেই। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। আত্মা হল ভগবান, সে যখন কাঁদছে, চল্‌ শালাকে মুক্তি দিই!'

পাঁচু বললে, 'আসবার সময় মা কালীর দিব্যি শামদ্দি-দা, বড় মেয়েটার টায়ফয়েড জ্বর দেখে এসেছিলুম। ওষুধ-পথ্যের পয়সা দিয়ে আসতে পারিনি, গিয়ে দেখব হয়তো মেয়েটা মরে গেছে। থাক তার চেয়ে বরং যেয়ে কাজ নেই!'

শামদ্দি আর কি বলবে ভেবে পেলে না। চুপচাপ বসে রইল পাথরের মতন।

সাগরের জলের পাহাড় ভেঙে পড়তে লাগল শুধু সারারাত তাদের নৌকোর গায়ে একটানা।

কাঠ কাটে কাঠুরে

গাছপালা সব উজাড় হয়ে গেল দেশ-গাঁ থেকে। বড় বড় মোটা গাছ, যাদের মহীরুহ বলা হয়, যারা মেঘ থেকে নাকি বৃষ্টি নামায়। আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতা প্রাকৃতিক সজীবতাকে গ্রাস করে,—সবুজ মাটিকে মরুভূমিতে পরিণত না করলে বাঁচি! গ্রামের লোককে এখন রেশনের ব্যাগ হাতে নিয়ে বাজার করতে

বেরুবার সময় একটা কয়লার থলেও সঙ্গে নিতে হয়—জ্বালানী কাঠের অভাব! কয়লা না আনলে উনোন জ্বলবে না। ঘুঁটেরও দাম বেশি। কেরোসিনের সেল ট্যাক্স! অথচ বজবজের কেরোসিন কোম্পানির ডিপোতে বছরে কয়েক লক্ষ কাহন খড়ের যোগান দিতে গিয়ে চাষীরা যখন ৪০ টাকা কাহন দরে খড় কিনে গরু পুষতে না পেরে কসাইখানায় বেচে দেয় তখন ঘরে ঘরে বাড়তি গরু না থাকলে গোবর পাবে কোথায় যে ঘুঁটে সস্তা হবে—জমিতে সার দেবে? তবু গাছপালা যখন শহরের চেয়ার, টেবিল, শো-কেস, ফার্নিচার, চায়ের পেটি, জুতোর হিল, চামড়া কাটার চকোর, মাংস কাটার চকোর, গাড়ির বডি পাটাতন, জেটির পাটাতন, রেলের পাডন, খেলনা, রেডিও-ক্যাবিনেট ইত্যাদি তৈরির জন্যে প্লাইউড, থ্রি পিস উড ফ্যাক্টরী, বাটানগর সু ফ্যাক্টরীতে প্রতিদিন হাজার হাজার গাছ টুকরো-টাকরা হয়ে, চকোর হয়ে চলে যাচ্ছে—দক্ষযজ্ঞের এ মহা-কাষ্ঠযাত্রা রোধিবে কে?

সরকার বছরে একটা পার্বণ করেন। বন-মহোৎসব বা বৃক্ষরোপণ পার্বণ। গাণিতিক পরিসংখ্যান অনুসারে যত গাছ কাটা হয় তার চাইতে বেশি না হোক ততগুলিও রোপণ করা হয় তো? নাকি এ শুধু মহাজনের সদিচ্ছা! একান্ত প্রকৃতি-নির্ভর এই সদিচ্ছায় যদি সজীবতা আর না বাঁচে তবে কি জনগণের অনিয়ন্ত্রিত স্বেচ্ছাধীন 'জঙ্গল আবাদ করো' নীতির প্রগতিশীল পাল্লাটার উপরেই পাথর চাপানো হবে? মুনি-ঋষিরা মহীরুহের বীজ বা চারা রোপণ করতেন, মহীরুহ কাটতেন না, কেননা তাঁদের সেই আকাশ আচ্ছাদনকারী অরণ্যকাননেই আশ্রম বেঁধে থাকতে হত। বেল, বট, নিম, জগী ডুমুর (শমিধ), অশথ, পাঁকুড়, কদম্ব, আমলকী, হরিতকী, আম, ঝাউ ইত্যাদি গাছ নাকি কাটতে নিষেধ ছিল। এসব কুলবৃক্ষ। কাটলে পাপ হয়। পোড়াতে নেই। তাই আজো ধর্মে-মতি-হারায়-নি এমন কোনো কোনো হিন্দু পরিবার কখনো এসব গাছের ডালপালা পর্যন্ত কাটে না। দেবজ্ঞানে এসব বৃক্ষকে পুজো করে। কিন্তু অর্থনৈতিক ভারসাম্য হারিয়ে যেতে এবং বৈজ্ঞানিক সভ্যতার কল্যাণে মন সংস্কার-মুক্ত হতেই আমাদের সব বাঁধন আলগা হয়ে গেল। বেলের যে কি অসাধারণ উপকার তা ভুলে গিয়ে পুরনো মোটা গাছ, বেশি দাম দিচ্ছে ধনরদ্দি সেখ, একটা তেঁতুল গাছের তিন শো টাকা দাম দিচ্ছে সাধু মল্লিক—অতএব দাও, বেচে ফেলো। করাত চলুক করররর ক্যাস—ফররর ফ্যাস শব্দে!

বড় বড় বেল, বট, অশথ, নিম, সবেদা, কাঁটাল, আম, জামরুল, লিচু, আঁসফল গাছের গোড়ায় যখন করাত টানা হয় তখন আমার যেন মনে হয় হিন্দু মুনিঋষিদের হাড়ের উপর দিয়ে তা চলেছে নির্মমভাবে!

আমাদের আধুনিক লাট-বেলাট মন্ত্রী-অফিসার-প্রফেসার, এমন কি সাহিত্যিক কবিদেরও সিংহাসন দরকার! কিন্তু তাঁরা আধুনিক যান্ত্রিক যন্ত্রণার হাতের যতই শিকার হন তবু তাঁদের বাৎসরিক বৃক্ষ-রোপণের বৈদিক ঐতিহ্যকে স্বীকৃতিদানের মাঙ্গলিক আচরণ দেখে ঋষিরা ঈষৎ খুশীও হতে পারেন এই কথা ভেবে যে ব্যাটারা একেবারে অকৃতজ্ঞ নয়!—ছেদন তাঁরা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলেও রোপণের প্রয়োজন দার্শনিক বা সাংস্কৃতিকভাবে বোঝেন! ধর্মকৃত্য না করে ব্রাহ্মণ বা মোল্লাকে ভোজন করিয়ে কিছু দান দক্ষিণা ধরে দিলেই মোক্ষলাভের ব্যবস্থা তাঁরা করে দেবেন। এর পরে আর আধুনিক অর্থনৈতিক জটিলতার দিকে তোমরা অগ্রসর হয়ো না। বড়জোর না হয় যে বেলগাছটা বেচে দিয়েছ ছেলেমেয়ের কলেজের মাইনে দেবার জন্যে, ব্রাহ্মণ ডেকে তার গোড়ায় পুজো দিয়ে দাও!

কিন্তু সাধু মল্লিক বলে, 'হিন্দুরা গাছ পুজো করে কেন এবার বেশ বুঝতে পারছি! সব গাছ আমরা সাবাড় করে দিচ্ছি। ফলে জ্বালানী কাঠের দাম আক্রা হয়েছে। কর ব্যাটারা, এবার কয়লাকে পুজো কর। ওটা খনির মধ্যে ছিল বলে সন্ধান পায়নি, পুজোর বিধান দেয়নি তাই। আগে নাকি হিন্দুদের বিয়ে করবার আগে গাছ বসিয়ে, মানে 'বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা' করে তাকে বিয়ে করতে হত, সেই গাছ আর কখনো কাটা হত না। গাছ ফল দিলে তবে তো তোমার সন্তান-বালবাচ্চা পালন হবে—তারপর বিয়ে কর। এখন ইটের পাঁজা পুজো করে! পাকা ঘর হবে, 'ইলেকটিলিক' আসবে, 'হিটারে' রান্না করবে! বেশি সভ্য হলে গাছ, কয়লাও তখন বিদেয়! কিন্তু তেঁতুলগাছ আর পাই কোথা? মানুষ দিন দিন জুতোয় অভ্যস্থ হচ্ছে বেশি করে। একটা লোকের তিনজোড়া জুতো চাই। বাটানগর নতুন নতুন জুতো আবিষ্কার করছে। সভ্যতা যত বাড়বে জুতোর কদর তত বাড়বে। তাই জুতো তৈরি করতে গেলে তেঁতুলগাছ চাই। তেঁতুল-কাঠের চকোর না পেলে কিসে চামড়া কাটবে? হিল তৈরি হবে মেয়েদের হাইহিল জুতোর? হাইহিল না পরলে মডার্ন লেডিদের পাছার বাহার খুলবে কেন? তার জন্যে চাই আস্ত গাছ। ভাবনা নেই, তাদের পোয়াতিকালে তেঁতুল না হলেও আঙুর আনারস হলেও চলবে, কিন্তু

সাধু মল্লিক এখন বিশেষভাবে ভাবিত বাটানগরের সাপ্তাহিক এক লরী ৩০০।৪০০ খানা তেঁতুলের চকোর কোথা পায়! ৪ টাকা ২০ পয়সা প্রতিটি চকোরের দাম। চাঁদি ১৪ ইঞ্চি, বেড় ৩ ফুট ১১ ইঞ্চি। ফাটা কাটা বাদ। বাটার বাবুদের চোখে ময়ূরের তারা লাগানো আছে। পাকা বেল, সাঁইবাবলা, বাবলা, কতবেল, কাঁটাল, করোমচা যাই হোক—ঠিক ধরবে তারা। বলবে, 'সাধু মল্লিক, অসাধু কাজ তুমি করলে আমরা অন্য লোককে কনট্রাক্ট দিয়ে দোব!' অতএব সাধু সাবধান। বেটারা ঘুষও নেবে না! এখন তেঁতুলগাছ পাই কোথা? ওদিকে বেহালা, ঠাকুরপুকুর—এদিকে ভাসা, পৈলান, আমতলা, সরষের হাট, সরার হাট, ফলতা রায়পুর, আছিপুর নিয়ে বিরাট কয়েকটি থানা এলাকায় আমি আজতক বিশ বছরে আর পুরনো তেঁতুলগাছ রাখিনি প্রায়। নামমাত্র দু-একজনের আছে, যারা বেচতে চায় না—টাকার অভাব নেই। বাটার এই 'কনটাক্‌সো' যখন ধরি, তখন মোর কাছে কি ছিল? কাবুলীর কাছে দেনা করনু। ৭০ টাকা করে করাত কিননু দু-খানা। সেহাই, দেউলী, খানেবাটি গাঁয়ের মুসলমান ছোঁড়া-বুড়োদের কাঠুরের কাজে লাগানু। মুই তো এক কলম লেখাপড়া জানি নি হে—কই একটা বি-এ পাস ছোকরাকে লেস্থক তো দেখি, মোর সাথে 'চোপরায়' পারে কেমন? ওদের তো বইপড়া বিদ্যে! আমি ঐ সব বাবুদের সাথে মিলেমিশে কথা শিখিছি। আজ কংগ্রেসের দুর্দিন, নাহলে কংগ্রেসের হেন মিটিং হত না যেখানে এই সাধু মল্লিককে এ অঞ্চলের এম এল এ-বাবু নেমতন্ন না করত। ভোটের সময় তিনটে গ্রাম আমার হাতে। অতএব টাকা দাও। এখনো দশটা হাই স্কুল, জুনিয়র হাই স্কুল, মেয়েদের স্কুল, কত সমিতির আমি সেক্রেটারী, ভাইস 'পেসডেন', 'নেম্বর' আছি। কেন? চাঁদা দিই। নতুন নতুন বুদ্ধি দিই। খাতা খুলে দেখ, হাউড়ী, রানিয়া, সেহাই, ধঞ্চেবেড়িয়া, দোসতিনা, বারাতলা—কত স্কুলের আমি 'নেম্বর'। সাধু মল্লিককে হিন্দু মুসলমান সবাই চেনে। আমার 'উদ্‌ভট-চণ্ডী' শুনলে অনেক বড় বড় 'সংস-কাঁকড়ি' পণ্ডিত ব্যাখ্যা করতে মূর্ছা যাবে। শোন তবে একটা শ্লোক:

'বদরি কোটি মূল্যাঞ্চ
লক্ষ মূল্যাঞ্চ দাড়িম্ব,
শ্রীফল সহস্র মূল্যাঞ্চ
লাউ মূল্যাঞ্চ কড়া কড়া।'

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা যিনি বুঝবেন তাঁর শত বছর পরমায়ু হবে।'

চা দোকানে বসে বসে কাপের পর কাপ চা আর বাণ্ডিলের পর বাণ্ডিল বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে বক্তৃতা করে সাধু মল্লিক। মাথায় কদমফুলি ছোট ছোট চুল। চাকা মতো মুখ। গোল গোল চোখ। চোখে বিড়ালের চাউনি। গালের লেগামের কোণে সারা বছরই ফ্যাদফেদে সাদা ঘা। (সাধু মল্লিক বলে, শালাটাকে ভাল করা যায় না। ঝাল-তরকারি খেতে আমার বড্ড কষ্ট হয়। জিবে ঘা।) ময়লা ধুতি, ময়লা সার্ট গায়ে। গায়ে মুড়ি দেওয়া কম দামের রঙ-জ্বলে-যাওয়া চাদর। পায়ে কখনো বিবর্ণ ছেঁড়া জুতো থাকে, কখনো থাকে না। বাটা থেকে বিল ভাঙিয়ে সে হয়তো সেদিন ফিরেছে, গোছা গোছা নোটের তাড়া আছে তার পকেটে। জনধন, কবাতি, কাঠুরেরা বসে আছে দামকড়ির জন্যে তার পাশে। তাদের কার কত পাওনা সবই সাধু মল্লিকের মুখস্থ। তবু নেবু কচলায়। প্রাইমারী-স্কুলে মাস্টারী পাবার জন্যে তার পিছনে-পিছনে-ঘোরা নিয়ামত ছোকরাকে সে হয়তো বলে, 'হিসেব কর ত বাপ, ৪০০ চকোর ৪·২০ পয়সা করে দাম হলে কত হয়?'

নিয়ামত কাঁপতে কাঁপতে হিসেব করতে থাকে। বলে: 'এক হাজার ছ'শো আশী টাকা হয় চাচা।'

সাধু মল্লিকের ঐ পয়সার হিসেবটায় গোলমাল হয়। বাসে আসতে আসতে অনেকবার হিসেব জুড়েছে সে। পাঁচ কুড়িং শ'। পাঁচটায় এক টাকা। তাহলে চারশোয় কত? হদিস পায়নি। কিন্তু নিয়ামত চট করে করলে কেমন করে? বিলে তো তাই আছে! তবু বলে, 'কি দিয়ে তোরা লেখাপড়া শিখিছিস? ধান দিয়ে না চাল দিয়ে? পেনসিলের মাথায় থুথু দে। ঘাড় চুলকে নে। মাথায় গাঁট্টা মার!'

তাই হিসেবটা আবার দেখে নিয়ামত। জনেরা দেখে, বুঝি বিপদ ঘনায় এই। তাহলে সাধু মল্লিক মারবে এক লাথি!

আবার ঐ একই হিসেব দাখিল করে নিয়ামত। তখন ষোল-সতের জন লোক—সবাইকে চা দিতে বলে সাধু মল্লিক। বলে, 'পঞ্চাশ টাকা লরীর বাদ দাও, চারশো টাকার গাছ, মজুরী ডেলিতে গাছ কাটাই, গরুর গাড়ি ভাড়াতে দুশো টাকা, চকোর তৈরি করতে দুশো টাকা, আর মুড়ি বিড়িতে পঞ্চাশ টাকা—কত হল? ন'শো টাকা? আমার জনের দাম এক সপ্তায় ধর একশো টাকা। আমারও তো খরচা আছে? তাহলে হাজার টাকা হল

লাভ ছ'শো আশী টাকা? পারবে কোনো লেখাপড়া জানা লোক এক সপ্তায় এত টাকা কামাতে? কপাল চাই, ধক চাই। লেখাপড়া শিখে কেরানীগিরির জন্যে ধর্না না দিয়ে বুদ্ধিফিকির করে ব্যবসা করতে কি বাঙালী ছোঁড়াদের ব্যামো হয়? তা নয় শৌখিন হতে চায়, বাবু হতে চায়। সিনেমার নটনটীদের ফ্যাসানে চলতে চায়! রাস্তার কাজ, নৌকোর কাজ, কারখানার কাজ, মাঠের কাজ, খালাসীর কাজ, ইটখোলার কাজ—এসব কাজকে শিক্ষিত লোকেরা ঘৃণা করে—এসব কুলীর কাজ। কিন্তু কুলী খাটাতেও তো পার? পুঁজি নেই? পুঁজি কি ট্যাঁকে থাকে, না মাথায় থাকে?'

লোকেরা এবার টাকা চাইলে সাধু মল্লিক বক্তৃতা থামায়। চাদরের মধ্যে হাত গলিয়ে জামার পকেটের মধ্যে ইষ্টমন্ত্র জপ করার মতো আঙুলের মাথায় নোট গুনে নিয়ে টেনে বার করে দেয়: 'এই নে আলীবক্স মল্লিক, কুড়ি টাকা!'

ঠিক কুড়ি টাকাই বার করে আনবে সাধু মল্লিক—চারখানা পাঁচ টাকার নোট। ইউনুস মল্লিক ত্রিশ টাকা—ঐভাবেই টাকা বার করে আনে মল্লিক সাহেব। কেউ তাকে সব টাকা একসঙ্গে বার করতে দেখেনি কোনোদিন। অভাবে স্বভাব খারাপ হয়—ওদের নিয়েই অন্ধকার পথে যেতে হবে। তারপর একালের শ্রমিক মালিক সম্পর্ক! তার সব জনধনেরাই এখন গোপনে লাল-মার্কা। যাদের সে টাকা দেয় নিয়ামত নাম লিখতে থাকে। নূর ইসলাম মল্লিক, সাফি মল্লিক, মফিজউদ্দিন মল্লিক, রুহুল মল্লিক, নকুল মান্না, শম্ভু প্রামাণিক, জয়দেব আদক, বিশ্বনাথ ভৌমিক, গিয়াসউদ্দিন মল্লিক, শুভা মিদ্দে, সেরাফাত সেখ, সায়েম আলি মল্লিক, আব্বাস মল্লিক।

তিন-চারশো টাকা দেওয়া হয়ে যেতেই হঠাৎ মোড়ের মাথায় সাইকেলে চেপে কাবুলী গোলাম হোসেন এসে হাজির হল। সাধু মল্লিককে সালাম জানালে সে বেরিয়ে এসে হাঁটতে হাঁটতে মানুষজনের চোখের আড়ালে সরিয়ে নিয়ে গেল; দিতে হল তাকে দুশো-আড়াইশো টাকা। কাবুলী ঠিক খোঁজ রেখেছে সাধু মল্লিক আজ বিল ভাঙাবে। সে বাটানগরে ধাওয়া করেছিল। কিন্তু সাধু কিভাবে অসাধুর মতন সটকা দিলে খোদা জানেন!

ফিরে এসে সাধু মল্লিক আবার বসে। নিয়ামতকে খবরের কাগজটা পড়তে বলে। মন দিয়ে শোনে। কিন্তু বামপন্থীদের শরিকী কলহ তার ভাল লাগে না। কাগজ কেড়ে নিয়ে ফেলে দেয়। বলে, 'অনেক কাঠ বাদ গেল

চকোর কাটবার সময় তোরা এমন করলে আমি ব্যবসা তুলে দেব। শালা, আজ হাজার দু-হাজার টাকা আনন্নু, কাল নেই। চারদিকে দেনা। গাছ-পালার দাম পাবে কত লোক? তবু খোরাকী কিনতে হয় না। পাকাবাড়িটা গাঁথতে যেয়েই ফেল হয়ে গেনু। তারপর কার কন্যাদায়, কার মামলা, কার ইস্কুল, কার ছেলের বই, কার মাইনে, পুজোর চাঁদা, মিলাদ-মসজিদেব চাঁদা—নানান দান-খয়রাত লেগেই আছে। ভাবছি আমার নামে 'কনট্যাকসো' থাকবে, আমি মাল সাপ্লাই দোব—কিন্তু অ্যাসিসটাণ্ট 'কনট্যাকটার' লোব।'

সাধু মল্লিক এবার নাকি তাই করেছে। সে সাত গেরাম খুঁজে খুঁজে আর গাছ পায় না বলে তার ভাইদের উপ-ঠিকাদার তৈরি কবেছে। কাবুলীকে বলে-কয়ে তাদের ঋণের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। সে-ই লরী ভাড়া দিয়ে শুধু তৈরি মাল সপ্তাহে একদিন বাটানগর জুতা কারখানায় চালান দেবে। তিন টাকা করে চকোর পিছু পাবে তার ভাইরা। উপ-ঠিকাদার আসফ মল্লিক, আত্তর মল্লিক অথবা কছুল মল্লিক, বাবুর আলী মল্লিক। সাধু মল্লিক না গেলেও তারা মাল জমা দিয়ে আসতে পারে। মাল এনকোয়ারীর সময় সাধু থাকবে, সে-ই বিল ভাঙাবে ধ্যাবড়া মোটা বুড়ো আঙুলের টিপসই দিয়ে! কোনো কিছু ঝামেলা নেই আর। তিনশোখানা চকোর হলেই তিনশো ষাট টাকা। লরীভাড়া দেবে শুধু মানিক দাসকে পঞ্চাশ টাকা। তিনশো দশ টাকা সপ্তাহে উপায়।

আসফ মল্লিক বলে, 'আমাদের কিছু থাকেনে বাবু। যে টাকা খাটাই সেটাই উঠে আসে। একটা তেঁতুলগাছ দশহাত 'খাড' (কাণ্ড) হলে চাল্লিশটা চকোর বার হবে। একশো টাকা দাম। মজুরী যেটা লাগে ডালপালা বেচে হয়ে যায়। দু 'ঝাল' (দল) করাতি আছে। ডেলিতে চারজনকে সতের টাকা দিতে হয়। আর চকোর কাটবার সময় প্রতিটায় আশী পয়সা ফুরোন। তার মানে একশোটা চকোরে আশী টাকা। তেঁতুল গাছ আর পাওয়া যায় না। তাই থি পিস বা প্লাইউডের কাজও কচ্ছি।'

দাড়িওয়ালা ধনরদ্দি সেখ এল তার কাঠ-কাটা কাঠুরেদের নিয়ে চা দোকানে। তাকে দেখলেই লোকজন খেপায়। বলে, 'কই গো চাচা, একটা গান কর তো!'

ধনরদ্দি অমনি চিৎকার করে গান ধরে :

'আল্লা আল্লা কর বান্দা
নবী কর সার
নবীর কলেমা পড়ে
হয়ে যাবে পার।...

তারপর সে 'হেই হেই' করে তার যেমন মুদ্রাদোষ উড়ো চিৎকার করে। চাবুস চাবুস করে পান চিবোয়। বেশ মিষ্টি তার কথাবার্তা। খুব রসিক লোক। আদৌ লেখাপড়া জানে না কিন্তু কথাবার্তা চালচলন ভদ্র, বিনয়ী। ছেলেরা ধরে, 'চাচা আর একটা রসের গান গাও।' তখন ধনরদ্দি তার নিজের বানানো গান গায় :

'মেয়েরা সব বুক ফুলিয়ে
কোট কাছারী যায়,
তাদের চাপে গাড়ি-ঘোড়ায়
উঠতে পারা দায়!
মদ্দরা সব কচি খোকা
'ডুডু টামাক' খায়
রাজনীতির লঙ্কাবাজি
জেলে দেশ পোড়ায়!'

সে বলে, 'আমরা বাবা বাটায় কাঠের চাকা দিয়ে টাকা রোজগার করবার ভাগ্য করিনি। তারা সাধুকে ছাড়া অসাধুকে 'কনট্যাক্‌সো' দেয় না। তেঁতুল, নিম, বেল, কতবেল, করোমচা, আম, জাম, জামরুল, সাঁইবাবলা, গুয়ে বাবলা, অশথ, বট, পাঁকুড়, জিউলী, কদম, বাদাম, খিরিশ, সিরিশ, খেল কদম, মাদারী বা ড্যাপোর, চালতা, দেবদারু, শ্যাওড়া, পেয়ারা, সবেদা, আঁসফল, কাঁটাল, অর্জুন, শিমুল, বাটাং, বাবলা, লিচু, বকুল, জগীডুমুর, আমলকী, হরিতকী, মহুয়া, শিশু, গুলমোহর বা কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, সোদালী, কুকুরছড়ি, গাব, কুঁচলে প্রায় সব গাছ আমরা কাটছি। শুধু শাল, সেগুন, মেহগনি দামী গাছ কাটি না। ওসব গাছ এদিকে বেশি নেইও, শখের গাছ। সরকারের আছে, দরকার মতন কাটে। 'বিরিক্ষ' হল অন্নদাতা—তাই হিন্দু ভায়েরা পূজা করে। আমরা গাছ পূজা করি না। গাছ কেটে দেশ উজাড় করে দিচ্ছি। এখন আর দেশে শকুনে বাসা বাঁধবার মতন বড় গাছ আছে কি? আমাদের, প্লাইউডে আম

কাঠেরই কদর বেশি। আম গাছের গুঁড়িতে এখন 'ইলেকটিক্‌' করাত চলে, ফরফর করে পাতলা কাগজের মতন আঁশ ওঠে। সেই পাতলা কাঠ জমিয়ে চায়ের পেটি—আরো কত কি সব হয়। থ্রি পিস কাঠ তৈরি হয়। আমাদের কাঠের মাপ হল চার ফুট বেড, এক ফুট লম্বা—এর দাম আম কাঠ হলে সাড়ে সাত টাকা। অন্য বাজে কাঠ হলে ছ' টাকা ষাট পয়সা ফুট। আমরা গ্রাম থেকে মজুর খাটিয়ে গাছ কেটে এনে মেপে মেপে লরিতে তুলে দিই—যেখানে লরি না যায় ঐ দেদার বক্স গাড়োয়ান, কোবাদ, হানিফ আছে গরু ঠেঙিয়ে পাকা রাস্তায় এনে দেয়। মাল চলে যায় কলকাতার মানিকতলায়। সেখানে ছ'টা আটটা কাঠ চেরাই কারখানা আছে। আছে বেহালায়। এদিকে মাল দিই আমতলা, বজবজ, পৌঁকপাড়ি বা শ্যামপুর, চটার কাছের বাঁড়ুজ্জের হাটে। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ গাছ কাটা হচ্ছে প্রতিদিন। অনেক ঠিকেদার আমাদের মাল যোগাচ্ছে। যেমন চকবাঁশবেড়িয়ার আনসার মল্লিক আমাদের মাল দেয়—সে কলকাতায় নিয়ে যায় না। আরো সব অনেকে আছে।'

দেদার বক্স গাড়োয়ানের কাঠ বোঝাই গরুর গাড়ি এল। তার ছেলে নবী, কালো, বক্কার গরু তেড়ে গাড়ির চাকা মেরে পাকা রাস্তায় গাড়ি তুললে কাঠ নামিয়ে লরী বোঝাই হতে থাকে। তেজি বলদ দুটো ফেনা ভাঙতে থাকে জাবর কাটতে কাটতে মুখ থেকে। দেদারের ছেলে কালোর পরনে চুস্ত প্যাণ্ট। তার হাতে একটা জাপানী অলওয়েভ সেট রেডিও। বিবিধ ভারতীর গান হচ্ছে।

কয়লার লরি এসে বাঁধল গ্রামের চা দোকানের মোড়ে। কয়লার ইমারত সাজিয়ে নিয়ে ঝরিয়া কোলিয়ারী থেকে মাল আসছে। প্রতিদিন নাকি এই অজ পাড়াগাঁয়ের চার-পাঁচটি গ্রামে পাঁচ-সাত টন করে কয়লা লাগে।

গ্রামে আর জ্বালানী কাঠ পাওয়া যাচ্ছে না। গ্রামের সবুজ সজীবতা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন। নাগরিক সভ্যতার চকচকে শুকনো খোলসের মধ্যে আমাদের সমস্ত জীবনটা কাগজের ফুল না হয়ে যায়—হারিয়ে না ফেলি প্রকৃতিকে—এই ভয়। শহর স্বল্প মূল্যে যেসব কাঁচা মাল নিচ্ছে রাহুর মতো, তার বিনিময়ে বহু মূল্যে গ্রামকে দিচ্ছে নানান দ্রব্য ; তার আর্থিক ভারসাম্য বহন করতে না পেরেও যে চুপিসারে গ্রাম শহর হতে চাচ্ছে সে কি অভিশাপ, না উজ্জ্বল ভবিষ্যতের হাতছানি ?

বুভুক্ষা

রক্ত ঝুজিয়ে পড়েনি তখনো ভস্মমাখা ভোরের আকাশে। অন্ধকার গলি থেকে ময়লার স্তূপ ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে এসে এইমাত্র চৌপট্টির মোড় চেপে বসল খয়রন।

মাথায় শন-নুড়ি চুল। উকুন বিজবিজ করছে। পরনে জড়ানো ফালি-খানেক হাড়িকালি স্যাকড়া। ছেঁড়া ঢুলি ঢুলি। পায়ের ওপরে পা জড়ানো, অদ্ভুত-কালো একটি মাংসপিণ্ড কোলে। ককিয়ে ককিয়ে মাথা কুটছে—মুখ ঘষড়াচ্ছে মায়ের বুকেতে।

পুড়ে পুড়ে পোড়ামাটি নোনা সে-বুক—সাহারা!

কোনো আশ্বাসই নেই এক ফোঁটা অমৃতের!

কনুই পর্যন্ত গড়িয়ে বেড়ানো কাঁচের লাল চুড়ি দুখানা দুটি শীর্ণ কঙ্কাল হাতে। গিঁটে আঙুলের মুঠি পাকিয়ে বাঁদরের মতো দাঁত খিঁচিয়ে উঠে ধাঁই ধাঁই করে ঘা-কয়েক পেঁদিয়ে দেয় খয়রন তার বাচ্চাটাকে। বাচ্চা তো নয়—রক্তচোষা হাড়গিলে পাখি!

আঁকাবাঁকা হাতখানা শূন্যে চাগিয়ে রেখে এক ঝোঁকে বেশ খানিকক্ষণ সুর ধরলে সে:

'আল্লা তুম-কো রুজি দে গা
দে খোদা-কী রাহা মে'—

কিনকিনে গলায় শুনতে বেশ! গানের মতো ছন্দ কাটা। তাল মাপা।

ভোরের চাকর ঝাঁটা হাতে আবর্জনা ঠেলে এনে চোখ টেরিয়ে—গোলক-ধাঁধাঁ আংটিপরা হাতের আঙুলে 'ভনকেয়ারী' গোঁফে মোচড় দিয়ে জবরদস্তির সুরে দাঁত খিঁচিয়ে বলে—'আবে গিধ্যড় জানানা! উঠে গা—ক্যা? মারে গা ঝাড়ু? হাট—ভাগ যা…'

পাতাল-কালো চোখের কোটর থেকে দপ্ করে আগুন ঝলকালো এক ফুল্‌কি। উকুন-ভরা মাথা নুচতে নুচতে ঘাড় কাতিয়ে কোলের বাচ্চাটাকে একটা ঝাঁকি মেরে বলে খয়রন, 'উঁঃ! মিনসের কথার ছিরি দ্যাখো-না! আমি জানানা—না তোর বাবা জানানা! মাথায় মারি মুড়িঝ্যাটা! মেড়ুয়া চোথর কোথাকার!'

বসে বসেই নিজেকে খানিকটা টেনে নিয়ে গেল খঞ্জন। গায়ের ছোঁওয়া বাঁচিয়ে মেথরটা ঘষঘষ করে ঝাঁটা চেলে-জঞ্জাল ঠেলে চলে যায় চৌপট্টির ডানহাতি মাথামরা একচিলতে ক্ষুদে গলিটার ভেতর।

কাঁচা আনাজের বাজরা মাথায় নিয়ে গ্রাম-গ্রামান্তের আঁকাবাঁকা অসমতল পথ ভেঙে আসছে কালঘামে ভেজা শিরদাঁড়া-খাড়া চাষীরা। আটটার বাঁশিতে ওরা বজবজের চার নম্বর ফটকের বাজার ধরবে।

বাবুদের আয়না-চকচকে ট্যাক্সিগুলো বুলবুল করে এক মুঠো নীলচে ধোঁয়া ছেড়ে সাঁ করে উড়ে যায়। তারপর চড়িয়ালের মোড় থেকে গাদাগাদি-করে-মানুষ পোরা শিখ-ড্রাইভারী বাসগুলো গর্জাতে গর্জাতে যায় কলকাতার দিকে। পাটের গাঁট বোঝাই ছখানা চাকাওলা বিরলা জুট মিলের 'বেরন্দো-বেরন্দো' লরী একটার পর একটা।

ডাগর মেয়ের দল বই বুকে নিয়ে বেণী দুলিয়ে চলেছে কালীপুর হাইস্কুলে। একটু পরেই মাড ভেঙে ছুটবে ন্যাংটো কলের লোকের দঙ্গল। মেয়েমর্দ ডাগর-কাঁচা আপামর। সামনেই রেজিস্ট্রারী অফিসের বাঁ-পাশ ঘেঁষে গোটা দুস্তর আসমান-জোড়া বার্মা শেল, স্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম, ক্যালটেক্স আর ইণ্ডিয়ান অয়েলের বিরাট বিরাট কেরোসিন তেল আর পেট্রোলের ডিপো।

ভাঁজা দিয়ে দাঁড়িয়েছে লোকগুলো রেশনিং অফিসের সামনে। টেলিফোন এক্সচেঞ্জের দোতলায় একটি মেয়ে—অনেকখানি নাইসমেত পেট বার করা, পিঠ উদোম, বগল ফাঁকা, বগলী ব্লাউস পরা—তুলিটানা ভুরু নাচিয়ে রঙিন ঠোঁটে হাসি মাখিয়ে রসালাপ করছে, চুস্ত প্যাণ্ট পরা, কপালে সিঙাড়ার মতো চুল পাকানো একটি ছোকরার সঙ্গে।

'মরি মরি! একি লজ্জা।' রেডিওর দোকানটা থেকে আধুনিক গান হচ্ছে। কোনো নারী যেন তার প্রথম যৌবনের বাসরশয্যায় প্রণয়ীর নিপীড়নে বসন হারানোর কী গভীর লজ্জা তা কণ্ঠলীলায় ব্যক্ত করছে।

এপাশে 'জেবুন্নিসা' হোটেলে মশলা মাখানো গোশ্‌ত কষার ছ্যাঁকছোঁক শব্দ আর বাতাস-মাতানো গন্ধ।

আর একদল মাজাভাঙা থুরথুরে বুড়ো-বুড়ী এল লাঠি ঠকঠক করতে করতে ব্যঞ্জনহাড়িয়া থেকে: হালদার পাড়ার হিন্দু-বস্তীটা ফুঁড়ে 'কুইন সিনেমা'র সামনের 'গোন'টা ধরে।

অন্যমনস্ক হয়ে গেছল এতক্ষণ খয়রন। আচমকা গানের সুর ভাঁজলে সে:
'আল্লা তুম-কো রুজি দেগা—দে খোদাকী রাহা মে…'

ঠক করে একটা চার কোণানে পাঁচ পয়সা পড়ল খয়রনের সামনে। মুখখানা চিকচিক করে উঠল অকস্মাৎ একঝলক আনন্দে। ঘোষেদের মেয়েটা। রোজ তাকে দিয়ে যায় কলেজে যাবার বেলা দু-চারটে পয়সা। আকাশের দিকে হাত তুলে ভরা গলায় দোওয়া করে খয়রন—'আল্লা তুমার ভালই করুক মা! পরাণ জুড়োনো বর হোক! ত। ক-মুল্লুক হোক তুমার! গতর সালামতে থাক ছেরকাল…'

মুখস্থ! গড়গড় করে বলে যায় খয়রন।

ফিক্ করে হেসে কাজল-কালো তুলি-টানা দীঘল চোখের তলোয়ার-বাঁকা ভুরু জোড়া নাচিয়ে স্লিপার টেনে টেনে খানিকটা চলে গিয়ে ঘোষেদের ডাগর মেয়েটা উঠে পড়ে মোটরে। সাঁ করে পালিয়ে যায় গাড়িটা, মেয়েটাকে নিয়ে।

কাঁচা কয়লার ধোঁয়ায় আর চুন-হাগা ব্যামোঅলা মুরগীদের কক্কক্ শব্দে ঘুম ভাঙল এত বেলায় বেশ্যাপটিটার।

বজবজের চৌপট্টি—চৌরাস্তার মোড়টা ছাড়তে হল খয়রনকে। ফৌজ বেঁধে গেছে আজ ওখানটায় যত সব ভিখিরীদের।

চলতে চলতে আপন মনেই বিড়বিড় করে বকে যায় খয়রন: 'নবুর মা বুড়ী! ভুঁয়ে মুখ লোগড়ে চলে 'জেয়োলে'র (কাছিমের) প্যানা! সি-ও এয়েচে গা কুন মুল্লুক সেই জটাধারীতলা থেকেন! বলে কিনা—'হাঁলা খয়রি, তুইও এইচিস লা মাগী!' এসবেনে কি করবে? কেন, ই-কি তোর একলা ভাতারের রাজুত্ব…'

বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে পা-পা করে এগিয়ে চলল সে গান্ধী রোডের কালো পিচমোড়া রাস্তাটার একধার ঘেঁষে।

চড়িয়ালের মোড়ে কলের লোকের ভিড়ে ভিড়াক্কার।

সাঁফুইদের কাঠগোলাটার পাশে—ছিয়াত্তর-এ বাসের কণ্ডাকটর চড়া গলায় চ্যাচাচ্ছে, 'যাবে—যাবে—বাখরা-বাওয়ালী-আমতলা, ভাসা, পৈলান, মাঝেরহাট, মোমিনপুর, ধর্মতলা।'

রাস্তার দু'পাশের ময়রা দোকানের বারকোশে সাজানো টাটকা ভালডায় ছাঁকা খাঁটি ভেলি গুড়ের রঙিন জিলিপিগুলোর দিকে কার না চোখ পড়ে!

পথের কুকুর জোড়াকে তাড়িয়ে দিয়ে সবেমাত্র দোকানী টাটে উঠেছে, অমনি লক্ষ্য পড়ে 'বাবা গো' বলে হাতপাতা খয়রনের দিকে। বিরক্ত হয়ে খান-দুই জিলিপি ছুঁড়ে দেয় তার পেতে-ধরা কোঁচড়ে।

একটা জিলিপি পেয়েও ছেলেটা সন্তুষ্ট নয়। মায়ের গাল থেকে অন্যটাকে হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে বলে, 'দে-না হারামী বাচ্চা!'

মাত্র একটা কামড়ে কোঁৎ করে জিলিপিটা গিলে ফেলতে বুঝি একটা মুহূর্তও লাগে না খয়রনের! চোখের বল দুটো বেরিয়ে পড়ে লাফিয়ে। ভাঙা কাঁসার থালায় আঘাত-লাগা খ্যানখেনে কণ্ঠস্বরে বলে, 'যা পাব সবই যেতিন তোর পিলে-পাগুলে দিবি তো মুই কি খাব র‍্যা ওলাউঠো!'

ছেলেটা তবুও প্রতিবাদ জানায় হাত-পা নেড়ে। তাকে একটা ঝাঁকি মেরে পা চালায় ভিখারী-জননী।

পোলটার ও-মাথায় যেখানে মুচিরা বসে—কচকচ করে থান-ইটে-উবু-হয়ে-বসা মানুষের চুল ছাঁটে নাপতে দুটো, ওখানটাতেই তো বসবার কথা ছিল খয়রনের স্বামী আবজেলের। খোঁড়া মানুষ। ন্যেংচে ন্যেংচে পথ চলে। কখন টঁ্যাক করে পাট-বোঝাই লরী কিম্বা বাবুদের মোটরের তলায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে কালো পাথুরে রাস্তায় চেপ্টে যাবে তার ঠিক আছে নাকি! ভাবনায় সদাই ধুকধুক করে খয়রনের বুকের ভেতরটা। ভাত দিতে পারুক আর নাই পারুক তবু তো তার নেই-ছেই ওই একটাই মাত্তর সোয়ামী! যখন রোজগারপাতি ছিল হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে মাছ-গোস্ত এনে এনে দিয়েছে তাকে ফি-হপ্তায়। গিন্নীবান্নির মতো তেলে-ঝোলে রান্না করেছে তখন সে, কিন্তু কি করবে এখন! খয়রনের নসীব—তার ফাটা কপাল!

লথিয়ান চটকলের একুশ টাকা হপ্তাঅলা বাঁধা চাকরি! তাঁতের সেপ্টোতে জড়িয়ে গেল বোঝাই বীমটা তুলে লাগতে যেয়ে! সিলেণ্ডারের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে এনে সামনের তাঁতের কলকব্জার ওপরে একেবারে মারলে কাছাড়! 'লউ'-এ (রক্তে) 'লদী' অবস্থা!' তিনমাস কল-বাড়ির পাশের 'বিনি-সম্বলে'র (চ্যারিটেবল) হাসপাতালে রইল। জানে বাঁচল বটে কিন্তু জনমের মতন খোঁড়া হয়ে গেল আবজেল।

আবজেলকে কোলে করে বয়ে নিয়ে যেয়ে যেয়ে খয়রন কতদিন ধরে কত কান্নাকাটি করতে তবে মিলের বাবুরা দয়া করে নেহাত নাছোড়বান্দা বলেই যা আড়াইশো টাকা দিয়েছিল।

কিন্তু…

বাপদাদার আমলের আড়াই কাঠা বাস্তুভিটের ওপরে তাদের ছিটেবেড়ার ভুঁইকুঁড়ে। বস্তিতে সে-রাত্রে টিপিটিপি বৃষ্টি আর হিন্দুস্থানীদের রামলীলার মাতন। ঘরে যা ধূলিকুঁড়ি ছিল সাফ করে নিয়ে গেল কোন্ আবাগীর বেটারা। কালা-জ্বরে ভুগে ভুগে খয়রনের সাত-আট বছরের ছওয়ালটাও মারা গেল বিনি-তিকিচ্ছেয়। তারপর আর হয়নি। কিন্তন ই-আপদটা আবার হাড়মাস জ্বালাতে এল উ-বছরে।

খোঁড়া পা-খানাকে কোলের কাছে টেনে গুটিসুটি মেরে বসে আছে আবজেল। দু'চার পয়সা যা কামিয়েছে মুড়ি কিনে খেতে আরম্ভ করেছে। লোকটার এক ফোঁটা আক্কেল নেই গা! ছেলেটা খিদেয় ককিয়ে মরছে কাল দুপুর থেকে। তারো পেটে জ্বলছে আগুন।—'বলি বাঁ-পা'র খাওয়ার মাথায় মারি ঝ্যাটা! ক-পয়সা কামিয়েছ তবু শুনি! ছওয়ালটা যে 'ভোগে' (ক্ষুধায়) মরতেছে—দাও এ্যাকে এগ্‌মুঠো।'

কাছে বসল খয়রন। ছেলেটা বাবার হাতে মুড়ি দেখে হ্যা-হ্যা করে উঠল। আবজেল ঠোঙার শেষ মুড়ি ক'টা নিজের গালে ঢেলে দিয়ে ঠোঙাটাকে মুড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে পথের মধ্যিখানে। রোঁয়া-ওঠা ঘিয়ে-ভাজা একটা কুকুর ছুটে এসে সেটা শুঁকতে লাগল।

চোখ দুটো জ্বলে উঠল খয়রনের। ছেলেটা গড়াগড়ি খেতে লাগল পথের ধুলোয়। গিঁটেগিঁটে হাত-পা ছুঁড়ে প্রতিবাদ করে চলে, 'কেন তুই লিবিনি র্যা শালা খোঁড়া!'

'ত্থাখ মুসা! শালা বলা ঘুচে দোব তোর 'মুয়ে' লাথি মেরে।'

মুসাকে মাটি থেকে হিঁচড়ে তুলে নিয়ে চা-দোকানটার দিকে পা পাড়ায় খয়রন। সুর ধরে আবজেল, 'খোঁড়া ফকিরকে দয়া কর বাবা! আল্লা তোমাদের রুজি-রোজগারে বরকত দেবে বাবা! তোমাদের বাল-বাচ্ছারা সালামতে থাকবে বাবা! বিরক্তি বেধে যায় পাশের মুচিটার। সামনে দাঁড়ানো রোগা পেঁকুটে কেরানীবাবুটার স্যাণ্ডেলটায় ফোঁড় তুলে ঘাড় ফিরিয়ে ভেংচে উঠল, 'আবে! কাহে অ্যায়সা উল্লুকা মাফিক খালি খালি চিল্লাতা হ্যায়? হটো হিঁয়াসে।'

মুক্তকচ্ছ ধনুকের মতো সটাং করে উঠল আবজেল।—'ক্যান র্যা শালা, তোর বাবার জায়গায় বসে চিল্লাচ্ছি? ই-তো কোম্পানি-কা রাস্তা!'

ভড়কে গেল মুচিটা। আবঘিঁটে আমতা আমতা করে বলে, 'দেখিয়ে সাব, দেখিয়ে! শালা আদমী ক্যাসা··'

মধ্যস্থ করে দিলেন কেরানীবাবুটি।—'থাক না ভাই! ভিখিরী-ফিকিরী মানুষ!'

ন্যেংচে ন্যেংচে আবজেল কোমরের 'থাম্মি'টা এক হাতে তুলে ধরে অন্য হাতে লাঠি ঠুকে ঠুকে এগিয়ে গেল খয়রনের দিকে।

চা-দোকানের বেঞ্চিতে বসে কতকগুলো ধোপদুরস্ত পোশাকপরা ছোকরা বাবুর দল হাফ-বয়েল ডিম আর মাখন লাগানো পাউরুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। খয়রনের ছেলেটা সেদিকে একখানা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। হঠাৎ গিলে-করা চুড়িদার পাঞ্জাবি-পরা একটি ভদ্রসন্তান নাক সিঁটকে ভিখিরী মেয়ের নজর লাগার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে একটু পাউরুটি আর চা ফেলে দেয় আলতোভাবে খয়রনের সামনে। তার দেখাদেখি সকলে।

ঘৃণায় শিউরে উঠল তাদের গোটা দলটা। অভিযোগ জানালে সদাচারী দোকানদারকে। দুর দুর করে তাড়া করতেও খয়রন যখন এক টুকরো রুটির লোভে সরল না বিরক্ত আর বাধ্য হয়ে দোকানদার এক গেলাস গরম জল ছুঁড়ে দিলে তার গায়ের ওপরে!

মুসাকে কোল থেকে ছিটকে ফেলে দিয়ে চিৎকার করে গড়াগড়ি দিতে লাগল খয়রন। কি ব্যাপার! ছুটে এল পথ-চলতি উচ্চকিত কলের লোকের দল।—'হা-হা-হা···হো-হো-হো···কেমন জব্দ। দোকানের খাবারে হাত দাও না একবার, দাও।' দোকানদারের ফ্যাকাশে মুখে রক্ত টেনে আনলে চুড়িদার পাঞ্জাবিপরা সরকার বাবুদের ছেলেটি। উপস্থিত বুদ্ধি আর কাকে বলে! মোড়ের শান্তিরক্ষক পুলিসটি তখন পায়ের ওপরে পা রেখে লাইট-পোস্টের গায়ে হেলান দিয়ে বিড়ি টানতে টানতে ট্যারচা চোখে বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে একটি বিকট আধুনিকার অঙ্গসৌষ্ঠব দেখায় ব্যস্ত!

'—মিছে কথা! মিছে কথা! মুই অদের 'ডুকানে'র কুনো চিজে হা' দিইনি গো বাবারা!'

ধুলো ময়লা জড়ানো দেহে বিবস্ত্র কানিটা কোলের কাছে চেপে জ্বালা-যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে তীব্র প্রতিবাদ করে চলে খয়রন। ভিড়জমা মানুষের পায়ের তলা গলিয়ে বাচ্ছাটাকে টেনে নেয় সে নিজের কাছে।

অন্যায় না করলে কি আর কেউ মানুষের গায়ে গরম জল দেয়? তা না হলে সবাই ধুকুড়ি ধুনে ফেলত—বাবুদের পোলারাই হোক আর যে লাট-সাহেবই হোক! ভিড় পাতলা হয়ে গেল। আটটার ভোঁ শুনে লেট-করে-ফেলা কলের লোকেরা দিলে ভো দৌড়!

এতক্ষণ পরে ন্যেংচে ন্যেংচে পঙ্গু আবজেল এসেছে খয়রনের কাছে। ভাষাহীন ফ্যাকাশে চোখে বারকয়েক তাকালে সে দোকানের মানুষ ক'টার দিকে। চেনা দায়! অদ্ভুত! সব ক'টাই তো মানুষের মতন দেখতে? চা-দোকানের পাশের ঐ 'বাপুজী সেবাসদনের' সেবকবাহিনী সব। অফিসার, ম াজন, আড়তদার মহাশয়দের তেজারতির ভবিষ্যৎ অংশীদার! আবজেল ং জ না হয় ভিখিরী বলে কেউ তাকে দয়া করে চেনে না। কিন্তু সে তো চেনে এখানের সকলকে।

খয়রনের একটা হাত ধরে চাগিয়ে তুলে দাড়ি-গোঁফ ভর্তি মুখটা রাগে আর বিরক্তিতে ভাংচুর করে বলে আবজেল, 'তুইন্যায় এত জায়গা থাকতে তুই এখেনে কেন পড়ে মত্তে এলি র‍্যা শালী? চ'—উ-দিক পানে চ'। যেমনি কুকুর তেমনি মুগুর। ঠিক হয়েছে। অদের কাছে গ্যাছে হাত পাততে! তোর গালে ..'

বিষম ক্ষুব্ধ আবজেল। খিড়কির কপাট খুলে গেছে তার মুখের। চার খুঁট বাঁধা একটা ঝুলির মালিক বটে সে, কিন্তু তার হাড়-পাঁজুরে গতরে মানুষ চেনার (সহস্রাধিক কশাঘাত) অভিজ্ঞতা আছে বিলক্ষণ। গরিব আর বড়লোক। সীমা ছাড়ায় কেন খয়রন? ঠেকে না শিখলে 'এদ' (ইয়াদ) হবে না তো! আবজেল মনে করে, সীমা যদি ছাড়াতেই হয় তবে তার তেল-পাকানো এই খুদে লাঠিটাই একান্তভাবে কাজ দেবে!

কিন্তু ভারি অসহায় মনে হয় কেবলই। ছাদহীন উন্মুক্ত আকাশের তলায় যে সংসার তাদের যাযাবর, তার অভিযোগ আর দুরন্ত ফরিয়াদ শুধু মাথা কুটে কুটে মরে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে এগিয়ে চলে খয়রন। পঙ্গু আবজেলের চোখের পাতা দুটো কেমন যেন ভিজে ভিজে। পচা ফেলে-দেওয়া একটা আম কুড়িয়ে এনেছিল আবজেল। সেইটাকে চোবলাতে চোবলাতে শান্ত হয়েছে ছেলেটা।

'বস এখেনে।'—বলে আবজেল: 'এট্টুস ছাঁচ্‌তেল চেয়ে 'লেসি' (লিয়ে +এসি) ঐ মুদিখানাটা থেকেন। পিঠে-পাছায় দিয়ে দোবখনে। ফোস্কা পড়ে

যাবে তোর গোটা 'শরীলে'! আবজেল এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ হেঁট হয়ে পড়ে কয়েকটা আধপোড়া বিড়ি কুড়িয়ে নেয়। ধরায় একটা, পান-দোকানের বোলেন থেকে! .দুটো টান মেরেই ফেলে দেয়। বিরক্ত হয়ে বিড়বিড় করে বলে, 'শালারা কি সেই লোক, যে এট্টুস রেখে-ধুয়ে ফেলবে!'

ভরসা করে পান-দোকানে একটা বিড়ি চাইলে আবজেল।

'ভাগ শালা কাঁহা-কো!'

বাপরে! একটা বিড়ির জন্যে যে খ্যাংরা তুলে বসে লোক! কি দেশ হল! নাঃ! বাঁচবার মতো আর কোনো সুরাহাই নেই আবজেলের।

তেল নিয়ে এল আবজেল। বাঁ-হাত বুলিয়ে রগড়ে দিলে খয়রনের মেরু-দণ্ডখাড়া পিঠখানায়। সামনের দিকটায় তেমন বেশি পোড়েনি চট করে ঘুরে পড়ার জন্যে। ছেলেটার কচি চামড়ায় এরই মধ্যে কয়েক জায়গায় ঢোলা ঢোলা ফোস্‌কা পড়ে গেছে। চড়িয়ালের মোড় থেকে বিদায় নিলে ভিখারী-দম্পতি।

সাড়ে দশটার ভোঁ হল চারদিক থেকে সব ক'টা চটকলে।

ভিড়ভিড় করে মিলের গহ্বর থেকে ফেঁসো-মাখা মজুরেরা তেলকালি-জমা গামছায় গা ঝাড়তে ঝাড়তে ছুটে এসে পড়ল কতক চার নম্বর ফটকের বাজারে। এরা সব বাসাড়ে। খরচা মতো কাঁচা আনাজ কেনে রোজের। দু-ঘণ্টা ছুটির মধ্যে রান্না, চান, খাওয়া, একগোড় গড়ানো। তারপর সাড়ে বারোটার ভোঁ ধরা। সপ্তার ছ'দিন ছক-বাঁধা কাজে জীবন নিঙড়ে রুদ্ধশ্বাসে ছুটে যায় যে যার বাড়ি-ঘরে। মাগ-ছেলে, জন-ধন, গরু-বাছুর, লাঙল-জমি, খাজনা-খেসারত, মামলা-মোকদ্দমা—হাজারো কাজ সেখানে। আর একদল—যাদের বাড়ি তিন মাইলের মধ্যে, তারা ছুটেছে নাভিশ্বাস বইয়ে বাড়িতে খেতে। রেল লাইন টপকানো পথটার দু'পাশে দুজনে একফালি করে ন্যাকড়া বিছিয়ে বসেছে—আবজেল আর খয়রন। দুজনের দু-সুর। দেহের দোলনও দু-ভঙ্গির। কিন্তু উদ্দেশ্য একই।

পাঁচটা মিনিটের মধ্যেই বিলকুল সাফ হয়ে যায় কলের লোকের ভিড়। বাসাবাড়ির আশেপাশে দু-একটি আবর্জনাসঙ্কুল পাতাপচা রঙীন শ্যাওলাজমা এঁদো ডোবায় মেয়েমর্দোর ভোল-ডোবাডুবি চলে কয়েক মিনিট। কাঁচা কয়লা বোঝাই ওয়াগন টেনে হুসহুস করে ফুঁসতে ফুঁসতে ওরিয়্যাণ্ট মিলের দিকে চলে যায় মন্থরগতি বাষ্পশকট।

পয়সা ক'টা খুঁটে নিয়ে গণ্ডা গণ্ডা করে গুনে হিসেব করে নাই-কোঁচড়ের খুঁটে বাঁধে খয়রন। আবজেল পেয়েছে ষোল পয়সা আর খয়রন বুঝি পঁচিশ পয়সা। এবারে বাড়তি কাঁচা আনাজের যোগাড়ে দুজন হাত পাতে এসে চাষী আর বাজারের স্থায়ী ব্যাপারীদের কাছে। ঝিঙে, উচ্ছে, পটল, লাল আলু, বেগুন, পিঁয়াজ। কেউ বিমুখ করে না। যা হোক দুটো একটা দান করে।

আবজেল বলে, 'ও মুসার মা, আজকে জুম্মাবার! তোর 'এদ্' আছে ?'

খয়রন হাসলে। তার মনেই ছিল যে আজ শুক্কুরবার।

মুসার হাতে চার পয়সার মুড়ি কিনে দিয়ে আবজেলের কাছে তাকে বসিয়ে রেখে বাড়িতে চলে যায় খয়রন। ভাঙা আগডটা খুলে কোঁচড়ের আনাজ ক'টা মেঝের স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার এক কোণে ঢেলে রেখে মাটির শান্কি দুখানা নিয়ে আসবার সময় গেঁটের পাঁচটা পয়সা বার করে ওড়িয়ার দোকান থেকে একখিলি গুণ্ডিপান কিনে খেলে খয়রন। নভচারী মিনারঅলা চড়িয়ালের বড় মসজিদ। বাঁ পাশে ব্যঞ্জনহাড়িয়ার ঘেঁষের হাঁটুরে রাস্তা। ডানপাশে কসাইখানা। হাড়গোড় নিয়ে ঘিয়ে-ভাজা কুকুরের শ্মশান-কীর্তন। ওপাশে মজা খালটার ধারে—করোমচা, পিটলি আর ভেল্‌কো বাঁশ ঝাড়টার তলায় শকুনের সঙ্গে আড়ি-করে-আনা কীল্‌খানার হড়মা-সার, আধমরা গরুর দল বাঁধা।

খেঁকামেকি বেধে গেছে ভিখারীদের মধ্যে। আঁচড়াআঁচড়ি কামড়াকামড়ি। চুল ছেঁড়াছিঁড়ি। শান্কি হাতে সবাই চায় পয়লা একটু বেশি 'হাজুত ভাত' নিতে। খোদার নামে মানসিক-করা খাসী কিংবা মোরগের মাংস রান্না আর ভাত দেওয়া হয় ফি জুম্মাবারে। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের নরনারায়ণ সেবা—এতিম মিস্‌কিনের প্রতি পরহেজগারদারী!

আবজেলের লক্ষ্য পড়ল, পেছন থেকে দুজন বিদেশী সাহেব তাদের ফটো তুলছে!

অনেক কষ্টে কালঘাম ছুটিয়ে দুজনে দু-মুঠো অন্ন সংগ্রহ করেছে আবজেলরা। হাঁক হাঁক করে গোগ্রাসে খেতে লেগে গেছে। আবজেল খেতে খেতে হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হয়েছে পেছনে লোমওঠা পচা ঘা-অলা পাগলা কুকুরটার গর্জনে, অমনি তার পাত থেকে খপ্ করে টুকরো দুই মাংস তুলে নিয়ে নিজের ভাতের মধ্যে লুকিয়ে ফেলে বাচ্চা মুসা।

খয়রন দেখেও যেন দেখে না।

হঠাৎ মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে, 'এ্যাঁ!' করে গাল মেলে শুয়ে পড়ে মুসা। গড়াগড়ি দিয়ে হাত-পা ছুঁড়ে ডুজনের শান্কি দুটোই উল্টে দিলে— 'ওরে হারামী বাচ্চা রে·· কেন আমার গোস্ত খেলি রে···রে রে!' খয়রন রাগে অগ্নিমূরৎ হয়ে এঁটো-ঝুঁটো হাতে পটাপট ঘা-কয়েক বসিয়ে দিলে বাচ্চাটার পিঠে।

খ্যাঁকখ্যাঁক করে অবিকল কুকুরের মতো দাঁত-ঝাড়া মেরে চেঁচিয়ে উঠল আবজেল: 'হ্যাঁ রা শালী, হারামজাদী, শুয়োরখাকী! কেন তুই অর বখরা খেতে গেলি?'

মুখ গোমড়া করে ধুলোমাটি আঁকড়ে ভাত ক'টি খুঁটে তুললে খয়রন। আবজেল নিজের বখরার ক'টা শান্কি ধরে দিয়ে দিলে ছেলেকে। জল গড়ানো চোখে সড়াৎ সড়াৎ করে সিক্নি টানতে টানতে হাভাতের মতো গোগ্রাসে গিলতে লাগল ছেলেটা। হাত গুটিয়ে বসে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আবজেল মসজিদটার ভেতরে। ইমামসাহেব থেকে সাধারণ নামাজীদের পাতে-পাতে একরাশি করে ভাত আর মাংস। তাদের তিনজনকেও ওদের একজনের মতো ভাত দেয়নি। কিন্তু দেওয়া না-দেওয়া ওদের ইচ্ছে। তবু ঐ খেয়েই বলতে হবে: 'সোকর আলা-হাম্‌দো লিল্লাহে রব্বিল আলামিন'। কিই-বা আর বলার থাকতে পারে আবজেলের? ওরা যে দিয়ে বখরা করে না। বখরা করেই দেয়।

ভাত ক'টি খেতে আরম্ভ করেছে খয়রন। আরম্ভ আর শেষ—একই কথা, বাসায় ফিরে মিটমাট হয়ে গেল যত সব অন্তর্দ্বন্দ্ব।

খেজুরপাতার ছেঁড়া চাটাইখানা বিছিয়ে শুলো তিনজনে।

চক্‌চক্ শব্দে আস্ত পৌষে-বিয়ুস্তি কুকুর ছানার মতো দুধ খাচ্ছে মুসা মায়ের উলঙ্গ বুকের মাঝখানে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। স্তনে এক ফোঁটা দুধ না পেলেও গালের লালা ভিজিয়ে অমনি করে চোষাই মুসার অভ্যাস। তাড়াতাড়ি তার মুখে দুটো ভালমন্দ বোল্ ফুটেছে বলে কিন্তু মুসা একটা হাড়গিলে পাখি কিংবা একটা মাংসপিণ্ড ছাড়া তুলনামূলক এমন কিছুর মতো ডাগর-ডোগর হয়ে ওঠেনি। হত। যদি···

আবজেল ছাউনি-গলা ফুটো চালাখানার ভেতর দিয়ে সুনীল আকাশের ভ্রাম্যমান একখণ্ড সাদা মেঘের দিকে চেয়ে থেকে বললে, 'সাঁঝের বেলা

আনাজ ক'টা ঘণ্ট করবি। আর আধ কিলো চাল কিনে আনবখন 'হুকান' থেকেন।'

'হুঁ! আমার বাঁ-পা কেঁদে গ্যাচে।' ফুঁসিয়ে ওঠে খয়রান। 'কাঠ নেই, কয়লা নেই—কি দিয়ে রান্না রাঁধব বলো তো?'

'সি মুই লেসে দোবখন! তুই অত ভাবিস ক্যানো! শালা, এমন মেয়েমানুষের পাল্লায়ও কেউ পড়ে!'

কোঁচকানো শুকনো কালো ঠোঁটে টেপা হাসি খয়রনের।

আজ আবার তাদের রান্না হবে শুনে মুসা তো মহা খুশী। বাবার ঝাঁপিমতো একগোছা দাড়ি ধরে একটা হেঁচকা মেরে বলে, 'এই শালা! এই শালা খোঁড়া!'

'কাকে রে!'

'তোকে রে শালা! দাড়ি রেখেচিস?'

খয়রন হেসে লুটোপুটি খেয়ে ছেলেকে বুকে টেনে নিয়ে মুখে গোটা দুই চুমো খেয়ে বলে, 'ছি! বাপ হয় যে! বলতে আছে?'

'তোর বাপ হয় উ-খোঁড়া?' ঘাড় তুলে মাকে শুধোয় মুসা।

রাগে চোখ দুটো অঙ্গারের মতো দপ্ দপ করতে থাকে আবজেলের। করোমচা আর পিটুলির ঝোপে-ঝাড়ে পড়ন্ত বেলার ছায়া ঘনিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। আষাঢ়ে 'তেউড়'-ঠেলে-ওঠা কঞ্চিহীন বাঁকা বাঁশ 'জটলাই'টার মাথায় বসে গভীর তান ধরেছে একজোড়া ঘুঘু। ঘুকুর···ঘু···ঘু···ঘু

মাঝে মাঝে গান্ধী রোডের ওপর দিয়ে ভারী ভারী কেরোসিন তেল আর পেট্রোলের গাড়ি, বাস, লরী ইত্যাদি যাতায়াতের গুরুগম্ভীর দুরন্ত গর্জন।

ভিখারী দম্পতির চোখে তন্দ্রা ঘনীভূত হয়ে আসে।

ঘুম ভাঙল যখন তাদের—ব্যঞ্জনহাড়িয়ার পথেঘাটে আলোর মালা গেঁথে চলেছে জোনাকীরা।

এদিকে দেহোপজীবিনীদের খুপরি খুপরি দাওয়ায় টিমটিমে হারিকেন অথবা লম্ফের আলো। হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে উবু হয়ে বসে আছে বেশির ভাগ। পথচলতি মানুষের দিকে চেয়ে চেয়ে ঘাড় কন্‌কনিয়ে যায় বলেই বুঝি তাদের এই তিনমাথা অবস্থা।

চা-দোকান আর কামারশালের আশপাশ ঘেঁটে টুকুরি করে দুটি কয়লা কুড়িয়ে আর আধ কিলো চাল এনে দিতে দীর্ঘ সাত দিন বাদে আবার উনুন

জ্বালালে খয়রন। নোনাঝরা ছিটেবেড়ার দেওয়ালে হেলান দিয়ে খোঁড়া পা-খানা কোলের কাছে জড়ো করে বসে বসে গুনগুন করে গান করতে করতে পাছাভারী পতিতা জোহরার 'লোচ্চার' সঙ্গে যেসব আদি রসাত্মক কীর্তিকলাপ চলে তা দেখে, দেখে যেন ছেলেদের চকোলেট চোষার মতো এক অনবদ্য আরামে। খয়রনকে তা ডেকে দেখালে সে হঠাৎ আবজেলের গালটা টিপে ধরে। বলে, 'উদিক পানে চাইলে তোমার 'হাজাম' শালা তালকানার চাইতে আরো তিন গাঁট বঁটি দিয়ে কেটে লোব !'

খয়রনের পায়ে ধরলে, আল্লার নামে 'কসম' (শপথ) খেলে তবে গলা থেকে হাত সরায় খয়রন। সে জানে চার আনা পয়সা জমলেই আবজেল জোহরার খুপ্‌রিতে যাবে পেটে ভাত থাকুক আর নাই থাকুক তিন দিন।

বৈচিত্র্যহীন জীবন।

এমনিভাবে কাটে দিনের পর দিন।

মাসের পর মাস।

আশা আছে, উদ্দীপনা নেই। প্রাণ আছে, প্রাণধারণের অবলম্বন নেই। জীবন আছে, যার কোনো মূল্য নেই এদেশে। এমন লক্ষ লক্ষ জীবন আজ পথে পথে অসহায়। জরা, ব্যাধি, অশিক্ষা, অনাহার, অবিচারে বুকে হামা টেনে মাটিতে মুখ ঘষড়াতে ঘষড়াতে একদিন দম ছুটে গেলে শিয়াল কুকুরে ছিঁড়ে খেয়ে নেয়। এখানে প্রাসাদের তলায় মানুষ মরে পড়ে থাকে। পড়ে থাকে মহাপুরুষদের মহান স্মৃতিগুলির নিচে।

তবু হাঁটু ধরে উঠে বসতে চেষ্টা করে খয়রন। ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে ঝোড়া কাঁখে নিয়ে রাবিশ হাঁটকে আধপোড়া কয়লা কুড়োতে আরম্ভ করে। চা-দোকানে দিয়ে ঝোড়াপিছু পায় দু' আনা করে। দিনে যদি চারটে ঝোড়াও বোঝাই করতে পারে আট আনা। তবে, আবার দু' আনা করে ঘুষ দিতে হয় মিলের গেটের দরোয়ানজী সায়েবকে ! ফেলে দেওয়া হলেও তার মনিবের মাল তো বটে ! তাছাড়া ফি রোববার করে বাগদি মেয়েদের সঙ্গে পাড়ায় পাড়ায় কলাপাতা কাটতে যায়। সেপুন্নে, শুশ্‌নী, কলমি, পুঁটি, হিঞ্চে, কুলপো, থুলকুনি, চিগ্‌নি এইসব শাক-পাতাটা খুঁটে এনে চার নম্বর ফটকের বাজারে বসে খুচরো দু-চার আনা যা বিক্রি করে তাই দিয়ে আটা-চালের ব্যবস্থাটা অন্তত একবেলাও করে খয়রন।

খোঁড়া আবজেলও আট আনা রোজের একটা ঠিকে চাকরি যোগাড় করে

কষাইখানায়। হাড়গোড় চুনে চুনে মাংসের ঝড়তি ছাঁট মালগুলো নিয়ে আসে হাতে করে।

উনুন জ্বলে প্রতি সন্ধ্যায়।

খান কুড়ি নারকোল-পাতা মেগেপেতে আনে স্বামী-স্ত্রীতে পড়শীদের বাড়ি বাড়ি থেকে। চেয়ে আনে তড়পি সরু সরু খান কতক বাঁশ। কানাই ঘরামির পায়ে হাতে ধরে তাদের ভাঙা ঝরঝরে ঘরটা ছেয়ে নেয়।

পাঠশালে পাঠায় মুসাকে। পাড়ার ছেলেদের সাথে সারাদিন ডাং-কোড়ে আর গুলী খেলে, মারামারি করে। নিত্য নতুন অভিযোগ গালাগালি সহ্য করে করে নাজেহাল। ধনা কষাই উপদেশ দিলে, 'পাঠশালে পাঠাও। মানুষ হবে। তোমারের দুঃখ-দুর্দশা ঘোচাবে বড় হয়ে। প্রতিটি মুসলমান পাড়ায় ৬০।৭০ জন করে ছেলেমেয়ে এমনি নোংরাভাবে ঘুরে বেড়ায়। তাদের হয় মেরে ফেলা, না হয় গারদখানায় পাঠিয়ে লেখাপড়া শেখানো দরকার। নইলে এ দেশকে ঐ শালার কৃমিকীটরাই খেয়ে ফেলবে!'

তাই ধনার কথায় বড় আশা করে মুসাকে স্কুলে পাঠিয়েছে আবজেল। তাদের জীবনের অন্ধকার মুছে আলো আনবে সে। প্রচুর আলো।

কিন্তু ভাগ্যের মোড় ফেরাবার জন্যে হতভাগ্যের সামনে বিপর্যয় এসে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে যে দেরি করে না মোটেই তা বোঝা গেল কিছুদিন পরেই।

বস্তির উদ্‌ভ্রান্ত মালিক সিনেমার হিরোইনদের পিছনে পিছনে ঘোরার পর অকস্মাৎ সচেতন হয়ে নতুন এক চৌকশ বৈষয়িক ব্যক্তিকে নিয়োগ করে দাঙ্গা বাধিয়ে দিয়ে এক রাত্রে সমস্ত বস্তিটা পুড়িয়ে ছাই করে দিলে। পতিতালয়গুলো আর আবজেলের ভুঁইকুঁড়েটা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। বুক ফাটিয়ে হাহাকার করে কাঁদলে খয়রন আর আবজেল। জায়গার মালিক বালীগঞ্জ থেকে মোটর হাঁকিয়ে এসে অনুশোচনা করে বলে গেল এখানে পাকা ইমারত গাঁথা হবে। যারা ভাড়াটে ছিল তাদের ঘর দেবার ব্যাপারটা ভেবে দেখা হবে আগে। অবশ্য তারা যদি মাসে পঞ্চাশ টাকা করে ভাড়া দিতে পারে!

হিমঝরা কনকনে শীতের রাতে পথের পাশে—পাতাঝরা গাছের তলায় পড়ে প্রথম দিন খুব কাঁদলে ভিখারী-দম্পতি। অসহায়ের সহায় নিরাকার আল্লার দরবারে অভিযোগ না করে নিজেদের কপালের লিখন পালটাবার জন্যে করুণাভিক্ষা করলে।

আবার সেই ভিক্ষাবৃত্তিতে নেমে এল দুজনে। পচা নোংরা গলির

আঁস্তাকুড় ঘেঁটে সারাদিন জীবিকার আহরণ : পড়ে থাকে যে কোনো জায়গায় আস্ত বাসি মড়ার মতো। মাছি ভনভন করে গায়ে মাথায়। তিনটে মানুষের কাঁচা জীবন ধুঁকিয়ে ধুঁকিয়ে শ্বাস টানে, চামচিকে পাকানো সিটে তিনটে শরীরে।

ধীরে ধীরে বয়স বাড়ে মুসার। পথ-চলতি পাড়াগাঁয়ের জমানো ভিক্ষের চাল-আটা নিয়ে গাছের তলায় তিনটি ইটের ঠিকে উনুনে কাঁধে-করে-বয়ে-বেডানো মাটির ছোবা ভাঁড়ে রান্না বসায় খয়রন। ছুটে ছুটে জ্বালানি-কাঠ কুড়িয়ে আনে বাচ্ছাটা। একফালি ন্যাকড়া জড়িয়ে শন্-নুড়ি চুল আর খোস-ওঠা গা মুঁচতে মুঁচতে গৃহিণীর মতো রান্নার কাজে ব্যস্ত খয়রন। ফেন জড়ানো চাল-ডালের কিম্বা খুদের খিচুড়ি-ভাতটুকু তিন ভাগ করে সপাসপ কয়েক মুহূর্তেই মেরে দেয় তিনজনে।

যাযাবর জীবনকে টেনে ক্রমে ক্রমে এগিয়ে যায় শহরের পথে। একদিন দেখা যায় নভচারী প্রাসাদের সুনীল নিয়ন থেকে ছিটকে-পড়া এক চিলতে আলোতে পার্কের এককোণে ওরা সংসার পেতে বসেছে। খোঁড়া আবজেল একটুকরো ইট মেরে মেরে ভাঙবার চেষ্টা করছে ভদ্রলোকে-খেয়ে-ফেলে-দেওয়া একটা ডাবের খোলকে। অদম্য চেষ্টা—প্রাণপণ। সে যেন লড়াই করছে। ভাঙতে না পেরে আঙুল গলিয়ে কুরে কুরে শাঁসটুকু খাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু পাকা শাঁস ওঠার নামই করে না। শুধু আঙুলটা চাটছে তো চাটছেই!

লোভাতুর ড্যাবডেবে আর জ্বলজ্বলে চোখ মেলে চেয়ে থাকে খয়রন। শুকনো ঠোঁট দুটো তার লালায় ভিজে যায় ঠোঁট নাড়ার অনুকরণ করে। শেষে ইটটা নিয়ে বলে, 'কই দাও দিকিনি—ভেঙে দিচ্ছি!'

'তুই যা কচ্ছিস্ কন্না।' না, কিছুতেই দেবে না আবজেল। খেয়ে নেবার মতলব। হাইফাঁই করতে করতে ছুটে ছুটে আর একটা খোল নিয়ে এল মুসা। রেলিংয়ের ওপারে নাকি খাচ্ছে দুটো বাবু। মেয়েরা সাথে আছে এক দঙ্গল। আরো খাবে। অনেকগুলো জুটে গেছে এরই মধ্যে ভিখিরী ছোঁড়া-ছুঁড়ির দল।

মায়ের কাছে খোলটা জিম্মা রেখে মাথা গুঁজে চিলের মতো ছুটে গেল মুসা। কিন্তু মাড়োয়ারী বাবুরা এবং বিবিরা বুঝি আর ডাব খাবে না!

দইবড়া আর ফুচকাঅলাদের কাছে ভিড় জমিয়ে ঘাঘরা ছড়িয়ে বসেছে

বিবিগুলো। পায়ে পায়ে কাছে ঘেঁষে গিয়া মুসা শীর্ণ একখানা হাত বাড়িয়ে বলে—'মা!…'

ক্ষুধার্ত শকুনশিশুর মতো তার কণ্ঠস্বর।

তাড়া খেয়ে সরে এল মুসা। মেয়েগুলোর গায়ে হাজার হাজার টাকার সোনার গয়না! মাড়োয়ারী বাবুটি রঙিন পাথর বসানো আংটিপরা আঙুলের টুস্‌কিতে পোড়া সিগারেট খণ্ডটি ছুঁড়ে ফেলে দিতেই চোখ কান বন্ধ করে দম মারে মুসা।—'আঃ!'…এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে দেয় আকাশে; কিলবিল করে ছড়িয়ে যায় বাউরী বাতাসে।

একজন বাঙালীবাবু ওখানে দাঁড়িয়ে। হাতে অ্যাটাচিব্যাগ। সাদা খদ্দরের পোশাক। উদাস চাউনি।

—'বাবু!'

—'কিরে! ওঃ! পয়সা চাইছিস? দুদিন খাওয়া হয়নি?'

ভদ্রলোক কবিসুলভ করুণ দৃষ্টি মেলে তাকে কিছুক্ষণ দেখলেন। মুসার শুকনো ঠোঁট দুটো নিসপিস করতে লাগল। এক পায়ে দাঁড়িয়ে এক পা ঘষতে লাগল হাত দুটো পিছনের ঘাড়ের দিকে করে বেঁধে। বললে, 'আমরা দুদিন খাইনি বললে তো কেউ কিছু দেয় না বাবু! বলে, আরে, দুদিন করে তো আমরা সব্বাই শুকিয়ে আছি। সব্বাই—অল বাংলার সব্বাই! খালি লাট, মন্ত্রী, বড় বড় কোম্পানির মালিক আর অফিসাররা ভালো ভালো খেতে পায়—যাকে 'খাওয়া' বলে! দুধ-ঘি-ডিম-মুরগি-মদ-পোলাও-কোর্মা এইসব! আমরা সেসব দেখিনি—নামও জানিনি।…'

ভদ্রলোকটি দুর্বল-হৃদয়। তাঁর চোখ সজল হয়ে উঠল। পকেট থেকে একটা কি যেন বার করে ওর হাতে দিয়ে হনহন করে সোজা চলতে লাগলেন।

কিন্তু…, মুসার চোখে ধাঁধা লেগে গেল। ছুটল পিছনে পিছনে।—'বাবু—ও বাবু'—ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেছেন তখন বাবুটি।

এক দৌড়ে পার্কের কোণে এসে দাঁড়াল সে বাবা-মা'র কাছে। গালের ভেতর থেকে একটা চকচকে আধুলি বার করে দেখালে তাদের দুজনকে। ছোঁ মেরে—ধাঁ করে—ছিনিয়ে নিলে খয়রুন।

আবজেল বলে, 'তুই ক্যানো লিবি?'

মুসা বলে, 'তুই শালা চুষার! অ্যাহ্! ফপর দালালী মাবাচ্ছে!

ডাবটা লেসে দিতেই ঝেড়ে দিয়ে বসে আছে! মা, দে মোর পয়সা, চাল কিনে লেসি!'

'তা দে! তা দে!' বলে আবজেল ঝাঁকড়া চুলদাড়ি বোঝাই মাথাটা নেড়ে নেড়ে। কিন্তু খয়রন ছেলেকে বিশ্বাস করতে পারে না। যায় তার সঙ্গে সঙ্গে। পথে বলে, 'ছ-পয়সার একটা 'আস-কিম' কেনতো বাবা।'

মুসা রাজি নয়। চাল কিনে ফিরতি পথে গলির আবর্জনা থেকে কুড়িয়ে আনলে একটা মরা মুরগী। খয়রনের মতে সেটা টাটকা—হয়তো এখনি কেউ ফেলে দিয়েছে। গায়ের উষ্ণতা পর্যন্ত বর্তমান।

রান্না চাপালে ঠিকে উনুনে।

মাঠভরা সবুজ ঘাসের আস্তরণ আলোয় আলো। আবজেলের হাত থেকে মুরগীর ছাড়ানো ধবধবে পালকগুলো নিয়ে মুসা খেলায় মত্ত। ফিরফিরে বাতাসে পেঁজাতুলোর মতো রঙিন আলো-ভরা সারা মাঠে ছড়িয়ে গেছে পালকগুলো।

রান্না শেষ হবার আঞ্জাম বুঝে অর্কিড ঝাড়টার কোল ঘেঁষে দাঁড়ায় মুসা। চোখ পড়ে তার সামনের প্রাসাদের দোতলার বারান্দায় দাঁড়ানো তারই বয়সী চকচকে একটা ছেলের দিকে। উৎসুক দুটো ভোমরা কালো চোখে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। মজা দেখছে যেন।

কি খেয়াল গেল মুসা মুখ ভেংচে কীল বাগিয়ে বাগিয়ে দেখাতে লাগল ছেলেটাকে। হঠাৎ ঝলমল-করা ঝুলন্ত পর্দাটার ভেতরে গপ্ করে সেঁধিয়ে গেল ছেলেটা।

কিছুক্ষণ পরে উৎকট চিৎকার আর অশ্রাব্য গালাগালিতে মৌনতা ভেঙে গেল চারদিকটার। উচ্চকিত হয়ে পার্কের কোণটায় তাকালে সকলে।

'কেন তুই লিবি র‍্যা শালা! ল্যাসবার গতর নেই—ফিরে মোর কেড়ে খাওয়া!'

'হাঁ র‍্যা শালার শালা পাজী—মুই লিইচি? না, উ-মাগী!'

'কেন মুই এট্টুস বেশি লুবুনি? মুই তো 'গুইড়ে' আনমু।' অতএব মাংসের বাড়তি অংশটুকু তো খয়রনের পাওয়া। যাহোক, সন্ধি হয়ে গেল একটু পরেই। অন্য আর একদিন—যেদিন মাংসের যোগাড় হবে দেবে মুসাকে বেশি করে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে পথের-কুড়িয়ে-আনা আধ পোড়া সিগারেট-বিড়ি-

গুলো বের করে উনুনের আগুনে ধরিয়ে ধরিয়ে তিনজনে বসে বসে বেশ কিছুক্ষণ ধূমপান করলে।

হাড়-কনকনে শীত। গুটিসুটি মেরে কাঁটালী-চাঁপা আর আঁকিভ ঝোপটার তলায় শুলো তিনজনে ছেঁড়া-ধোকড়া ময়লা গুদ্‌ড়ি মুড়ি দিয়ে। উচ্ছ্বসিত সেতারের সুমধুর আলাপ ভেসে আসছে পার্কের কোণের বাড়িটা থেকে। কানে এসে বাজে হরেক রকমের শব্দ :

'রাজকুমারীয়া ইলতুৎ পাউডার।'…'কুলপী মালাইবরফ!'…'মালিশ।'…

পথ থেকে পথে। আশাহীন আকাঙ্ক্ষাহীন জীবন। বৈচিত্র্যহীন।

আর একদিন :

ভিখারী বধূর আর্তচিৎকারে ছিঁড়ে-খুঁড়ে গেল মধ্যাহ্নের নীরবতা।

এইমাত্র পরনের আটপৌরে কাপড়খানা মাঠের ঘাসে মেলে দিয়ে হাত দেড়েক একটা ফালি ন্যাকড়া কোমরে জড়িয়ে এলো বুকে পড়েছিল খয়রন ওই শাখাপ্রশাখা বিস্তার-ঘন শিরীষ গাছটার তলায়। বসে বসে তার মাথার শনুনুড়ি চুল হাঁটকে উকুন বাছছিল আবজেল। হঠাৎ—হঠাৎ এমন করে আকাশ-ফাড়া চিৎকার করে উঠল কেন খয়রন? পাগলের মতো চিৎকার করে ছুটে চলেছে সার্কাস এভিন্যুটার দিকে!…

কালো পীচ-মোড়া চওড়া রাজপথের বুক থেকে রক্তাক্ত দেহ মুসাকে বুকে তুলে চিৎকার করতে করতে পঙ্গু স্বামীর কাছে ছুটে এল খয়রন।

বাবুদের উল্কাবেগ ট্যাক্‌সির তলায় চাপা পড়ে নাকি মারা গেছে তার বাচ্ছাটা! খয়রন শুয়ে শুয়েই দেখতে পাচ্ছিল, রাস্তার ওপারের বাড়িটার তেতলা থেকে একটা মেয়ে খান দুই বাসি রুটি ছুঁড়ে দিচ্ছে মুসাকে দেখিয়ে। ওপারে অনেক ভিখারীর ভিড়। হাঠৎ ছুটে রাজপথটা পাড়ি দিতে গিয়ে—'মোর বুকের মাণিক, ওই বাবুদের গাড়ি চাপা পড়ে মরে গেল বাবারে'…অসহায় আর্তনাদে খয়রন বুক চাপড়াতে লাগল তার রক্তমাখা বাচ্ছার লাসটা কোলে চেপে। গণ্ড উঁচু তোবড়ানো গালের রোদপোড়া চাপ-দাড়ি বেয়ে ঝরঝর করে অশ্রু ঝরে পড়ছে পঙ্গু আবজেলের। তার যদি মিলের-সেপটোয়-জড়িয়ে-সিলেনডারে-ঘুরিয়ে-আছাড়-খাওয়া এই ঠ্যাং-ঠোকনা-ভাঙা-'অবস্থা' না হত —তাহলে তার মাগছেলে আজ এমন করে…

খয়রন ভিখারী মেয়ে হলেও সে মা! বুকে তার দুরন্ত হাহাকার!

পথের মানুষ হঠাৎ একটু দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে চলে যায় যে যার কাজে।

রক্ত উগরে শ্রান্ত সূর্য নামছে পাটে।

কান্না থামিয়ে খয়রন একসময় কঞ্চি-কঙ্কাল শরীরে ছিন্নমলিন আটপৌরে কাপড়খানা জড়ালে। কাঁধে তুলে নিলে তার শুকনো কালো রক্তমাখা মরা বাচ্চার লাসটা।

অশ্রুক্ষুব্ধ চোখ দুটোর তারায় তারায় তার এক ঝলক নতুন আশার আগুন। খয়রন পা বাড়ালো পথে। কান্না-মাখা সারা মুখে তার চিকচিক করছে আরেক বুভুক্ষা!

দানসাদ মিস্ত্রির কথা

দানসাদ মিস্ত্রির মতো লোক সংসারে বড় দুর্লভ। সে জানে না এমন বেশি কাজ নেই। রেডিও সারা, গ্রামোফোন সারা—সাইকেল, মোটর মিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, ঘরামি-গীরি, কাঠ বা কাপড়ে নকশা আঁকা, দেওয়ালে চিত্র আঁকা, জাল বোনা, ঘড়ি সারা, দর্জির কাজ, ছুতোরের কাজ—সব তার ভাল জানা আছে।

পান-খাওয়া রাঙা ঠোঁটে তার মিষ্টি হাসিটি লেগে আছে সব সময়। সে নামাজ পড়ে পাঁচওয়াক্ত। মুখে পাতলা হালকা দাড়ি। মাথায় কিস্তির জালিদার টুপি—কখনো থাকে, কখনো আবার থাকে না। সিঙ্গাপুরী চেক লুঙ্গি আর ফতুয়া পরনে। পাতলা গড়ন। পাকা গৌর বর্ণ। বয়স গোটা পঞ্চাশ। বাড়ি চক-কাশীপুর।

মাটির বা ইটের দেওয়াল হয়ে গেলে ডেকে আনো দানসাদ মিস্ত্রিকে। দেওয়ালও সে গেঁথে দিত আগে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাটির 'চাপ' মেরে দিত—কোণ-কান, একেবারে সোজা—পাকা ঘরের দেয়ালের মতন। এখন তার দশ টাকা রোজ, আর তাকে সহজে পাওয়াও যায় না—তাই ছোটখাটো পাঁচ টাকা রোজের ঘরামি, বাউর ঘরামি অথবা পূর্ণ সরদার 'দেলী'কে দিয়ে দেওয়াল গাঁথিয়ে নিতে হয় মাটির হলে। দানসাদ এসে তার ছোট হাত-করাত দিয়ে নিচে বসে বসে সমস্ত বাঁশ, গরান বা শালের খুঁটি, তালের 'লাদনা', ভাঁসা, 'পাড়', 'সরদাল'—সমস্ত কুঁচিয়ে নিয়ে উপরে তুলে কাঠামো খাটিয়ে দেবে। বাঁশের মুখে মুখে ভাঁসাগুলো এমন খিলিয়ে দেবে যে বাঁথারীর 'বাঁটাং' মারার

পর দু-কুটরী ঘরে সাড়ে বারোশো টালি খোলা তুলে দিলেও 'তীর' না লাগিয়েই সমস্ত চাল বা ছাউনি শূন্যে শুধু 'দাদ্না' বা 'দাঁত নে'র মুখে ভর রেখে দাঁড়িয়ে থাকবে। আড়াই কেজি করে প্রত্যেক খোলাটার ওজন হলে সাড়ে বারোশো খোলার ওজন কত? একত্রিশ কুইণ্টল পঁচিশ কেজি হয় কি? তারপর বাঁশ, কাঠ, কাঠামোর ওজন আছে। কাজটায় এখন নোদাখালীর বাগদির ছেলে পূর্ণ সরদারও হাতপাকা হয়ে গেছে।

দানসাদের হাতের ঘর আছে এ অঞ্চলে শত শত। তার মধ্যে ফুল-বাঁখারী চাঁছতে পারবে না কেউ। বহু ব্যয়ে শৌখিন বাংলো-বাড়ি বাঁধতে হলে দানসাদ মিস্ত্রিকে চাইই। মোড়ল বাবুরা যখন ছবির মতন দোতলা পাকাবাড়িটা বাঁধেন তাঁদের সঙ্গে দানসাদের মতের মিল না হওয়াতে—মূলত তাঁদের সঙ্গে না—কলকাতার একজন হিন্দু রাজমিস্ত্রির সঙ্গে—সে কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে আসে। সপ্তাহ দুই পরে মোটর সাইকেলে চেপে অমিয়বাবু স্বয়ং এসে হাজির, 'দানসাদ, তোমাকে যেতে হবে, ইন্দু মিস্ত্রি টেরা-বাঁকা করে ফেলছে দেওয়াল গেঁথে তুলতে। বলছে সিমেণ্ট মশলা দিয়ে ভরাট করে দেবে। মা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। তোমাকে চাই যেতেই হবে।' দানসাদ চোখে কাঁচ লাগিয়ে ঘড়ি সারছিল তার দলিজে বসে। ছোট্ট দলিজ। বিচিত্র ছবি আঁকা দেওয়ালে। মাটির দেওয়াল 'উলুটি' করা। চকচক করছে যেন আয়নার মতন। গিরিমাটির রঙে চিত্রিত ছবিগুলি। এই 'উলুটি' করতে গেলে অনেক পরিশ্রম, অনেক খরচ। দানসাদের ঘরের দেওয়াল আরো আশ্চর্য রকমের সুন্দর—মসৃণ। প্রথমে উলু কুঁচিয়ে কাদার ছোপ মারতে হয়। পরে পাট কুঁচিয়ে। তারপর তুঁষ। কুঁড়ো। তারপর দুধেমাটি। শেষকালে কুসুম বাদ দিয়ে ডিমের লালা দিয়ে সমস্ত দেওয়াল মাজতে হবে। পাকাবাড়ির চাইতেও অনেক খরচ। এ একেবারে প্লাসটিক পেইণ্টের মতো চকচকে। দানসাদ ঘরামি বটে কিন্তু 'ঘরামির ঘর ফাঁকা' অভিশাপ থেকে মুক্ত।

হঠাৎ কালো রঙের কাপড়-পরা দীপশিখার মতন অপরূপা এক সুন্দরী যুবতী মাথা এলো করে এসেই জিব কেটে আবার অন্দরে পালিয়ে গেল। অমিয়বাবু আশ্চর্য, দানসাদের বউ নাকি—এত সুন্দরী! এ যে একেবারে কাশ্মীরী গোলাপ!

দানসাদ বললে, 'বাবু যাই কি করে বলুন দেখি! অনেক কাজ হাতে।

এ-ক'টা মাস চাষীবাসীদের ঘর হচ্ছে। কাঠামোর কাজ হাতে নিয়েছি। অনেকেই গরিব লোক। অনেক কষ্টে দেওয়াল তুলেছে। চোত, বোশেখ, জষ্টি মাসের মধ্যে ঘর শেষ না হলে বিষ্টি নামলে মাটির দেওয়াল ধুয়ে যাবে। এখন আমাকে মাফ করুন। অন্য রাজমিস্ত্রি কত আছে, তারা কাজ পাচ্ছে না, তাদের ডেকে নিন।'

'না তা হয় না, দানসাদ মিয়া, তোমাকে যেতেই হবে।' শেষকালে হাতে ধরে অমিয়বাবু। বি-এ পাস, সম্ভ্রান্ত লোক, কলকাতায় চা-দোকান, মনিহারী দোকান চলে, আগের পুরনো জমিদার। দানসাদ উঠে পড়ে।

'একি করেন বাবু...ঠিক আছে, আমি যাব একদিন...'

'না, এখনি একবার দেখে আসবে চল।'

মোটর সাইকেলে করে অমিয়বাবু তাকে নিয়ে এলেন। এসে সব দেখে সে তো বুড়বাক বনে গেল। এক-মানুষ উঁচু গাঁথা হয়ে গেল। এ যেন পায়মিক অ্যাবসেসের রোগীর সাইটিকা বলে ডাক্তার খুব জাঁকিয়ে চিকিৎসা করে গেছে।

দানসাদ বললে, 'সব ফেলে দিতে হবে। নিচের বনেদ বার করে রাখুন, পরে আমি আসব। এর উপর ঘর গেঁথে তুললে অ-সমান হবে। অল্পদিন পরে দেওয়ালে ছাদে ক্র্যাক হবে।'

অগত্যা। অনেক টাকা লোকসান। আবার টাকা খরচা করে ভাঙো। দানসাদের নির্দেশ মতো শিরাকোল-বঙ্গনগর-কাশীরামপুরের ইউসুফ মিস্ত্রি খোদাবক্স মিস্ত্রিকে ডেকে আনতে হল। অমিয়বাবুর মা দানসাদকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গিয়ে বেশ খাতির করে চা মিষ্টি লুচি খাওয়ালেন—পাছে লোকটা তার পুরনো অপমান মনে পুষে রাখে। বনেদ গাঁথা, মানে, ভিত্তি পত্তনের সময় ঈশান কোণে কিছু সোনা-রুপো দিতে হয় দানসাদ জানাতে বৃদ্ধা মা তাঁর কপালের টিকুলি খুলে দিয়েছিলেন। আর একটা রুপোর ছোট্ট বাটি। গৃহ যে লক্ষ্মী। বসতমাতাকে সন্তুষ্ট করতে হয়। তাঁর যেন অভিশাপ না লাগে।

ইনজিনিয়ারের নকশা দেখে নতুন প্যাটার্নের ঘর গাঁথা হতে লাগল। দানসাদ ছোট মিস্ত্রিদের শুধু ফরমাস দেয়। মাপ জোঁক করে। 'ওলোন', ধরে। 'কণিক' চালায়। 'বাস', 'মাটাম', 'উসো', 'দস্তি', 'সুরমি', 'আতান', 'ডাইস' ধরে কাজ দেখায়—কাজ শেখায়। ইউসুফ মিস্ত্রি পাকা লোক।

খোদাবক্সের রাগ একটু বেশি। খুলি পাতলা—রগচটা লোক। তার বাবরি চুল, মাথায় পক্কড়, পরনে পাজামা, পাঞ্জাবি, ওয়েস্ট কোট। মুখে কাঁচা কালো দাড়ি। রঙ খুব কালো। সারা গায়ে বসন্তর দাগ। ইউসুফ মিস্ত্রি ধুতি শার্ট পরে। ওদের রোজ সাত টাকা করে। অনেক যোগাড়ে লেগেছে। ইট ভাঙছে, সুরকি কুটছে, মশলা মাখাচ্ছে, বালতি করে ভারা বেয়ে বেয়ে মাল তুলছে। মাঝে মাঝে দানসাদ গান করে।

তার গান শুনতে আসে ছেলেমেয়েরা। সামনে বিরাট পুষ্করিণী। ফল ফুলের বাগান। পুরনো আমলের বাড়ি জল থেকে গাঁথা হয়ে উঠেছে। মাথায় সিংহ বাঘ! অমিয়বাবুর ঠাকুরদাদা ওই বাড়ি তৈরি করেন। তখন বিখ্যাত রাজমিস্ত্রি ছিল নোদাখালীর জয়নদ্দি সেখ। বাগানে অর্ধনগ্না নারীদের মূর্তি। পাম, ঝাউ, ইয়ুক্কা, ক্যাকটাস গাছ।

অমিয়বাবুর ঠাকুরদাদা রায় সাহেব ঈশান মণ্ডলের নাম শুনলে নাকি যমেও ভয় পেত। গল্প আছে: তিনি একবার শালতি করে ধান-বনের মধ্যে দিয়ে আসছিলেন। কে যেন হেঁকে বলে, 'কে যায় হে? ধানের ক্ষতি করলে ঈশান মোড়লের কাছে ধরে নিয়ে যাব। শংকর মাছের ছড়ি দিয়ে ছাল ছাড়িয়ে নেবে।'

শালতিঅলা বলে, 'ঈশান মোড়ল আমার বাপ হয়, তুই তার শালা?'

তখন জমিদার ঈশান মণ্ডল করঞ্জ চোখ তুলে বিরাট গোঁফ জোড়া নাচিয়ে কৌতুক-ভরে শালতিঅলাকে শুধোন, 'তুমি জমিদার ঈশান মণ্ডলকে চেনো?'

শালতিঅলা বলে, 'না, বাবু!'

সেই বাড়িতে কাজ করতে এসেছে দানসাদ।

দানসাদ গাইছিল:

'আজ বুঝি তোরে যাবে লইয়া
লো বুবুজান,
আজ বুঝি তোরে যাবে লইয়া॥
বিহান থেকে মুখটি কেন ভার
কথা কেন সরে না মুখে আর
চোখের পানি চলে দুগাল বইয়া—
লো বুবুজান
আজ বুঝি তোরে যাবে লইয়া॥

টিপির টিপির পানি হয়
বাইহে চলে লইয়া।
এতই সাধের আলতা পরা
তাও গেল ধুইয়া—
লো বুবুজান
আজ বুঝি তোরে যাবে লইয়া ॥'

অমিয়বাবুর মেয়ে তিনটি গান শুনে খিলখিল করে হাসে। গলার ঢলানি সুরটি দানসাদের বড় মিষ্টি। একেবারে মেয়েলী ধরনের। কলেজে-পড়া মেয়েটি, যার নাম সুনন্দা—সে বলে, 'মিস্ত্রি আর একটা গান করো।'

দানসাদ আরম্ভ করে :

'চাঁদামাছ উঠিয়া বলে
আর কেঁদো না ভেইয়া
তোমার বিয়েতে যাব
কানের পারশি হইয়া ॥
চুনোমাছ উঠিয়া বলে
আর কেঁদো না ভেইয়া
তোমার বিয়েতে যাব
নাকের 'নোলক' হইয়া ॥
পাল্কী চলে হুম হুম
হুম হুম হুম হুম
জোরসে হাঁকে হেইয়ো
শালী বড্ড ভারী রে
হুঁস করে ভাই বইয়ো ॥'

মেয়েরা আবার হাসতে থাকে। সবাই টিফিন করতে চলে গেলে দানসাদ যখন একা এক কোণের দিকে নকশার কাজ করে, বই কোলে নিয়ে একটা টুলের উপরে বসে থাকে সুনন্দা। গল্প করে ওর সঙ্গে। ওর সংসারের গল্প। বউয়ের নাম নাকি পরী। পরীর মতন ফরসা। তন্বী চেহারা। তার কখনো ছেলেপুলে হয়নি। একেবারে জোয়ান যুবতী। সে কালো রঙের শাড়ি পরে সর্বদা। সুন্দর কাঁথা সেলাই করতে পারে। আর ঘুমোয় খুব বেশি। দানসাদের একটা মাসি থাকে সংসারে। সেই সব দেখে। মাসির

নানান অভিযোগ। সে নাকি রুটি গড়ার সময় 'জিনিস' বা নেচি তৈরি করে কুলোয় রেখে দেয় আর বউকে বলে, দেখিস মা, ভেড়াটা যেন খেয়ে না নেয়। কিন্তু বউ তার এক গেলাস গরম চা খেয়ে নেবার পরই পিঁড়েয় বসে দেওয়াল হেলান দিয়ে দিব্যি ঘুমোতে থাকে। আর ভেড়াটা আস্তে আস্তে এসে সব নেচিগুলো খেয়ে নেয় কখন।

সুনন্দা খুব হাসে। বলে, 'তুমি বেশ গল্প বলতে পার!'

দানসাদ মিস্ত্রি নিচের তলার মিস্ত্রিদের একবার হেঁকে কাজের কথা বলে দেয়। তারপরে বলে, 'চোদ্দ অক্ষরে পয়ার ছন্দে আমি একটা পুথি লিখেছি। তার কাহিনী শুনবে নন্দা?'

সুনন্দা মিষ্টি হাসি মাখিয়ে বলে, 'বল।'

'কাহিনীটা আমি একটা উর্দু বইয়ে পেয়েছিলাম। উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দ শহরে যে জগৎবিখ্যাত মসজিদটি রয়েছে তারই কাহিনী। এটি তৈরি করে চেঙ্গিস খাঁর প্রথম রানী। চেঙ্গিস সৈন্য-সামন্ত নিয়ে দূর কারাকোরম পার হয়ে সোনার রাজ্য হিন্দুস্তানের দিকে চলে গেছে। বীর চেঙ্গিস। দুর্দান্ত কষ্টের জীবন তার। বাপের রাজ্য হারিয়ে সে বন্দী হল। ঘাড়ে কাঠের ক্যাঙ। উৎসব রাত্রে মাতোয়ারা শত্রুশিবির। প্রহরীকে কাঁধে-বাঁধা ঢেঁকির মতন ক্যাঙের গুতো মেরে ফেলে দিলে তার রানীকে মুক্ত হতে পারলে দেবার লোভ দেখিয়ে শিকল খুলে দেবার পরেই। তারপর দৌড়। পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। জল খাবার জন্যে নদীর তীরে নামল। খাড়া তীর। মুখ বাড়াল ক্যাঙ ঘাড়ে নিয়ে। না পারছে না। পড়ে যাবে। হঠাৎ একদল ঘোড়-সওয়ার এল। তাকে খুঁজছে। শরখড়ির ঝোপে সে লুকিয়ে আছে। একটি সৈনিকের চোখে চোখ পড়ল। সে কিছু বললে না। রাতে কনকনে ঠাণ্ডায় মরুভূমি পেরিয়ে একটা আলো দেখে এসে এক বাড়ির দরজায় আঘাত করতে বেরিয়ে এল সেই সৈনিকটি। সে দলপতি। বললে, 'চেঙ্গিস তুমি!' সে তাড়াতাড়ি ভিতরে এনে ক্যাঙ কেটে ফেলে চেঙ্গিসকে মুক্ত করে গরম দুধ খেতে দিলে। তার বউ তাকে কম্বল চাপা দিয়ে দিলে। কিন্তু খানিকটা পরেই সন্দেহপরায়ণ আর একদল সৈনিক এল। বাঁশের চোঙার দুরবীনে তারা নাকি দূর মরুভূমির আকাশপটে চেঙ্গিসকে ক্যাঙ ঘাড়ে নিয়ে এদিকে আসতে দেখেছে। মরুভূমির বালিতে স্পষ্ট পায়ের ছাপ। সৈনিকদের হাতে বর্শা আর জলন্ত মশাল। তারা বাইরে

থেকে ডাকতেই বউটি চেঙ্গিসকে খিড়কি দিয়ে বার করে এনে পশমের গাড়ির মধ্যে গুঁজে দিলে। দলপতির বাড়ি খানাতল্লাসী হল। ক্যাওটা আগেই পুঁতে ফেলা হয়েছিল। সৈনিকরা পরে এসে বর্শা চালাতে লাগল গাড়ি ভর্তি পশমের মধ্যে। চেঙ্গিসের দেহে তাদের বর্শা গাঁথতে লাগল। বর্শার রক্ত মুছে গেল পশমে। তারা টের পেলে না। সবাই চলে গেলে দলপতি তাকে টেনে বার করলে। শত ঝোরায় রক্ত ঝরছে চেঙ্গিসের দেহ থেকে। দলপতি একটা ঘোড়া দিয়ে বললে, 'এ রাজ্য ছেড়ে পালাও বন্ধু—নিস্তার নেই। বাঁচলে পরে দেখা হবে।'

চেঙ্গিস সেই আহত অবস্থায় ঘোড়া ছুটিয়ে বহু মাইল পার হয়ে এসে এক সময় অজ্ঞান হয়ে এক মরুদ্যানের মাঝখানে পড়ে গেল। তার জ্বর হয়েছে। ঘোড়াটা সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল। পরে একদল বেদুইন এসে চেঙ্গিসকে তুলে নিয়ে যায়। এবং চেঙ্গিস পরে তাদের দলপতি হয়ে হৃতরাজ্য আব রানীকে উদ্ধার করে।

এটি হল চেঙ্গিসের দুঃখময় জীবনের ভূমিকা। মসজিদ তৈরির কাহিনী এরপর। চেঙ্গিস এক বৎসর পরে দেশে ফেরার কথা বলে রাজ্য জয় করতে বেরিয়ে গেলে রানী রাজ্যে ঘোষণা করে দেয় যে সে একটি জগৎবিখ্যাত মসজিদ করাতে চায়। তার নকশা তৈরি করে আনুক শিল্পীরা। অনেক শিল্পী তাদের নকশা নিয়ে এল। কোনোটাই পছন্দ নয়। নতুন কিছু চায় সে। শেষে একটি নকশা এল। রানীর খুব পছন্দ হল। রানী শিল্পীকে দেখেই তো অবাক। অপরূপ সুন্দর এক যুবক। এমন রূপ যে মানুষের থাকতে পারে রানী তা কল্পনাও করেনি। স্বর্ণাভ ঢেউ খেলানো চুল, নীল চোখ দুটি যেন মায়াময় ঝিনুক। নাকের গড়ন কি অপূর্ব! শিল্পীকে রানী বললে, 'এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পাবে কিন্তু যদি এক বছরের মধ্যে মসজিদ তৈরি না করতে পার তাহলে তোমার গর্দান যাবে। কেননা আমি চাই জগৎজয়ী বীর চেঙ্গিসকে জিততে। তিনি এসে এই মসজিদ দেখে যেন স্তব্ধ হয়ে যান। যেন মনে করেন যাদুমন্ত্রবলে কোনো যাদুকর স্বর্গ থেকে এই সাদা রুপোর প্রাসাদ তুলে এনে তাসখন্দের বাগিচায় বসিয়ে দিয়ে গেছে।'

শিল্পী রাজী হল। রানীর রূপ দেখে সেও মোহিত হয়ে গেছে।

মসজিদের ভিত্তি স্থাপিত হল। শত শত উট মাল বইছে। দামী দামী পাথর আসছে। হাজার হাজার লোক কাজ করছে।

মানুষ-সমান গাঁথা হবার পরে একদিন রানী তার সহচরীকে সঙ্গে নিয়ে কাজ দেখতে এল। সূর্য তখন অস্তাচলে। শিল্পী মীনহাজ বেগ দাঁড়িয়ে আছে ভিত্তির উপরে। বোরখার নেকাব তুলতেই তার সঙ্গে চোখোচোখি হল রানীর। অস্তসূর্যের রাঙা রশ্মি পড়েছে রানীর গোলাপ-কোমল মুখে। সেই অপরূপ দৃশ্যে শিল্পী মুগ্ধ হল।

সহচরী তাকে ইঙ্গিতে ডাক দিলে।

সন্ধ্যার পাতলা অন্ধকার। চেনার গাছের নিচে এসে দাঁড়াল রানী। তার সামনে শিল্পী মীনহাজ বেগ। রানী হাত ধরলে শিল্পীর। দুজনে নির্বাক। কাঁপতে লাগল শুধু। দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। মশালের আলো এসে পড়ছে দূর থেকে মাঝে মাঝে। চলন্ত উটের ছায়া চলেছে দীর্ঘ হয়ে দিগন্তের কোল পর্যন্ত। আখরোট, খেজুর, খুবানি, চেরী, পাইন, ফার গাছের মধ্যে কুয়াশা—বরফের হালকা পেঁজা তুলো ভাসতে ভাসতে পাতায় পাতায় ঘাসে ঘাসে জমছে আলতো পায়ে পায়ে। অনেক রাত্রে জমা বরফগুলো ছুঁচলো পাইনপাতা থেকে খসে পড়বে কাঁচের মতন ঝনাৎ করে।

তারপর ?

তারপর হঠাৎ যদি ভয়ঙ্কর তুষার-ঝড় ওঠে, ফার গাছগুলো ফেড়ে চৌচির হয়ে যাবে। তাঁবু লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে শিল্পীর।

সহচরী সামনে এল। হাত ছেড়ে গেল। চেঙ্গিসের চর আছে। জানতে পারলে শিল্পীর প্রাণ যাবে।

তাঁবুতে ফিরে এল শিল্পী।

রাজমিস্ত্রিরা পরদিনের কাজ বুঝে নিয়ে চলে গেল। শিল্পীর চোখে ঘুম নেই। সে চেয়ে থাকে মসজিদের দিকে। তারপর দীর্ঘ ছ-মাস কেটে গেল বহু আয়াস কষ্ট স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে।

রানীকে দেখতে না পেয়ে শিল্পীর মন শ্রান্ত হল। মসজিদের প্রাথমিক কাজ সব শেষ। এবার বাইরের গাঁথুনি। নকশার কাজ। শিল্পীর নিজের কাজ। কিন্তু রাত জাগার জন্যে তার হঠাৎ খুব ঠাণ্ডা লেগে জ্বর এসে গেল। জ্ঞান হারালে শিল্পী। রানী হেকিম পাঠালে। নিজে এল একদিন তার তাঁবুতে। কাজকাম সব বন্ধ। চিকিৎসার পর শিল্পীর জ্ঞান ফিরতে সে দেখলে তার স্বপ্নের দেবী তার মাথাটা কোলে নিয়ে বসে আছে—বসে আছে যেন রোগগ্রস্ত সন্তানকে নিয়ে মায়ের মতন। শিল্পী আবার জ্ঞান হারাল।

দীর্ঘ পনেরো দিন পরে যেদিন সে আরোগ্যলাভ করে কাজে হাত দিলে কোনো কাজই করতে পারলে না সে। উদাস মনে শুধু বসে রইল। রানী এল আবার বাগানে। শিল্পী সেই চেনার-বৃক্ষের তলায় এসে রানীর সামনে নতজানু হয়ে ক্ষমা চাইলে।

'রানী, আমাকে মুক্তি দিন। নাহয় গর্দান নিন। আমি আর পারছি না।'

রানী তাকে তুলে দুহাতে তার মুখটা ধরলে।

শুধোলো, 'মনে হচ্ছে তুমি ক্ষুব্ধ, পিপাসার্ত। কি তোমার অভাব, অভিযোগ? টাকা চাও, সোনা চাও?'

'না। তা যা দিচ্ছেন অনেক। কেবল ভাবছি, চেঙ্গিসের কথা। রক্ত-মাংসের নিষ্ঠুর এক পাষণ্ড কিনা আপনার মতন গোলাপকে পুরে রেখেছে হারেমে। আপনি কি সুখী? আপনার বুক কি ভরেছে তাকে পেয়ে?'

রানী হাসলে। বললে, 'সবাই সব কি পায়? তুমি কি পেয়েছ?'

'যা সুন্দর, যা মহৎ, যা ঐশ্বরিক তাকে আমি উপলব্ধি করি। সেটা শিল্পীর ব্যক্তিজীবনে এক অভিশাপ। স্বপ্নটা বাস্তব তার কাছে, কিন্তু বাস্তবটাও যখন স্বপ্ন হয়ে ওঠে, তাকে বহু আশাতেও পাওয়া যায় না।'

'কি চাও তুমি?'

'মুক্তি।'

'পাবে না। বিনিময় বল, তাই আমি দেব। আমি চাই তুমি অনুপ্রেরণা পাও। কাজে শক্তি পাও। নতুন বল ফিরে পাও মনে। কি চাও তুমি শিল্পী?'

শিল্পী কম্পিত। বিমুগ্ধ। সে রানীকে বলতে চাইলে, চাই তোমাকে কিন্তু বলতে পারলে না। কোথায় যেন পাশব-চেতনা সেখানে। রানী হয়তো উত্তর দেবে, সুন্দরী নারী, সোনা-রুপো, হীরে-মণি-মুক্তো বন্দী থাকে পাষণ্ড জঙ্গী মানুষদের আয়ত্তে। চেঙ্গিস তার মূর্ত প্রতীক। সে তোমাকে কেটে কুঁচিয়ে পায়ে দলে পিষে ফেলবে, যখন খুঁজে পাবে। অতএব যা নৈসর্গিক তাই চাও শিল্পী।

মীনহাজ বললে, 'আমি চাই বহুমূল্যের অমূল্য জিনিস। তা কি দিতে পারবে রানী? আমি চাই শুধু মাত্র একটি চুম্বন। আর কিছু নয়।'

রানী হাসলে। শিল্পীর কাছে পদ্মকোরক মুখখানা তুলে ধরলে। শিল্পী

প্রগাঢ় আবেগে চুম্বন করলে। বললে 'একটি চুম্বনের দামে আমি এই সৌধপুরী তোমাকে পুরস্কার দিয়ে গেলাম প্রেয়সী! শুধু আমার নামটি তোমার মনের পটে খোদাই করে রেখো!'

তারপর মসজিদ তৈরি হয়ে গেল।

পরীর মতো সাদা ডানা মেলে সবুজ মাঠের উপরে দাঁড়াল সৌধপুরী।

সহসা সংবাদ এল চেঙ্গিস খাঁ ফিরে এসেছে শহরে বিপুল বাহিনী নিয়ে।

চেঙ্গিস এসে সৌধপুরী দেখেই তো হতবাক! এ আবার কোথা থেকে এল? রানী হেসে বললে, 'এক যাদুকর এনে দিয়েছে আমাকে স্বর্গ থেকে।'

'তাই তো দেখছি! কোথায় সেই যাদুকর? আজ তাকে আমি পুরস্কৃত করতে চাই লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা।'

দরবার বসলে শিল্পীর ডাক পড়ল।

কিন্তু শিল্পী কোথায়? তাকে নাকি কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তার সহকারী শিষ্য এসে বললে, 'ওই সৌধপুরীর শেষ শিখরদেশ যখন গাঁথা হয়, গত রাত্রির ভোরে, অবাক কাণ্ড, গুরু আমার, ঐ নীল আকাশে সোনার আলো ছড়িয়ে চলে গেলেন দু'বাহু মেলে। এই সৌধ তৈরি করবার জন্যে তিনি এসেছিলেন—আর কোনোদিন ফিরবেন না।'

রানীর দু'গাল বেয়ে নীলকান্তমণি চোখের জল ঝরে পড়তে লাগল নীরবে।…'

কাহিনী শুনে সুনন্দা নির্বাক হয়ে গেল। একজন রাজমিস্ত্রি বলে কি? লোকটা কি মানুষ! যে তাজমহল তৈরি করেছিল সেও তো ইনজিনিয়ারিং পাস করেনি! বৈজ্ঞানিক ইনজিনিয়াররা ছাঁচে-গড়া জিনিসকে রূপ দেন। তারা স্বপ্নকে, সৌন্দর্যকে রূপ দিতে পারেন না। কাজের মানুষ, যেমন অর্ধশিক্ষিত এই দানসাদরা, এরাই খাঁটি মানুষ। বাইরে থেকে মনে হয় এরা অশিক্ষিত, অভদ্র, দরিদ্র, নোংরা। কিন্তু ভিতরে দানসাদ শিল্পী। তার তুলনা নেই।

দানসাদ এবং সুনন্দা অনেকক্ষণ কথা বলে না। পরে দানসাদ বলে, 'মহাকাব্য 'শাহানামা' লেখার জন্যে মহাকবি ফেরদোসীকে লাখ টাকার সোনার মোহর দেবার কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজা কিছু কম দিতে চাইলে কবি বলেন, রাজার কথার যদি খেলাপ হয় তবে সাধারণ মানুষ কি করবে! অতএব তিনি নিলেন না।'

আবার অনেকক্ষণ চুপচাপ।

দানসাদের হাত চলছে ঠিকই। কোণ তৈরি করছে সে মন দিয়ে। সুনন্দা একসময় চা এনে দিতে সে খুশী হয়। বলে, 'মা তোমার মনটা ভাল। ভাল মানুষ হওয়াও সংসারে বড় লাভ। নাইবা জগৎবিখ্যাত হলে। তবু সৎ হতে বাধা কিসের? তারও দাম অনেক। জানো মা, কলকাতায় একবার এক পণ্ডিত গুণী লেখকের বাড়ি তৈরি করতে যাই আমি। এক মিস্ত্রি আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। লেখক মশায় মুসলমান, অগাধ পণ্ডিত। আমার সঙ্গে গল্প করতেন। একদিন তাঁর ঘড়ি সেরে দিলাম, রেডিও সেরে দিলাম। বেতের চেয়ার বুনে দিলাম। তিনি একদিন কোরআন শরীফের একটি আয়াতের ভুল ব্যাখা শোনাতে আমি খুব বিনয়ের সঙ্গে আপত্তি করলাম এবং আমার বক্তব্য শোনালাম। তিনি তো অবাক! একজন রাজমিস্ত্রি বলে কি? কিন্তু আমি যে ভাল আরবী, উর্দু, ফারসি জানি। শুধু ইংরিজি জানি না, পড়তে পারি—ভাল মানে বুঝি না।'

মিস্ত্রির কথায় সুনন্দা প্রতি মিনিটে যেন অবাক হয়। তার বাপকে সে সব কথা বলে। ঠাকুরমা শুনে বলেন, 'ওরাই তো মানুষ! ওরা তো আধুনিক ঢ্যাডোস নয়? ওরা কাজ করে তাই পৃথিবীটা চলে।'

বেলাশেষে কাজকাম ছেড়ে তিনজন রাজমিস্ত্রি যখন মগরেবের নামাজ পড়ে বাগানের ঝাউগাছটার তলায়, অমিয়বাবুর মা স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকেন।

চলে যাবার সময় দানসাদকে তিনি ডাকেন। বলেন, 'হাঁ বাবা দানসাদ, তোমার ছেলেমেয়েদের আন না একদিন।'

'না মা, তারা ভীষণ দুষ্টু। একেবারে চেঙ্গিস খাঁ, নাদির শাহ্ তারা সব। আপনাদের বাগান-টাগান তছরূপ করে দেবে। একেবারে খাঁটি মুসলমানের বাচ্চা।' কথা বলে হা-হা করে হাসে দানসাদ।

মাও হাসেন।

সুনন্দা বলে, 'কিন্তু আপনি যে দানসাদ-কাকা বললেন, আপনার ছেলেপুলে নেই?'

'হে হে মা, তা কি এই মায়ের সামনে বলতে আছে? মা যে মনে কষ্ট পাবেন। ঐ দেখ দেখ, মায়ের চোখ কাঁপছে বেচারা নিঃসন্তান রাজমিস্ত্রির কথা ভেবে!'

মা হাসলেন। কিন্তু সত্যিই তাঁর চোখ দুটোতে সহানুভূতির কুয়াশা ঝাপসা করে এসেছিল।

রাজমিস্ত্রিরা চলে গেল রোজ যেমন সন্ধ্যার সময় যায়।

পরদিন আবার গল্প শুনতে এল সুনন্দা।

'কাকা গল্প বলুন।'

দানসাদ বললে, 'আমাকে 'তুমি' বলবে। আমরা সাধারণ লোক। শ্রমিক-মজুর। আর তা ছাড়া যারা বাবা কাকা মামা আত্মীয়স্বজনকে 'আপনি' বলে তারা যেন বড্ড বেশি শৌখিন—মাটি ছাড়া। 'তুমি'র ভিতরে আত্মিক রস আছে।'

'বেশ, তুমি গল্প বল।'

'এই তো মায়ের মতন কথা। তুই বেটি যদি আমার মেয়ে হতিস! শালা, এমন কপাল আমার, একটা মেয়ে পর্যন্ত হল না। আর ঐ খোদাবক্স মিস্ত্রির খালি ন-টা ছেলেমেয়ে!'

'আমি তোমার মেয়ে হলে কি করতে?'

'তোর বিয়ে দিতুম।'

'যাও!'

খোদাবক্স হা-হা করে হাসতে থাকে। সে তখন দানসাদের কাছে কাজ করছিল।

হঠাৎ দানসাদ মহা রেগে যায় খোদাবক্সের উপরে, বলে, 'এই কি তোর কাজ হল? এই কোণটা থাকবে কেন? ঝুরো মশলা! কেন সিমেণ্ট কি কম পড়েছে ওদের? এই ছোঁড়াটা—কি কাজ হচ্ছে—না গল্প মারছিস? ক'বার 'জিরেন' দিস র‍্যা! বাবুদের কাজ না? 'উষোটিলে মেরে গেছ সব। যত সব্ ওলাউঠো জুটেছে এখানে।'

দানসাদ ভীষণ পান খায়। সুনন্দা এক ডিবে পান এনে দেয়। মাঝে মাঝে সেও তার পাঠ্যপুস্তকের গল্প বলে শোনায়। তাজমহলের কথা উঠতে দানসাদ ইরানী শিল্পীদের কথা বলে। সে নাকি তাজমহল দেখে এসেছে আজমীর শরীফ থেকে তীর্থ করে ফেরার পথে। বলে, 'বড় আশ্চর্য সৌধ মা। যারা গরিব মানুষ—এর পাথরের কি দাম, নকশার কাজের কত পরিশ্রম, কত অর্থব্যয়—ধারণা করতে পারবে না। আর মহাআশ্চর্য যে, সেকালেও মোজাইক হত। তাজমহল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমি দেখেছি। জ্যামিতির মাপ-জোক দেখছি। সব ঠিক আছে। শুধু ইনজিনিয়াররা এটা তৈরি করতে পারবে না। একই সঙ্গে শিল্পকলাও জানা চাই। যেমন কবি যদি গান লিখে

নিজেই সুর দেয়, নিজেই গান গায়, তার মূল্য অনন্ত। এখন একজন লেখে, অন্যজন সুর দেয় আর একজন গায়। কাজেই বেশির ভাগ ফালতু। তবে তাজমহলের মধ্যে একটা দৃষ্টিকটু ব্যাপার চোখে পড়েছে আমার। সেটা হল, মাঝখানে বেগমের কবর, তার একপাশে বাদশার যে কবরটি। অন্য পাশে জায়গার ফাঁকটা একটু বেশি। চট করে অবশ্য চোখে পড়বে না। অনেকেই কবর, আলো, ফুল, দৃশ্য—এইসবেই মোহিত হয়ঃ আমরা তো রাজমিস্ত্রি, ওসব না দেখে নিখুঁত মাপজোক দেখি। যেমন মুচিরা গোটা মানুষটাকে না দেখে, দেখে তার জুতো! স্বপ্নরসিক বাদশাহ্ শাহজাহান এর জন্য দায়ী নন, দোষী তাঁর পুত্র আওরঙ্গজেব। যিনি স্বদেশ-উদ্ধারকামী শিবাজীর শত্রুতায় তাঁর নাবালক নিরপরাধ কিশোর পুত্র শাহুজীর জিব টেনে ছিঁড়ে ফেলেছিলেন—যিনি দারাসিকোর মতো মহানুভব মানুষের গর্দান নিয়েছিলেন নাকি ধর্মের কথা ভেবে! আহা কি ধর্মের চাঁই তিনি। হতে পারেন তিনি জগতের একজন শ্রেষ্ঠ কূটনীতিক, গোঁড়া ধর্মপ্রেমী কিন্তু তার ফলাফল কী দাঁড়াল? মোগল রাজ্য তাঁর জন্যই তো হারাল। যেই তাঁর হাত থেকে তলোয়ার খসে পড়ল, অমনি চারদিকে বিদ্রোহ, আর বিভীষিকা জাগল। তাজের মতন একটা সুন্দর জিনিসকে তিনি বুঝতে পারলেন না, মায়ের পাশে বাবাকে শুইয়ে দিলেন—খরচ বাঁচালেন, কিন্তু বাকি বিসদৃশ ফাঁকটাকে তিনি নিজে শুয়ে ভরাট করলেন না কেন? খরচ আরো বাঁচত!'

'চেঙ্গিস তুমি বুঝবে কি রাণীর চোখে জল কেন?'

দানসাদ হা-হা করে হাসে। অদ্ভুত তো লোকটা!

মনের ছবি : গ্রিগরের ঘোড়া

যে মার্কিন রকেট চাঁদে গিয়েছিল মহাজাগতিক রশ্মি ভেদ করে, তার গতি ছিল অসাধারণ, কিন্তু অঙ্কে বাঁধা ; মানুষের মনের রকেট তার চাইতে অনেক দ্রুতগামী এবং তা বিষয় থেকে কেমন করে বিষয়ান্তরে যায় তা লক্ষ্য করলে অবাক হবেন। অনিয়ন্ত্রিত মনের ছবি এত টেরাবাঁকা উল্টোপাল্টা রেখায় ছোটে যে তা অনুধাবন করা কঠিন।

যেমন ভোরবেলায় আমার ঘুম ভেঙে গেছে আর ভেবে চলেছি :

মছলন্দপুর—দক্ষিণ চাতরা-রায়পুরের সেই ছুঁচলো দাড়িঅলা মুসলমান লোকটি, পুকুরে ডুব দিয়ে উঠল, তার দাড়ি থেকে বাঁকা স্রোতে হুড়হুড় করে জল নামছে, আমি গলা-জলে দাঁড়িয়ে আছি, পায়ের তলায় একটা গল্দা চিংড়ি-মাছ চেপে ধরে, পাশেই ঘাস-ফোটা শুকনো ইছামতী নদী, বাঁশ-জটলাই থেকে একটা পেটসাদা ছোটমতো মাছরাঙা পড়ল জলে, মাছ নিয়ে গিয়ে গাছের ডালে বসে গা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে গিলতে লাগল, লোকটা বললে, 'হাঙ্গা তোঙ্গার বাড় কম্‌নে?' বুঝতে পারছিলাম না ভাষাটা। বন্ধু সহজ বাংলা করে দিলে, 'হাঁ গা, তোমার বাড়ি কোথা?'

...

মেটিয়াবুরুজের দর্জি হাসমত বলেছিল, বর্মা মুল্লুকের রাজধানী রেঙ্গুনে ছিলাম বিশ বছর, বর্মী মেয়ে বিয়ে করেছিলুম, চারটে তার ছেলেমেয়ে হয়েছিল, প্লেগ দেখা দিতে সব ফেলে রেখে পালিয়ে এলুম। তা ওরা রেগে গেলে বলে, 'ফু আনে তুয়া মে।' 'জুতো মেরে মুখ ছিঁড়ে দেব।'

...

আর বিরলাপুরের রাজ্জাক ডাক্তারের কাছে কালো পাথর চেহারা, গলায় তক্তি বাঁধা, তাতে আরবী লেখা, লোকটাকে কোথায় কি কাজ করে শুধোতে বলেছিল : 'হুড্ গরে হানি মাফি!'

আমি তো বক দেখলাম।

লোকটি নোয়াখালির। পোর্ট কমিশনারে জাহাজে কাজ করে। তার কাজ নাকি নদীর জল মাপা। 'হুড গরে হানি মাফি' হল—ফুট ঘরে পানি মাপি!

...

নোয়াখালির ম্যালেরিয়া ডিপার্টমেন্টের ফালতু কাজ নেই, কম্ম নেই, শুধু খাতা সারা, ভট্টাচায্যিবাবু পদ্মাপার বরিশালের লোক। তিনি বলেন, 'তোমার কতা হুইন্যা, গোরাও হাসব।' তোমার কথা শুনে, ঘোড়াও হাসবে। এটা হল ঢাকাই কুট্টিদের ভাষা!

আমাদের মুসলমান পরিবারের মধ্যে যেসব কথাবার্তা চলে, বাইরে এক পা বাড়ালেই তার গতি চেহারা পাল্টে যায়।

...

লেখক চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় বলছিলেন, 'যেসব নতুন শব্দ পান

তা অর্থসহ সংগ্রহ করলে কিন্তু বাংলা ভাষার উন্নতির জন্যে অনেক কাজ করা হয়। যেমন, গরুর গাড়ির নানান পার্টস আছে, সে সবের নাম কি?'

মনে মনে বলে গেলাম: লাপা, চাপা, ঠেকো, ধুরো, পাকি, হাল, রংকিল, সিম্‌লে, তকাট, ফড়, জোল, হাঁড়ি, একসেল ইত্যাদি।

চিত্তবাবু বলছিলেন, 'জারের হাত থেকে রাশিয়া মুক্ত হবার পর রাজধানী-কেন্দ্রিক বা নগরকেন্দ্রিক সাহিত্য না হয়ে যাতে দেশের সার্বিক লোকাল ছবি প্রকাশ পায় তার জন্যে প্রদেশে প্রদেশে প্রেস পাবলিকেশন করা হল। সেখানে লোকাল পিকচার ফুটল। মানুষের চিন্তাভাবনা অভাব-অভিযোগ ধরা পড়তে লাগল। এতে কেন্দ্র থেকে সারা দেশকে বুঝতে সুবিধা হল। আর আমাদের দেশে প্রায় সম্পাদক মশায়রা চাকরি করেন। নিজের কাগজে নিজে সম্পাদক হলে নতুন লেখক তৈরি করা সহজ। কিন্তু চাকরিজীবী সম্পাদক চাইবেন, নামী লেখক। যাঁর লেখা নিয়ে গোল বাধলে লেখক দায়ী হবেন, কৈফিয়ৎ দেবেন। কিন্তু নতুন লেখক হলে, তাঁর লেখা এডিট করতে হয়, অত কষ্ট কে করবে, যদি শেষ পর্যন্ত লেখাটা না দাঁড়ায়, বাজে পরিশ্রম, অতএব···আজকাল নগরসাহিত্যে সবাই এক কথাই যেন নানা রঙে-ঢঙে লিখছেন, তাতে সারা দেশের ছবি ফুটছে না। আর এটা সত্যি যে, বিদেশের অর্থাৎ য়ুরোপের যে-কোনো নাম-না-জানা লেখকেরও একটা বই পড়ুন, দেখবেন, তিনি যে বিষয়ে লিখেছেন, কত খোঁজ নিয়েছেন!—'

...

ছোট মেয়ে অনিমা জিনাত ঘুমোতে ঘুমোতে হঠাৎ হেসে উঠল। তারপর আবার কান্নার স্বর। ওর পেটটা গরম হয়েছে। তাই ওয়েদার এ্যাবজর্ব করতে পারছে না। ঠাণ্ডা লেগেছে।

মহা আতঙ্কে আছি। একটু দূরের গ্রামে দারুণ বসন্তের মহামারি দেখা দিয়েছে। কারো একটু জ্বর হলেই ভয় লাগে। এই বুঝি বসন্ত হল! সোজ্‌নে-ফুল কুড়িয়ে এনে সিম দিয়ে রান্না করে, ভাজা করে খেতে বলেছি। লাউটাও নাকি ভাল। বসন্তের প্রতিশেধক। করলা উচ্ছেটা সব চাইতে বেশি ভাল। বসন্তর দাগে ভরা বিশালদেহী লাউ হাতে বাঙাল বন্ধু সুধাকর বাবু বললেন, 'লাউ দিয়ে ল্যাঠা মাছ রান্না ভাল লাগে!'

ল্যাঠা দেখুন, বললাম, খাবেন না। ল্যাঠা, কই, মাগুর, সিঙি জাতীয় কালো মাছে নাকি বসন্তর জীবাণু থাকে। আমি শীতকালে কই মাছ ধরে

দেখেছি তার গায়ে বসন্ত ফুটেছে। মনে হয়েছে, এটা হয় বোধহয়—মাছগুলো শীতে জড়সড় হয়ে বসে থাকে, অল্প জলে পোকা জন্মায়, বিশেষ করে কেঁট জাতীয় একরকম পোকা—সেগুলো মাছের গায়ে বসে রক্ত খায়—ঘা করে দেয়। শ্রীমতী বললে, 'না, এই তো বসন্ত ফুটেছে—ফেলে দাও ডোবায়—সাবান দিয়ে গরম পানিতে হাত ধুয়ে এস।' বললাম, 'দেখ, পিত্ত ফোটেনি তো? শীতকালে আমরা লেপ-কাঁথার তলায় শুই, পেট গরম হয়, পিত্ত বেশি পড়ে, সেইটা ফুটে বের হয় বোধহয়। শীতে গাছের পাতা ঝরে যায়। বাকল ওঠে। সাপের খোলস ছাড়ে। এ ঋতুতে বার্ষিক পরিবর্তন আসে। নব জীবন আসে।'

শ্রীমতী মানে আমার সহধর্মিনী, সর্বদা যদিও একমত নয়—সে অবশ্য অন্য কথা ভাবে, সে বলে, 'তাহলে কি মানুষও চামড়া ছাড়তে চায়?'

'হয় তো চায়, পারে না, মরে যায়।'

'তা তোমাদের জনস্বাস্থ্য বিভাগ প্রতিজনের টিকে দিতে আসে না কেন? তাদের ডাকলেও আসে না। তাছাড়া ডাকতেই বা হবে কেন? বি-ডি-ও অর্ডার দেবেন পৌষ মাসের মধ্যেই সমস্ত গ্রামের প্রত্যেকটি মানুষকে টিকে দেবার। বাজ পাখির মতন কখন ছুঁয়ে ছুঁয়ে এসে দু'চারজনকে টিকে দিয়ে চলে যায়। ম্যালেরিয়া ডিপার্টমেণ্টের লোকগুলো কি এখনো কোটি কোটি লোক ঘেঁটে ম্যালেরিয়ার বিষ খুঁজে বেড়াচ্ছেন? দেশে বসন্ত কলেরার মড়কে মানুষ শেষ হয়ে যাচ্ছে আর তাঁরা ভারতবর্ষকে 'ম্যালেরিয়াশূন্য দেশ' বলে ঘোষণা করবার জন্যে হাজার হাজার মানুষকে চাকরি দিয়ে যেন অনাথ পুষছেন। লোকগুলোও অকম্মা হয়ে যাচ্ছে। জনসাধারণ তাঁদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে। সেই হোমিওপ্যাথির গবেষক ডাক্তার যেমন আপনার নাকের ডগায় বিষাক্ত একটা ফোড়া হলে আপনার সাতপুরুষ আগে থেকে হদ্দহদিস নিতে থাকেন এবং ছ-মাস হদিস নেবার পর একটা অদ্ভুত হাদিস তৈরি হতে হতে রোগী টেঁসে যায় এও তেমনি!...'

চালচিত্তির পড়ে পণ্ডিতচূড়ামণি ডঃ চট্টোপাধ্যায় মশায় নাকি খুশী। জুরুরী তলব পাঠিয়েছেন ঐ 'মাংস এবং কসাই'টা নাকি তাঁর ভাল লেগেছে খুব।

কিন্তু চ্যাটার্জিবাবু, সব কথা কি লেখা যায়?

ধরুন, যে গাড়োয়ানটা তার গরুকে হরদম চাবুক দিয়ে পিটছে তাকে নির্মম বলে হয়তো চড় বাগিয়ে এলেন কেউ কিন্তু একটু ভেবে দেখেছেন কি, মায়ের চাইতে মাসির দরদ বেশি হতে পারে না। আমি নবাহার গাড়োয়ানকে তো দেখেছি একহাঁটু কাদা রাস্তায় যখন সে বাঁশের বোঝাই গাড়ি নিয়ে যায় কাদা মেখে ভূত হয়ে আর গরু দুটোকে চামড়ার চাবুক দিয়ে পেটে মরীয়া হয়ে—একদিন সে নিজেই অজ্ঞান হয়ে কাদার ওপরে পড়েছিল—পেটে অম্বলের ব্যথা উঠলে ট্যাঁকে খোঁসা শিশি বার করে সোডা খায় টাউটাউ করে—সে যখন মাল খালাস করে গাড়ি নিয়ে বাড়িতে ফিরে গরুর যত্ন করে সেটা দেখলে খুশী হবেন। যদি খড়ভূষি দিতে তার স্ত্রী দেরি করে তবে তারও পিঠে পড়ে চামড়ার চাবুক। এসব জীবনের প্রকৃত কথা লেখা হয়নি। কে তা লিখবে? যাঁরা স্মরণীয় বরণীয়, রোজ সকালে বিকালে সন্তুষ্ট মনে তাঁদের গোলাপ দিয়ে পুজো করেই কাজ সাঙ্গ! আমি তো নাকি সামান্য নগণ্য এক "ফিচার' লিখিয়ে, যাঁরা গণ্যমান্য সাহিত্যিক আছেন তাঁদের···

সেই বুড়ী পীরিনী মা বলেছে কাউকে আঘাত দেবে না। স্টপ। কানমলা! ··

আমার ভায়ের ছোট ছোট ছেলে দুটো কানমলা খেতে, ওঠ-বস দিতে খুবই খুশী। তারা মনে করে ওটা এক রকমের আমোদ!

আমার ছেলে 'অশোক ফেরদৌসী' ছ' বছর—নট নড়ন-চড়ন! শয়তান! ছোটর ছেলে বলে, 'বড়বাবু, তুই কানমলা খা! ওঠ বস কর!'

আমি তাই করতে থাকলে মা, বউমা (ভাত্রবধূ), স্ত্রী সবাই হাসতে থাকে। কেন, হাসে কেন?

হাসিটা কোথা থেকে আসে?

অশোক হঠাৎ আকাশে দেখায় 'ঐ দেখ শকুন নামছে! শোঁ শোঁ শব্দ। তীর বেগে নেমে গেল। জানো বাপী, শ্মশানে রোজ গরু পড়ছে। একটা লোক সাইকেলের পেছনের সিটে করে বেঁধে এনে একটু আগে একটা বাছুর ফেলে দিয়ে গেল!'···

ভীষণ গরু মরছে।

'কি করে আকাশ থেকে শকুনরা দেখতে পায় বাপী?'

খুব বসন্ত হচ্ছে।

'ওদের চোখে কি দুরবীন আছে?'

গরুদেরও বসন্ত হচ্ছে। অথচ হোটেলখানায় কসাইখানা উজাড় করে মাল যাচ্ছে।

'শকুনদের বসন্ত হয় না কেন?' দশ বছরের মেয়ে মনিরা জিনাত শুধোলে।

অশোক বলে, 'হলে ওদের ডাক্তার ডাকবে, নাহয় তো ৫০০ বছর বাঁচে কি করে?'

৫০০ বছর না হাতি! কেউ ধরে তার বাপ-ঠাকুরদাদার আমল থেকে সাতপুরুষ পরীক্ষা করে গুনে রেখেছে?

বিদিরা রামচন্দ্রপুরে গিয়েছিলাম গতকাল। প্রতি বাড়িতে বাড়িতে গেলাম রাইটার্স বিলডিংস্ থেকে বসন্তর মড়ক প্রতিরোধ করাব জন্যে যে বাবুবাহিনী যাচ্ছেন প্রায়ই, তাঁদের সঙ্গে। বাবুরা সবাই সাহেব। সুট পরা। অনেকেই পূর্ববঙ্গীয়, পূর্ববঙ্গীয় ভাষা শুনতে আমার খুব ভাল লাগে। তার টান টোন—রসিকতা।

ঘরে ঘরে রোগী। কী বীভৎস!

কলাপাতায় সরষের তেল মাখিয়ে শোয়ানো আছে দু' বছরের বাচ্চা মেয়েটা। বসন্তর গুটি ছেয়ে গেছে সর্বত্র। কাপড়ে শোয়ালে জড়িয়ে ধরে। ছাড়াবার সময় চিৎকার করে। একটা বুড়ো লোক—বাড়ির কর্তা, মরে পড়ে আছে দাওয়ায়। কাঁদবার লোক পর্যন্ত নেই। বুড়োর মেয়ে আছে শ্বশুরবাড়ি। খবর দেবার পরও তাকে আসতে দেওয়া হয়নি। দুটো জোয়ান ছেলে শয্যাশায়ী। দুটি বউ। চারটি ছেলে। সবাই পড়ে আছে। কে কার মুখে জল দেয়!

পঞ্চাশজন মারা গেছে। রোজ দুটো চারটে করে মরছে। গ্রামে লাল নিশান পোঁতা। শীতলা পুজো হচ্ছে। আর একটি বাড়ি থেকে মড়া বেরুল। বলো হরি হরি বোল।...

অন্য একটি বাড়ি। মা ভাল আছে। চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে এলো বুকে। স্তন থেকে দুধ ঝরে পড়ছে। তার বাছা আর টানতে পারছে না। কোলে ধরা আছে বসন্তর গুটি পাকা বাচ্চা! নাভিশ্বাস টানছে!

এদিকে পাশাপাশি কবর। বাপ মা ছেলেমেয়ে শুয়ে আছে।

সংকার করার লোকের অভাব।

পথ নেই সরকারী গাড়ি যাবার।

বাবুরা হেঁটে আসেন তিন-চার মাইল বাস-রাস্তা থেকে। ঠিকে হাসপাতাল খোলা হয়েছে। কিন্তু শেষ দশায়। না না, আর কোনো বাড়ি যাব না। এসব দেখা যায় না।

ভগবান যদি থাকেন আপাতত তিনি নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে এখান থেকে পালিয়েছেন।

আল্লাও কি দেখতে পাচ্ছেন না কবরগুলো?

ঐ সব নিষ্পাপ শিশুদের কিসের অপরাধ? কার পাপে কার দণ্ড?

কিন্তু পৃথিবীর ভার তো কমানো চাই। তাহলে যুদ্ধ বন্ধ কেন?

... ...

'কি খাচ্ছেন?'

'মাংসের ঘুগ্‌নী!'

'খাবেন না।'

'কেন?'

'মাংস ওতে নেই, পাঠা খাসী ছাগলের বাসি মাছিধরা আধপচা নাড়ী-ভুঁড়ি কুঁচোনো ওতে আছে—মাংস নেই। ব্যাধি হবে। বসন্ত, কলেরা, আমাশা।'

...

'কি খাচ্ছেন?'

'আইসক্রীম।'

'খাবেন না।'

'কেন?'

'বজবজের ক'টা আইসক্রীম তৈরির কারখানায় গেলে দেখবেন চৌবাচ্চার মধ্যে যে জল এনে রেখে জমানো হচ্ছে তা কত দূষিত। ঐ যে প্রস কোয়ার্টারসের গায়ে পথের ধারে সবুজ বর্ণের শ্যাওলা-জমা এঁদো ডোবা, ওর জলে প্রসেরা নোংরা কাপড়-চোপড় ধোয়। চোবাচ্চার জলে বড় বড় পোকা। এসব খেলে কলেরা হতে পারে।'

স্কুলের ছেলেগুলো তো খুবই খায়!

ভারত, আমার সোনার ভারত, এর বাতাসে প্রতি ধূলিকণায় বিষ কিন্তু রৌদ্ররশ্মি যদি না সেই সব বিষ মেরে ফেলত—অরক্ষিত অনিয়ন্ত্রিত আমাদের

কোটি কোটি জীবন বাঁচত না। কিন্তু বেঁচে আছি কি ?

কজন বেঁচে আছি ?

আমরা তো আধমরা। যাদের হাতে কাস্তে হাতুড়ি—তারা আধমরা। শুধু বিপ্লবের ডাক দিয়ে এদের বীর্যবন্ত প্রতীকী মূর্তি করা হয় শিল্পীদের দিয়ে। শিল্পীর করেও সুখ, আমাদের দেখেও সুখ। এর নাম আর্ট!

...

কিন্তু কেন বসন্ত হল বিদিরা রামচন্দ্রপুরে ?

শীতলা মায়ের মানসিকের একটা পাঁঠা নাকি চুরি করে খেয়েছিল কজন লোক। তা সব কজনের বসন্ত হল।

যতো সব!

কুসংস্কার। বানানো গল্প।

কিন্তু দুর্গন্ধ বুড়ো দাড়িঅলা পাঁঠার মাংসে শীতকালে বসন্তর বিষ থাকা কি খুব আশ্চর্য ? আর সেই পাঁঠাটা যদি দৈবাৎক্রমে খাওয়া হয়ে থাকে ?

রক্ষা করো মা শীতলা দেবী! সবই তোমার মহিমা!

...

একটি সুন্দরী ষোড়শী, তাকে আমি চিনি না, বলছিল, 'আপনার চালচিত্তির পড়লে পরাচিত্তির করতে হয়। ওটা কি সাহিত্য ?'

বললাম, 'য়ুনিভারসিটিতে আমি পড়িনি, সাহিত্যের জ্ঞান আমার সীমিত 'বাংলার চালচিত্র' অটোবায়গ্রাফি অব আওয়ার ভিলেজেস। কে ভাল বলল কে মন্দ বলল আমার আসে যায় না। আমি মিথ্যা লিখি না। যেটুকু বানাই সে শুধু ভাষার বা সামাজিক ভদ্রতার, শালীনতার জন্য! লোকে যে ভাষায় কথা বলে তা যদি সত্যিই লেখা যেত তাহলে 'পরাচিত্তির' কেন ধিক্কারে লজ্জায় ঘৃণায় গায়ে কেরোসিন মেখে, থুড়ি! অমন শ্রীঅঙ্গে দুর্গন্ধ কেরোসিন নয় (আর্ট ফর আর্টসের) পেট্রল বা গ্যাসোলিন মেখে আগুন ধরিয়ে দিতেন।'

...

মাছরাঙা ডাকছে। সকাল হয়ে গেছে।

ছোট মেয়েটা বলছে, 'বাবুর কাছে যাব।'

'না, এখন লিখছে! বককে।'

আমি বকি ?

লোকে যে বলে খুব ঠাণ্ডা লোক ?

সে তো বাইরে। স্ত্রীর কাছে ?

বিমল-দা বলেন, 'স্ত্রীর কাছে একটু রাগ দেখাবে, নইলে পুরুষ বলে মানবে না।'

পুরুষ !

নারী !

পুরুষ+নারী=ছেলেমেয়ে !

ছেলেমেয়ে আমার এবং সব্বার। সবায়ের ছেলেমেয়েরা আইসক্রীম খাচ্ছে, ঘুগনি খাচ্ছে। অথচ টিকা দেওয়া হচ্ছে না, ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে না।

শ্রীমতী বলে, 'আর দিয়েও তো হচ্ছে ? রাজার হল। মায়ের হল। তাঁর তো দুবার বসন্ত হল ? কোনো পুরনো থিসিস চলছে না। আজকের বৈজ্ঞানিক তথ্য কালকে অচল। মশা রয়েছে, ম্যালেরিয়া গেল কেন ? ম্যানিয়া আবার ভাল নয়। সাহিত্যিকদের যেমন ম্যানিয়া, কিসে সাহিত্য হল কিসে হল না, সর্বদা সেই লক্ষ্য। তোমরা জীবনের সুরুচির সাধক। সেই সাধনাকেই তো সাহিত্য বল ? তাহলে সাহিত্যে তোমরা নোংরামি ঢোকাচ্ছ কেন ? আল্লা যদি মনুষ্যত্ব হয়, বর্বরতা তা হলে শয়তান। নিরীশ্বরবাদী মানুষ তাহলে শয়তান। রবীন্দ্রনাথ, গ্যেটে, ফেরদৌসী, সাদী, লিও টলস্টয়, সেকস্‌পীয়ার—এঁরা ঈশ্বর মেনেছেন—এঁরা কি বোকা ছিলেন ? দুঃখে-ধাক্কায়, দারিদ্র্যে-কষ্টে অত্যাচারিত নিপীড়িত মানুষ তার মনের সুকুমার বৃত্তি হারিয়ে ফেলে যদি স্রষ্টার ভূমিকার নামে তার সৃষ্টি কি হবে ? গান্ধীজী কি বলেন নি 'ক্ষুধিতের সামনে ভগবান আসেন খাদ্যরূপে !'

'ভগবান বেচারাকে মুক্তি দাও, বড় বুড়ো হয়ে গেছে। বড় ব্যবহৃত হয়ে গেছে। বুড়োর ন'কোটি নিরেনব্বুই লক্ষ কোটি বছর বয়েস। পায়ে গোদ, চোখের পাতা দেড় হাত ঝুলে পড়েছে, বিরাট ভুঁড়ি—ধর্মের ইঁদুররা তার মধ্যে বাস করে, নড়ে বসতে পারেন না—তিনি ছেলেমেয়েদের কার মশারী নেই, কার শাড়ি নেই, কার কলেজের মাইনে বাকি, কে কার জমি কেড়ে নিয়েছে, কার রাজ্য কেড়ে নিয়েছে, কার স্বরাষ্ট্রদপ্তর কেড়ে নেবার জন্যে নেড়া ওল গরম হয়েছে—সবই তিনি দেখেন, জানেন, বোঝেন, অনুভব করেন কিন্তু তাঁর করার শক্তি নেই কিছু। তিনি যে নড়তে পারেন না, শিব—পাথর !'

'তবু সেই শিবের মধ্যে সুন্দরের সাধনা করেন কারা? সাহিত্যিক শিল্পীরা না?'

'বৈজ্ঞানিকরা?'

'তাঁরা পথ করে দেন? কিন্তু সৌন্দর্যের সংজ্ঞাটি কী দেবেন তাঁরা?'

'ফুল ফোটা কি মিথ্যা?'

সেইজন্যই তো বসন্তকাল আসে? আবার বসন্ত?

হাঁ, ফাগ ছড়াবার দিন আসছে। কৃষ্ণচূড়া জন্মাচ্ছে গাছের হাড়ে। শীতে তার মজ্জায় সৃষ্টির গোপন ক্রিয়া চলে। তারপর ফাল্গুনে আকাশ লাল করে দেবে। রাধাদের গায়ে ফাগ দিও তখন। বসন্তর বিষ নাশ হবে। নিজেও ফাগ মেখো। কোরো কোলাকুলি, ঢলাঢলি। শালী শেলেজ নিয়ে কিন্তু সাবধান।

উদ্দাম যৌনাচারের নেশা দিন দিন সাহিত্যে সিনেমায় পোশাকে—অফিসে কলেজে হোটেলে—রাস্তায় ঘাটে বাড়ছে।

বিপ্লব কি তাহলে আসন্ন? তাই : চেয়ারম্যানের চীন আক্রান্ত হতে পারে, বিপ্লব দ্রুততর করুন।

কাস্তে কুড়ুল ফেলে ছুটে এলুম। দেখি মাঠ ফাঁকা।

হাড়গোড় পড়ে আছে জোড়া জোড়া বলদের। দিগন্তে লাল লতি শকুনের পাল উড়ছে।…

কালো কালো পিঁপড়ের মতন মিছিল চলেছে মানুষের। সাহিত্যিকদেরও মিছিল? মহাকাল জয়ের দাবি! হঠাৎ একটা চাষীর বাড়ির ছেলে কি করে যে তাঁদের মধ্যে গিয়ে পড়েছিল কে জানে! গায়ে তার ঘাম আর মাটির গন্ধ! একজন বললেন, 'ভাগ বেটা, চাষ কর গিয়ে!'

সেই বেদনা তার হাড়ে বিঁধে গেল। সেই বেদনার রক্ত বসন্তর কৃষ্ণচূড়া ফোটাবার গোপন মন্ত্রণায় ভ্রূণের মতন এখন সুপ্ত।

'অ্যাণ্ড কোয়াইট ফ্লোজ দি ডন' সেই এক বাঙালী কৃষক জোয়ানের মধ্যে এই ভীষণ শীতের দুর্দিনে তাপ সংগ্রহ করছে—ধীরে বন্ধু ধীরে।

বসন্ত আসুক। রক্তপরাগ ঢালা। রূপময়, গন্ধময়, মধুময়।

আকসিয়ানা, সূর্যমুখীর বনে তোমার মাথার লাল রুমাল উড়ছে। তোমার দুরন্ত যৌবনের ডাক শুনে :

আসছে—ঘোড়সওয়ার কসাক গ্রিগর আসছে। পথ ছেড়ে দাও।

হরিজন

'বিহারের সাসারাম। বাদশা শের শা-র কবরখানা আমাদের গাঁও থেকে বেশি দূর নয়। ছোট্‌বেলায় ইস্কুল পালিয়ে কতদিন সেখানে যেতাম। সরষে, লঙ্কা, ইক্ষু, গমক্ষেতের পাশে মহিষ-গরু চরাতাম ডাণ্ডা হাতে নিয়ে। 'কেলাস' ফাইভ পর্যন্ত পড়েছিলাম। ইস্কুলে মুচির ছেলে বলে আলাদা বসতাম আমরা। মুচিপাড়া, আলাদা পাড়া। আমাদের দেশে সব হিন্দুদেরই ইয়া মোটা মোটা টিকি থাকে। সব পণ্ডিতদেরই টিকি ছিল। ছোটবেলায় গম কেটেছি, বয়েছি, ঝেড়েছি, মেড়েছি। মা যাঁতা ঘুরোতো। ছোলার ছাতু কুটত। ভাজা ছোলার নতুন ছাতু খেতে কি সুস্বাদ ছিল বাবু! 'গায়' আর ভঁইষের দুধ, দহি, রাবড়ি, ঘোল খেতুম। মা চমৎকার হালুয়া তৈরি করতে পারত। তাতে আখের গুড় আর তেজপাতা দিত। সেই দিয়ে গরম-পানির-খামির-করা সোঁদা-সোঁদা-গন্ধ-ভরা নতুন গমের নরম মোলায়েম রুটি খেতাম। চার ভাই আমরা কুস্তি শিখতাম রাত্রে বাপের কাছে, লাঠি খেলা শিখতাম। কবাটি খেলতাম। বড়কা গাঁওে মিডল ইংলিশ ইস্কুলে যখন পড়ি বাবা মারা গেল। জমিজমা সামান্যই ছিল। সম বচ্ছর খোরাকী হত না। স্কুল ছেড়ে পরের গমক্ষেতে জন খাটতে গেলাম। গরু-মহিষের একবার খুব মড়ক হল। আমাদের একটা গাই গরু আর একটা গাই-মহিষ মারা গেল। মা মাথা কুটে কাঁদতে লাগল। গরু-মহিষ পেলে মা দুটি বাছুর পেয়েছিল। তাদের মানুষ করেছিল। তারাও মারা পড়ল। আমরা ফকির হয়ে গেলাম। অনাহারে অনেকদিন কাটতে লাগল। আমি আর মাঝের দু'ভাই পরের ক্ষেতিতে কাজ করতে লাগলাম। ছোট রামপ্রবেশ প্রসাদ ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়ল। আমার বিয়ে হল। দুটো গরু পেলাম। একদিন আমাকে আর ছোট ভাইকে কলকাতায় মুচির কাজ করবার জন্যে পাড়ার এক বুড়ো নিয়ে এল। কলকাতায় গাড়ি-ঘোড়া দেখে অবাক হলাম। আমরা জানবাজারের এক মুচিবস্তিতে উঠলাম। মুচির ছেলে, ছোটবেলা থেকেই আমরা কিছু কিছু মুচির কাজ জানতুম। হিন্দু হলে মুচি, মুসলমান হলে চামার। 'চাম' বোধহয় উর্দু কথা। তাই থেকে চর্মকার। কিন্তু চর্মকার বললে মুচি চামার উভয়কেই বুঝায়। জানবাজার 'চর্মশিল্পী-সংস্কার সমিতি'র সেক্রেটারী রামানন্দবাবুর কাছে রোজ

রাত্রে আমি অথবা ছোটভাই রামপ্রবেশ বাল্মীকি বা তুলসীদাসের রামায়ণ পড়ে শোনাতাম। কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে লেখা 'প্রেমসাগর' পড়তাম। আমাদের কথ্যভাষা মৈথিলী নয়, ভোজপুরী। মৈথিলী হল দ্বারভাঙার লোকের ভাষা। আমরা লেখাপড়ার কাজ করি সব হিন্দীতে। পূজা, বিয়ের মন্ত্র, ধর্মকর্ম হয় সব সংস্কৃতে। আমাদের গাঁয়ে সিকিভাগ মুসলমান। আর সাধারণ হিন্দু, রাজপুত ছত্রী। কারো সঙ্গে কারো জল-চল্ নেই। ধরুন কোনো মছ্‌লিভোজী বঙ্গালী আমাদের দেহাতের কোনো চা-খানায় গিয়ে হয়তো দেখলে মণ খানেক মোটা সর-পড়া দুধ ফুটছে। যদি অবাক হয়ে ডেকৃচি ছুঁয়ে দিয়ে বলে, 'আরে ব্যাস্! এত দুধ!' তাহলে বঙ্গালী মছ্‌লিভোজীর পরশ-করা দুধ সবটাই ফেলে দেবে! কলকাতা থেকে দেশে ফিরে গেলে বড়বহু আমাকে গরুর গোবর খাওয়ায় আগে, তারপর বাড়িতে ঢুকতে দেয়! বহু আমার খুব নাচতে পারে। গাওনাও ভি গাইতে পারে। হোলির সময় তো এমন রঙ মাখামাখি, কাদা মাখামাখি, নাচ-গান-হুররা—'ছা-রা-রা-রা-রা-রা গজ' বলে উন্মাদ-কাণ্ড হয় যে তিন-চারদিন আর উঠতে পারে না কেউ। আমাদের দেশে মহুয়া বা 'মেহুয়া' ফল থেকে দেশী মদ তৈরি করা হয়। হাড়িয়াও পাওয়া যায়। আমরা পাল-পার্বণে ওসব খুব খাই। বিয়েতে আমাদের বরপণ লাগে। একান্ন টাকা দিতেই হবে। অবস্থা যার যেমন। চারশো থেকে কুড়ি হাজার টাকা পর্যন্ত ওঠে। তারপর গরু, ভঁইষ, সোনা, রুপো। রুপোরই চল বেশি। চুচি, হার, হাঁসুলি, কানের ফুল, পায়ের মল, তাগা, তাবিজ, গোট, পৈঁছি। যত ভারী ভারী হয় তত ভাল। আমার মায়ের রুপোর গয়না ছিল প্রায় আধমণ! আমার বউয়ের হাতে যে দুটো রুপোর রুলি আছে তা দিয়ে যদি ঘা-দুই সাঁটায় যে কোনো মরদ জখম হয়ে যাবে বাবু। নাকের কানের ফুলের ওজনের ভারে অনেক আধবয়েসী মেয়ের নাক-কানের লতি কেটে যায়। মেয়েরা হাতে বুকে কপালে উল্কি পরে। মেহেদি বা জাফরানে হাত রাঙায়। আর ডানদিকে আঁচল রেখে ঘাগরা করে কোঁচা দিয়ে রঙচঙে ছাপা শাড়ি পরে মাথায় কাপড়ের পাড়ের তৈরি নক্‌শাদার বিড়ে বসিয়ে তার উপরে কলসী বা গাগরি বসিয়ে নিয়ে বিকেলে পাড়ার মেয়েরা দল বেঁধে পানির জন্যে যায় পাহাড়ী ঝরণা বা তালাওয়ে। আমাদের দেশে খুব পাহাড় আছে। পাহাড়ের ঢেউ চলে গেছে আকাশের কোল পর্যন্ত। যখন কাল-বৈশাখীর ঝড় ওঠে তখন বালু ওড়ে।...'

মাঝবয়সী হরিরাম প্রসাদ জুতোয় ফোঁড় তুলে তার ঝোবড়ার মধ্যে থেকে কনকন-করা ঘাড়টা একবার তোলে, কথা বন্ধ করে। আকাশের দিকে তাকায়। কালো মেঘের চূড়া ভেসে আসছে পশ্চিম থেকে। হরিরাম বলে, 'ওই মেঘটা আসছে বিহার থেকে। এতক্ষণে সেখানে বিষ্টি এলে গম, কলাই, লঙ্কা, সরষে, ঘুঁটে, কাঠ তাড়াতাড়ি তুলে নিচ্ছে মেয়েরা।'

ভাই রামপ্রবেশ খইনী ডলে দিলে গালের-কোলে-নামা-বড বড় কালো গোঁফ-জোড়াকে এক হাতে তুলে ধরে হাঁ করে গালের মধ্যে ফেলে হরিরাম। জিব দিয়ে খইনীর দলাটা নিচের পাটির দাঁতের কোলে ঠুলি পাকিয়ে রাখে। মাঝে মাঝে চরাৎ চরাৎ করে থুথু ফেলে। ওদিকে হাই স্কুলে মহা গণ্ডগোল বেধেছে। স্থানীয় এক ভদ্রলোক বললেন: 'ইতিহাসে এম-এ অনার্স—জনৈক মাস্টারকে প্রায় তিন বছরকাল ডেপুটেশনে রেখে এখন নাকি অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড মাস্টারের একটা পদ খালি হতে স্থানীয় স্কুল-ক্লার্ক প্লেন গ্রাজুয়েটকে নিয়ে ডেপুটেশনের মাস্টারকে ছাঁটাই করছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। ছাত্ররা চিৎকার করছে: 'এ জুলুম চলবে না।' 'বিচার চাই—বিচার চাই।'

ঝোবড়ার মধ্যে আর একটি ছেলে কাজ করছে—তার নাম সরযুলাল। হরিরামের রঙ মিশকালো। টিকলো নাক। মাথায় মাঝারি চুল। গায়ে ফতুয়া। খাটো আট-হাতি ময়লা ধুতি পরনে। মাথায় কিন্তু টিকি নেই। রামপ্রবেশ তরুণ, ঈষৎ ফরসা। দু'পাশেব কপালেব চুল পাতলা হয়ে গেছে।

হরিরাম বলে, 'বাইশ বচ্ছর আছি বাবু এই বাথরাহাটে। জানবাজারে বেশিদিন থাকতে পারিনি। হঠাৎ একদিন আমরা রাত্রে তুলসীদাস পড়ছি আর 'আল্লাহু আকবর' চিৎকার ধ্বনি উঠল। ১৯৪৬ সাল তখন। জিন্না সাহেব কলকাতায় বক্তৃতা করে গেলেন: লড়কে লেঙ্গে। পাকিস্তান চাই। শুনলাম নাকি মেটেবোরেজে দাঙ্গা বেধেছে। ওড়িয়া হিন্দুস্থানীরা হরদম মরছে। আমরা সকলে 'রাসমণি কুঠি'তে গিয়ে উঠলাম। দশ হাজার লোক এক বাড়িতে। ওদিকে তালতলা, এদিকে চাঁদনীচক—চারদিকে মুসলমান। আমরা অনেক ইট তুললাম ছাদে। তারপর সবাই অস্ত্র, লাঠি ধরলাম। মুসলমানরা ভেগে গেল। রামানন্দবাবু এখনো বেঁচে আছেন—'চর্মশিল্পীসংকাব সমিতি'র সেক্রেটারী আছেন তিনি এখনো জানবাজার অঞ্চলে। তিনি আমাদের বাঁচিয়ে দিলেন। বাপ-সমান লোক। কদিন পরে 'বিরলা কোম্পানি'

তার ‘টেরেনে’ করে আমাদের বিনা ভাড়ায় দেশে পাঠাল।…৪৬-এর দাঙ্গায় কত মানুষ মরে গেল বাবু কে আর সুমার করে রেখেছে।’

১৯৪৬ সাল!…দাঙ্গাব আগুন-নাচা রক্ত-ছোটা দৃশ্যের একটা ফিল্ম চলতে লাগল হঠাৎ আমার মনের মধ্যে!…

…কাক-জ্যোৎস্না। দুটো লোক ওখানে কি করে? চাপা চওড়া ম্যানহোলের মধ্যে কয়েকটি জ্যান্ত মানুষ গঙ্গার ঘোলাজলে পাক খাচ্ছে—বল্লম গাঁথা হচ্ছে তাদের মাথায়—মুখে—পেটে—পিঠে! তারা ‘মাগো—বাবা গো’—বলে কাতরাচ্ছে! বক্‌বক্‌ করে রক্ত ঘুলিয়ে উঠছে! স্রোতের টানে তারা গড়িয়ে যাচ্ছে!…

ড্রেন উপচে ময়লা ভাসছে পথে। আলো জলছে দিনরাত। বস্তি পুড়ছে। বস্তির যত মাল—সেলাই কল, গ্রামোফোন, রেডিও, পাখা, সিন্দুক—সব পুকুরের জলে ডুবিয়ে রাখা হচ্ছে!… বস্তি ছত্রখান—পট, কাঁচভাঙা চারদিকে। কারা যেন ভাতের থালা নিয়ে সবে খেতে বসেছিল। ফেলে পালিয়েছে। পালাবে আর কোথায়? তারা মানুষ হলেও মানুষের হাতেই মারা পড়েছে!…

হঠাৎ একজন স্থানীয় বাসিন্দা তলোয়ার হাতে নিয়ে ছুটে এল—গায়ে, তলোয়ারে রক্ত! বললে, ‘সাতজনকে কেটে এলাম।’…

পুলিসের গাড়ি আসছে!…

ছ’জন লোক আমার বাসার মধ্যে ঢুকে প্রাণ বাঁচাতে চাইল। তাদের রাখলাম। ভোরে তাদের বার করে দেবার সময় ধার্মিকেরা জানতে পারল। তাদের টেনে নিয়ে গেল। আমার মাথার উপরে উঠল তলোয়ার।

সাবধান!

একটা লোক পায়খানার নিচে থেকে বেরিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে পড়ল ওদের সামনে। বললে, ‘মেরো না বাবারা, আমি এই একভরি আফিং খাচ্ছি!’…খেল সে। তারপর টলতে টলতে গিয়ে পড়ল পুকুরে। সেখান থেকে নাকি উঠছিল—পড়ে গেল ড্রেনে। তারপর সাফ!…

গোর্খা নেপালী মিলিটারী নামল। কারফু!…

তারপর কংগ্রেস আর লীগের পতাকা একসঙ্গে বেঁধে মৈত্রীর বাণী ছড়ানো হতে লাগল। হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই।…

বারেক তারা তা করেছিল—নইলে এতদিন আমরা বাঁচতাম না!

সব দৃশ্য কি আর বলা যায়? দাঙ্গার কথা—এ যে মহামারীর মতন সংক্রামক! কার নাম বলব? সবাই সাধু! নয় তো, সবাই চতুর—সবাই ফতুর!

অসভ্য জানোয়ার।

ফিল্মটা বন্ধ করলাম। ওটা শঙ্খচূড়। মনের ঝাঁপিতে লুকিয়ে রাখলেও হঠাৎ হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে! একটু অসাবধান হলেই ওটা বেরিয়ে পড়েই মাথায় চোট করে! 'শিরে সর্পঘাত! তাগা বাঁধবে কোথা? ..'

হরিরাম আবার এল কলকাতায়। পাঞ্জাবে নাকি তখন দাঙ্গা চলছে। এল বাখরাহাটে। রামপ্রবেশ জোড়াবাগানে ১৫ দিন কাটিয়ে পি-জি হাসপাতালে ওয়ার্ড বয়ের কাজ পেলে।

সে কাজও তার বেশিদিন টিকল না। দাদার কাছে চলে এল বাখরাহাটে। মাখালিয়া গ্রামের বাবু পূর্ণচন্দ্র মালের ঘর ভাড়া নিলে। ১১ টাকা ভাড়া। ৪ বচ্ছর কাটল। পূর্ণবাবু ঘর বিক্রি করে দিলেন।

হরিরাম বললে, 'নতুন বাবু হলেন সতীশচন্দ্র দত্ত। ১২ টাকা ভাড়া নিলেন ৪ বচ্ছর। তারপর ১৫ টাকা চোদ্দ বছর। ১৫+৫ আলো বা বিজলী খরচ=২০ টাকা, বাবুকে মনি অর্ডারে দিতে হয় এখন। এখন বলছেন, উঠে যাও। ঘর সারাচ্ছেন না। হেলে পড়েছে। বত্রিশ হাজার খুঁটি লাগানো আছে। আমরাই লাগাচ্ছি। জল হলে বালতি দিয়ে ছেঁচতে হয়। ঝড় উঠলে প্রাণের ভয়ে মরি। রাম নাম জপ করি। আমরা বলছি ভাড়া বেশি লিন—ঘর সেরে দিন—তা দেবেন না। বলছেন, উঠে যা বেটারা। আমরা যখন একটা ঘর দেখলাম তখন বললেন, ঠিক আছে থাক। যতদিন না তুই ঘর ছাড়িস তোকে সরাবো না। ঘর যেই হাতছাড়া হয়ে গেল, অমনি বলছেন, এই বেটা, উঠে যা। আমরা পরবাসী, বাবু, মামলা লড়ব কেমন করে? বুড়ো হলাম! এখন কোথা যাই?'

হরিরামের চোখে জল টলটল করে। তার বউয়ের নাকি চিঠি এসেছে, 'ছোট ছেলেটার ভারী ব্যামো। বাড়ি যাবার টাকা নাই। ভাইরা সব এখন আলাদা। ছোট রামপ্রবেশ শ্বশুরবাড়ি শাহাবাদ-আরায় তার সংসার রেখেছে। আজ সারাদিন কাম করে মাত্তর দশটা পয়সা পেয়েছি। খইনীর দাম হয়নি। পথে-ঘাটে অনেক মুচি। বাঁধা দোকানের অর্ডারী জুতো তৈরি

করা অনেক কমে গেছে। তখন চাষীরা এক জোড়া বুট তৈরি করে নিত—দশ বচ্ছর যেত। এখন বাটা, নেভি, প্লাসটিক, রবার আমাদের মেরে ফেলে দিল বাবু। কোনোদিন পাঁচ টাকা হয়, কোনোদিন আবার দশ টাকাও হয়। আজ একেবারে ফাঁকা—মাত্তর দশ পয়সা।'

হরিরাম উঠে বাজারের দিকে চলে গেল।

রামপ্রবেশ কথা বলতে লাগল। সে বেশ খোসমেজাজী। বললে, 'বাঁধা দোকানেও আমরা কিছু কিছু মাল অর্ডার-সাপ্লাই দিই। এই যে দু-ইঞ্চি চওড়া বারো ইঞ্চি লম্বা কাঠটা দেখছেন, এর নাম 'ফরহি' অথবা 'খরহর'। এটা হল জংলী চন্দনকাঠ। চির রসাল। যখনি কাটা হবে এর মধ্যে রস পাওয়া যাবে। এই যে সেগুনকাঠ এনেছিলুম, হল না। এর উপরে রেখে বাটালী দিয়ে চামড়া কাটতে হয়। চাঁছবার বাটালীকে 'খুরপি' বলে। কাটবার বাটালীকে বলে 'খুরপা'। এর স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ আছে। হিন্দীর লিঙ্গভেদ করা বড় কঠিন। এর নাম 'নেহাই' বা হ্যাণ্ডেল। এটা জুতোর মধ্যে ঢুকিয়ে 'কাটি' বা পেরেক মারতে হয়। সব মিস্ত্রির কাছেই থাকে। তে-ফ্যাকড়া লোহায় তৈরি। এটা 'বেলে সিল'। এটা 'পেনচিস' বা প্লায়ার্স। এর নাম 'তীজ-করনী' মানে ফোঁড় বা 'সুই'। 'মুচির তীজ-করনী' চকচক তো 'হাঁড়ি-পাতিল' চকচক। 'তীজ-করনী'—মাঝারি। মোটার নাম 'ওয়াল্‌টি'। সরু ৩নং—'কোলোসী'। এটা হাতুড়ি বা 'হাম্বর'! যে হাতুড়ি কমিউনিস্টরা পতাকায় লাগিয়েছেন! ওটা আমাদেরই হাতুড়ি।'

'কাকে গতবার ভোট দিয়েছ?'

হে হে করে হাসলে রামপ্রবেশ।

শুধোলে, 'আপনি বিধানসভায় যান?'

'যাই।'

'কি রকম ঘরটা।'

'গোল ঘর।'

'গোলঘর! চাষীরা গোয়াল ঘরকে তো 'গোলঘর' বলে।'

মুচি রামপ্রবেশ মাথা চুলকোতে লাগল। সরযু ছোকরাটি আবার কাজের কথার সূত্র ধরিয়ে দিয়ে বললে, 'এইটে 'লক্‌টোন' পাথর বাবু। চামড়া পেটাই করি এতে।'

রামপ্রবেশ বললে, 'সঙ্গ মারওয়ার'-ও বলা হয় কালো ইটের আকারের

পাথরকে। এটা 'টাক উঠাউনী' নক্‌শা-করা যন্ত্র। এটা প্রথম বন্ধনীর মতো দেখতে 'ধপ লেহানী'—মহিষের সিং। এটা 'ফাইল'। এ হল 'জিগিড়'। 'ঘিরনী' —হিলের নক্‌শা-যন্ত্র, 'লোহিয়া' বা 'হিলওয়াল'—রঙ লাগানো হয় এ দিয়ে। 'তেড়য়া' রঙ লাগানো যন্ত্র। 'সিটক' পালিশের যন্ত্র। 'রিং কিটনী' পন্‌চ, জালী কাজের যন্ত্র। 'জিন হামড়'।—শত শত যন্ত্র আমাদের।'

'কি কি জুতো করো?'

'যখন যেমন অর্ডার পাই। ঐ সব ফর্মা টাঙানো আছে কাঠের। চুস্ত, অ্যামবেসডার, প্যাণ্টেড, স্থ, নিউকাট, স্যাণ্ডেল। চামড়া হল: 'ক্রুম লেদার'—কালো লাল—গরুর চামড়া। কাফ লেদার—বি, আর, মানে ব্ল্যাক রেড! গ্লেজ কিড—বি, আর, ব্রাউন, ডার্ক টান। মাদ্রাজী-গরুর চামড়া। সোল হয় মহিষের চামড়ার। আমরা কখনো ভেজাল মাল দিই না। খাঁটি মাল দিই বলে ব্যবসা চলে না। লোকে এখন শৌখিন চকচকে কম-দিন-চলবে এমন মালই বেশি কেনে। আমাদের কাছে যখন সারতে আসে মাল হাতে পড়লেই মালুম পাই। চকচকে বাবুলোকদের চেহারার মতন, ভেতরে রোগ-শোক, হতাশা, বাঁশ-খড়-ভূষি।···আমরা একজোড়া চটি বেচি ১০ টাকা। বুট ১৪ টাকা থেকে ১৮।২০ টাকা। ঐসব ফর্মা বড় সাইজ হল ১২।১১।১০। ৯।৮।৭।৬ পর্যন্ত। মাঝারি ১ থেকে ৪ পর্যন্ত। ছোট সাইজ ১ থেকে ১৩ পর্যন্ত। রাজা মহারাজা থেকে চাষাভুষো, যার যেমন সাইজেরই পা আনুন, ঐ সব ফর্মার মধ্যে হবেই হবে।

'সুতো: ছড়ি সুতো, কাটিম, টোন, মারসেরাইজড। এইসব সুতো তানা করে পাকিয়ে মোম দিয়ে নিতে হয়।'

'পেরেক: তিন জ, ১ ইঞ্চি, ½ ইঞ্চি, টিঙ্গেল।'

'রঙ: ক্রুম, পালিশ, ক্রিম, 'কসিস'—কালো হবে দিলে।'

'আচ্ছা, চামড়া কোথায় থেকে আনো?'

'ট্যাংরা, ধাপা, বীরশূল হাট—কলকাতার চার নম্বর পুলের কাছে। চুনা গলি বা ফিয়ার্স লেনের মুসলমান বা চীনারা জাবনাদার। কীলখানা থেকে কাঁচা চামড়া এনে তারা নুন মাখিয়ে গোডাউনে রাখে। তাদের কাছ থেকে ট্যানিং-এ চলে যায়। ট্যানাররা সবাই পাঞ্জাবী হিন্দু। চামড়ার দর হল ৬।৮ টাকা কিলো। ফুট দরে ১'৫০—১'৭৫—২'০০—৪'০০ পর্যন্ত আছে। গ্লেজ কিড ৪ টাকা থেকে ৬ টাকা পর্যন্ত দর ওঠে।

'কদ্দিন ছাড়া বাড়ি যাও?'

'ছ'মাস পরে পরে বাড়ি যাই। গেলে মাস দুই করে থাকি। আমার একটা ছেলে, দুটো মেয়ে। দাদার দুটো ছেলে, তিনটে মেয়ে। যেতে আসতে ৫০ টাকা ভাড়া লাগে। মনি অর্ডারে ২০।২৫ টাকা করে মাসে মাসে পাঠাই। নিজেদের খরচ, মাল কেনা, অসুখ-বিসুখ আছে। ওখানের ক্ষেতে কিছু কিছু গম কলাই হয়—সব মেয়েরাই গম কোটে, ডাল ভাঙে, যাঁতা ঘুরিয়ে ছাতু কোটে—কষ্টেশিষ্টে চলে যায় বাবু।'

'বউয়ের জন্যে মন কেমন করলে কি কর?'

রামপ্রবেশ লজ্জা পেয়ে ঘাড় চুলকোয়। বলে, 'আমরা তো বাঙালী নই বাবু, আমরা বেহারী। পাথরের মানুষ। তবে বাঙলায় এসে পান্তাভাত খেয়ে খেয়ে মনটা আর শরীরটা নরম হয়ে যাচ্ছে। যখন মনটা উতালা হয়ে ওঠে—খুব হু হু করে—তখন বাল্মীকির রামায়ণ পড়ি। সীতাহরণের পর রামচন্দ্র যেমন সীতার বিরহে বন-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে পাগল হন, আমরাও তেমনি মনের অন্ধকারে বিরহিনীকে তপস্যা করি। পাপ আমরা জানি না। আমরা হরিজন।'

গাড়োয়ান

'খড়ের গাড়ি নিয়ে যাবার সময় সাঁজের বেলা মুই দেখে গেনু একটা গলায়-দড়ি-দেওয়া ষোল বচ্ছরী ছুঁড়িকে পুঁততেছে ওই ট্যাংরাখালির মড়া-পোতাটায়। সিঁথিতে সিঁদুর, সবে এই ফাগুন মাসে বে' হয়েছে, হঠাৎ কি এমন হল যে গলায় দড়ি দিলে জিজ্ঞেস করতে শালারা কোন বাত না করে হুম হুম করে কোদাল মেরে মেরে 'গত্তই' খুলতে লাগল! পথে একটা আধবুড়ী মেয়েমানুষ বললে, জোর করে বিয়ে দেছিল গো, গোপন-আসনাই ছিল, স্বামীর ঘরে যাবে না, স্বামীকে কামড়ে-আঁচড়ে দিলে···তারপর মার-ধর···নিজে কি আর গলায় দড়ি দিয়েছে? অজায়গায় কুজায়গায় লেগে গেছে, তারপর তেঁতুল গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিয়েছিল···আবার শুনি পেটে নাকি বাচ্চা ছিল, দু' মাস বিয়ে হয়েছে, পাঁচ মাসের পোয়াতি·· আর মেয়েরই বা দোষ কী! অত বড় ডাগর করে ফেলে রেখে দেবে বাপেরা, মেয়েদের চোখ-কান ফুটলেই ভয়, যেমন করে হোক

পার করে দিতে হয়, মেয়ে হল বাপের মাথার বাজ…যখন হোক একবার পড়বেই…'

বাঁশের গাড়ি বোঝাই করতে করতে সাদা পাকা গোঁফজোড়ার জটা দাঁত দিয়ে চিবুতে লাগল করিম গাড়োয়ান। চৈত্রের আকাশে মেঘ, পড়ন্ত বিকেল, ঝড়ো হাওয়া বইছিল। পাকা হলদে ঝরা বাঁশপাতাগুলো ছুরির ফলার মতো পাক খেতে খেতে ঊর্ধ্বে উঠে ছুটে চলছিল বাতাসে। কথা বলা বন্ধ করে করিম আসমানের দিকে একবার তাকালে। 'নামদড়ি' ধরে টান দিতে দিতে বললে, 'তা খানিকটা গাড়ি লিয়ে আসার পর দেখি মন্মথ রায় গামছায় চোখ পুঁছতে পুঁছতে আসতেছে। জিগেস করনু, এই মন্মথ, কি হয়েছে? সে বললে, করিমদা, মেয়েটা আমার 'অপঘাত'-মরণে মরল! বলনু, তুই একটা শালার বেটা শালা! দোব শালা তোকে এক লাথি! কুত্তার বাচ্চা! মেয়েটার দোষ?…সে বললে, না মেরেও তো উপায় ছিল না করিমদা…কেলেঙ্কারি হত…জামাই যেন সেই কেলেঙ্কারিই রটাতে চেয়েছিল ·· যাক মেয়েটা মরে বেঁচে গেল! পুলিসকে আধ-ধামা পোঁতা কাঁচা টাকা দিতে হল। পাপ এসেছিল সংসারে!…ভুল হয়েছে। ও পাড়ার গোসাঁই পদ্দানের ছেলে শঙ্করের সঙ্গে ওর বিয়েটা দিলেই হত। শঙ্করের বাবার সঙ্গে আমার যে চার নম্বর মামলা চলছিল আলিপুর ফোজদারী, দেওয়ানি কোর্টে!'…

করিম বললে, 'বজবজের তেলের 'ডিবু'তে খড় লিয়ে চলে গেনু, মনটা যেন খারাপ হয়ে গেল, গরু দুটোকে খুব করে চামড়ার চাবুক কষিয়ে মনের রাগ মেটালুম! বাঁশ কিনতে, খড় কিনতে পাড়ায় আসতুম, মেয়েটা কাকা বলত, সে মারা গেল! তাকে পুঁতে ফেলতেছে! মানুষের 'জান'টা বেরিয়ে গেল তো আর এই 'শরীলটা'র কোনো মূল্য নেই! 'শরীল'টা লিয়ে কেলেঙ্কারি হল, জানটার কথা কেউ ভাবলে না, অথচ জানটাকেই বার করে দিতে হল।…সে যাক, সদর-শহরে এসে সব ভুলে গেনু। মাল খালাস করে ফিরতে রাত হল। তখন একটা। পথে 'জনো-মনিষ্যি' নেই। এমনি 'চোত' মাস। ঝড়ো হাওয়া ছুটে যাচ্ছিল গাছপালা বাঁশঝাড়ে আড়মোড়া ভেঙে। ফিট 'জোচ্ছনা' রাত। দক্ষিণ বাওয়ালীর তেঁতুলতলায় এসে মনে পড়ে গেল, তাই তো, মেয়েটাকে শালারা মেরে ফেলে পুঁতে রেখে গেছে তো! ট্যাংরাখালির মড়াপোতা! গা যেন শিউরে উঠল। এবার কাঁচা রাস্তায় নাবতে হবে। গাইদুধের মতন

সাদা 'জোচ্ছনা'-ধোয়া পথ। মাঝে মাঝে পাক মেরে মেরে ধুলো উড়তেছে। রাতের বেলা মোরা গাড়ি চালাই—কত 'দিশ্শ' দেখি! তা ট্যাংরাখালির মড়াপোতার গল্প শুনলে দিনের বেলাতেই তখন ভয় হত—কলসীতে কলসীতে নাকি গড়াতে গড়াতে এসে ঠোকাঠুকি লাগত, মড়ার মাথা থেকে খনাখনা কথা শোনা যেত—শিস দিয়ে বাঁশি বাজত! ডজন ডজন শিয়াল দৌড়াদৌড়ি করত! গরুর গাড়ির চাকার 'হাঁড়ি'র সঙ্গে ভেতরের লোহার 'ধুরো'র ঘটাঘট শব্দঃ মড়াপোতাটার কাছে এসে দেখি, ভয়ঙ্কর ব্যাপার! মেয়েটাকে শিয়ালে তুলে এনেছে পথের মধ্যিখানে! আড়াআড়ি ভাবে শুয়ে আছে মেয়েটা চিৎ হয়ে। পরনের শাড়ি লম্বা হয়ে পড়ে আছে একটু দূরে। চারদিকে শিয়ালগুলো যেন বামাচার সাধনায় বসে আছে জ্যান্ত মড়া লিয়ে কাপালিক বাবাজীদের মতন! তাড়া দিলেও সরে না। বারোটা শিয়াল। মেয়েটাকে যেন ঘেরাও করেছে। তখনো 'বিসমল্লা' পড়েনি। সবে টেনে তুলে এনেছে। শালারা সরতেছে না দেখে বাঁশের 'ঠেকনা'টা খুলে লিনু। গরু দুটো থির হয়ে দাঁড়িয়ে 'দিশ্শ' দেখতেছে। জাবর কাটা পর্যন্ত বন্ধ। 'টেকনো' হাতে লিয়ে চাকার হাঁড়িতে পা দিয়ে আমাকে নাবতে দেখে শিয়ালগুলো আনচান করতে লাগল। তাড়া দিনু, ভাগ শালারা! তারা খ্যাকখ্যাক করে হঠাৎ তেড়ে আসতেই একটার মাথায় সেঁটে কষালুম এক ঘা। তারপর নেবে পড়ে বাঁশ লিয়ে তাড়া করতেই সব পালাল! তখন গাড়ির তলা থেকে 'ল্যানটেন' (লণ্ঠন) বাতিটা হাতে লিয়ে এসে মেয়েটার মুখ দেখনু! চোখে পানি এল আমার! কি সোন্দর ভাসা ভাসা বড় বড় চোখ ছিল মেয়েটার! উল্টে আছে এখন! বুক খোলা। তলপেটটা সত্যিই বেশ ভারী মতন। মা হয়েছিল বেটি! পয়লা 'যৈবনে'র এই রকম ভরাট চেহারা 'বিছেনা'র মধ্যে কত শতবারই তো দেখেছি ইউসুফের মায়ের। লতুন আর কিছু লয়। কাকা বলত, তার 'শরীল'টার ওপর দিয়ে গাড়ির চাকা তুলে দিয়ে চলে যেতে মনে বাধল। মেয়েটার হাত-পা ধরে টেনে তুলে এনে 'গত্ত'টার ভেতরে ফেলে দিতে চাইলুম। বেঁকে যেন কাঠ হয়ে গেছে। পিঠে পাছায় কয়েক খাবল মাংস খেয়ে নিয়েছে শিয়ালে। চুল ধরে টেনে এনে গত্তটার মধ্যে ফেলে দিনু। দিলে কি হবে, শালা শিয়ালরা তো এক্ষুনি তুলে খেয়ে লেবে। গাড়িতে কোদাল কাটারি ছিল। কয়েক চাপ মাটি কেটে চাপা দিয়ে পথের ধারের সেঁকুল, বৌচকাঁটা

কেটে দিয়ে তার ওপর আবার মাটি চাপা দিয়ে দিনু। তারপর আল্লার নাম করে গাড়ির 'মোড়া'য় উঠে জোরে গরু-গাড়ি ছুটিয়ে চলে এনু। ঝুনঝুন করে ঘুঙুর বাজতে লাগল গরু দুটোর গলায়। কি জানি কেন মনে হতে লাগল মেয়েটা যেন 'কাকা কাকা' বলে ছুটতে ছুটতে আসতেছে আমার পেছনে!··· 'কাকা আমাকে এখানে ফেলে যেও না।'···'শিয়ালে খেয়ে লেবে!'···'বাবা আমাকে মুগুরের বাড়ি মেরে মেরে-ফেলেছে বলে তুমিও কি কাঁটাপালা চাপা দিয়ে পুঁতে রেখে যাবে?'···ঘরে এসে গা ধুয়ে খেয়ে শোব কি, ইউসুফের মাকে বলনু এক ঘটি পানি দে—সেই পানি এক চোঁচায় খেয়ে লিয়েই অজ্ঞান হয়ে গেনু! ভূতে আমি বিশ্বাস করি না। ভয়ও আমার কম। আমি রাতচরা। তবু কেন যে অজ্ঞান হয়ে গেছিনু আজো ভেবে পাইনি। বোধহয় ঝোঁকে পড়ে কিছু করতে নেই। সেই 'ভূতে বিশ্বাস করি না' বলে একটা শিক্ষিত ছোকরা নাকি 'তক্ক' করে গেল মড়াপোতায় একটা খোটা পুঁতে রেখে আসতে—গেল আর খোটাও পুঁতলে সে। কিন্তু আসবার বেলায় কাপড়ে টান পড়ল। তারপর 'হাটফেল'। আসলে সে ভয় পেয়েছিল আর উপস্থিত-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিল। সে যে তার নিজের কাপড়েই খোটা পুঁতে বসেছিল তা দেখে নি।'

করিম গাড়োয়ান কাঁটালি কলার ছড়ার মতো হলদে দাঁতের পাটি বার করে হাসতে লাগল। চুলভরা একটা কানের ওপর থেকে আধপোড়া বিড়িটা নিয়ে ধরালে। ষাট বছর বয়স তার কিন্তু চেহারা যেন মাস্‌লভরা। চোখ দুটো লাল। যেন খুনীর মুখ। বললে, 'ঐ তো সেবার, তোর মনে নেই, বিন্দেরানী ভেদবমি হয়ে মরে গেল কোরোঙ্গাদের, বেশ্যাগিরি করত বলে কেউ তাকে 'গতি' করতে গেল না। মুই গরুর গাড়ি করে তুলে ঐ ডোঙাড়ের 'শ্মাশনে'র ঝোপ-জঙ্গলে ফেলে দিয়ে 'দে-কাটি' (দেয়াশলাই-কাঠি) মেরে উলুবন, ঝোপ-জঙ্গলটা শুদ্ধু বেটিকে পুড়িয়ে দিয়ে এনু।···শালারা বলে কলেরা রুগী, তার ওপর বেউশ্যে মাগী, 'পরাচিত্তে' না করলে ছোঁবে কে? 'ধম্ম' যাবে, জাত যাবে। দুস্ শালা—তোদের জাত-ধম্মের মায়ের নিকুচি করেছে! আমি 'মুস্থল-ম্যান'—আমি গা'ড়ান—আমার ধম্ম হল এই: গরিব অসহায় অনাথ অভাগাকে দেখ! সে যে জাতই হোক। শালা, জাত আগে না মানুষ আগে? 'মনিষ্যি'র জন্যেই তো তোদের ঐ কোরআন-পুরান, আল্লা-ভগবান সব হয়েছে। মানুষ না থাকলে ওসবের লম্যি কী? শিয়ালে কি রামায়ণ পড়বে?···'

করিম লোকটি ছিল ভয়ঙ্কর। খুনে ডাকাতের মতো। তার চেহারা দেখলে ভয় করত। তাকে গোয়ালঘরের মধ্যে 'ঝাঁপা' বোঝাই তাড়ি বিক্রি করতে দেখেছি বটে, কখনো খেতে দেখিনি। তাড়ি খাবার গল্প করলে সে বলর্ত, 'আগে জোয়ান বেলায় হরদম খেতুম। একবার 'আখ্যিনে'র (পৌষ-সংক্রান্তির) দিনে এক ঝাঁপা তাড়ি খেয়ে খুব নেশা করে আছাড়-কাছাড় খেয়ে একটা মেয়ের শুকুতে-দেওয়া ধানে গড়াগড়ি খেতে সে খুব ঝাঁটা-পেটা করেছিল আমাকে, মাইরি! সেই থেকে 'তওবা' করে দিইচি তাড়িটা।...'

করিমের ছিল চুরি করে মাছ ধরার খুব ঝোঁক। হুইল নিয়ে রাত নামলে নাকি যেত সে নীলের পুকুরের ধারে। বহুকাল আগে ঘোষের বাগানে নীল-কর সাহেবরা ছিল। তাই নীলের পুকুর নাম। ঘোষের বাগানের ওই পুকুর-পাড়ের পশ্চিমে বিরাট কবরস্থান। ভীষণ সাপের ভয় ছিল। কাল-কেউটে, বেনাফুলী কেউটে, চন্দ্রে বোড়া এমনি বেয়ে বেড়াত দিনের বেলাতেই। তা করিম একটা ছোট এক সেলের টর্চ হাতে নিয়ে যেত গহিন রাতে ঐ নীলের পুকুরে। হুইল ফেলত একাই। ফাংনার মাথায় একটা জোনাকী পোকা গেঁথে দিত। সেটা দেখতে না পেলেই মারত এক টান। তারপর কররররর শব্দে হুইল ঘুরতে থাকত। গেঁথেছে শালা! শাপলা গাছে জড়িয়েছে? টেনে কেটে নেবে—মোটা মজবুত মুগো ডোর। করিম বলে, 'একটা রুই মাছ ধরে শালার 'গালাসি'তে হাত গলিয়ে পিঠের দিকে চাপিয়ে আনতিছি ঘরে—ল্যাজটা বুঝিন ঠ্যাকেঠ্যাকে ভুঁয়েতে!' করিম ছিল খাটো পাঁচফুটে লোক। গাট্টা-গুট্টি। মাছটা নাকি আধমণের কম ছিল না, সে বলেছিল।

করিম মারা যাবার পর তার গাড়ি-গরু চালাত তার ভাইপো ইব্রাহিম। করিমের ছোট ছেলে ইয়াকুব গাড়ির 'সেতপাই' দিয়ে চাকা মারত—সঙ্গে যেত। অবস্থা খারাপ হয়ে যেতে গাড়ি-গরু বেচে দিলে। তিরিশ বিঘে সম্পত্তি যেন তার 'তনছ ননছ' হয়ে গেল। এখনো বেশ মনে পড়ে ইব্রাহিম তাড়ি খেয়ে একবার উন্মাদের মতো কী কাণ্ড করেছিল! সে তার বউকে ধরে পীড়াপীড়ি, 'বল শালী, 'খালু' (মেসো) বল্।'...বউ তার দাড়ি ধরে ঠেলে দেয় আর বলে: 'মিন্‌সে যেন এক ঢং! ওয়াক থু ...'

করিমের স্ত্রী ইব্রাহিমের চাচী। সে রসিকতা করে বললে, 'বল না বাপু, একবার 'খালু' বল্—আপদ চুকে যাক।'

কিন্তু স্বামীকে কেউ কি মেসো বলতে পারে? মেসো তো অনেক দূরে,

বাবা বলতেও নারাজ! বউটা শুধু খিলখিল করে হাসতে থাকে। তারপর এক বালতি জল এনে দিলে ইব্রাহিমের মাথায় ঢেলে। সেই ইব্রাহিম গলে গেল। তার ছোট চাচা দেদার গাড়োয়ান বলে, 'গাড়ি-গরু একবার গেলে করা কি সহজ? একজোড়া গরু কম করে ছ-সাতশো টাকা দাম। গাড়িতে চারশো টাকা?'

'গাড়িতে চারশো টাকা কেন?'

'ঐ তো খোসাল করে দিলে ই-বচ্ছর মোর লতুন গাড়িটা—চারশো টাকা খরচ পড়ে গেল। দুটো চাকা তৈরি করতেই দুশো টাকা। শক্ত পাকা বাবলা কাঠ যোগাড় করে খোসালকে তিন টাকা মজুরী দিয়ে ঐ চাকার 'পুঁটে' (বেড়ের কাঠ), 'পাকি', 'হাঁড়ি' এসব করতে কতদিন গেল। ভেতরের 'ধুরো' 'লোয়া'টার দাম পঞ্চাশ টাকা। 'হাল' দুটো—চাকার ওপর লোয়ার বেড়ি—পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ সত্তর টাকা। 'তেঁতুলে—যে কাঠ দু'খানা ভেতরের তলায় পাতা আছে, ওর দাম দশ টাকা করে কুড়ি টাকা। 'ধুরো'র ওপর মাঝামাঝি এড়ো কাঠ যেটা ওটার নাম 'তকাঠ'। ওর দাম পঁচিশ টাকা। 'ফড়ে'র বাঁশ বাছাই চাই। মাথা থেকে শেষ পর্যন্ত—দুটোই এক রকম ডৌল হওয়া চাই। একটু বাঁকা ভাবে পড়ন –শেষ ধারে থাকে। এই বাঁশ এক এক-খানা তিন টাকা করে। লম্বা বাঁখারীর মতো গুলোর নাম 'লাপা'। এড়োগুলোর নাম 'চাপা'। মাঝখানের পাকানো দড়ির মধ্যে ডাং ঢোকানো এইটা হল 'লাট'। জোয়ালটাকে আমরা বলি 'জো'। 'জো'-এর মধ্যে যে বাড়িটা ঢোকানো থাকে ওটাকে বলে 'সিম্‌লে'। চাকার মধ্যে যে লোহার 'ধুরো' আছে তার মুখে থাকে লোয়ার 'রংকিল'। তলায় যে বাঁশটা ঝোলে তার নাম 'ঠেকো' বা 'ঠেক্‌নো'। 'নামদড়ি' দিয়ে বাঁশ বা খড়, মালজাল বাঁধতে হয়। গরুর গলায় যে দড়িটা পরানো হয় তাকে বলে 'আঁজ'। গরুর পায়ে মারা লোয়ার পাত্‌কে বলে 'নাল'। নাল মারতে লাগে সাড়ে তিন টাকা। বাখরার ভিকু নাল মারে। সে গাড়িও তৈরি করতে পারে। 'মিনিস্‌প্যালিটি'র 'পাস' নিতে লাগে সাড়ে তিন টাকা। কলকাতা 'করপোরশনে'র শহরে যাবার 'পাস' নিতে লাগে বিয়াল্লিশ টাকা।'

আমাদের অঞ্চলে কয়েকটি গ্রামে গাড়োয়ান আছে অনেক। হানিফ, কোবাদ, দেদার, পিয়ার, নবা। কওসের, নূর মহম্মদ, রুহু বক্স—এরা বাঁশের কারবার করে। একদিন ছাড়া বেহালায় মাল নিয়ে যায় রাত্রে রাত্রে, বাস চলা

বন্ধ হলে। ১২।১৪ মাইল পথ, বোঝাই গাড়ি-ভরা বাঁশ নিয়ে 'হেট হেট' করে কি শীত কি বর্ষা কি গ্রীষ্ম ওরা চলেইছে। ওদের জনেরা বড় বড় আড়াই কেজি ওজনের কাটারি হাতে নিয়ে গেরস্থর বাঁশ কেটে বেড়ায়। সন্ধ্যায় সেই বাঁশ গাড়িতে তুলে 'নামদড়ি' দিয়ে সেঁটে বাঁধে 'হেইয়ো হেইয়ো' শব্দ করে। ৫০।৬০টা গাঁটঅলা হাত ২৫ বড় বড় 'ভেলকো', 'গুড়ি ভেলকো' বাঁশ বোঝাই করে জটা ছেঁটে ফেলে দেয়। বাঁশের ডগার দিকটা থাকে গাড়ির সামনে।

গ্রামে সওয়াশো দেড়শো টাকায় বেশি বাঁশ কেনে নূর মহম্মদ। বেহালায় নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে আড়াইশো টাকা একশোখানাতে। 'মুলি বাঁশ কার্যালয়' অথবা বাড়ি তৈরির জন্যে আড়তে বাঁশ নেয় মোটা মোটা দেখে। পাকা মজবুত দরকার নেই। মোটা হলেই হল। তাই গাড়োয়ানরা চায় কাঁচা দু' সনের মোটা বাঁশ। তাতে বাঁশঝাড়ের ক্ষতি হয়। নবা আর নূর মহম্মদ দু' ভাই। নবা দেশ গাঁয়েই গাড়ি হাঁকে। মুদিখানা, কণ্ট্রোলের মাল বয়। টালিখোলা, কাঠ, খড় বয়। মোটা অর্জুন গাড়োয়ান আসে নারকোল ছোবড়া কিনতে। চোত-বোশেখের গভীর রাতে মাঠের মধ্যে দিয়ে ২০।২৫ খানা করে খড়ের গাড়ি যায় লাইন ধরে ঘুঙুর ঘণ্টা বাজিয়ে বজবজের কেরোসিন তেলের ডিপোতে। হাজার হাজার কাহন খড় টেনে নেয় তেল-কোম্পানি ড্রাম সাজাবার জন্যে।

বর্ষায় ওদের গরুর গাড়ির চাকা যখন পুঁতে যায় 'হাঁড়ি' পর্যন্ত এক কোমর, ওরা অমানুষিক খাটুনি খেটে—চাকার 'পাকি'র মধ্যে 'সেতপাই'-বাঁশ ঢুকিয়ে দিয়ে কাঁধের ওপর রেখে অসুরবিক্রমে পঁচিশ-তিরিশ মণ মাল সমেত ভারী পুঁতে-যাওয়া চাকাকে খানিকটা চাগিয়ে নড়িয়ে দিলে কুঁকড়ে পড়ে গরু দুটো টান দেয় চামড়ার চাবুকের সিপ্‌টি খেতে খেতে। গরুদের চোখ বেরিয়ে পড়ে। প্রায়ই পথে তখন দেখা যায় নবা, নূর মহম্মদ কাদা মেখে হাঁফাচ্ছে। গাঁজা ভাঙছে গরু দুটো। নবার আবার অম্বলশূলের ব্যথা। যখন নূর মহম্মদ শহরে গাড়ি নিয়ে চলে যায়, নবা তার কচি কচি চিগ্‌নে বাচ্চা দুটোকে গরু তাড়তে দেয়। নিজে 'ওলাট' ধরে, চাকা মারে। গরু দুটো এমনি শিক্ষিত যে অন্য কেউ তাড়া দিলে এক পাও নড়বে না। নবার বাঘের মতো রাশভারী হাঁক শুনলেই টানতে থাকবে চচ্চড় করে। ২৪ পরগনার বিখ্যাত এঁটেল মাটির কাদা! বর্ষাকালে গলে যায়। একহাঁটু কাদা ঠেলে কণ্ট্রোলের মাল নিয়ে গেলে তবে ভোর-থেকে-লাইন-মারা মেয়েমর্দরা মাল পাবে। একদিন নবার

গাড়ি আসছে না কেন দেখতে এসে কণ্ট্রোলঅলা দেখলে নবা কাদার ওপরে সটান অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। ছেলেটা কাঁদছে তার 'বাজী' মরে গেছে মনে করে। একটা গরু কাদায় শুয়ে পড়ে আছে জরদগব হয়ে।

নবার বড় ছেলেটা আট বছরের। সে বলে, 'বাজীর প্যাটে ব্যথা ধরেছ্যালো। ট্যাঁক থেকে শিশির কৌটো বার করে টাউটাউ করে সোডা খেলে। তারপর 'পাকি'র ভেতরে 'সেতপাই' ঢুকিয়ে চাকা-মাবতে যেয়ে বুকে লেগে গেল। 'বাবাগো—বাবাগো' বলে কাদাতেই শুয়ে পড়ল।'

লোকজন এসে তাদের উদ্ধার করলে।

নূর মহম্মদেব চেহারাটা সুন্দর, পাথরকোঁদা। সে অবিবাহিত। রাত্রে বাঁশের গাড়ি নিয়ে যায় কলকাতার বেহালায়—সঙ্গে থাকে একটা ছেলে। তাদের নাকি সহরে ঢোকার 'পাস' নেই। রাত ডিউটির পুলিস ধরলেই ফ্যাসাদ। নূর মহম্মদ হাসে কথা বলতে গেলে। বলে: 'শালারা হাঁস।' হয়তো বললে, 'পাস' দেখি। নেই? চল্ শালা থানায়। একটা টাকা দিলেই ছেড়ে দেবে। হয়তো বললে, 'গরুর কাঁধে ঘা কেন?' দাও শালাকে দুটো টাকা। নয়তো বলবে, 'গরুকে মারছ কেন?' মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ শালাদের। আমার গরু, সাত-আটশো টাকা দাম, আমি মারছি কাজের জন্যে, শালাদের দয়ায় পিঁডে ফেটে যাচ্ছে। তবে তুই শালা টান না অত 'যেতি' দয়া! তারপর 'বাতিতে কালি পড়েছে কেন?' 'এত ওভার লোড কেন?' অন্তত টাকা না থাকলে চাবআনা পয়সাও ঘুষ দিতে হবে। পথের ডিউটি 'পুলুস'গুলো সাংঘাতিক। চেক-পোস্টের চোরাই চালঅলী মেয়েদের ওরা ধরে, থানায় এনে মজা মারে!'

'মাসে তোর কত লাভ হয় নূর মহম্মদ?'

প্রেতি গাড়িতে ৪০ খানা বাঁশ লিয়ে যাই, ৪০ টাকা লাভ। ২০ টাকা খরচা বাদ। মাসে ১৫ গাড়ি মাল গেলে ৩০০ টাকা। সব সময় পনেরো গাড়ি মাল হয়নে। গরুর খরচা আছে। গমের ভুঁষি দশআনা কিলো। 'দানা' (আধভাঙা খেসারি কলাই) চোদ্দআনা কিলো। খড় এখন চোদ্দ টাকা কাহন। বর্ষার চারমাস খড়ের দাম চল্লিশ টাকা কাহন ওঠে। তারপর 'খোলে'র (খইল) দাম বাড়ছে। দু' ভাই যা রোজগার করি আমাদের চলে যায়। পাঁচটা গরুর লাগে রোজ দশ টাকা করে। সংসার খরচা লাগে তিনশো টাকা। কোনো শালার ধারি না।'

'গহনি রাতে কোনো ভূত-পেত্নি দেখিস নি ?'

'কত কি দেখি ! মাঠের অন্ধকারে আলো ছুটছে ! খ্যাকশিয়াল, শিয়াল, 'খড়কোস' ছুটেছে। ডাকাতের দল হৈ মেরে মশাল জ্বেলে হয়তো বেরিয়ে গেল ! পাগলা-পাগলী হ্যা হ্যা করে হাসছে। মড়াপোতা থেকে রাস্তার ওপরে মড়া টেনে এনে খাচ্ছে শিয়াল-কুকুরে। মড়ার ঠ্যাং ধরে উল্টে দিয়ে আল্লার নাম করে চলে গেনু। আমরা হনু রাতচরা। ভূত, জীন, ডাকাত, 'ওবা', নিশাচর সবাই আমাদের বন্ধু। একশো 'শুকনি' মরলে তবে একটা গাড়োয়ান পয়দা হয়—তাদের কি ভয় ডর করলে 'গাড়ওয়ানী' করা চলে ? তবে ভয় করি আমরা ভদ্দরলোকদের, ছুঁচো 'পুলুস'দের—যারা দয়া দেখিয়ে, আইন দেখিয়ে মারপিট করে আমাদের, হাজতে দেয়, ঘুষ নেয়। ভদ্দরলোকদের মতন খারাপ 'মাল' আর জগতে নেই !'

মেদিনীপুরের ফকির

দর্জির দোকানের 'ফুঁচ্‌ড়ো' বা বাতিল ছাঁট কাপড়ের বহু বিচিত্র, রাজকীয়, বর্ণাঢ্য সত্তর তালি দেওয়া একখানা আলখাল্লা গায়ে। কাঁধে পূর্ব বাংলার মা-জননীদের হাতের ফুলতোলা নকৃশী-কাঁথা সেলায়ের মতো মিহি এবং সুচারু 'ধাগা'-দেওয়া লম্বা একটি ঝোলা। মাথায় তেমনি নকৃশাদার জালি টুপি। পাকা-কাঁচা সুন্দর দাড়ি। পরনে গেরুয়া লুঙ্গি। হাতে আঁকাবাঁকা সাপের মতো লতার লাঠি। একটা সিঙ্গাপুরী নারকোলের তেল-কুচকুচে নৌকো-সদৃশ খোল আর-এক কাঁধে ঝোলানো। গলায় কাঁচ-কড়ার পাথরের মালা—লাল, নীল, হলদে, সাদা, সবুজ—বিচিত্র শোভাময়।

টিকোল নাক। ফরসা রঙ। চোখ দুটি যেন পদ্ম-পলাশের পাপড়ি। মধুর—একেবারে মিহি, মোলায়েম, বিনয়ী গলার স্বর। সঙ্গে দুটি লব কুশ। যেন রামায়ণ গান গাইতে এসেছেন নগরবাসীদের দুয়ারে। কান করে শুনলাম। শুনে আমি মুগ্ধ হলাম। স্বনামধন্য ঔপন্যাসিকের রকবাজ নাগরিকদের নিয়ে লেখা উপন্যাসখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শাঁকের মধ্যে সমুদ্রের গর্জন শুনতে পেয়ে যেন শিশুর মতন ছুটে বেরিয়ে এলাম সদরে। মেদিনীপুরের ফকির। গান গাইছেন। অপূর্ব গলা। দোয়ারকী গাইছে দুটি নওল

কিশোর। পাড়ার ছেলেমেয়েরা ছুটে এসেছে। সবাই চায় ফকির সাহেব তাদের বাড়ি যান। এক সরা চাল দেবে। আলু, কাঁচকলা, পয়সা দেবে। ছেলেবেলা থেকে আমিও এমনি মেদিনীপুরের ফকিরের গানে সম্মোহিত। মনে করতাম বুঝি বা এঁরা ফেরেস্তা! স্বর্গীয় দেবদূত! ঝুলিতে এঁদের অনেক মজার মজার গান আছে। বড় বড় পুথি মুখস্থ। যাদের বাড়ি রাত থাকবে তাদের বড় কপাল। সারারাত ওরা গজল, বয়ান, বয়েৎ গাইবেন। কত কাহিনী, ধর্মকথা শোনাবেন। শিঁরি-ফরহাদ, লায়লা-মজনু, সোহরাব-রুস্তম, হজরত মুসা, হজরত ইউসুফের কাহিনী। ঝ্যাংলা-মাদুরী বুনতে বুনতে বাড়ির কর্তা শুনবে, গিন্নি শুনবে পাট কাটবার ঢ্যারা ঘোরাতে ঘোরাতে—বউরা থাকবে আটচালার আড়ালে, 'মৌলুদ' শোনার মতন সারারাত বসে। বুড়োরা হুঁকো টানবে ভুড়ুক ভুড়ুক করে।

এক ঝাঁক রঙিন উড়ো পাখির মতো সেই সব স্বর্গীয় দেবদূতেরা কোন্ কুমেরু দ্বীপের দিকে উড়ে চলে গেলেন অভাবের দুনিয়া থেকে বয়েস বাড়ার সিঁড়ি ভাঙতে গিয়ে তার হদিস রাখি নি। এখন হিসেব মেলাতে গেলে 'ফাজিল' হয়ে যায়। যোগের চাইতে বিয়োগের অঙ্ক, মহাবীর হনুমানের চাইতে তার ল্যাজের মতন বড় হয়ে যায়। সেই ল্যাজের লঙ্কাকাণ্ডে সীতা উদ্ধার হল বটে কিন্তু জননী সীতা আগুন নেভাবার জন্যে আমাদেরই মুখে লাঙ্গুল গুঁজতে বললেন!

আধুনিক সীতা এখন কোথায়? বনবাসে না পাতালে?

তবু হঠাৎ এতদিন পরে লাল মেঘের আকাশ ফাটিয়ে হজরত মুসার 'আসাবাড়ি' হাতে নিয়ে যে এলেন একজন—তাই ভাল। মন ক্ষোভ করে বললে, কোথায় ছিল এতদিন?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফকিরের গান শুনছিলাম। তাঁর রূপ দেখছিলাম। ইনি যে একেবারে দরবেশ! ফকির গাইছেন:

বন্যায় আমাদের ভেসে গেল দেশ
মোরা ভেসে এনু পেয়ে কত ক্লেশ॥
ঘরদোর গরুগোলা ভেসে গেল জলে
জলের অতলে
দেহ মাগো ভিক্ষা কিছু করুণা করে।

চাল গম কাপড় যা খুশী
ডালাটি ভরে!
আল্লার করুণা পড়িবে ঝরে
নাই তার শেষ
বন্যায় আমাদের ভেসে গেল দেশ
মাগো ভেসে এনু মোরা পেয়ে কত ক্লেশ॥

ছেলে দুটি সমবয়সী, যমজের মতো দেখতে। তারা গেয়ে-যাওয়া প্রতিটি লাইনের শেষ যতিটুকুর ধুয়ো ধরছিল। ফকিরের হাতে খঞ্জনী। ছেলে দুটোর হাতে চালুনী আকারের ঝুমঝুমি। তাদের হাত নাড়ার কায়দাও অপূর্ব।

বুকে নিয়ে কচি ছেলে ভেসে গেল মা—
টাকা কড়ি ধান খড়
বউ ছেলে বাড়ি ঘর
ভেসে কোথা গেল মাগো কেউ জানে না।…

মা বললেন, 'আর একটা গান গাও বাছা। আর একটা।'

একটা একটা করে ফকির সাহেব সাতটা গান গাইবার পর সাঁজবাতি জ্বলে গেল।

তাঁরা 'আছরা' গাড়লেন আমাদের বাড়ি। তাঁদের খেতে দেওয়া হল।

রাত্রে ভড়ি কাটতে আমি গল্প জুড়লাম ফকিরের সঙ্গে।

'আপনার নাম?'

'মোহম্মদ আলী-আহমদ জিয়া হায়দার আল্-তমলুক।' বলে হাসলেন। বললেন, 'এ আমার বনেদী সায়েরী নাম। বাবাজী নাম রেখেছিলেন জিয়া হায়দার। মিলাদ মহফিলে যাই। কেউ কেউ 'ফকির-দরবেশ' বলে। তাই একটু জাঁকিয়ে নাম না বললে ভক্তরা 'গেরাজ্জি' করে না বাবা।'

বললাম, 'এক ভদ্রলোক অমনি বড় নাম লিখতেন, তিনি আমার দূর সম্পর্কিত এক মামু। চিঠি দিয়েছেন 'মোহম্মদ আবুল কাশেম বোরহানউদ্দিন' নাম লিখে। আসলে তাঁর নাম বোরহান। আমি তাঁকে চিঠি লিখি আরো খানিকটা তোয়াজ করে, নামটার বহর বাড়িয়ে দিয়ে।'

'কি লিখেছিলে বাবা?'

'জনাব হাফেজ আলি সিদ্দিকী মওলানা মোহম্মদ আবুল কাশেম বোরহানউদ্দিন টককরউদ্দিন-কা ঢেকাই আল্-ভেল্লাবাড়িয়া।'

ফকির হাসতে হাসতে ফেটে পড়লেন। আমার হাত চেপে ধরলেন। বললেন, 'টক্করউদ্দিন-কা ঢেকাই মানে উনি কি ঢেঁকির মতন টক্কর মেরে মেরে কথা বলতেন ? রাগী লোক ? তা কি উত্তর এল ?'

'তুমি একটা আস্ত শূয়ারের পয়দাস !'

ফকির জিয়া হায়দার আর হাসলেন না। হঠাৎ গুম হয়ে গিয়ে মোমবাতির আলোটার দিকে করুণ চোখ মেলে মাথা নিচু করে তাকিয়ে রইলেন। ছেলে দুটি তখন তাঁর ঘুমিয়ে পড়েছে ফুলতোলা নক্‌শী-কাঁথা মুড়ি দিয়ে।

শিয়াল ডাকছে দূরে। একপাল শিয়াল। হুয়া হুয়া স্বর। একই অনুকরণ। কবরস্থানের ভাঙা কবরেব মধ্যে ওদের বাসা।

বাঁশবনের মধ্যে জোনাকিরা আলোর জাল বুনছে।

ক্রু ক্রু শব্দে উই-চিংড়ি ডাকছে।

কানা বক ডাকছে—কুব্…কুব্…কুব্…

বললাম, 'ঋষি বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়কে কে যেন একজোড়া জুতো পার্শেল করে লিখেছিলেন, 'জিনিসটা কেমন' ?

তিনি উত্তব দেন, 'তোমার মুখের মতন !'

ফকির বললেন, 'না বাবা, তুলনাটা ঠিক হল না। তোমার মামু অহঙ্কারী লোক—শূন্যগর্ভ—মানে ফোঁফরা ঢেঁকি ! বঙ্কিম-বাবাজী কি তাই ? তাঁকে জুতো পাঠাবার স্পর্ধা দুনিয়াতে কারো ছিল কি ? তবে 'বঙ্কিম' না হয়ে যদি 'সরল' নাম হত তাহলে জুতো জোড়াটা পরতে পারতেন ! · তোমার মামুর মতো অনেক পীর-ওলি আছেন, যাঁরা বাংলা দেশটাকে বখরা করে নিয়ে ভোগ করছেন, রস-রসিকতা বোধহীন। যারা নিজেদের নামের আগে 'জনাব' পর্যন্তও লেখেন ! তা লিখুন, নিজে না লিখলে অন্যে লিখবে কেন ? তুমি তো 'সাহিত্য' করো, তুলনাটা যদি ভাল না দিতে পার, ভাষাটা যদি রপ্ত করতে না পার, তাহলে তোমার দ্বারা ভাল সৃষ্টি হবে না। তবে তোমার মামাকে লেখা উচিত ছিল, অধম শূয়ারের বাচ্চা হলে আপনি শূয়ারের শালা !'

'আপনি…'

'আমি নাকি ভাল লেখাপড়াই শিখেছিলাম ছোটবেলায়। আমাদের ৭০০ বিঘে সম্পত্তি ছিল। চোদ্দ জোড়া হাল-লাঙল ছিল। বাবা ঘোড়ায়

চড়ে সদর থেকে ফেরার পথে শত্রুদের দ্বারা তীরবিদ্ধ হয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে যান। টাকার লোভে শত্রুরা কাছে এলে তিনি অকস্মাৎ উঠে পড়ে তলোয়ার খুলে চারজন লোককে কেটে কুঁচিয়ে ফেলে ঘোড়া ছুটিয়ে রক্তমাখা শরীরে বাড়িতে এসেই পড়ে গিয়ে মারা যান। তারপর গ্রামে আগুন জ্বলে যায়। আমাদের পৈতৃক শরিকী বিবাদ ছিল এই জিঘাংসার মূলে। মামলা মোকদ্দমায় সব 'তনছো নন্‌ছো' হয়ে গেল। মা আমাকে নিয়ে মামার বাড়ি চলে গেলেন। আমি তখন নাকি এনট্রানস্ পড়ছি। তারপর মা হঠাৎ এক প্রণয়ীর গর্হিত প্রেমের পাপ হজম করতে না পেরে গায়ে আগুন ধরিয়ে পুড়ে মারা গেলে আমি নাকি পাগল হয়ে যাই। পাগলা গারদে অনেকদিন রাখার পর আবার ভাল হয়ে যাই। আমাকে ছেড়ে দিলে পথে পথে ঘুরে বেড়াই।'

'আচ্ছা আপনার মা'র নিকাহ্‌ হল না কেন?'

'শুনেছি নাকি সেটা অসামাজিক, অবৈধ প্রণয় ছিল।'

'যেমন?'

'থাক না, সে শুনে কি লাভ তোমার! ওসব দিয়ে মনকে কৃমির মতো ময়লা ঘাঁটতেই সাহায্য করে!'

ফকিরের পলাশ চোখের আগুনে যেন একটা অন্ধকার ঊর্ধ্ববাহু অরণ্য পুড়তে পুড়তে ছাই হয়ে গেল।

তবু তিনি হাসলেন। বললেন, 'আমার রূপ ছিল, বড় এক চাষী তাঁর সুন্দরী কন্যাদান করে আমাকে ঘর-জামাই রাখেন। এই দুটি ছেলে আমারই। একবার ভীষণ ঝড়-জল-বন্যা হল মেদিনীপুরে। এরা তখন পাঁচ বছরের। ঘরদুয়ার সব ভেসে গেল। ওই যমজ বাচ্চা দুটোকে নিয়ে আমি একটা তেঁতুল-গাছে উঠে প্রাণ বাঁচাই। বউকে গাছে তুলতে পারি নি। ছেলে দুটোকে গাছে রেখে আবার ঝাঁপ দিয়ে পড়ে ওদের মাকে উদ্ধার করবার জন্যে এগোতেই, ওদের কি কান্না! বাবা যদি আর না আসতে পারে! বন্যার তোড় ঠেলে বউকে টেনে আনছিলাম। সে অনেক পানি খেয়ে হাউমাউ করতে লাগল। শাড়ি জড়াল কাঁটাগাছে। শাড়ি খুলে ফেলে দিয়ে তার চুলের গোছা দাঁতে কামড়ে সাঁতার কেটে কোনোক্রমে তেঁতুল-গাছের গোড়ায় এলাম। ছেলে দুটো কাঁদছে। হেঁকে বলছি, সাবধান, ভয় নেই, আল্লাকে ডাক, হাত ছাড়িস না!'

হঠাৎ চিৎকার করে নাটকীয় স্বরে কথা বলাতে চমকে উঠল আমাদের

বাড়ির সবাই বোধহয়।

'বউকে কিন্তু তুলতে পারলাম না। সে তখন অজ্ঞান হয়ে গেছে। ছেলেদের বাঁচাবার জন্যে তাকে আল্লার নামে ছেড়ে দিলাম। তার নগ্ন যৌবনভরা দেহটা চকিতে একবার আল্লা যেন আমাকে দেখিয়ে দিলেন।… তারপর ভীষণ বন্যার তোড়ে সে হারিয়ে গেল।· গাছে উঠে বাচ্চা দুটোকে কাছে টেনে নিলাম। সারারাত কাঁপুনি। ঝড় চলেছে। পরদিনও। তার পরদিন আকাশ কাটল। সমস্ত জলে জলময়। গাছটাতে আরো অনেক লোক। সাপ জড়িয়ে আছে ডালে ডালে। ঘরের চাল, খড়, গরু, মোষ, ছাগল—কত কি ভেসে চলেছে। ক্ষুধায় তেঁতুলপাতা চিবিয়ে খেয়েছি। ছেলে দুটোর প্রচণ্ড জ্বর উঠল। তারপর মানুষজনের সাহায্য এল, নৌকো এল। আমাদের সদরে নিয়ে গেল। ছেলে দুটো আর আমি বেঁচে গেলাম।'

'আপনি ভিক্ষাবৃত্তি নিলেন কেন?"

'মেদিনীপুরের অনেক লোকের এই রেওয়াজ। অনেক চাষআবাদ আছে, অথচ যখন ধান-রোয়ার কাজ শেষ হল, ফকিরী লাইনে থেকে দু'পয়সা কামাবার জন্য ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমানে অনেকে ঝোলা কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। জনধন খাটাবার টাকা যোগাড় হলে আবার চলে এসে ক্ষেতে নামে।'

'আমি দেখেছি মেদিনীপুরের ফকিররা এখানে এসে কারো সদরে আশ্রয় নেয়। জনা চারেক করে, ভাই ছেলে মিলে ভিক্ষে মেগে এনে সেই বাড়ির কোনো অনাথা মেয়েকে তাদের খোরাকীর মতো চাল রাঁধতে দিয়ে বাকিটা বাজার-দর থেকে কিছু কম দরে বিক্রি করে দেয়। একদিনে তারা দশ কিলো, পনেরো কিলো পর্যন্ত চাল পায়। এক টাকা ছাপান্ন পয়সা কেজিতে পাড়ায় (গরিবদের) তাদের কাছ থেকে চাল নিতে দেখেছি। যে মেয়েটা রান্না করে দেয় তাকে ওরা খোরাকী দিত। রাত্রে ফেরার পথে রোজই দেখতাম লম্ফের আলোয় একটা বুড়ো ফকির বসে বসে তার 'গেজে' বা 'তবিল' খুলে টাকা পয়সা গুনছে। অগ্রাণ-পৌষমাসে ধান-কাটার সময় আসতে, সে যখন যাবে যাবে করছে একদিন হঠাৎ তাকে বুক চাপড়ে কাঁদতে দেখলাম। কী ব্যাপার! বললে, 'বাবু, কুন শালা মোর সব টাকা চুরি করে লেছে রাত্তিরে 'নিদ' পড়ে যেতে।'

ফকির জিয়া হায়দার সাহেব হাসলেন। বললেন, 'ওটা পট্টিবাজী।

নাহলে ব্যবসাদারী করে মোটা টাকা নিয়ে গেল কেউ ভাবতে পারে, পর বছর এলে লোক তাড়িয়ে দিতে পারে অথবা কোনো চোর-ছ্যাচড় খুন জখম করতে পারে পথে, তাই ওই মিথ্যা কান্না !'

'আপনার ঘরবাড়ি আছে ?'

'করেছিলাম। তাও গত বন্যায় আবার ভেসে গেল! এখন পথে পথে, জেলায় জেলায় কাটছে। কি হবে সংসার করে ? ঘর বাঁধার পর অনেকে বলেছিল আবার সাদী করবার কথা। নাউজোবিল্লাহ্। ঘরে সুখ নেই। ছেলে দুটোর মা এখনো আমার মধ্যে বেঁচে আছে। বন্যায়-ভাসা তার শরীরটা এখনো মনে পড়ে।'

'আমি সাহিত্য করি জানলেন কি করে ?'

'যদি বলি আল্লা আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন ?'

'তাহলে ভাতের ভেতরে তরকারি দিয়ে আপনাকে বসিয়ে রাখার পর তরকারি না আসার জন্য খাচ্ছেন না জানালেই পীরগীরি ঘুচিয়ে দিতাম! এক ফকির নাকি হঠাৎ ছি-ছি করে কুকুর তাড়াতে থাকে একজনের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে। কুকুর সেখানে কোথায়, শুধোলে সে বেটা বলে মক্কার মসজিদে কুকুর উঠছিল, আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি সব! তখন গৃহস্থ তার চালাকি বোঝার জন্য ভাতের মধ্যে তরকারি দেয়। বেটা মক্কার মসজিদে কুকুর উঠলে বাংলাদেশ থেকে দেখতে পায় কিন্তু ভাতের ভেতরে তরকারি দিলে দেখতে পায় না ? দে ঝাঁটার বাড়ি!...আমি অলৌকিকতায় বিশ্বাস করি না। যাদের বুদ্ধি কম তারা কোনো ব্যাপার ভাল করে বুঝতে না পারলে কিংবা বোধশক্তি বা ক্ষমতার বাইরে কিছু ঘটতে দেখলে তাকে অলৌকিক বলে বিশ্বাস করে। যেমন প্রমত্তা পদ্মায় রবীন্দ্রনাথের নৌকো যখন ঝড়ের বেগে আর তরঙ্গের আঘাতে যায় যায় তখন নাকি হঠাৎ কে একজন একাই তীরবেগে পানশি বেয়ে চলে যেতে যেতে হেঁকে বলে যায়—'চলে যাও—ভয় নেই!' রবীন্দ্রনাথ নাকি বলেছেন, একে যদি কেউ অলৌকিক ব্যাপার বলতে চায় তবে বলুক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ভদ্রলোক, সুখে লালিতপালিত, মাল্লামাঝিদের জীবনের ভয়ঙ্করতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় যতখানিই থাক তা তাদের দুর্জয় সংগ্রামশীল জীবনের সঙ্গে একই সমতার বা ওজনের নয়। হজরত মোহম্মদও ঝড়কে ভীষণ ভয় পেতেন। প্রাণের দায় যখন তখন যিনি উদ্ধার করেন বা দুঃসাহস যোগান তাঁকে অলৌকিকতার বিভূতিতে মণ্ডিত করে আমরা আনন্দ পাই। রবীন্দ্রনাথ

বলেছিলেন, 'জীবনে আমি ওইরকম সাহসের বাণী আর কাউকে উচ্চারণ করতে শুনিনি। কেউ যদি একে অলৌকিক বলে আনন্দ পান আমার আপত্তি নেই।' কারণ এতে আছে প্রেরণা, বীর্যবান চেতনা। তবে আধ্যাত্মিকতার সাধারণ ব্যাখ্যায় বেশি ভক্তিরসের রঙ পড়লে আমার ব্যক্তিগত আপত্তি। কেননা 'জীবন তারই লভ্য এবং ভোগ্য যে প্রতিদিন জয় করে এ দুটি।' যাহোক, নিজেকে মিথ্যে প্রচার করলে ফকির সাহেব আপনি আমার শ্রদ্ধা পাবেন না। আল্লার কিসের গরজ আমার পরিচয় আপনাকে দেবার জন্য?'

ফকির সাহেব হাসতে লাগলেন। বললেন, 'মাঝেমাঝে নাকি আমি পাগল হয়ে যাই। তখন সব ভুলে যাই। আবার ঠিক হয়ে যায়। লেখাপড়া যা শিখেছিলুম, তা ভুলে গেছি। তবে একটা গুণ আমাকে আল্লা দিয়েছেন। আমি লোক চিনতে পারি।'

'লোক চেনাই তো সব বিদ্যার শেষ বিদ্যা!'

'হাঁ। পথে আসতে ছেলেরা বলছিল, অমুক লোকদের বাড়ি যাবে? শুধোলাম, সে কি করে? তখন তারাই বলে দিলে। এই আমার আল্লায় বলা!'

দুজনেই হেসে উঠলাম।

ফকিরকে এরপর আবিষ্কার করলাম। তিনি বললেন, 'বাংলা দেশটাকে জানি বলে অহঙ্কার করবে না। কেউ সম্যক জানে না। আচ্ছা, বলো তো বাছা আমার ঝোলা থেকে কুড়িটা মাটির ঢেলা বার করে রাখছি—কোন্ জেলার কোন্ অঞ্চলের মাটি বলো তো দেখি।'

মাটিগুলো দেখলাম। কতক বলতে পারলাম, কতক বলতে পারলাম না। তিনি সব জানালেন: 'এটা ঘাটালের মাটি, এটা বর্ধমান জেলার কুলগড়িয়া গ্রামের, এই মাটিটা হুগলী জেলার বালি-কুথাড়ি গ্রামের, এই মাটি হল বীরভূমের সিউড়ীর। মালদহ, কৃষ্ণনগর, কালিমপঙ—এসব মাটির ঝোলা বয়ে বেড়াই আমি—পাগল নয়তো কি? এই ঝোলাতে আছে গাছপালার শেকড় আর পাতা। কত রকমের গাছপাতা, লতাগুল্ম, ঘাস, আগাছা-পরগাছা আছে তার হদিস রাখি! এ আমার অভ্যাস। বড় বড় গাছের নাম অনেকেই জানে। লতা-গুল্ম বা ঘাস-আগাছার নাম সবাই জানে না। হাজার হাজার গাছ, জেলায় জেলায় নামের তফাত। কিছু নাম শোন: মুক্তোঝুরি, আপাং, পাতাল-গুলগুলি, চাঁদা-পটপটি, পাতাল-ভৈরবী, কোঁকসিমা, মনিরাজ, মাথা-

ওকড়া, তেলাকুচো, ছাগলভাঁটি, দোয়েল, অ্যাড়জালি, ঘৃতকুমারী, ম্যাড়ামারা, থানকুনি, পানকৌটি, ভেরাণ্ডা, জীবদণ্ড, গোদানি, আদা, বিড়মি, বিলঝনঝনি, কালমেঘ, চিরতা, জোঁকার পাতা, ধুতরো, হাড়ভাঙা, বনতুলসী, ইনচিরি, পাথরকুচি, মিছরিকুদো, রাঙচিতা, বনচাঁড়াল, ঘি-চাঁড়াল, বনবেগুন, কণ্টিকারী, ঢলকল্মি, বসন্তবিহার, শ্বেত বেড়ালা, স্বর্ণখিরুই, ঘোড়াখিরুই, আয়াপান, নিসিন্দা, বুড়িগোপান, পানশিউলী, আকন্দ, টিকচোনা, নাকদানা, ঘুরঘুরি, ভেঁটকোল, খঞ্জনবোডা, ওলটকম্বল, ঢোল-সমুদ্র, হরকোচ, তে-কাঁটাল, বঁইচি, সোনাকাঁটা, সোঁয়াকুল, কুকুরছড়ি, গিডিম, গোলঞ্চ, বামনআঁটি, হাতীশুঁড়, দইখই, নিমুখী, বাঁটবলি, বেনেবউ, বন-কেওড়া, সেপুন্তে, চিগ্‌নি, হিঞ্চে, কুল্‌পো, জালকেঁটে, সোঁ-করাতে, সুসনি, বিছুটি, ঝুমকো, ভৃঙ্গরাজ, কেশুত, কুঁচ, কানছিঁড়ে, ঘুলকো, চেঁচকো—কত আর নাম বলব ? যেসব নাম বললাম, এসব গাছ কি চেনো বাবা ?'

'চিনি। আরো অনেক জানি। কয়েকটা গাছের নাম এ অঞ্চলের কোনো প্রবীণ লোকও বলতে পারে না। আপনাকে দেখাব আমি। তবে আপনি যেমন বললেন, মিছরিকুঁদো, বসন্তবিহার, শ্বেত-বেড়ালা—এ তিনটি নাম কিন্তু একটা গাছেরই। এর শিকড় পান দিয়ে চিবিয়ে খেলে শ্বেতপ্রদর ভাল হয়। কুঁচের শিকড় হল জ্যৈষ্ঠ মধু। আফুলা শিমুলের মূল হল মেহরোগের ওষুধ। পৃথিবীর সব গাছই ওষুধ। আমরা জানি না কোনটা কোন্ কাজে লাগে। কোনোটা আবার তীব্র বিষ। যেমন গেঁয়োগাছের আঠা, কুঁচলে ছাল, কুঁচ, পটল মূল, কোলকে ফল, ধুতরো দানা, বাজবরণের আঠা, ভেরাণ্ডাবিচি। মানুষজনের চাইতে আমি বোধহয় আমাদের অঞ্চলের মাটি এবং গাছপালাকেই বেশি চিনি। আর পশুপাখি জীবজন্তু, পোকা মাকড়, মাছ সাপের খবর আমার নিজের রক্ত-মাংসের মতো জানা। যেমন একমাত্র জানতেন স্বর্গত সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।...'

মেয়েদের খাওয়া-দাওয়ার পর ফকির সাহেব বয়েৎ গাইতে শুরু করলেন। পয়ার ছন্দের পুঁথির ছড়া। সাপ খেলানো সুর। প্রেমের উপাখ্যান বা ধর্মীয় কাহিনী তার মূল বস্তু। শুনতে চমৎকার লাগে। মূলত বাংলা সাহিত্যের বিশাল মহাকাব্য 'কাসাসল আম্বিয়া'র কাহিনীর খণ্ড-বিচ্ছিন্ন অংশ তিনি সুর করে গাইছিলেন। তাঁর গান শুনতে শুনতে রাত পার হয়ে গেল।

'কাসাসল আম্বিয়া' এবং 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'—এই দুটি মাত্র মহাকাব্য

বাঙালীর!' ফকির সাহেব বললেন। 'রামায়ণ, মহাভারত মহাকাব্য বটে, কিন্তু মূলত এ দুটি সংস্কৃতের। 'কাসাসল আম্বিয়া' এখনো অনেকের ঘরে আছে। কোনো মুসলিম-সংস্থা এটিকে রক্ষা করতে এগুচ্ছে না অনেক খরচ বলে, কেননা এটি মহাভারতের চাইতেও বড় বই। বহু নবীদের কাহিনী এতে আছে। মানুষ বৃহতের মহতের অনুসরণ অনুকরণ ছেড়ে দিয়ে ক্ষুদ্রত্ব এবং ক্ষণসুখের লালসায় বৃহৎ মহৎকে গাল দিচ্ছে—একালে এ বড় অভিশাপ। জেনে রেখো বাছা, মহৎ না হলে মহৎ চরিত্রসৃষ্টি সম্ভব নয়।'

মেদিনীপুরের ফকির সকালে উঠে নামাজ পড়ার পর গাছপালা দেখিয়ে এসে নাস্তাপানি খেয়ে ছেলে দুটির হাত ধরে পথে পথে আবার কোথায় যে কত দূরে চলে গেলেন, আজ তা আমি জানি না। ছেলে দুটি নাকি তাঁর বন্ধন। চোখ দুটি যদি তাঁর অন্ধ হয়ে যায় কোনোদিন, ছেলে দুটি তাঁর চোখ হয়ে জ্বলতে থাকবে। তাদের বাসা নেই, ডেরা নেই, তবু ঘরে ঘরে পথে পথেই বেঁচে থাকবে। জিয়া হায়দার মারা গেলে তারা ঘর বাঁধে তো বাঁধবে কোথাও।

সেই মানিকজোড়কে কোথায় কোন্ জেলায় বাসা বেঁধে দিয়ে যাবেন, তা নাকি মনঃস্থির করতে পারছেন না ফকির সাহেব। বন্যার আতঙ্ক তাঁর আজো কাটেনি, কাটেনি মায়ের পুড়ে মরার অগ্নিময় দৃশ্যের বিভীষিকা। ভাবতে গেলেই নাকি মনে পড়ে বাবার খুন হয়ে খুন করে মরা আর গোটা গ্রামে আগুন জ্বলার দৃশ্য! তিনি পাগল হয়ে যান।

তিনি যাবার সময় তাঁর গলার বহু বিচিত্র রঙ-বেরঙের পাথরের একটি মালা আমার হাতে দিয়ে গেলেন আশীর্বাদ-স্বরূপ। বলে গেলেন, 'যদি কোনোদিন ভীত, অহঙ্কারী, ঈর্ষাপরায়ণ, লোভাতুর, লালসাপরায়ণ হয়ে পড়ো, তবে এই পাথরের মালাটা মুঠোয় চেপে সংসার-বিবাগী জিয়া হায়দারকে স্মরণ করো বাবা—শান্তি পাবে।'

আমি তাঁর কথা রাখতে পারি নি। মালাটি মেদিনীপুরের আর-একজন ফকিরকে দিয়ে দিয়েছি।

কেননা, আমি একজন সাধারণ মানুষ। ষড়-রিপুর আন্দোলনে সংসারে থেকেই সকল সংসারের মানুষের মনে আমাকে সাড়া দিতে হবে। আমার চাইতে দরবেশ ফকিরের মালাটির প্রয়োজন বেশি।

তাঁত বোনে তাঁতী

মায়ের পেট থেকে যেই না মাটিতে পড়েছি অমনি ট্যাট্যা করে আওয়াজ তুলেছি, মাগো গালে মধু দাও, দুধ দাও।

আর যখন একটু বড হয়েছি মা একটু আচ্ছাদান জড়িয়ে দিযেছে কোমরে। টেনে খুলে ফেলে দিয়ে দিগম্বর হতে গেলেই বলেছে: 'ছি বাবা, ন্যাংটো থাকতে নেই!'

তারপরে আর একটু বড় হতেই সিঁথি কেটে পাততাড়ি বগলে দিয়ে মুখে চুমু খেয়ে বলেছে, 'যাও সোনামণি, ইস্কুলে যাও—মানুষ হও।'

সভ্য মানুষের জন্যে এ তিনটি জিনিস চাইই। অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা। প্রথম অধিকার অন্নের, পরে বস্ত্র। তারপর শিক্ষা। বস্ত্রের বয়স কত হাজার বছর? কলকাতার যাদুঘরে মিশরের যে মমিটা রয়েছে তার গায়ের বস্ত্রটির বয়স নাকি চার হাজার বছর। তার রঙ, বুনোন দেখে মনে হয় কেউ বুঝি ধোঁকা দিয়েছে! আধুনিক মেশিনে বোনা থান কাপড় নিয়ে মমির গায়ে চড়িয়ে দিয়ে লোককে বোকা বানাতে চেয়েছে যাদুঘরের কোনো যাদুকর! কিন্তু না। অত সহজে মানুষ যাদুর গোলাম বনে না। তাহলে মিশরের আকাশচুম্বী তিনকোণা যেসব পিরামিডগুলো রয়েছে তার পাথরের হাজার হাজার টন ওজনকে বিজ্ঞানের কোন্ কপিকল টেনে তুলেছিল মশায়? কোন্ ছাঁচে ব্লক করে মানুষের মুখের হুবহু নকল তুলেছিল শিল্পীরা? কোন্ আরক তৈরি করেছিল ভেষজবিদরা যা হাজার হাজার বছর পরেও অক্ষয় অব্যয়—সমান ক্রিয়াশীল?

অথচ এখন? কোন্ ওষুধের ক্রিয়া কতদিন থাকে? কোন্ কাপড়ের রং কতদিন টেকে? আড়াইশো টাকায় একটা জামদানী শাড়ি কিনে এনে দশদিন রোদে রাখুন রং জলে ভ্যানিস্‌ড!

যাদু আমরাই জানি, আমরাই নকলাইয়ের নবাব। হাজার হাজার বছর আগে আমাদের চোদ্দ পুরুষের চোদ্দ হাত মা-বাবারা নকল দাঁত, নকল পরচুলা, নকল স্তন, নকল চোখ পরতেন না—তাঁরা ছিলেন খাঁটি এবং অবৈজ্ঞানিক হলেও আমাদের চাইতে আধুনিক। তাহলে ৪।৫ হাজার বছরের মিশর-সভ্যতা,—অজন্তা-ইলোরা, দ্রাবিড়-সভ্যতা যদি আধুনিক হয়, বাকল অথবা কাপড় পরার বয়স কোন্ না হাজার পঁচিশ বছর হবে! পণ্ডিত ডারউইনের

বাপ ঠাকুরদাদারা বাঁদর-হনুমান ছিলেন বলে তিনি জানাবার আগে তাঁর কোমরের কাপড় খুলে পড়ে গিয়েছিল বোধহয় কত হাজার বছর আগে মানুষ প্রথম কাপড় বুনতে এবং পরতে শিখল সেই গভীর গবেষণার কঙ্কালে শলা পাস করতে গিয়ে!

যাহোক, আমরা মানুষ, ভগবানের চেলা, সভ্য জীব, বহু হাজার বছর পরে হলেও একেবারে ন্যাংটো থাকি নি, কাপড় পরতে শিখেছি! আমরা গরু ঘোড়া, ছাগলের মতন আর ন্যাংটো নেই। এমন কি মাটির ঠাকুর, পাথরের বা কাঠের ঠাকুরকেও কাপড পরিয়ে ছেড়েছি! শুধু আমাদের বুকে আর জঙ্ঘায় নয়, কাপড় এখন ফানুস হয়ে মানুষ নিয়ে আসমানে উড়ছে। কাপড এখন জীবন থেকে জীবিকা হয়ে গেছে। মানুষের চারপাশে শুধু কাপড আর কাপড়ের রাশি। বালিশ, কাঁথা, লেপ, তোষক, গদি, উড়ানি, শালোয়ার, পাজামা, পীরহান, আচকান, শাড়ি, ধুতি, পাতলুন, ব্লাউজ, শার্ট, পাঞ্জাবি, বোরখা, ব্রেসিয়ার, সায়া, গেঞ্জি, গামছা, তোয়ালে, চাদর, মশারি, টুপি, পাগড়ি, কৌচ, সুজনি, গেলাপ, সামিয়ানা, কম্বল, গালিচা, সতরঞ্চ, দোর-জানলার পর্দা, সুটকেশ-রেডিও-বন্দুকের ঢাকনা-জামা—কোথায় আমাদের বেপর্দা জীবনের ইজ্জৎ ঢাকবার জন্যে কাপড় নেই? এমন কি মানুষের শরীরের ওপরে কাপড়, ভেতরে কাপড়, তার ভেতরে কাপড়। কবরে পর্যন্ত কাফন জড়ানো। কাফনের ভেতরে মরা মানুষের দেহের সব ক'টি ছিদ্রপথ কাপড়ের পুঁটুলি দিয়ে ছিপি এঁটে বন্ধ করা! স্বর্গেও নাকি থাকবে হীরা-মুক্তা-মানিক্যের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুময় বসনবিলাস! সুটপরা সাহেবরাও পেট্রো-কেমিকেলের জামা-কাপড় কেন রেডিয়াম বা নিউক্লিয়ার-অক্সিজেনের পোশাক পরে গ্রহে-গ্রহান্তরে ঘুরে বেড়াবে! সংসারে যে যত বিত্তবান তার তত বেশি কাপড়। তত বেশি পোশাক।

বাবু চেনা যায় শীতকালে।

শীতপ্রধান দেশে কাপড় জন্ম নেয় মানুষ জন্মাবার আগে থেকেই। আমাদের গরম দেশেও মায়েরা বাচ্চা হবার আগেই কাঁথা সেলাই করে রাখেন। ছোট ছোট 'মিনি কাঁথা'।

গরম দেশে আমরা প্রায় সবাই ন্যাংটা ফকির—গান্ধীবাবা! ইংরিজি-সাহেব হয়ে বৈশাখ মাসেও যাঁদের সুট পরতে হয় কলকাতায়, তাঁরা অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু ব্যক্তি!

গরম দেশে ধুতি, গামছা, লুঙ্গি, গেঞ্জি, পাঞ্জাবি, পাজামা, শাড়িতেই হয়ে যায়। শীতে পশম বা মোটা খদ্দর। গরমে সুতি বা সিল্ক।

কিছুদিন আমি লক্ষ্য করছিলাম, কে কি পরে আছে। কোথায় সেই সব তৈরি হয়। এর হদ্দ-হদিস রাখা কঠিন। বিদেশী কাপড় বাদ দিলেও কাশ্মীরী সার্জ থেকে শুরু করে গামছা বা ল্যাঙ্গট পর্যন্ত কোথায় কোনটা জন্মায় সেসব তথ্য নিতে গেলে দোরাস পাগল মেরে যেতে হবে। হঠাৎ নেড়া হয়ে নিজের মাথার চুল গুনতে বসার মতো! মিলের কাপড় আলাদা। বোম্বাই, দিল্লী, মোরাদাবাদ, হায়দরাবাদ, সিঙ্গাপুর, পশ্চিম বাংলা, কটকের মিলের বহু রকমের কাপড়—পৃথিবীর নানান নগরে বন্দরে গ্রামে গ্রামান্তরে জাহাজ বোঝাই হয়ে গাঁটকে গাঁট ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছে।

তাঁতের কাপড় বুনছে ছায়া-সুনিবিড় গ্রামের ঘরে ঘরে কত শত-সহস্র মানুষরা। পশ্চিম বাংলার তাঁত শিল্পীদের কথাই ধরুন। হুগলী জেলার বড়-ডঙ্গল, শ্রীরামপুর, চন্দননগর, রাজবলহাট, বেগমপুর, গুলটিয়া, রশিদপুর, দাসপুর, ধনেখালি, সমাসপুর, গৌরহাটি, মায়াপুর,—কতখানেই না খটাখট শব্দে রাতদিন হাজার হাজার তাঁত চলেছে। শিল্পীরা নকশা-আঁচলা, পাড় বুনছে। জরির কাজ হচ্ছে।

বর্ধমানের গ্রামে গ্রামে চলেছে হাতের তাঁত।

২৪ পরগনার ফলতা থানায় রুখে, গোপালপুর, শতোল, কল্সা, বেলে, আস্নে, চিলে গ্রামে ১২০০ ঘর মুসলমান জোলার বাস। প্রায় ৬০০০ লোক। কোন্ আদ্যিকাল থেকে তারা তাঁত বুনে চলেছে।

রুখে-গোপালপুর পাশাপাশি গ্রাম। তাল, নারকোল, খেজুর, বাবলা, বাঁশগাছের জমাটি জঙ্গল গ্রামের মধ্যে। দুস্তর দুরন্ত মাঠ চারদিকে। ধূ ধূ করছে। দূরে কলাপাতার জঙ্গলে রোদ্দুরের লেলিহান শিখারা ঝিলমিল কিলবিল করছে। মাঠের মাটি ফেটে চৌ-চাক্লা। আকাশ-পাতাল ছুঁয়ে নীলকণ্ঠ চিৎকার করছে।

রহিম মিদ্দে তাঁত বুনছে। ষাট বছর বয়েস। মাথার সব চুলই সাদা। ঝোলা গোঁফ দুটো পর্যন্তও। তার ডাগর মেয়েটা বালতিতে করে লাল রঙ এনে সুতোর তানা ডুবিয়ে ভারাতে ভারাতে শুকোতে দিচ্ছে। মেয়েটার বিয়ে হয়েছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। মুসলমান মেয়েদের বিয়ে হয়েছে কিনা ধরা কঠিন যদি শরীর দেখে বোঝা না যায়।

রহিম জোলা বলে, 'এই গামছা বুনছি বাবু! গামছা আর মশারিই আমরা এ অঞ্চলে বেশি বুনি। ১২০০ ঘর জোলার বাস এখানে। কলকাতার বড়বাজার থেকে সুতো কিনে আনি। মাল বেচতে যাই মঙ্গলবারে হাওড়া মঙ্গলাহাটে। বিরলাপুর, বাঁড়ুয্যের হাট, বাখরা, কালীঘাট, বেহালাতেও মাল 'নে-যাই'। 'ম্যাড়া' এটার নাম। 'দক্তি', 'ঝাঁপ', 'মাকু', 'পুলি', 'বপিন'—এ সবগুলোর নাম। এই সব নিয়ে তাঁত। ধুতি শাড়িও বোনা হয়। ৬০ সানায় ছোট শাড়ি হয়। ১½ তানা সুতো লাগে। গামছার 'সানা' ৩২—২৮—২৬ থাকে। রং সাবান দিয়ে সুতো রাঙাই। ১ বাণ্ডিলে ২০ 'ফেটি' করে সুতো থাকে। ৩৭—৩৭½—৪০—২০—৩০ টাকা করে বাণ্ডিল সুতোর। ভেরাইটি সুতো আছে। গামছার আবাব অনেক 'রকম' আছে। এই যেটা বুনছি খুচরো এক-একখানার দাম সাড়ে তিন টাকা করে। বেনারসি গামছা পঁচাত্তর পয়সা দাম। এই মাঝারি গামছাটার দাম এক টাকা সাঁয়ত্রিশ পয়সা। মশারি বুনছে ওরা। একখানা বড় মশারি—চার-পাঁচজন শুতে পারে—মানুষ-সমান খাড়াই—বারো টাকা দাম। এখন সুতোর দাম চড়েছে, পনেরো টাকা হয়তো পড়ে যাবে।'

কয়েকটা ভেড়া বাঁধা আছে সোঁদালি গাছটার তলায়। ছোট ছোট ভেড়াবাচ্ছাগুলো মাথার গুঁতো মেরে মেরে দুধ খাচ্ছে। বড় বড় নোনা পেকে লাল হয়ে আছে তাঁতঘরের পাশেই। রহিমের স্ত্রী ফেন দিয়ে কুঁড়ো গুলে 'আয় আয় আতি!'··বলে মোরগ-মুরগীদের ডাকতে থাকলে তারা চারদিক থেকে ছুটে এসে গপ্ গপ্ করে 'গল্‌মা' ঠেসে কুঁড়ো খেতে থাকে।

রহিম বলে, 'চার ছেলে আলাদা খাচ্ছে বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে। আমাদের এক কাঠাও জমি নেই বাবু। ঐ মেয়েটা 'কেলাস' এইট পর্যন্ত পড়েছে। এখনো বে' দিতে পাচ্ছি নি। আমাদের জোলাদের ঘরেই দিতে হবে। দু' চারটে ছেলে দেখিছি, পসন্দ নয়। জোতদার আহসান মিয়ার কুড়িটা তাঁত চলে। তার ছেলের জন্যে বলছে। জমি তো এখন গ্রামের দু'তিনটে লোকের হাতে। সব গ্রামেরই। ওদের হাতেই বন্দুক, কণ্ট্রোল, মুদিখানা, থানা, 'পুলুস'--সব। গাঁয়ের মোড়ল—দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ওরা। ওর ছেলেটা লেখাপড়া জানে না। আকাট মূর্খ। রাজনীতি এমন বেনোজলের মতন আমাদের মতন মূর্খ গরিবদের ঘরে ঢুকেছে যে ঐ জোতদারের ঘরে মেয়ে দিতে ভয় পাই। কবে পঙ্গপাল হাজারে হাজারে মানুষ এসে একদিন ঘেরাও করে

গুষ্টিসুদ্ধ সবাইকে টিপে মেরে ফেলে দিয়ে যাবে তার ঠিক আছে নাকি! জোতদার আহসান সাহেবের চরিত্র বদ। অনেক বদনাম। মাসী-পিসি তার জ্ঞান নেই। মামলা-মোকদ্দমা খুন-জখম দাঙ্গা বাধাবার লোকবল অর্থবল আছে তার। তার গরু-মোষ লোকের ফসল নষ্ট করলেও খোঁয়াড়ে দেবার উপায় নেই। শালার পো বলে, রহিম চাচা, তোর মেয়েটাকে মোর ভারি পসন্দ। মোর ছেলেকে না দিস তো নাহয় মোকে দে। শোনো শালার পো-র কথা! মেয়েটা একদিন টিউকলে পানির জন্যে গেছিল, পথে নির্জনে পেয়ে বাঁশবনের আড়ালে নাকি ওর একটা হাত চেপে ধরেছিল। মেয়েটা গালে চড় কষিয়ে দিয়ে কলসী ফেলে রেখে পালিয়ে আসে। আহসান মিয়া চোখ রাঙিয়েছে, আচ্ছা সে যদি বাপের বেটা হয়, মায়ের দুধ খেয়ে থাকে তো শোধ নেবে। আমাকে পার্টির লোকেরা উস্কাচ্ছে, লাগাও শালাকে!…'

খটাখট খটাখট—খটাখট খটাখট…তাঁত চলেছে সমানে। রহিমের সুন্দরী ষোড়শী মেয়েটা রঙ মাখা লাল হাতে কাপড়টা মাথায় তুলে দিয়ে বললে, 'বাবাজী, রহমত-চাচা এসেছে, পাইকারী গামছা, মশারি দেবে নাকি? বললে তো এ হাটে হাওড়াতে যাবে না? রাত্রে ফেরার সময় আহসানের লোকজন খুন করতে পারে!'

রহিম মুখ তুলে মেয়ের দিকে তাকালে। মেয়েটার চোখ দুটো বেশ সুন্দর। ভাসা ভাসা। পাকা ফরসা রঙ। ভাবান্তর কাটিয়ে রহিম বললে, 'আল্লা যার হাতে মরণ রেখেছে মরতেই হবে মা। মঙ্গলা হাটে না গেলে বড়বাজার থেকে সুতো আনব কেমন করে? সামাদ, হাসিম, হামিদ, গোবরা, পদো, নিমু—সবাই একসঙ্গে যাব আসব, ভয় কি! এই যে, ছুরি থাকবে আমার ট্যাঁকে!'

ছ' ইঞ্চি ফলা চকচকে একখানা ছুরি খুলে দেখালে রহিম বুড়ো!

হাসিনা হাসলে।

পাশের বাড়ির তাঁতঘরের লোকগুলো একবার চোখ তুলে চাইলে। আবার ম্যাড়ার ঘা মেরে মেরে মাকুকে চলন্ত ঝাঁপের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করাতে লাগল। মেয়েরা ওদিকে চরকা ঘুরোচ্ছে কজন। হাসিনার গায়ে ব্লাউজ নেই। হাত তুলে ভারায় রঙিন সুতো শুকোতে দিতে দিতে মিটমিট করে হাসছিল।

হঠাৎ একটা দাঁড়কাক পাকা নোনা-ফলের গায়ে ঠোকর বসাতেই সে একটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে যখন ছুঁড়তে গেল তার অপরূপ মনোহর কোমল

একটি বক্ষচূড়া বসনমুক্ত হয়ে গেল এক নিমেষে! রহিম জোলারও তা চোখে পড়ল। মেয়েটি লজ্জা পেয়ে দীপ্ত চোখ দুটোতে কাতর এবং তির্যক হাসি উপচে দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল অন্দরে।

রহিম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে শুধু।

চলে আসতে আসতে পথে রহিম জোলা আর তার মেয়েটার কথা ভাবছিলাম। রহিমের লাসটা হয়তো একদিন পড়ে থাকবে মাঠের জাঙালে অথবা তালবাড়ির মধ্যে—কারণ রহিমের মেয়েটা ভরা যুবতী—সুন্দরী—তার চোখ দুটো যাদু জানে! আহসান মোড়লের টাকা আছে, লোকবল আছে। আর সেই লোকেদের মধ্যে নাকি রহিমের ছেলেরাও আছে। তারাও নাকি 'জীনের গোলাম'! রহিমের ভাষায়: 'আগুনের জীন হল আহসান মিয়া!'

রুখে, গোপালপুর, শতোল, কলসা, চিলে—সব ক'টা গ্রাম ঘুরে ঘুরে তাঁত দেখে, মানুষ দেখে বেড়াতে সারাদিন গেল।

আহসান মিয়ার বাড়িতে গেলাম সন্ধ্যায়। লোকটাকে দেখা দরকার। বসতে চেয়ার দিলে সে। খাটো কালো চেহারা। মাথায় চাঁদের মতো টাক। ডান হাতের বাজুতে প্রায় আড়াই ভরি একটা সোনার 'পদো'। তাতে মিনেকরা তাজমহল। খালি গা, কাঁধে তোয়ালে। পরনে সিঙ্গাপুরী ঝরনাদার লুঙ্গি। গোল গোল চোখে ধূর্ত ভাব। বললে, 'বসুন। আমাদের জোলাদের খবর নিয়ে কি হবে? হুগলী জেলায় যান, তাঁতীদের খবর জানবেন। এখন তাঁতী-জোলারা অভাবে দুর্দিনে সব মরে গেছে। ১৯৫২ সালে 'ভারত তাঁত সংস্থা' হল। ১৯৫৬ সালে 'তাঁতশিল্প সাহায্য-কেন্দ্র' হয়েছে। শ্রীরামপুরে অফিস আছে, 'ইনেসপেকটার' আছে। তাঁরা 'রেজিস্টার' শেয়ার-খাতা দেখেন। সুতোর দাম দেখেন। নতুন নতুন ডিজাইন দেখান। সমিতি, সরকারের কাছে কাপড়ের বিক্রয় বাবদ ৫% সাধারণ রিবেট আর পুজোর ৭ দিন ১০% স্পেশাল রিবেট পেয়ে থাকে।'

'সেসব কথা থাক—আপনি আপনাদের কথা বলুন।'

'বসো বাবা একটু। বয়েস কম, ছেলেমানুষ, তাই তুমি বললাম, মনে করো না কিছু। তাঁতী-মজুরদের দামকড়ি দিতে হবে, বসে আছে। একদিন রোজ না দিলে আর ভাত হয় না। বেটারা সব হাভাতে হাঘরে। বাপকেলে তাঁতটা পর্যন্তও আমড়া ভাতে দেবার মতন বেচে খেয়েছে। এই রাহিলা, ভাতারছাড়ি মাগী, তোর কি?'

'মোর কি, তুমি জাননি?' মাঝবয়েসী মেয়েটি টেরা চোখে তাকায়। ব্যাপার দেখে সহজেই বোঝা যায় মেয়েটার সঙ্গে আহসান-ব্যাটা আছে। ওর কোন রুচি নেই। হলেই হল একটা। আরো দুটো দোয়াল-গাই বসে আছে যেন একেবারে ছাপোসা ভিজে বেড়াল।

আহসান বললে, 'তোর ন'সিকে পাওনা।'

পাঁচ টাকার নোটটা খপ করে টেনে নিয়ে দৌড় মারতে গেলে পেছন থেকে আঁচল চেপে ধরে কাছে টেনে আনে আহসান মিয়া। কানে কানে কি যেন বলে। মেয়েটা ফণা তুলে কৃত্রিম ক্রোধ দেখিয়ে বলে, 'ওলাউঠো!'

হা-হা করে বিকট হাসে আহসান মোড়ল।

জোলারা তাঁত বন্ধ করে মুখহাত ধুয়ে এসে দাম নিয়ে চলে যায়।

মিয়া ফিরে এসে বলে, 'আজ বাবা তোমার যাওয়া হচ্ছে না। কাঠুরে সাধু মল্লিকের কাছে তোমার কথা শুনেছি।'

'সেই আপনার নাম বলে দিয়েছিল। আর রহিম জোলার কাছে আপনার কথা শুনেছি।'

'কোন্ রহিম জোলা?'

'যার মেয়ের নাম হাসিনা; পরীর মতন দেখতে। মেয়েটা নাকি আপনাকে চড় মেরেছিল?'

হ্যারিকেনের আলোয় মুখখানা আহসান মিয়ার হঠাৎ ঝুলে গেল। গোল হয়ে গেল চাকার মতন। চকচকে টাকের ওপরে তার লকলক করছে যেন প্রজাপতির শুঁড়ের মতন দু'গাছা কালো বাঁকা চুল।

বললে, 'হাঁ। চড় মেরেছিল। মেয়েটা সোনার পিদিম; পিদিমের শিখা। আমাকে পুড়িয়ে মেরে ফেললে।'

'গরিবের মেয়ে। আপনার নাতনীর বয়সী। আপনি চাইলেও সে যদি না চায়? তাছাড়া আপনার ছেলেমেয়ে রয়েছে।'

'কিন্তু লেখক-বাবাজী, মানুষের চরিত্র বড় বিচিত্র। কেউ তার ভেতরের কথা, সব কথা জানে না। কেউ বলেও না। কিন্তু আমি বলছি, আমার গায়ে যত লোম আছে তত নারীদেহ উপভোগ করেছি আমি। আমি পাপিষ্ঠ, দোজখের শেষ লাইনের শেষ ঘরটা আমার। তবু হাসিনাকে আমার চাই। সে বাঘের মুখে চড় মেরেছে।' জন্তুর মতন সে যেন একবার আড়মোড়া মারলে শরীরে।

অন্ধকার কলকাতার 'নাইট' বন্ধুবর বসন্ত পোদ্দার আমাকে একবার 'ভানুমতীর খেল' নামে একখানা বই দিয়েছিল। সে ধনী ব্যবসায়ীর দুলাল, উচ্চশিক্ষিত হয়েও ঐ একই কথা শুনিয়েছিল, 'আমার দেহে যত লোম আছে তত সুন্দরী উপভোগ করেছি।'

তাই অবাক হলাম না। বিত্ত থাকলেই চিত্ত রসসিক্ত হয়।

রাত্রের খানা এল। সীতাশাল চালের ভাত। ডিমের অমলেট, ভেটকি মাছের তরকারি, মুরগীর তরকারী, মাছ ভাজা, চিংড়ি মাছের মালাইকারী। শেষে দই মিষ্টি! এত সব খেয়ে শরীরের পোষ্টাই করলে, মেদমজ্জার ভার কমাবার জন্যে যদি শরীর বেচারা উতালা হয় তো তার দোষ কি!

'কত বিঘে সম্পত্তি আ

'লোকে বলে ২০০ বিঘে।'

'আসলে?'

'আসলে ছেলে, বউ, আমার নামে ভাগ করা আছে সব।'

'ক'টা বউ?'

'একটা। দৈতড়ি, ফেদ্‌ড়ি!'

'কেন? বিত্ত আছে, মুসলমান লোক, ইন্দ্রিয়পরায়ণ বলে স্বীকার করতেও যখন লজ্জা পেলেন না, তখন চারটে সাদি না-করা কি উচিত হয়েছে? বাদশারা তো 'মীনাবাজার' থেকে রোজ সন্ধ্যায় একটা করে 'কুসুম' চয়ন করতেন!…আচ্ছা, আপনি তো বিত্তবান, আপনি কি সুখী?'

'না। জগতে কেউ সুখী নয়। টাকা সোনার জন্যে আমার কোনো রাত্রেই ভাল করে ঘুম হয় না। যখনি ওদের মিছিলের স্লোগান শুনি, ছাদে উঠে পর পর বন্দুক ফায়ার করে শোনাই। এস শালারা, মদ্দের বাচ্ছা হও তো এগিয়ে এস।'

কিছুক্ষণ নীরবতার মধ্যে কাটল। চন্দ্রবোড়া ডাকছে কোথায় কররররর-কররকর…শব্দে।

'মঙ্গলাহাটে আপনার দোকান আছে?'

'হাঁ। দু'খানা। গরুর গাড়ি বোঝাই করে পাইকারী আর নিজের মাল নিয়ে যাই। বাখরা থেকে বাসে তুলে নিই।'

'ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখান নি কেন?'

'ওদের কপাল! আচ্ছা, ঘুমোও বাবা! আমি চলে যাই শুতে। রাত্রে

কেউ ডাকলে দোর খুলবে না।'

সকালে নাস্তাপানি করানোর পর তবে ছাড়লে আহসান মিয়া। ফেরার সময় বললে, 'যাবার সময় রহিম মিদ্দের মেয়ে হাসিনাকে বলে যেও বাবা, আহসান মিয়ার বাইরেটা বুড়িয়ে গেছে বটে, ভেতরে সে এখনো 'এ্যাক্কেরে' ডালিম-বেদানা। গাছের শেকড়ে-মূলেই রস, পাতার চাকচিক্যে কি হবে? তাকে বিশভরি সোনা দোব, দশবিঘে জমি দোব, যদি আমার সঙ্গে সাদিতে মত দেয়।'

ইয়ার্কি করে বললাম, 'সে আসা দুরাশা! তাকে আমি এখনি নিয়ে চলে যাচ্ছি, আমার এক বি-এ পাস আত্মীয় ছোকরার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেব কথা দিয়েছি। রহিম মিদ্দে আমার মাসতুতো ভাইয়ের ছেলে হয়।'

আহসান মিয়ার ঠোঁট দুটো রসগোল্লার মতন গোল হয়ে গেল। বললে, 'আই সি!'

হুগলীর পথে পথে গ্রামে গ্রামে ঘুরছি, মনটা বিষণ্ণ—বলে তো এলাম আহসান মিয়া তোমাকে কলা দেখাব, সে তো মিথ্যে কিন্তু কি করছে শয়তানটা কে জানে! লেখাপড়া জানা ছেলে নেই, থাকলেও সাদিতে সবাই টাকা, ঘড়ি, আংটি, রেডিও, খাট-পালং চায়। জন্মনিয়ন্ত্রণ, ভ্রূণহত্যায় এখন আর পার্লামেণ্টারী পাপ নেই কিন্তু কন্যাহত্যার মোহম্মদপূর্ব আরবীয় বিধান লাভে এখনো আমরা বঞ্চিত আছি যদিও কন্যাদায়ে মধ্যবিত্ত বাবারা ফতুর হয়ে আমাদের শ্মশানের রাজা করে রেখে গঙ্গাযাত্রা করছেন! কিন্তু রহিমের কি আছে? কাজেই হাসিনা।···

বড়ডঙ্গল! মনোরঞ্জন দাস তাঁত চালাচ্ছেন। বললেন, 'এই গ্রামেই প্রফুল্ল সেন মশায় ইস্কুল-টিচার ছিলেন। তাঁর একটা কুঁড়েঘর-লাইব্রেরী আছে। · আমরা ধুতি, চাদর, শাড়ি, থানকাপড়, গামছা, মশারি, সব-রকম করি। সমিতির আমি সম্পাদক। মঙ্গলা হাটে আমরা মাল বেচতে যাই। মঙ্গলা হাটের পরেই নবদ্বীপ হাট। সেটা শুক্রবারে বসে। নবদ্বীপের কাছাকাছি হুগলী জেলার চিত্তরঞ্জন, মিলনগড়, শান্তিপুর, রাণাঘাটের তাঁতীরা মাল নিয়ে যায় সেখানে। দরকার হলে কিছু কিছু সরকারী লোন নিতেও পারি। 'ডবি' দিয়ে নতুন নতুন ডিজাইন করছি আমরা। নকশা করে 'গ্রাফে' তুলে বুনতে হয়। ১০০—১২৫ সানায় শাড়ি বোনা হচ্ছে এসব। লোহার সানা,

ডবি, জ্যাকার্ড, জালা—এই সব নিয়ে তাঁতের কারবার। শান্তিপুর, সমুদ্রগড়ের শিল্পীদের চাইতেও এখানে নকশার কাজ ভাল হচ্ছে, 'ডবি' আর 'গ্রাফে'। ১০০ থেকে ১৫০ টাকা মাসে উপায় করে তাঁতীরা। কারো ভাল করে সংসার চলে না। আমার পাঁচজন লোক সংসারে। সবায়ের পাঁচ-সাতজন করে লোক। হুগলীর মাটি ভাল, দামোদর পরিকল্পনার জল আসছে, তাইচুং, আলু, পিঁয়াজ, শাকপাত ভাল হচ্ছে। তবু সমস্যা হল মিলের কাপড়ে বাজার ছেয়ে গেছে। তবে এটা ঠিক, ধনেখালি ইত্যাদির তাঁতের শাড়ি আজ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা পরছেন বেশি। বাবুরা খদ্দর পরছেন, টাঙ্গাইল ফরাসডাঙার তাঁতের ধুতি পরছেন। ভাল একখানা খাদি ধুতির দাম ৮০ টাকাও আছে বাবু। তা ছাড়া ৭৫—১০০—১৫০ ২০০—২৫০ টাকা দামের শাড়ি আছে। মুর্শিদাবাদের সিল্ক, আংটির মধ্যে শাড়ির একটা কোণ ঢুকিয়ে দিয়ে হড়হড় করে টেনে বার করে নিন, খাঁটি মাল হলে আটকাবে না। ঢাকাই মসলিন, জামদানী, টাঙ্গাইল, গঙ্গাজলী, নীলাম্বরী, শান্তিপুরী, বেনারসী, ভেঙ্কটগিরি, চান্দেরী, পায়রা খোপা, ময়ুর পেখম, ময়ুর চশম, বালুচরী—কত রকমের শাড়ি আছে। জরি সাচ্চার কাজ হয়। সোনার পাড হয়, ফুল হয়। নানা গাঁয়ে নানান শিল্পীরা ছড়িয়ে আছেন—সমবেত হয়ে যদি একটি সংস্থায় কাজ করতেন অনেকের গুণপনা কাজে লাগত। শুধু নকশার কাজ জানলেই হবে না, কত দামের কাপড়ে কত মজুরির নকশা তুলতে হবে সে হিসেবও জানা চাই। নকশারও অনেক রকম নাম আছে। কল্কা, বুঁটি, চিত্রা, ভারতী, গোলকধাঁধাঁ, কুকুরছড়ি, বিন্তি, পেখম, জংলা, ঝরণা—নানা জায়গায় নানা নাম। আগে মাল ভাল ছিল, নকশা ছিল সাধারণ। এখন সাধারণ কাপড়েও অসাধারণ ভাল নকশা হচ্ছে। দক্ষ আর্টিস্ট সুলভ হয়েছে।'

সহজ সরল সাদা মানুষ, কর্মব্যস্ত মনোরঞ্জন দাসের কাছ থেকে আরামবাগ তারকেশ্বর ঘুরে শ্রীরামপুরে ফিরে এলাম। তাঁতীদের বাড়ি বাড়ি ঘুরলাম। পথে এক তাঁতীর বাড়ির ছেলে, চশমা চোখে, ধুতি পাঞ্জাবি পরা, বি-এ, বি-টি ইস্কুল মাস্টার, 'চালচিত্রে'র রীতিমতো গুণগ্রাহী পাঠকের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। রাতের অতিথি হতে বাধ্য হলাম তাঁর।

ভাইবোন মা-বাবা সকলের সঙ্গে আলাপ করে দিলেন মাস্টারমশায়। বৃদ্ধ বাবার চোখে পুরু কাঁচের ভারী পাওয়ারের চশমা। অমূল্য দাস নাম। মাটির দেওয়াল, টিনের বাড়ি। গোয়ালে গরু, খামারে খড়ের গাদা। রাত্রে

অনেকক্ষণ গল্প করলেন বৃদ্ধ হুঁকোয় তামুক টানতে টানতে। বললেন, 'গোড়ায় গলদ বাবা, মাল খারাপ পাই। সুতো খারাপ। তাঁতীদের দোষ দিলে কি হবে! আমার বাবার একখানা জার্মানী পশমের শাল আছে, দশ টাকায় কেনা ছিল। এখন দুশো টাকাতেও সে মাল পাওয়া যাবে না। তবে সুঁচের কাজ, নকশার কাজ সেকালের চাইতে একালে আমার বড় মেয়েই এখন ঢের ভাল পারে। ও যে আর্টিস্ট, ছবি আঁকতে পারে। বি-এ পাস করেছে। তিনটে মেয়ে বাবা, কি করে পার করব ভাবনায় আছি। ছেলে মহেন্দ্রর বিয়ে দিয়ে যা পাই তাই দিয়ে রমলাকে পার করব ভেবেছিলাম, কিন্তু বিধি বাম। মহেন্দ্র 'লাভ-ম্যারেজ' করে আনলে কলকাতা শহর থেকে। কিছু পেলেও না। শিকারী মেয়ে। এ সব কথা যেন আবার মনাকে বলো না বাবা। দোহাই তোমার।'

রমলা এল। বেশ শান্ত গম্ভীর মেয়ে। কম কথা বলে। বৃদ্ধ বললেন, 'বসো মা, আলাপ করো।'

রমলা বসল। মাথা হেঁট করে কাপড়ের পাড় কুঁচোতে লাগল।

বললাম, 'তুমি একটা মাস্টারী পাচ্ছ না?'

'আজ্ঞে না, দেখছি।'

শিয়াল ডাকছে দূরে। বৃদ্ধ বললেন, 'যাই বাবা, তাঁতে বসে সারাদিন গতরটা ধরে গেছে, একটু লম্বা হই গিয়ে।' হেসে সবিনয়ে তিনি যেন বিদায় প্রার্থনা করলেন।

রমলা বললে, 'আচ্ছা, ফিচারে কখনো ক্যারেকটার হয় বিশ্বসাহিত্যে তেমন কোনো নজীর আছে?'

বললাম, 'জানি না।'

মহেন্দ্রবাবু এলেন। বললেন, 'তাঁতশিল্পীরা সব মরে গেল। এই বাংলার তাঁতীরা একদিন এমন ঢাকাই মসলিন তৈরি করত যে, একখানা শাড়ি নাকি একটা শামুকের মধ্যে ঢোকানো যেত। শিশিরে খড়ের ওপর বিছিয়ে দিলে সকালে দেখা যেত না। বাদশা আওরঙ্গজেবের কন্যা জেবুন্নিসা নাকি একবার বালিকা-বেলায় সাত পরদা ঢাকাই মসলিনের পোশাক পরে দরবারে আসতে বাদশা মেয়েকে নগ্ন দেখে হারেমে গিয়ে পোশাক পরে আসতে বলেছিলেন?'

আমি হাসলাম। নাইলন টেরেলিনও তো তাই হয়েছে। কিন্তু সেগুলো তো মিলের। লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যাপার।

শ্রীরামপুর থেকে ফিরে এসে শুনলাম রুখে গোপালপুরের রহিম জোলার মেয়ে হাসিনার সঙ্গে আহসান মিয়ার সাদি পড়ানো হয়েছে। জমি আর সোনার লোভে রহিম জোলা নাকি শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গেছে। রাজি না হলে তাকে কেটেই ফেলে দিত আহসান মিয়া। হাসিনা খুব কান্নাকাটি করেছে। বলেছে, 'আমি গলায় দড়ি দেব।' খবর এনেছে একটা চুড়িঅলী বুড়ী।

পাকা লাল নোনাফলটা দাঁড়কাকেই যখন খাবে তখন ঢিল ছুঁড়তে গিয়ে বুক উদাম করে ফেলে লজ্জা পেয়ে হাসিনার পালানোর মধ্যে আজ আর কোনো কাব্যই খুঁজে পেলাম না। মনে হল দাঁড়কাকটা হাসিনার নাকের মধ্যে ঠোঁট ঢুকিয়ে দিয়ে তার মগজ টেনে বার করে করে খাচ্ছে। খাবেই তো। জীবনটা তো আর উপন্যাস নয়!